"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

সমকালীন

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পঞ্চম বর্ষ বৈশাখ ১৩৬৪

সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ : বৈশাখ ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪ চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও

টেম্পল প্রেস ২ ন্যায়রত্ন লেন কলিকাতা—৪ হইতে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিকাতার জনতার মধ্যে আমি শরীরে মনে একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি এই কারণে মহারাজের নিকট অবসর প্রার্থনা করিয়া অদ্যই অপরাহ্ণের মেলে আমি বোলপুর ফিরিব স্থির করিয়াছি। মহারাজের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য গতকাল মুখেই জানাইয়াছি।

কৌন্সিলের দ্বারা কোথাও কাজ চলে না। কৌন্সিলকে সহায়রূপ করিয়া একজনকর্ত্তা কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে স্থলেও কৌন্সিলের সদস্যগণকে নিস্বার্থ হিতৈষিতার সহিত অধিনায়কের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ কূটচক্রান্ত পরস্পর বিরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা থাকেনা। মহারাজের বর্ত্তমান পারিষদবর্গের প্রতি মহারাজের কি যথার্থ শ্রদ্ধা আছে? ইহারা কি এতবড় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য? ইহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কি মহারাজের মঙ্গল হইবে? মহারাজ নিয়ত প্রশ্রয় দিয়া ইহাদের বলবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কোথায় ধীরে ধীরে সেই বল খর্ব্ব করিবেন, নিজেকে স্বার্থপর দীনচরিত্র ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের জাল হইতে মুক্ত করিবেন, না, রাজ্যশাসনভার ইহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া ইহাদের প্রলয়শক্তিকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিবেন?

ম্যাকলিন সাহেবকে শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা আর এক প্রস্তাব। আমার নিকট ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। ম্যাকলিন কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে শান্ত করিতে পারিবেন—কিন্তু চিরদিন তাঁহাকে পাইবেন না—এমন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শাসনকার্যে কোন ত্রুটি না থাকে, যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অপদস্থ হইবার কোন আশঙ্কামাত্র না ঘটে। যদি নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া কখনো নিশ্চিন্ত থাকেন তবে বিপদ তখনি ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। মহারাজের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে ত্রিপুরারাজ্যকে চিরদিনের মত দায়গ্রস্ত ও পঙ্গু হইতে দিবেন না। এখন ইহাকে কঠোর ব্যবস্থায় খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে। মহারাজের চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে তাহারা মহারাজের মঙ্গল লইয়া খেলা করিতেছে। তাহারা তাড়াতাড়ি রাজ্যের পতনের পূর্বেই নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয় তবে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু যেমন করিয়াই হৌক ইহারা কোনপ্রকার গুরুতর দায়িত্ব লইবার যোগ্য নহে—কারণ

উঁহারা লঘু চরিত্রের লোক। ইহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য নাই—এই জন্যই আমি মহারাজকে অনুনয় করিতেছি ইহাদের হাতে নিজেকে ধরা দিয়া অনুতাপের কারণ ঘটাইবেন না। বন্ধন রচনা করা সহজ ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন। এখন যদি পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া না দেখেন পরে আর সময় পাইবেন না।

রমণীর দ্বারা মহারাজের কার্যসাধন হইবে কিনা আমি জানিনা—তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও বলিতে পারিনা—তাহার সম্বন্ধে যেমনি ব্যবস্থা হউক তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু যে করিয়া হউক একজন সক্ষম ধর্ম্মভীরু মহারাজের একান্ত হিতৈষী ব্যক্তির আবশ্যক—তাহাকেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া রাজ্যচালনা করিতে হইবে। এমন লোকের প্রয়োজন যে ব্যক্তি রাজ্যের শক্রদের সহিত বা কোন প্রকার স্থানীয় দলের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বলের সহিত কাজ করিয়া যাইতে পারিবে—যাহাদিগকে দলন করা আবশ্যক তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে দলিত করিতে পারিবে। আমি মহারাজকে অত্যন্ত সরলভাবে ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া এই সকল কথা বলিলাম। যদি কোন কথা রূঢ় হইয়া থাকে মহারাজ ক্ষমা করিবেন। আমি আমার সংসারের সমস্ত জালবন্ধন ছিন্ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি—মহারাজের সহিত তিনিই আমার সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন, এই সম্বন্ধের দ্বারা আমার সাধ্যমত মঙ্গল সাধন না হইলে আমার ক্ষমা নাই এই জন্যই আমি মহারাজের পারিষদবর্গের আলোচনার বিষয় হইয়াও এই সমস্ত জটিল ব্যাপারের মধ্যে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়াছি। মহারাজকে সকল কথা জানাইবার অবকাশ পাইনা—আজ পত্রে নিবেদন করিলাম। এক্ষণে ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই সিদ্ধ হইবে—আমি কেবল মহারাজের মঙ্গল কামনা করিতে পারি তাহার অধিক আমার ক্ষমতা নাই। মহারাজের স্নেহঋণে আমি বদ্ধ, তাহা আমি কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিব না। এক্ষণে মহারাজ অনুমতি করুন আমি আমার কর্ম্মস্থানে গমন করিয়া শান্তিলাভের সাধনা করি। ঈশ্বর মহারাজের নিয়ত কল্যাণ করুন। ইতি ১৪ই পৌষ ১৩১৩

একান্ত অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খামের উপরে লেখা ঠিকানা H. H. The Maharaja Bahadur of Tippera
13, Park Street

(মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখা) বিশ্বভারতীর অনুমতিতে ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসর

হেমলতা ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে। দিন তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০। বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়ীতে। বিয়ে করতে যেতে হয়নি তাঁকে শ্বশুরবাড়ি। পরিবারের বড় ছেলের ও ছোট ছেলের বিয়ে বাপ-মা-রা ঘটা করে দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রথম কাজ ও শেষ কাজ বলে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের শেষ পুত্র। মা নাই—আড়ম্বরে উদাসীন পিতা তখন হিমালয়বাসী। বিয়েতে ঘটা করে কে। ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধুমধামের সম্পর্ক ছিল না তার মধ্যে। পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি—যার যখন বিয়ে হত সেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে—স্ত্রীআচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর। নূতন কাকিমার[১] আত্মীয়া—যাকে সবাই ডাকতেন 'বড় গাঙ্গুলীর স্ত্রী' বলে—রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তাঁর পরনে ছিল একখানি কালোরঙের বেনারসী জরির ডুরে।

বিয়ের সময় কাকিমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে—সে যে কত বড় আশ্চর্য মানুষ—কাকে তিনি পেলেন, এর কোনো ধারণাই তাঁর ছিলনা। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল—শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদানস্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড় মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। দালানের একধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের। দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান।

সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এলে তার থাকবার জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসলো সেই ঘরেই। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড়কুলো খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল ভাঁড়-খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুর করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোট কাকীমা ত্রিপুরাসুন্দরী[২] বলে উঠলেন,

—ও কি করিস্ রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলো সব উল্টে পাল্টে দিচ্ছিস কেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি—নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী।

২ নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী।

—জানোনা কাকিমা—সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ বাক্‌সিদ্ধ মানুষ—কথায় তাঁকে হারাতে পারবেনা কেউ। তাঁর কাকিমা আবার বললেন,

—তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে—তুই এমন গাইয়ে থাকতে?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কি চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে বুঝতে পারবেনা। আমরা যে কানে শুনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন সবই হারিয়ে গেছে—তবু যা পেয়েছি তাই রেখেছি মনে ধরে।

বাসরে গান জুড়ে দিলেন :

আ মরি লাবণ্যময়ী
কে ও স্থির সৌদামিনী
পূর্ণিমা জ্যোছনা দিয়ে
মাজিত বদনখানি
নেহারিয়া রূপ হায়
আঁখি না ফিরিতে চায়
অপ্‌সরা কি বিদ্যাধরী
কে রূপসী নাহি জানি।

দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন—সেটা আমার স্মরণ নাই। সেদিনকার পালা ওখানেই শেষ।

কাকিমা প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—মাত্র ১বৎসরের বড় আমার থেকে। তাই তার সাথে আমাদের বেশ ভাব জমেছিল পরে। নানারকম ছেলেমানুষি গল্প হত খুব। নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে—তিনিও আমাদের গল্পের দলের একজন। কাকিমার বিবাহের তিনমাস পরে আরেকটি ঘটনা না বলে পারছিনা। ন'পিসিমার[৩] প্রথমা কন্যা হিরন্ময়ীর বিবাহ। গায়েহলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। মধ্যাহ্ন ভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে দুটো। সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নূতন। সেই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রচলন। তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত, আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে। মেজো কাকিমার[৪] সঙ্গে কাকিমাও যাবেন প্রদর্শনীতে। বাসন্তীরঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড় বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কথায় বলে বিয়ের জল গায়ে

৩ স্বর্ণকুমারী।
৪ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী

পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে। সেঃ রোগা কাকিমা দিব্যি দোহারা হয়ে উঠেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় সেইখানে—হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে। কাকিমাকে সুসজ্জিত বেশে দেখে দুষ্টুমি করে গান জুড়ে দিলেন তাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে—

হৃদয় কাননে ফুল ফোটাও
আধো নয়নে সখি চাও চাও

এমন চড়া সুরে ধরেছেন যে জোর পৌঁছে যায় সবার কানে—

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসোহে
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসোহে।
হৃদয়ে কাননে ফুল ফোটাও
আধো নয়নে সখি চাও চাও
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসোহে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ

ভবানীগোপাল সান্যাল

পাখীর গান যদিও স্বতোৎসারিত কিন্তু তাদের লক্ষ্য পাখীসমাজ কিনা নিশ্চয় করিয়া তাহা বলা যায় না। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্রষ্টার মনের ঐশ্বর্য্য প্রকাশক হইলেও তাহার লক্ষ্য যে মানব সমাজ ইহা সুনিশ্চিত। সাহিত্যের সহিত মানবজীবনের গভীর সম্পর্ক জড়িত। মানসিক জীবনের সৃষ্টি হইতেছে সাহিত্য, এখানে হৃদয়মন ও মনীষা সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ করে। 'পর্য্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে'। সমগ্র মানুষ যেরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করে তেমনি তাহার লক্ষ্য সমগ্র মানুষকে সত্যরূপে প্রকাশ করা। এই প্রকাশের সত্য পরম লক্ষ্য। বিচার করিয়া দেখা হয়, কি প্রকাশ পাইয়াছে ও কতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া বস্তুরূপ বা বস্তুর ধ্যানরূপ সার্থক হইতে পারিয়াছে কিনা। গত শতাব্দীর সাহিত্যে বস্তুর ভাবরূপ প্রকাশিত হইত বলিয়া সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল মনোহর হইয়া ওঠা! কিন্তু বর্ত্তমান কালে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের পরিবর্ত্তনের ফলে বস্তু-জগৎ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে সাহিত্যের লক্ষ্য হইয়াছে মনোজয়িতা। সুতরাং বিষয় নির্বাচনের ও তাহার শুচিতা রক্ষার তাগিদ আর নাই।

সাহিত্যের ভাব চিরপুরাতন। এই চিরন্তনকে নূতন করিয়া প্রকাশ করা হয়। ভাবকে অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে আবার সর্বজনীন রূপ দেওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব যেরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ সাহিত্যের ভাব তেমনি সঞ্চারধর্মী। উপরন্তু, বিজ্ঞানের স্বভাব ব্যক্তিস্বভাব-বর্জিত। সত্য সম্পর্কে তাহার আছে অপক্ষপাত কৌতুহল। কিন্তু সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাহার পক্ষপাত ধর্ম্ম। 'সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা'। বিজ্ঞানের জানার আনন্দ সাহিত্যে যদি রসরূপে উদ্ভাসিত হয় তবে সাহিত্যের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ থাকে না। তবে বিজ্ঞানের কৌতুহল যদি সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সাহিত্য-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয়। জেমস্ জয়েস্ বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অবচেতন মনের কাহিনী বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিকে তাহার পরিবেশ ও অন্যান্য চরিত্রের আলোকে দেখিবার চেষ্টা করা হয়না, সেই জন্য তাহার পরিচয় রসরূপে সত্য নয়। অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে যাহা তাৎকালিক বা তাৎস্থানিক তাহা সর্ব্বপ্রধান আসন দাবী করিবার চেষ্টা করে। 'এইজন্য বর্ত্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব-কালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্য নিবেশ করিতে হয়'। আগুনের শিখাটাই সত্য। যদিও অপর্যাপ্ত ধূম্রের বিস্তৃতি আমাদের সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত করিতে পারে। *

* We see generation after generation or untrained readers being taken in by the sham and the adulterate in its own time—indeed preferring them, for they are more easily assimilable than the genuine article. [The use of poetry & the use of criticism in T. S. Eliot.]

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ চিরকাল সমান উজ্জ্বল থাকে না। "সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলেনা; মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে! আলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখনি অদ্ভুতের প্রাদুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্ছে বিকৃতির কাল"। অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ফলে এই অন্ধকারের কাল অনিবার্য্যরূপে দেখা দেয়। সমাজবিন্যাসের সহিত সাহিত্য সম্পর্ক যুক্ত। সেখানে প্রাণশক্তির অভাব দেখা দিলে সাহিত্যেও বিকৃতি দেখা দেয়। ইংরেজী সাহিত্যে ক্যারোলিন যুগ এই বিকৃতির কাল। কিংবা অষ্টাদশশতকে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে যে ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায় তাহার কারণ নিহিত আছে সমাজ-জীবনে। সামন্ততন্ত্রের অবসানে, বণিকশ্রেণী ধনের যে প্রাচুর্য্য আনিয়াছিল তাহা ম্লান হইতে থাকে। বাংলা দেশেও রাজনৈতিক ঔজ্জ্বল্যের অবসান ঘটিয়াছিল। যদিও জমিদারশ্রেণী মুঘল দরবারের অনুকরণে ঐশ্বর্য্যের গৌরব প্রকাশে যত্নবান হইয়াছিলেন তথাপি সমাজে যে ধনাভাব হেতু অনটন দেখা দিয়াছিল ইহা সত্য। ধনব্যাপ্তির কালে মানুষের মন স্বতঃই ক্রীড়াশীল হইয়া ওঠে, সমাজ-জীবনে নূতন ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। সমাজ যখন স্থিতিশীল হইয়া পড়ে তখন সকল ক্ষেত্রে ইহার বিকৃতি প্রকাশ পায়। অষ্টাদশশতকে উভয় দেশের সাহিত্য বাস্তবজীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। নূতন ভাবধারা ছিল না। সুতরাং দেখা যায় রীতিগত উৎকর্ষ। শিল্পী যেখানে বাস্তবজীবনকে ইতিহাসগত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে পারেন না সেখানে তাঁহার রচনা কৃত্রিম হইয়া পড়িবে।* এক যুগের সাহিত্য যদি অন্যের সাহিত্যাদর্শকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে সেক্ষেত্রেও ব্যর্থতা আসিতে বাধ্য। নূতন যুগের সার্থক সৃষ্টির মাধ্যমে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। কালিদাসের সাহিত্যের ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে মধ্যে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। পোপ বা ভারতচন্দ্র অতীতে পদচারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে সৃজনধর্মী ভাবপ্রবাহ না থাকায় তাঁহারা রীতির দিকে অধিকতর মনঃ সংযোগ করিয়াছিলেন। লোকভাষাকে গ্রহণ না করায় তাঁহাদের ভাষাও ছিল কৃত্রিম।† সাহিত্যে সাম্প্রতিককালের ডাডাইজম্‌কে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে ভাষায় অর্থ বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়া পাঠক মনে চমক লাগানো এই মতবাদের উদ্দেশ্য। ইহাতে বাংলা সাহিত্যেরও আশঙ্কার কারণ আছে। আমরা শাস্ত্রমানা জাত বলিয়া সহজেই অনুকরণ প্রিয় হইয়া উঠি। ইহা আধুনিকতা বলিয়া গর্ব করিবার বিষয় নহে। বিশ্বকে নির্বিকার চিত্তে তদ্‌গত ভাবে দেখা যথার্থ আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন 'এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ।

* The only approach to truth is a historic one, an approach which comprehends the phenomenon in terms of its past and its future. [Literature & Reality : Howard Fast.]

† The poetry of a people takes its life from the people's speech and in turn gives life to it and represents its highest point of consciousness, its greatest power and its most delicate sensibility. [The use of poetry : T. S. Eliot.]

আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিকে দেখবে এইটেই যে শাশ্বতভাবে আধুনিক'।

'সাহিত্যের পথে'র অন্য একটি প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে বিজ্ঞানের অপক্ষপাত কৌতূহল সাহিত্যের নয়। সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা। এই উক্তির মধ্য দিয়া সাহিত্যে আদর্শ-বাদের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। 'নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমস্ত দৃষ্টিতে দেখা'র মধ্য দিয়া সাহিত্য সৃষ্টির মূল সত্যটি, তাহার অপরিবর্ত্তনীয় রূপটি গ্রহণ করা হইয়াছে।* ইহা কোন বিশেষ কালের কথা নহে। কিন্তু সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তনের ধারণাটির পরিচয় প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগ হইতে লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নগ্নরূপ ও বিপুল ক্ষয় ক্ষতির অভিঘাতে সকল বিশ্বাস ও আনন্দের অবসান সাহিত্যে পরিবর্ত্তন সূচিত করে। যুদ্ধের ফলে দুইটি প্রতিক্রিয়ার ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেল সাহিত্যে অবিশ্বাস, বিদ্রূপ ও সন্দেহের সুর। ইহা হইতে আসিল নেতিবাদ ও তির্য্যক দৃষ্টিভঙ্গী। দ্বিতীয়তঃ আবির্ভূত হইল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। টি, এস, এলিয়ট প্রভৃতি কবির কাব্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সুর প্রবলরূপে প্রকাশিত হইল।

This birth was
Hard and bitter agony for us, like death, our death.
We returned to our palaces, these kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation
With an alien people clutching their gods
I should be glad of another death.

রোমান ক্যাথলিক চার্চে গভীর বিশ্বাস টি, এস এলিয়টকে তখন জীবন-ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেও অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের কবিগণের মধ্যে দুইটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হইয়াছিল। একদল নূতন মতবাদ (প্রলেটেরিয়ান হিউম্যানিজম্) গ্রহণ করিলেও শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতার সহিত শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। আর একদল বস্তুগত জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া জীবনের অন্তর্লীন সমস্যাকে রূপদান করিয়াছেন।†

জীবন ও শিল্পকে পৃথকরূপে দেখা যায় না। মানুষের ভাবজীবন ও বাস্তবজীবন অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত। বুর্জোয়া সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা বাস্তবজীবন হইতে সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়কে আলাদা করিয়া দেখে। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক অথচ যৌথভাবে জীবনের সহিত

* The standard for realism is the distillation of the objective truth, whether in the general or in he specific, not the particular style or form, which the writer may choose. [Literature and reality : H. Fast.]

† Proletarian humanism of Marx-Lenin-Stalin is a humanism whose aim is the complete liberation of all races and nations from the iron talons of capital.
[Articles & pamphlets : Maxim Gorky.]

সংলগ্ন ও তাহার পরিপূরক। সাহিত্য মানবমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ বলিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। মানুষের চেতনার বহির্ভূত অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা সাহিত্যের রূপ ও প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবন ও সাহিত্য যতক্ষণ না সমসূত্রে গ্রথিত হয় ততক্ষণ শিল্পসৃষ্টির কোন সার্থকতা নাই। প্রলেটারিয়ান সাহিত্যের অর্থ ইহা নহে যে ইহার মধ্যে মার্ক্সীয় দর্শন বা শ্রেণীসংঘর্ষের তত্ত্ব যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই সাহিত্যে বাস্তবকে রূপ দেওয়া হয়। পূর্ব্বযুগে বাস্তব অর্থ ছিল স্রষ্টার মন জীবনের যে অংশটুকুকে গ্রহণ করে। মনের স্বীকৃতির বহির্ভূত জীবনের মূল্য সাহিত্যক্ষেত্রে নাই। কিন্তু প্রলেটারিয়ান আদর্শ অনুযায়ী বাস্তব অর্থে গ্রহণ করা হয় জীবনের বহিরঙ্গ রূপকে। বাস্তবজীবনের নিজস্ব যে রূপ বা অস্তিত্ব আছে, তাহা নিছক ব্যক্তি চেতনা সাপেক্ষ নয়, সৃষ্টি-প্রয়াসী শিল্পীর মানসকল্পনাও নহে—তাহা একান্তরূপে বস্তুগত। বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্জন করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিবার যে বলিষ্ঠ আশা ইহাই প্রলেটারিয়ান সাহিত্যের উপাদান। বন্ধনমুক্ত, সৃষ্টিশীল সুখী মানবজীবনের ইতিহাস উদ্গীত হইয়াছে নূতন সাহিত্যে।*

সাহিত্যসৃষ্টির জন্য শিল্পীর ও তথা সমাজজীবনের স্বাধীনতা আবশ্যক। শ্রেণী-সমাজে এই স্বাধীনতা নাই বলিয়া শিল্পীরা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়েন ও তাঁহাদের সৃষ্টি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যম রূপে দেখা দেয়। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া শিল্পী একদিকে যেমন নিজেকে উপলব্ধি করেন তেমনি পাঠকও ইহার মধ্যে জীবনের মূল্য খুঁজিয়া পায়। জীবনে যাহা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ তাহাই সাহিত্যে সুসম্পূর্ণ ও সুষমা মণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়।

আদিম সমাজে কবিতা ছিল সমস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। শিকারীর আনন্দ, প্রতিকুল প্রকৃতি-শক্তিকে বশীভূত করিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কার্য্যাবলী প্রাচীন কবিতায় রূপ পাইয়াছে। তাহার পড়ে মানুষ যখন ঘর বাঁধিয়াছে, খাদ্য উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে তখন কালক্রমে উৎপাদক-মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ যতদিন পর্য্যন্ত প্রকট হয় নাই ততদিন প্রকৃতির সহিত নিবিড় সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে। বিভক্ত সমাজে মানুষের আশা, নৈরাশ্য, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া উদ্ভূত হইল গীতিকবিতা। সমাজ জীবনে যতই বিচ্ছেদ ও দুঃখ প্রবল হইয়া উঠিতেছে ততই কবিতা কবির আত্মগত অভিজ্ঞতা ও বেদনার বাহন হইয়া দেখা দিতেছে। সাধারণ পাঠকসমাজ কবিতার জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। কবিতা অতিমাত্রায় রোমান্টিক বা বাস্তব হইয়া পড়ায় কবিতায় ভাষাও উৎকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। রীতিগত উৎকর্ষ কবিতায় হয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু ভাব-সম্পদ, জীবনের মূল্যবোধ হ্রাস পাইতেছে।

ভাবের বাহন যে ভাষা তাহা লোকজীবন হইতে গৃহীত না হওয়ায় তাহার আবেদন সীমাবদ্ধ

* You must take the difficult creative road- that of refashioning the categories and technique of art so that it expresses the new world coming into being and is part of its realisation. [Illusion & reality : C. Caudwell.]

হইয়া পড়িতেছে।* অবশ্য টি, এস, এলিয়টের মতে কবি অনেক সময়ে নূতন শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন যাহাতে ভাব ও ভাষা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে।

কবি বা শিল্পী বিপ্লবের অধিনায়ক হইতেন না; যদিও তাঁহার রচনা নূতন সমাজ-জীবন গঠনের কার্যে সহায়ক হইবে। বিপ্লবের মধ্য দিয়া জীবন হইবে মুক্ত, সমাজ-বিন্যাস হইবে সুষ্ঠু যাহাতে শিল্পী আনন্দের বার্তা প্রকাশ করিতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক শিল্পীদের সাধনাও ব্যক্তিগত কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিতে সমগ্র সমাজের মানস-জীবন প্রতিফলিত হইয়া ওঠে।

সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, কার্যক্ষেত্রে এই সাহিত্য রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যম রূপে রূপায়িত হইয়া ওঠে। সাহিত্যকে যখন সামাজিক ক্রিয়া বলিয়া দাবী করা হয় তখন ইহাকে রাষ্ট্রানুমোদিত সমাজ-সেবার অনুকূল কার্যে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য ধর্ম স্রষ্টার মনের ঐশ্বর্যের প্রকাশ। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা নিজেকে উপলব্ধি করেন কিন্তু এই সৃষ্টি কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নহে। কর্মী ও শিল্পীর কাজ সম্পূর্ণ পৃথক। কর্মী তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়া বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি অহৈতুক। কবি 'আশুপ্রয়োজনের সদ্যঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ করে' দেখান।

আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাইতেছে জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যে সেই বাণীর ধারা প্রবাহিত। 'যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত তার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন করে নিয়ে তার রস পাই।'

সাহিত্যসৃষ্টিতে স্রষ্টা আপনাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই উপলব্ধির নিবিড়তা সাহিত্যের বাস্তবতা প্রমাণ করে। বাস্তব বলা যাইবে তাহাকে যখন স্রষ্টা বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া এমন কিছু ভাব সত্য সৃষ্টি করেন যাহার মধ্যে তিনি নিজেকে প্রবলরূপে উপলব্ধি করেন। 'বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব'।

ছন্দে, ভাষায়, ইঙ্গিতে যখন কোন কিছু জীবন্ত হইয়া ওঠে ও আমাদের মনকে জাগাইয়া তোলে তখন তাহা শিল্পবস্তু হইয়া ওঠে, তাহাই সম্পূর্ণ রূপে বাস্তব। এই অর্থে ছেলে-ভুলানো ছড়া বাস্তব, রূপকথার কাহিনী বাস্তব। বস্তুভার মানুষকে পীড়িত করে। তাহার দায় এড়াইবার জন্য মানুষ বস্তুকে বস্তুর অতীত করিতে চায়। 'সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে

* ভাষার এই কৃত্রিমতা সম্বন্ধে কড্‌ওয়েল মন্তব্য করিয়াছেন 'the vocabulary of the bourgeois poet became esotaric and limited. It was not limited in the sense of limitation of number of words but limitation of useable public values of words. [Illusion & reality : Caudwell.]

দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য। সেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মলাভ করে আছে।' রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে ঘড়ায় করিয়া মানুষ জল আনে। কিন্তু তাহাকে সে প্রয়োজনাতিরিক্ত করিয়া তুলিবার জন্য অলঙ্কৃত করিল, সুন্দর করিয়া তুলিল। কিন্তু বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্তা বাঁধিয়া জল আনিবার মধ্যে বস্তুভার আছে, সৌন্দর্য্য নাই। শিল্পের ক্ষেত্রে তাই ঘড়া বাস্তব ও সার্থক, টিনের ক্যানেস্তা নিছক বস্তুভার-পীড়িত। প্রয়োজনের দায়ে মানুষ যুদ্ধ করে, শত্রু হনন করে কিন্তু হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের জন্য বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। মানুষ আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে বস্তুতে বা তত্ত্বে পায়না। যেখানে বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ সেখানে বাস্তবতার যথার্থ পরিচয়।

বিশ্বের সঙ্গে এই চিরন্তন যোগ অনুভব করিয়াছে কিনু গোয়ালার অস্বাস্থ্যকর গলির অধিবাসী হরিপদ কেরানী। বাস্তব জীবনে সে বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত কিন্তু ভাবজীবনে তাহার সহিত আকবর বাদশাহের কোন পার্থক্য নাই। তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায় হরিপদর জীবনে ভাবসত্য ও বাস্তব জীবনের মধ্যে কাহার প্রভাব সমধিক? ভাবজীবনে তাহার ক্ষণিক মুক্তি তাহাকে বাস্তবের সকল ক্লেশ ভুলাইতে পারে কি না? পিলু-ভাঁইরোবার তাল মনে তাহার সম্মোহ রচনা করে বটে কিন্তু যখন সে বাস্তবে ফিরিয়া আসে তখন তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া যে ওঠে, ইহা সত্য।

রামায়ণ মহাভারতের অমৃতকাহিনী প্রত্যেক মানবের নিকটে সুধা আনিয়া দিতেছে। 'নিতান্ত তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রামলক্ষণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণা মিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে'।

মানুষের দুঃখলাঞ্ছিত কুটীরে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজাদের সুখদুঃখের কাহিনী প্রবেশ করিয়া দারিদ্র দুঃখকে লঘু করিয়া তুলিতেছে। মানুষের ভাবসৃষ্টি সাহিত্য বাস্তব সংসারের চারিদিকে দ্বিতীয় একটি সংসার রচনা করিতেছে।

কিন্তু এই দ্বিতীয় সংসারে মানুষ ক্ষণকালীন মুক্তিলাভ করিতে পারে। সাময়িকভাবে দুঃখ ভুলিতে পারে তথাপি বাস্তবজীবনের রূঢ়তা ভুলিয়া যাইবার উপায় নাই। নাইটিংগেল পাখীর গান কীট্‌সের মনে স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে বাস্তবের আকস্মিক সংঘাতে তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল 'Do I wake or sleep'?

রবীন্দ্রনাথের মতে বিশুদ্ধ সাহিত্য অহৈতুক লীলা। সাহিত্যের লক্ষ্য উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হইয়া যাইবার আনন্দ। বস্তু আপন অপ্রয়োজনীয় তথ্যভার বর্জন করিয়া শিল্পীর নিকটে সত্য হইয়া ওঠে।

সাহিত্যে ব্যক্তি-রূপের প্রকাশ। মানুষের জীবনে সীমা ও অসীমের ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। সীমার ক্ষেত্র নিঃশেষিত হইয়া যায় ব্যবহারিক জীবনে, প্রয়োজন সাধনের তাগিদে। কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ ও আত্মত্যাগ মানুষের মনকে অসীমের অভিমুখীন করিয়া তোলে। যেখানে মানুষ সৃষ্টিশীল সেখানে প্রকাশ পায় তাহার ঐশ্বর্য্য। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে বলিয়া শিল্পসৃষ্টি বাস্তবের ভাবরূপের প্রকাশ।*

সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রাচুর্য্যের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। এই সাহিত্যসৃষ্টিকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহার মধ্যে অতিশয়তার স্পর্শ লাগে। যে মানসজগৎ হৃদয়-ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাকে ছন্দ ও অলঙ্কারের আভাস-ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।

'অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ'।

সাহিত্যের বিষয় ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নহে। ব্যক্তি যাহা কিছু আপন বিশেষত্বের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া ওঠে।

'সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে কোন পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি। জীবজন্তু গাছপালা নদীপর্বত সমুদ্র ভাল জিনিস মন্দ জিনিস ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি—নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হলো, তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত'।

যাহার বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয় তাহাই ব্যক্ত হয়। তখন সে বস্তু বা মানুষের নাম ব্যক্তি।

বুদ্ধদেব বসুর 'ব্যক্ত' নামক কবিতায় (শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর) বই-এর দোকানের মালিক অবন্তীবাবু 'নিষ্প্রভ নির্জীব বিবর্ণ মানুষ, লাখে একটাও হয়না।' তাঁহার মধ্যে যাহা অসাধারণ তাহা তাঁহার নামে। 'আর যা—তাকে সাধারণ বললে অপমান হয় সাধারণের।' কিন্তু তিনি একদা গল্প করিয়া গেলেন তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু-কাহিনী, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যিকদের প্রতি অনুরাগের কথা। অবন্তীবাবুর জীবন হইতে যবনিকা অপসারিত হইল, তিনি ব্যক্ত হইলেন।

দেখে চেনা যায় এমন কোন রূপ নেই তার।
মুছে যাওয়া ছবির মতো তিনি ছিলেন
যা কেউ লক্ষ্য করেনা, তবু নামিয়েও রাখেনা।
সেই আবছায়ার ছাইরঙা আচ্ছাদন সরিয়ে
হঠাৎ তিনি স্পষ্ট হলেন, ব্যক্ত হলেন,
হলেন ব্যক্তি।

সুতরাং সাহিত্যে ব্যক্তি সুপরিস্ফুট। এইজন্য সাহিত্যে শ্রেণীরূপ অপেক্ষা ব্যক্তি-রূপ অধিকতর আদরনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে 'ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিজনক সমাজের তাড়নায় চিরদিন সংকুচিত।' রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন 'সাহিত্য জগন্নাথের ক্ষেত্র, এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তি অপমান চলবেনা'।

সংস্কৃতি, সাহিত্যে ব্যক্তির বর্ণনা শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। সেখানে 'সকল সুন্দরীরই

---

* So we find that our world of expression does not accurately coincide with the world of facts, because personality surpasses facts on every side.

[Personality : Rabindranath.]

গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য'। রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যে যদিচ শ্রেণীপরিচয় প্রাধান্য দাবী করে তথাপি ব্যক্তি-পরিচয় কম উজ্জ্বল নহে। কিন্তু ব্যক্তি-পরিচয় স্বভাবতঃ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তত্ত্ব-বাহী নাটকে। রাজা নাটকে শ্রেণীপরিচয় অত্যন্ত উজ্জ্বল ও প্রধান। মুক্তধারায় রাজা রণজিৎ ও রক্তকরবীতে রাজা ও নন্দিনী ব্যতীত সকলে শ্রেণীপরিচয় বহন করে। বার্ণার্ড শ'র ভাব-বাহী নাটক 'ব্যাক টু মেথুসেলাতে' শ্রেণী-পরিচয় একান্তরূপে সত্য।

সাহিত্যে তথাকথিত বাস্তবতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'অন্যান্য সকল বেদনার মত সাহিত্যে দারিদ্র্য-বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে ঝাঁঝ বাড়াইবার জন্য দরিদ্রদের দুঃখের কাহিনী অবতারণা করিবার তাগিদ দেখা যায়। ইহা সৌখীন মজদুরি মাত্র। কৃষক মজুর আদিবাসীদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনার প্রয়াস বঙ্কিম প্রবর্তিত রোমান্স ধারা রক্ষার প্রচেষ্টা মাত্র। বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকগণ বঙ্কিম-সৃষ্ট পথে পা বাড়াইয়াছেন। সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সাহিত্য সৃষ্টি করিতে যেরূপ সংযত কল্পনা প্রয়োজন তাহা উপভোগ করিতেও মনের সংযম প্রয়োজন। সাহিত্য-রস সমাহিত পাঠকের উপভোগ্য হয়। মনের এই সংযম আমাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির গভীরতা বাড়াইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন মহিষীকে দেখিবার জন্য। তিনি দেখিতে পাইলেন না কারণ মন তাঁহার শুচি ছিলনা।

'কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারেনা। সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই।'

উপরন্তু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে হইলে শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ইয়ারো নদীর সৌন্দর্য্য ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থকে মুগ্ধ করিয়াছিল কারণ তিনি মন দিয়া এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের চাঞ্চল্য ও হৃদয়মন্থনকারী রমনীয়তা বর্ণিত হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মঙ্গলের পরিপূর্ণতা সৌন্দর্য্যের গম্ভীর মাধুর্য্যে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাই কুমারসম্ভবের কবি অকাল বসন্তের সমারোহ মধ্যে উমার প্রেম-প্রত্যাখ্যানের চিত্র না আঁকিয়া তাঁহাকে তপঃশুদ্ধা করিয়াছেন। মেঘদূতের বিরহী যক্ষ পৃথিবীর মঙ্গল-ব্যাপারের সহিত মেঘকে যুক্ত করিয়া তাহাকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে মঙ্গল ও শান্তির মধ্যে।

"বস্তুত সৌন্দর্য্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগলভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্য্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্য্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

সাহিত্যসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করিয়াছেন অহৈতুক লীলারূপে। গ্রীকশিল্পী ভস্মাধারে

উৎকীর্ণ রূপের মধ্যে অরূপকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে কোন প্রয়োজন সাধনের তাগিদ নাই। এই চিত্রাবলী আমাদের মনকে অসীমের অভিমুখীন করিয়া তোলে।

সাহিত্য দুইপ্রকারে আমাদিগকে আনন্দ দেয়। সাহিত্য সত্যকে প্রত্যক্ষগোচর ও মনোহর করিয়া দেখায়। একটি পানাপুকুরও যদি সাহিত্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে তাহা মনকে প্রফুল্ল করে। দামুন্যা গ্রাম তাহার সমগ্র পরিচয় লইয়া আমাদের নিকটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র রূপ লইয়া সাহিত্যের বিষয় আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহার মূর্তি মনোহর। ভাঁড়ুদত্ত বা হীরামালিনী সমগ্ররূপে আমাদের নিকটে ব্যক্ত বলিয়া তাহারা আমাদের মনকে প্রসন্ন করে।

সাহিত্যে যাহা উপকরণ বিভাগ, ভাষা ও ছন্দ তাহাও মনকে আনন্দ দেয়। 'এইজন্য অনেক সময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।' সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের জনপ্রিয়তা মূলতঃ তাঁহার ছন্দ ও শব্দ—পারিপাট্যের উপরে নির্ভরশীল।

সাহিত্যের সৌন্দর্য নিবিড় বোধের দ্বারা প্রমাণিত হয়। এমন কি দুঃখ বা শোক যখন গভীর ভাবে অনুভব করা যায় তখন তাহাও সুন্দর হইয়া ওঠে। শোকের অভিঘাতে আমাদের মন জড়তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে ও চতুর্দিকের পরিবেশকে প্রবলরূপে জানিতে পারে। সাহিত্যে স্বার্থবোধ মনকে পীড়িত বা শঙ্কাতুর করিয়া তোলেনা। তাই, ট্রাজেডি আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনন্দের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে। আনন্দ সম্ভোগের ক্ষেত্রেও নির্বাচনের কর্তব্য আছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন। 'আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বস্তুবিচার আছে।' কিন্তু এই নির্বাচন সামাজিক কল্যাণবোধে কিনা তাহা তিনি বলেন নাই। সাহিত্য নৈতিক উৎকর্ষ শিক্ষা দেয় বলিয়া শেলী বলিয়াছেন।* তবে দেখা যাইতেছে সাহিত্যে স্রষ্টা আপন ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেন ও বহু বিচিত্র উপায়ে তিনি উপভোগ করেন কিন্তু সেই আস্বাদনের সহিত সমাজ কল্যাণের যোগ আছে। আর্টের স্বয়ংসম্পূর্ণতা কথাটা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। সমাজের প্রতি দায়িত্বের কথা সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিঘোষিত হইয়া থাকে। সাহিত্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সহিত অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত। সামাজিক জীবনকে মুক্ত ও নিরাপদ করিবার কর্তব্য শিল্পী এড়াইয়া যাইতে পারেনা। দৃষ্টান্তস্বরূপে কে, সাইমোনভের কাব্যসৃষ্টির কথা ধরা যাউক। তাঁহার একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নায়ক একজন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী।† সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সম আদর্শসম্পন্ন বন্ধুদের সাহায্যে তিনি ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াইয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কোথাও-বা বাধা প্রাপ্ত হইয়া, কোথাও বা আদর্শবাদীদের দুর্জয় সঙ্কল্পে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ইহাই নানা কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। সমাজ-কল্যাণের আদর্শে এই কাব্য-গ্রন্থ অনুপ্রাণিত কিন্তু ইহার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সুর এত উচ্চ যে ইহা রস-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়িবে না। তথাপি, এই কাব্যে নূতন যুগের সাহিত্যের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে।১

* Preface to Prometueus Unbound.

† Friends and foes : K. Simonov.

১ প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদে কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভুরি ভুরি

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে আর্টিস্টের দৃষ্টি প্রকৃতির ধারা অনুসরণ করিয়া চলেনা। প্রকৃতির রাজ্যে আছে বাহুল্য। সেখানে যথাযথ রূপে প্রকাশের জন্য শিল্পীর নিপুণ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। 'আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মতো।...বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে'।* কল্পনাকে শুধু মন নির্দেশ দেয়না, সৃষ্টিকার্য্যে হৃদয়-মন-মনীষা সমভাবে যুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়া যায়। এই সৃজনশীল কল্পনা সামান্য বা অসুন্দরকেও বিশিষ্ট করিয়া তোলে। ইন্দ্রিয়বোধের জগৎ ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়। সাহিত্যসৃষ্টির ইহাই রহস্য।

সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে (গ্রন্থের) প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়'।† প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানকালে সমালোচনার অর্থ দাঁড়াইয়াছে বাজারদর-যাচাইকরা, কারণ সাহিত্য হইয়াছে হাটের জিনিস। সকলে এখন চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায়। তাহাতে ঠকিবার ভয় কম।

'তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র'।‡ বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। এই পদ্ধতির সাহায্যে সৃষ্টির যে অবিশ্লেষ্য গৌরব তাহাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। মানুষের মধ্যে নানাপ্রকারের প্রকৃতি আছে। ইহাদের অস্তিত্বের দ্বারা মানুষের গৌরব নহে। যে অভাবনীয় প্রক্রিয়ায় ইহারা সম্মিলিত হইয়া মহত্ব লাভ করে তাহা দ্বারা চরিত্রের বিকাশ ঘটে। সেই যোগের রহস্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের চরিত্রে নানা প্রবৃত্তির অস্তিত্ব ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহাদের সার্থক সমন্বয়ে বুদ্ধদেবের চরিত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের রস আস্বাদন করা যাইতে পারে ব্যাখ্যা দ্বারা। 'আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটি বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রসবিচার'। সাহিত্যের বিচার তাই সাহিত্যের ব্যাখ্যা।

সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণমূলক, এই উভয়বিধ সমালোচনা প্রচলিত আছে। পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যা যদি সমালোচনার প্রকৃত আদর্শ বলিয়া যদি গ্রহণ করা হয় তবে আবেগের আধিক্য যে সাহিত্যের রসভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে তাহার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। অনেক সময়ে ব্যাখ্যা, রচনার না হইয়া সমালোচকের ভাব ও রুচি অনুযায়ী হইয়া দাঁড়ায়।

ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসেনা, সমস্যা সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলঙ্কৃত হোক তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবী মিটলেই তার অন্তর্ধান।

(র, রচনাবলী ১, অবতরণিকা)

* It would be more correct to describe naturalism as a retreat from realism, realism being that literary synthesis which through selection and creation heightens for the reader his understanding of reality. [Literature & Reality : H. Fast.]

† প্রাচীন সাহিত্য

'প্রাচীন সাহিত্যে' মেঘদূত সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব রসজ্ঞ পাঠকের মন লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা কালে ('আধুনিক সাহিত্য') রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে মূলগ্রন্থের রসভোগের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইয়াছে। রসের পরিচয় ও বিচার, বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় সার্থক ভাবে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যার সহিত বিচার, যাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাই সমালোচনার শ্রেষ্ঠ পন্থা।*

* টি, এস, এলিয়টও বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :
It is only the exceptional reader, certainly, who in the coarse of time comes to classify and compare his experiences, to see in the light of others ; and who, as his poetic experiences multiply, will be able to understand each more accurately. (The use of poetry & the use of criticism).

প্রমথচৌধুরীর 'চার-ইয়ারী-কথা'

রথীন্দ্রনাথ রায়

চল্লিশ বছরেরও বেশী হ'লো প্রমথচৌধুরীর' চার-ইয়ারী-কথা' লেখা হ'য়েছে[১]। ইতিমধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বহুশাখায়িত পরিধি-বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু 'চার-ইয়ারী-কথা'র নিঃসঙ্গ মহিমা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। রূপসৃষ্টির অনন্যতায়, দীর্ঘ-অনুশীলিত বিদগ্ধ মানসিকতায় ও মাজ্জিত ক্লাসিক গুণের বাঁধুনীপনায় কাহিনীটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'চার-ইয়ারী-কথা' আসলে চারটি বিচ্ছিন্ন ছোট গল্পের সমষ্টি—চারটি বিচ্ছিন্ন ছোট গল্প হিসাবেও এর মূল্য কম নয়—চারটি পরিচ্ছন্ন নাতিদীর্ঘ মুক্তা-নিটোল কাহিনী! কিন্তু বৃহত্তর অর্থে কাহিনীটি একটি চতুরঙ্গ-উপন্যাস। চারটি বিচিত্র ধরণের প্রেম কাহিনী একটি দীর্ঘ প্রসঙ্গের এক একটি অধ্যায় মাত্র। কাহিনীগুলির ফাঁকে ফাঁকে সরস মন্তব্য, সমালোচনা ও বিতর্কের অংশগুলি আপাত-বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলির সংযোগরেখাকে ভরাট ক'রে তুলেছে। গল্পচারটির ভূমিকা অংশটির পরিবেশ-চিত্রণের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে—পরিবেশটিও যেন গল্পগুলির মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্যের সৃষ্টি ক'রেছে। মেঘ-মূর্চ্ছিত ম্লান আকাশ ও চাঁদের রহস্যাচ্ছন্ন পাণ্ডুর আলো সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন এক প্রেতায়িত ছায়া বিস্তার ক'রছে। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এক অনির্দেশ ও অপরিচিত সঙ্কেত "কৌতূহল মিশ্রিত আতঙ্ক" সৃষ্টি ক'রেছে। আসন্ন দুর্যোগের আতঙ্ক-পাণ্ডুর পরিবেশ—ক্লাবঘরে যে চারটি বন্ধু এতক্ষণ তাসখেলায় মগ্ন ছিল, আকস্মিক দুর্যোগে তারা বাড়ী ফিরতে পারে নি—তাই বৃষ্টি না ছাড়া পর্য্যন্ত তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা ব'লেছেন। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী-বিবৃতির জন্য একটি বিশেষ ধরণের পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। ম্লান আলোর স্পর্শে স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছিত পৃথিবী যেন ক্লাবঘরে সমবেত চারটি বন্ধুকে মুখর ক'রে তুলেছিল—যেন তারা আজ সম্পূর্ণ নূতন পৃথিবীর মানুষ। যা কিছু গোপনীয় ও অব্যক্ত—যা প্রাত্যহিকতার ধূলিজালে আচ্ছন্ন তা যেন এক মুহূর্ত্তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আজ যেন তারা প্রতিদিনের নয়—প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে তারা যেন একই রসলোকের তীর্থপথিক। বহিঃপ্রকৃতির এই নিগূঢ় সঙ্কেত তাদের মানসলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রেছে: "বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ ক'রেছিল, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা নূতনভাবের মানুষ হ'য়ে উঠেছিলুম। যে সমস্ত মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে, তার বদলে দিনের আলোয় যা কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হ'য়ে থাকে, তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।—"এই সুমিত মন্তব্যটির সাহায্যে লেখক অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই ব্যঞ্জনাটি কাহিনী-চতুষ্টয়ের কেন্দ্রীয় ঐক্যকে ঘনবদ্ধ ক'রেছে।

১। জানুয়ারী, ১৯১৬

ক্লাবঘরে সমবেত চার-ইয়ারের শুধু মনেই নয়, কাহিনীতেও ম্লান-পাণ্ডুর মেঘ-মূর্চ্ছিত প্রকৃতির অল্প-বিস্তর প্রভাব আছে। 'সোমনাথের কথা' অংশটির মধ্যে এই প্রভাব খুব নিগূঢ় নয়, কিন্তু অনিদ্রা-কাতর রুগ্ন-দেহ মনের ক্রিয়া যে গল্পটির ওপরে একেবারেই প্রভাব বিস্তার করেনি, এ কথা বলা যায় না। রিণীর মনের দু'একটি আকস্মিক ভাবান্তরের বর্ণনায় লেখক বহিঃপ্রকৃতির আলোছায়া রঞ্জিত ধূসর রহস্যময় রূপের বর্ণনা দিয়েছেন : "আমরা বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, সুমুখের দিগন্ত বিস্তৃত গোধূলি-ধূসর জলের মরুভূমি ধূ ধূ করছে। তখনও আকাশে আলো ছিল। সেই বিমর্ষ আলোয় দেখলুম, "রিণীর মুখ গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, সে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু সে দৃষ্টির কোনও লক্ষ্য নেই। সে চোখে যা ছিল, তা ঐ সমুদ্রের মতই একটি অসীম উদাসভাব।"—সেনের কথা'য় কাহিনী অংশের চেয়ে স্বপ্ন-মদির পরিবেশ বর্ণনা অনেক বেশী স্থান অধিকার ক'রেছে। ফেনিল জ্যোৎস্নায় রূপকথার পরীরাজ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার প্রসারিত হ'য়েছে—চারদিক যেন অজস্র পুষ্পবর্ষণ। জ্যোৎস্নাফুলের মাঝখানে একটি চিরন্তনীর আকাঙ্ক্ষা শরীরিণী হ'য়ে উঠেছে। বাইরের পাণ্ডুবর্ণ ধূসর আলো গল্পটির পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকরঞ্জিত পরিবেশের বিপরীত—কিন্তু রহস্য-ব্যঞ্জনায় দু'টি ছবির মধ্যে যেন কোথায় একটি একাত্মতা আছে! 'সীতেশের কথা'য় লণ্ডনের নভেম্বর মাসের নিরানন্দ পরিবেশ, স্যাঁত সেঁতে বর্ষান্ধকার ও বৈচিত্র্যহীন অবকাশ গল্পটির উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা ক'রেছে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে গল্পটির পরিবেশ বর্ণনার সংযোগসূত্র একেবারে অনুপস্থিত নয়। চতুর্থ গল্পটিতে বহিঃপ্রকৃতির কোন মুখ্য প্রভাব নেই, কিন্তু গল্পটির যে পরিবেশ আছে তার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির একটি অদৃশ্য সংযোগসূত্র আছে। জনবিরল প্রকাণ্ড পুরী, নিস্তব্ধ রাত্রির প্রেতায়িত পরিবেশ ও নিশাচরধ্বনি মিলে একটি অলৌকিক শিহরণ সৃষ্টি করেছে—এই পরিবেশই যেন টেলিফোনের প্রেতকণ্ঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কাহিনী বর্ণিত পরিবেশগুলির সঙ্গে গল্পের 'সেটিং'-এর একটি নিগূঢ় ঐক্য আছে। আপাত-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এইখানে একটি অদ্ভুত সমন্বয় আছে।

গল্পগুলির মধ্যে ভাবগত ঐক্যও অনুপস্থিত নয়। চারটি গল্পেই প্রেমের অসঙ্গতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রেমানুভূতির সহজ সাবলীল প্রবাহটি এখানে আকস্মিকতার মরুবালির মধ্যে পথ হারিয়েছে। প্রেমের শান্ত ধীর মিলনাত্মক রূপ ফুটিয়ে তোলা যেন লেখকের কাম্য নয়—প্রেমকে তিনি একটি অসাধারণ বক্রতীর্যক দৃষ্টির সাহায্যেই পর্যবেক্ষণ ক'রেছেন। তার বিসর্পিল পথরেখা; উদ্ভট আকস্মিকতা ও নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি—রোম্যান্টিক প্রেমানুভূতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। জ্যোৎস্নালোক-মুগ্ধ রাত্রিতে যে কবি-কল্পিত মানসী মূর্তি গড়ে ওঠে, তা-ই উন্মাদিনীর নিষ্ঠুর অট্টহাসিতে খান খান হয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয় গল্পে রূপসী প্রণয়িনীর হীন চৌর্যবৃত্তিতে একটি মোহময় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তৃতীয় গল্পে অস্থিরমতি বহুবল্লভ প্রণয়িণী প্রেমলীলার প্রৌঢ় প্রহরে প্রেমিককে আকস্মিকভাবে প্রত্যাখান ক'রেছে, চতুর্থ গল্পে পরলোকবাসিনী প্রেমিকার অবরুদ্ধ ও অনুচ্চারিত প্রেমের বাণী টেলিফোনের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিবেদিত হ'য়েছে। প্রেমের রোমান্টিকতা ও নভোস্পর্শী আদর্শবাদের প্রতি শ্লেষ-চতুর তির্যক দৃষ্টি প্রতিবারই নির্মম আঘাত

হেনেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রেমের মোহময় ও সুখালস পরিবেশ প্রথমে বনিয়ে তোলা হ'য়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে সেই রঙীন রসাবেশ ব্যর্থতার ধূলিশয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। এ্যান্টিক্লাইমেক্সের আকস্মিক তীব্র আঘাতে প্রেমের অমৃতও বিষে পরিণত হ'য়েছে। রোম্যান্টিক প্রেম সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব অনেকগুলি গল্পের প্রাণ। প্রেমের ভাব-গভীরতা ও হৃদয়াবেগকে তিনি নির্মম আঘাত ক'রেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যেও প্রেমানুভূতি সম্পর্কে এই বিশেষ মনোভঙ্গির পরিচয় অনুপস্থিত নয়।২ প্রেমানুভূতির এই শ্লেষ-রঞ্জিত অভিব্যক্তিই গল্পগুলির কেন্দ্রসংহত ঐক্যকে ঘনবদ্ধ করেছে।

॥ ২ ॥

'চার-ইয়ারী-কথ'ার প্রথম গল্প 'সেনের কথা' আগাগোড়া যেন একটি 'ফ্যাণ্টাসি'। কবিতা কল্পনা জগতে যে স্বপ্নালস মায়ার সৃষ্টি হয়, তাকেই তিনি বাস্তবের রক্তমাংসের নারীর মধ্যে দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়েছেন। ইউরোপীয় নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকারাই তাঁর কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছিল, আর যাঁরা বাস্তবের দেহধারী মানুষ তারাই হয়ে উঠেছে ছায়া। বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত আকাঙ্ক্ষা একটি অলক্ষিত ও অনির্দেশ ব্যাকুলতার কল্প-বাসরে আকাশ-কুসুম চয়ন করত—সেখানে বিয়াত্রিশ, সিরাণ্ডা ডেসাডমনদের পদচিহ্ন পড়ত। এমনি করেই ভাব-প্রবণ সেন একটি চিরন্তনী নারীর মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু মানস-সুন্দরীর মূর্ত্তি রচনা করেই তিনি থেমে থাকেননি, বাস্তবে তাকেই শরীরিণী ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। আলোর মায়ায় বাঙালী রোমিও-র চোখে তাঁর বাসনালক্ষ্মী আবির্ভূতা হ'য়েছেন। কিন্তু আবেগ-বিহ্বল মুহূর্ত্তে সেই নারীর করপল্লব স্পর্শ মাত্র, সে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়েছে—তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ও বিকৃত। বিমূঢ় প্রেমিক যে দু'পা এগিয়েছেন অমনি একটি বিকট অট্টহাসিতে তাঁর স্বপ্নস্বর্গ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। মোহে ও মায়ায় যার সৃষ্টি, সেইখানেই তার চিরকালের স্বর্গ—মর্ত্যের মানবীর মধ্যে সেই চিরন্তনীকে অনুসন্ধান করা আর বাস্তবের রূঢ় আঘাতে স্বপ্নভঙ্গ হওয়া একই কথা। সেন বলেছেন: "আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হ'য়ে গিয়েছিল যে, মনে কোনও অবলা

২। কল্পনা কম্বোজ ঘোড়া, বয়সে হ'য়েছে খোঁড়া
চলে তিন পায়ে।
ভোতা হ'ল পঞ্চবাণ প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।—পত্র—: পদচারণ

আবার অন্যত্র বলেছেন:

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা পড়ি গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,
জোর-করা ভাব, আর ধার করা ভাষা।—উপদেশ: সনেট-পঞ্চাশৎ।

সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার ছিল না।"—এই উক্তিটি সেনের মানসিকতা বিশ্লেষণের সহায়ক হ'য়েছে। 'সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার' থাকলে হয়তো কাল্পনিক ব্যাকুলতার কোন অবকাশ থাকতো না। বাস্তবস্পর্শ শূন্য কল্পনা-সর্বস্ব নভোচারী প্রেমানুভূতিকে উন্মাদিনীর অট্টহাস্যের নির্মম আঘাতে ধূলিসাৎ করা হ'য়েছে। গল্পটির পরিণতিতে যে শ্লেষের ইঙ্গিত আছে, তা যেমন অর্ধব্যক্ত, তেমনি সুচতুর: "আমি সেই দিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal Faminine কে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।"—এই সাধারণ উক্তিটির মধ্যে যে তির্যক ও বক্রদৃষ্টির সহাস্য আলোক বিচ্ছুরিত হ'য়েছে, তা-ই গল্পটির প্রাণকেন্দ্র।

দ্বিতীয় গল্প 'সীতেশের কথা'য় লেখকের অম্ল-মধুর শ্লেষের সুর প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমগল্পের রোমান্টিক আমেজটুকু এখানে নেই। বক্তার চরিত্র ও তার বিশিষ্ট মানসিকতা তার জন্য দায়ী। সীতেশ দুর্বলচিত্ত নারীসঙ্গলোলুপ মানুষ। সে নিজেই বলেছে: "সেকালে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেইজাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই অনুরক্ত হয়। এ সত্বেও যে আমি নিজের কিম্বা পরের সর্বনাশ করি নি, তার কারণ Don Juan হবার মত সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই, কখনও ছিলও না।" এই চমৎকার আত্মবিশ্লেষণটি গল্পের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। সীতেশের তরল ও নারীসঙ্গ লোলুপ সদাচঞ্চল মনের সঙ্গে নভেম্বর মাসের লণ্ডনের স্যাতসেঁতে পরিবেশের বেশ একটি ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'পাঞ্চ' পত্রিকা ও সস্তা উপন্যাসের ডিনারের বর্ণনার মধ্যে পাঠকের তরলরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তরল মানসিকতা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে প্রতারণাময়ী নায়িকার আবির্ভাব সুসঙ্গত। সে নারী তার বাক্‌চাতুর্যে ও প্রেমের বাস্তবনিষ্ঠ গন্ধময় বিশ্লেষণে স্বভাব-নিপুণ। দীর্ঘকালের প্রণয়-অভিনয়ে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকেই সে কথাচাতুর্যে ও আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সীতেশ প্রণয়-মূঢ়, প্রণয়-ব্যবসায়িনীর হীন প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তিকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারে নি। শ্যাম্পেনের নেশা আর প্রণয়ের মদিরা তার এক মুহূর্তেই অপসারিত হ'য়েছে। একদিকে বিশ্বাসমুগ্ধ প্রেমতৃষ্ণা, অন্যদিকে চটুল তরল ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি—এই দুই বিপরীতের আকর্ষণে প্রমথ চৌধুরীর স্বভাব-সিদ্ধ পদ্ধতিটিই নিপুণ শিল্পকলায় রূপায়িত হয়েছে।

তৃতীয়গল্প 'সোমনাথের কথা'র ভূমিকা ও উপসংহার দুই-ই দীর্ঘ—মূল গল্পটিও অন্যগল্পলির চেয়ে শাখা-জটিল। সোমনাথ দার্শনিক, নারীসম্পর্কে চিরকালই উদাসীন। 'একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল'—এ বোধ তার ছিল। সোমনাথের চরিত্রে একটি ভারসাম্য আছে, তাই নারীকে নিয়ে প্রেমের আকাশ কুসুম রচনা করা তাঁর চরিত্রের বিরোধী। এহেন সংযতচরিত্র প্রণয়দ্বেষীনায়ক যিনি জীবনে ভেনাস ডি মিলো-র জগদ্বিখ্যাত মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ভালবাসতে পারেন নি—তার সম্মুখে রাণির আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি অভাবনীয়। লেখক এই প্রণয়লীলার দীর্ঘছবি এঁকেছেন। রাণির দ্রুত-পরিবর্তনশীল মনোভাবের পতঙ্গ-চপল রূপ তার কথা-বার্তায় ও চলন-বলনে, চমৎকার ফুটে উটেছে। তার লঘু-চপল

পরিবর্তনশীল মনোভাবের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটি ভাব-স্থির গভীর মুহূর্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। রাণি চরিত্রের এই বৈচিত্র্য সোমনাথের সঙ্গে একটি ব্যবধান রচনা করেছে—সে ফাঁক কোনদিনই পূরণ হয় নি। তাই সে সোমনাথের কাছে ধরা না দিয়েও তাকে অনায়াসে জয় করেছে। দার্শনিক সোমনাথের চেয়ে রাণির পর্যবেক্ষণ শক্তি ও মানবচরিত্র অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। তাই তার কাছে স্থূলবৃত্তি জর্জ ও অভিজাতরুচি সোমনাথ—দু'জনের মনোজীবনের ছবিই সমানভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। গল্পটিতে দু'টি অংশ আছে—প্রথমার্ধে বিসদৃশ চরিত্রের নারীপুরুষের প্রণয়লীলা বর্ণনা, দ্বিতীয়ার্ধে তার হাস্যকর পরিণতি। জর্জের সঙ্গে নিজের বিবাহ সংবাদ দিয়ে রাণি যে চিঠি লিখেছে তাতে প্রমথীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বাক্-বৈদগ্ধ্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এই চিঠিতেই রাণির চরিত্র সবচেয়ে বেশী ফুটেছে। রাণির কাছে সোমনাথ কোনদিনই লক্ষ্য ছিল না—জর্জকে লাভ করার উপায় হিসেবেই সুকৌশলী নারী সোমনাথকে ব্যবহার করেছিল। রাণি স্পষ্টভাবেই তার এই কৌশলের কথা জানিয়েছে "ওদের কাছে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে jealousy; ওদের মনে যত jealousy বাড়ে, ওরা ভাবে ওরা তত ভালবাসে। স্টেশনে তোমাকে দেখেই George উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, তারপর যখন শুনলে যে তোমার একটা কথার উত্তর আমাকে কাল দিতে হবে, তখন সে কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললে।" রাণি সোমনাথকে শুধু জর্জকে লাভ করার উপায় হিসেবেই ব্যবহার ক'রে নি—তার কাছে প্রেমের কোন ধ্রুবাদর্শের মূল্য যে নেই, তাও প্রমাণিত হয়েছে—প্রেম তার কাছে ক্ষণিকের খেয়াল ও খেলনামাত্র। সোমনাথের মূল কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার আছে। রাণি সোমনাথকে প্রতারণা করতে গিয়ে নিজেও প্রতারিতা হ'য়েছে—জর্জের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে সে একটি কনভেন্টে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনের এই অভিজ্ঞতার ফলে সোমনাথ প্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার ক'রেছে: প্রেমের ধ্রুবনির্দিষ্ট একমুখী সত্য নেই—খাঁটি ভালবাসার মধ্যে রহস্য ও প্রবঞ্চনা দুই-ই থাকে, এই দুটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়—'ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke,' রাণির তুলনায় সোমনাথ চরিত্র যত ম্লানই হোক না কেন, নিরুত্তাপ অনাসক্ত সত্যজিজ্ঞাসা তার চরিত্রে অনুপস্থিত নয়।

চতুর্থগল্পের প্রথমেই পূর্ব-কথিত তিনটি গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে—এই আলোচনার মধ্যে বক্তার তীক্ষ্ণবিশ্লেষণ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থগল্পের বক্তা রায় বলেছেন: "সেন কবিতায় যা গড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানবজীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনজনই সমান আহাম্মক বনে গেছেন।"—রায়ের মতে প্রথম তিনটি গল্পে প্রেমের হাস্যকর অসঙ্গতির দিকটিই ফুটেছে, শুধু বক্তারা সেই হাস্যরসকে করুণরসে পরিণত করতে গিয়ে তাকে আরও অস্বচ্ছ ক'রে ফেলেছেন—দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো তাঁদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। চতুর্থগল্পের কথক আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁর গল্পে আর যা কিছু থাক না কেন 'কোনও হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই।'

হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর অসঙ্গতি না থাকলেও শেষগল্পটিতে প্রমথীয় প্যারাডক্স চাতুর্য আকস্মিকতার চমকে প্রখর হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম তিনটি গল্পের সঙ্গে শেষগল্পটির আর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথম তিনটিগল্পে গল্পারম্ভের আগে বক্তারা তাঁদের ব্যক্তিচরিত্র ও মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন এবং গল্পাংশের মধ্যে বক্তা-চরিত্রের সবটুকু প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থগল্পে বক্তা নিজে ধরা দেন নি—এমন কি গল্পের ভূমিকাতেও নয়। শুধু তিনজন পূর্ববর্তী গল্প কথকের সমালোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে চতুর্থবক্তার চরিত্রের ভারসাম্য অনেক বেশী। গল্পটি গড়ে উঠেছে টেলিফোনের মাধ্যমে—গল্পটি রচনা করেছে একটি লোকান্তরিতা নারী-কণ্ঠ। বিলাত প্রবাসের সময় রায় গর্ডনস্কোয়ারে মিসেস স্মিথের বাড়ী থাকতেন। সেই বাড়ীর রূপসী দাসী 'আনি'র গোপন ও অবরুদ্ধ প্রেমের কাহিনী বিবৃত হয়েছে—'আনি,' নিজ মুখেই সেই কাহিনী বলেছে। একটি পরিচারিকার সলজ্জ হৃদয়ের গোপন ও অবরুদ্ধ প্রেমের প্রতিদান প্রত্যাশাহীন অতন্দ্রসাধনার কাহিনী একটি করুণ ও কোমল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ বেদনায় ও রোমান্সে গড়ে-ওঠা একটি কাহিনীর নির্মম যবনিকা টেনে দিয়েছে। কাহিনীটির মধ্যে একটি বিষণ্ণ-মধুর মৃদু সৌরভ আছে—হৃদয়ের চঞ্চল বিক্ষোভ এই সুন্দর ছবিটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। কারণ কাহিনীটি এমন একটি সূক্ষ্মসূত্রের বন্ধনে গড়ে উঠেছে, যেখানে দ্রুততাল মণ্ডিত হৃদয়াবেগ শুধু তালভঙ্গের কারণই হ'য়ে উঠত! গল্পটির আকস্মিক পরিসমাপ্তির মধ্যে একটি অবিশ্বাস্যকর অসঙ্গতির দিক আছে—পরলোকবাসিনী প্রেমিকাও বাস্তব উপায়ে এতকালের গোপনীয় কথা জানাতে চেয়েছে। লেখক সুকৌশলে শূন্যগৃহ, ভৌতিক নিশাচর ধ্বনি ও বক্তার সন্তনিদ্রোত্থিত মনের তন্দ্রাতুর ভাবের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। গল্পটিকে একটি অতিপ্রাকৃত কাহিনী ক'রে গড়ে তোলার অবকাশও ছিল—কিন্তু লেখক সে পথে অগ্রসর হন নি। অতি-প্রাকৃতের যে সূক্ষ্মশরীরী বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, টেলিফোনের মাধ্যমে লৌকিক কাহিনীর অবতারণায় তা ক্ষণদৃষ্ট রামধনুর মতো শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

॥ ৩ ॥

প্রমথচৌধুরীর গল্পগুলির একটি নিজস্ব স্বরূপ আছে, এর প্রধান কারণ হ'ল তাঁর গল্প বলার নূতন ধরণ। বর্ণনা বা বিবৃতি তাঁর গল্পের পক্ষে বড় কথা নয়—কিন্তু সংলাপের প্রতিটি সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। কারণ তাঁর গল্পগুলি সংলাপ-নির্ভর—সংলাপ-বিন্যাসের কুশলতা তাঁর গল্পগুলির অগ্রগতি ও কলেবর রচনার জন্য দায়ী। 'চার-ইয়ারী-কথা'র গল্পাংশ রচিত হ'য়েছে চার ইয়ারের বক্তব্যে—তাঁরা নিজেদের জীবনের প্রণয়-ঘটিত অভিজ্ঞতা নিজেদের জবানীতেই ব'লেছেন। তা ছাড়া গল্পটির মধ্যে আর একজন 'আমি' আছেন—এই 'আমি'ই লেখকের দ্বিতীয় স্বরূপ। অবশ্য চতুর্থ গল্পটির কথক সেই 'আমি'। প্রমথ চৌধুরীর এই গল্পগুলি বিশেষ ধরণের আমি শুধু নীরব দর্শক নন, তিনি প্রয়োজন মতো ঘটনা ও চরিত্রের ওপর নানাজাতীয় মন্তব্য করে থাকেন ও গল্প-

প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ করে তোলেন। 'চার ইয়ারী-কথা', চারটি 'বিশুদ্ধ 'গল্পের সমষ্টি মাত্র নয়—গল্পরস ছাড়াও গল্পের প্রারম্ভে, শেষে ও কখনও কখনও মাঝখানেও বিশ্লেষণ, মন্তব্য ও বিতর্কের ছড়াছড়ি। মূল গল্পের চেয়ে এই অংশগুলির মূল্য কম নয়—মূলগল্পের সঙ্গে বৈঠকী আবহাওয়াটি যেন 'উপরি পাওনা',—অবশ্য প্রমথচৌধুরীর কোন কোন গল্পে এই 'উপরি পাওনা'টিই আসল পাওনা হ'য়ে উঠেছে 'চার-ইয়ারী-কথা'র কথকেরা অত্যন্ত আত্মসচেতন, তাঁদের পরিচ্ছন্ন আত্মবিশ্লেষণই কাহিনীটিকে যেন অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রণয় কাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই বক্তা, কি ধরণের মানুষ এবং প্রেম ও নারী সম্পর্কেই বা ধারণা কি—এর নিপুণ বিশ্লেষণ ক'রেছেন।

চার-ইয়ারী-কথা প্রেমের চতুরঙ্গরূপের কাহিনী। 'সেন' কাব্য-নাটক ও কল্পকাহিনীর মধ্যে তাঁর চিরন্তনীকে পেয়েছিলেন, কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে সেই চিরন্তনীকে বাস্তবের মধ্যে খুঁজতে এলেন। এইখানেই হ'ল রোমান্সের চরমতম অপমান। সীতেশ আত্মরক্ষায় অক্ষম দুর্বলচিত্ত প্রেমিক—চটুল প্রণয়িনীর হীন চৌর্যবৃত্তির মধ্যে তার প্রেমস্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সোমনাথ বিচারশীল, প্রণয়দ্বেষী দার্শনিক—কিন্তু প্রতারণাময়ী প্রেমিকার ফাঁদে পড়ে তার চরিত্রগৌরব নিষ্প্রভ হ'য়েছে, প্রেমিকা তাকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির কৌশল হিসেবে ব্যবহার ক'রেছে। শেষগল্পের নায়ক চরিত্রের ভারসাম্য বেশী, কিন্তু প্রেমের পরিণতির আকস্মিক উপসংহারে এর ফলশ্রুতি এমন কিছু স্বতন্ত্র নয়। পরলোকবাসিনী দাসীর অবরুদ্ধ প্রেমানুভূতি টেলিফোন সহযোগে বিবৃত হ'য়েছে! আপাত দৃষ্টিতে চতুর্থ গল্পটিতে একটি সহজ সুন্দর করুণ অভিব্যক্তি আছে—কিন্তু সমগ্র কাহিনীর সঙ্গে অন্বিত হ'য়ে এই গল্পটিও প্রেম-জীবনের প্যারাডকসকে নিঃসন্দিগ্ধ ক'রেছে। প্রেমের গভীর হৃদয়াবেগ ও রোমান্টিক স্বপ্নের ধারণা কাহিনীগুলির মধ্যে পদে পদে খণ্ডিত হ'য়েছে।

'চার-ইয়ারী-কথা'র গদ্যরীতি প্রমথচৌধুরীর সার্থকতম কলাকৃতির নিদর্শন। প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের ভাষার মধ্যে সচরাচর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। গল্পের নিজস্ব একটি রস আছে, তাই প্রকাশরীতির দুর্বলতা অন্যান্য কারণেও ঢেকে যেতে পারে। অনেক সময় দুর্বল ভাষাও দুর্বলতর স্টাইল খ্যাতনামা কথাসহিত্যিকদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু রচনার অন্যান্যগুণেতারা রসোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে কিন্তু প্রমথচৌধুরীর ভাষাচর্চ্চার প্রয়োজন আবশ্যিক কথা সাহিত্যিকের পক্ষে এই চর্চা অনেকটা গৌণকর্ম। প্রবন্ধ ও কথা সাহিত্য—উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর স্টাইল ও ভাষা কর্ষণার প্রমাণ সমান ভাবেই পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে সেই দুর্লভ সাহিত্যিকদের অন্যতম যাঁদের প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের গদ্যস্টাইল একই প্রযত্নে গ'ড়ে উঠেছে। প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের ভাষা ও স্টাইলগত ব্যবধান যে একেবারেই নেই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত প্রমথচৌধুরীর রচনাবলী। এর কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, প্রমথচৌধুরীর প্রবন্ধ যেমন প্রচলিত প্রবন্ধের রীতিকে লঙ্ঘন ক'রেছে, তেমনি তার গল্পও প্রচলিত গল্পের মতো নয়। এখানে যেন লেখককে এই দু'টি স্বতন্ত্র মার্গের জন্য স্বতন্ত্র শিল্পনীতির আশ্রয় নিতে হয় নি। দ্বিতীয়ত, প্রমথচৌধুরীর প্রবন্ধাবলীতে যে বৈঠকী মেজাজ ও আলাপচারীতার রীতি সুস্পষ্ট লক্ষ্য, গল্পগুলিতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কথার

রসে কথা সৃষ্টি হ'য়েছে। সূক্ষ্ম সুচতুর বুদ্ধি-মার্জিত সরস কথকতায় প্লট রচিত হ'য়েছে। গল্পটি যেন আগে থেকেই তৈরী থাকেনা, আলাপ-অলোচনার বিশেষ মুহূর্তে গল্পরস ধীরে ধীরে জমে ওঠে—পদ্ধতি অনেকটা একাঙ্কিককা রচয়িতার। গল্পের ভাষাতেও এখানে সুকর্ষণা ও প্রযত্নের চিহ্ন বিদ্যমান। 'চার-ইয়ারী-কথার গদ্যরীতির মধ্যে আতিশয্য নেই। পরবর্তীকালের কোন কোন গল্পে আতিশয্য আছে।

সুবিন্যস্ত শব্দ-গ্রন্থন, গাঢ়বন্ধ পরিমার্জিত প্রকাশ-নিপুণ বাকরীতি,—মাঝে মাঝে শ্লেষের লাবণ্য ও অলঙ্কারের দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়ে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা হ'য়েছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দীপ্ত জীবন সমালোচনা লেখকের মনোভাব সুপরিস্ফুট ক'রেছে: "আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটা বিরাট একটা পুতুল নাচের মত দেখাত। নিজে পুতুল সেজে আর একটি সালঙ্কারা পুতুলের হাত ধরে, এই পুতুল সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে মনে করতেও আমার ভয় হত।" সীতেশ তাঁর আত্মকাহিনী বর্ণণায়, যে ভাষায় নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন, তার সাধ্য প্রমথীয় পরিহাসের চূড়ান্ত সিদ্ধি আছে: স্ত্রীজাতির দেহ ও মনের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যা আমার দেহ মনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি কারও বা চোখের চাহনীতে থাকে, কারও বা মুখের হাসিতে, কারও বা গলার স্বরে, কারও বা দেহের গঠনে। এমনকি শ্রীঅঙ্গের কাপড়ের রঙের, গহনার ঝঙ্কারেও আমার বিশ্বাস যাদু আছে। মনে আছে, একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হ'য়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল—তারপর তাকে আশমানি রঙের কাপড় পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম।"—বীরবলের পরিহাস-রসিকতা, বাক্-বৈদগ্ধ্য, তীক্ষ্ণাগ্র এপিগ্রাম প্রয়োগ 'চার-ইয়ারী-কথা'-কে বিশিষ্ট শিল্পরূপ দিয়েছে। বিদ্রুপাত্মক মনোভাবের প্রকাশ সর্বত্র সমান নয়। অবশ্য উচ্চকণ্ঠ প্রবল হাস্যবেগের মুহূর্ত খুব কমই আছে—কিন্তু সর্বত্রই একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ ও চাপা হাসির বিদ্যুৎ অতি সূক্ষ্ম তাড়িত-ক্রিয়ার মত সঞ্চারিত। এখানেই খাঁটি বীরবলী রসিকতার বৈশিষ্ট্য।

॥ ৪ ॥

'চার-ইয়ারী-কথা' প্রথম চৌধুরীর কথাসাহিত্য রচনার প্রথম পর্বে রচিত হয়। 'চার-ইয়ারী-কথা'র পূর্বে তিনি গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বপ্রথম গল্প-গ্রন্থ 'চার-ইয়ারী-কথা'। অবশ্য প্রবন্ধ ও কবিতার সঙ্কলন পূর্বেই প্রকাশিত হ'য়েছিল। সবুজপত্র-পর্বের প্রথম দিকেই এই অসাধারণ গ্রন্থটি রচিত হ'য়েছিল। শিল্পকর্ম ও রূপ রচনার অনন্যতায় 'চার-ইয়ারী-কথা' প্রমথচৌধুরীর সাহিত্য সাধনার মধ্যমণি। এমন নিটোল ও সম্পূর্ণাঙ্গ গল্প তিনি পরেও আর লেখেননি। তার শিল্পকর্ম লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এখানে একটি প্রৌঢ় পরিণতির ছাপ আছে। মানসিক অনুশীলন তাঁর দীর্ঘকালের। 'চার-ইয়ারী-কথার পূর্বে তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যচর্চা'র ধারা-বাহিক ইতিহাস নেই সত্য, কিন্তু কাঁচা হাত ও অপরিণত মন নিয়ে যে তিনি গল্প লিখতে বসেন নি; তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা তিনি দীর্ঘকালের সাধনা ক'রেছেন—মনকে তৈরী

করার সাধনা। চিন্তা, বিচার ও বুদ্ধির মধ্যে কোথায়ও জড়তা নেই—এই পরিচ্ছন্ন মন তার লেখনীর সঞ্চালনেও ফুটেছে—এখানে ক্রোচে বর্ণিত "ইনটুশ্যান" ও "এক্সপ্রেশ্যান" পার্বতী পরমেশ্বর একাত্মতায় গ্রথিত। তাই চল্লিশ বছরের কাছাকাছি এসে তিনি যখন চার ইয়ারের প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রেছেন, তখন পাঠক-সাধারণের মনেও বিস্ময়ের সৃষ্টি হ'য়েছিল। কিন্তু লেখার লোভ দমন করে কতকাল ধ'রে যে তিনি তাঁর ক্লাসিক মনটি সযত্নে তৈরী করেছেন, তা ভাবলে আরও বিস্মিত হ'তে হয়।[৩] দীর্ঘকালের মানস-প্রস্তুতির ফলেই 'চার-ইয়ারী-কথা'র মতো এমন একটি অসাধারণ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হ'য়েছে।

'চার-ইয়ারী-কথা'র চারটি গল্পের পটভূমিকা হয় কলকাতা না হয় লণ্ডন—কিন্তু লণ্ডনের চিত্রই যেন স্পষ্টতর। কারণ কলকাতার গল্পেও লণ্ডনের স্মৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথম ও শেষগল্পের পটভূমিকা কলকাতার, কিন্তু প্রভাব যেন লণ্ডনেরই বেশী। প্রতিদিনের প্রাত্যহিক জীবন, বাঙালী মধ্যবিত্ত তরুণদের প্রণয়-কাহিনী ও জীবনচর্যা থেকে তাঁর কাহিনীর জগৎ বহুদূরে। প্রমথ চৌধুরী নব্যতন্ত্রী লেখকদের গুরুস্থানীয়, তাঁর প্রবন্ধাবলীতে তিনি আধুনিক জীবনের ভাষ্যরচনা করেছেন, কিন্তু কথাসাহিত্যের জগতটি মোটেই আধুনিক নয়। হয় প্রাচীনবাংলার জমিদার অধ্যুষিত গ্রামজীবনের জমিদারের বৈঠকখানা, না হয় দেশীয়রাজ্যের মার্গ সঙ্গীতের কলাবতী-পরিবেশ, আর না হয় কলকাতা-লণ্ডনের উনিশ শতকের বিচিত্র জীবনধারা—প্রমথ চৌধুরীর কাহিনীগুলির পক্ষে এই পরিবেশ যেন অত্যাবশ্যক। অথচ একে ঠিক অবাস্তব বলাও সঙ্গত হবে না—কারণ এ জগৎও ঠিক তাঁর অদেখা ও অজানা নয়। 'চার-ইয়ারী-কথা'র মূলকাহিনীটির পরিবেশ অজানা নয়ঃ কলকাতার একটি ক্লাবঘরে চারবন্ধুর তাসের আসর। কিন্তু তাদের কথাবলার ভঙ্গী ও বিষয়বস্তু অ-সাধারণ অর্থাৎ আমাদের সাধারণের নয় ও প্রাত্যহিকের নয়। চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ সব কিছুই অসাধারণ—ক্লাসিক্যাল মানসিকতায় ও রূপচর্যার (Aesthetics) স্পষ্টোজ্জ্বল প্রতিফলনে চার-ইয়ারের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীগুলির একটি নূতন ধরণের আস্বাদন আছে।

নূতন ধরণের আস্বাদনটি কি? সাধারণ অর্থে 'চার-ইয়ারী কথা' চারটি প্রেমকাহিনীর সঙ্কলন, কিন্তু সাধারণ প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। মনস্তত্ত্বের দীর্ঘ-বিসর্পিল বর্ণনার চেয়ে তিনি যেন ইন্দ্রিয়জ রূপজ্ঞানের সাধনাই করেছেন। প্রেমের গভীর হৃদয়াবেগের আলোড়নকে তিনি বিদ্রূপ ক'রে একটি বিশেষ ধরণের রূপ-রসচর্চাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যে ও 'ফাল্গুনী'—নাটকে 'ভোগের ভোগবতী পার হয়ে, অনাসক্ত

৩। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর মনেরই প্রতিফলন আর তাঁর মনের পশ্চাতে পশ্চাতে রয়েছে বহুদিনের মনন ও রোমন্থন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর মনটিকে তৈরী ক'রেছেন সক্লেশে, তাই তার বাগবিস্তার এত অক্লেশ এবং তাঁর ভাষিতগুলির মধ্যে এতগুলি সুভাষিত।...আমার অনুমান তিনি তাঁর মনের অনুশীলন ক'রেছেন কথোপকথনে।" বীরবল : জীবনশিল্পী : অন্নদাশঙ্কর রায়

যৌবনের তটসীমায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর কৈফিয়ৎ কবিতায় তাঁর এই দ্বিতীয় যৌবনের বর্ণনা দিয়েছেন :

"হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিল ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির-আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।" (৪)

ইন্দ্রিয়জ রূপের তিনি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সে রূপের মধ্যে একটি অনাসক্ত মহিমা ছিল ও তাই তাঁর রূপ-চেতনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও ইন্দ্রিয় বিহ্বল নয়। রূপ-চেতনায় তিনি অতীন্দ্রিয়তা ও রুচিহীনতার বিরোধী। তিনি রূপজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন : "সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়,—দেহ ছিল—এবং সে দেহকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করে গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সম্মুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল তা হচ্ছে অশরীরী আত্মা।" (৫) অথচ এই রূপজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর স্থূল সম্ভোগআকাঙ্ক্ষা কোথায়ও জড়িয়ে নেই, এইজন্যই সম্ভবতঃ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠেছে। "চার ইয়ারী-কথা"য় নারীরূপের বর্ণনায় তিনি তাঁর বিশেষ ধরণের রূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন :

(ক) "দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল, এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে;—একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে সাজ্জত হ'য়ে উঠেছে;—এমন কাতর এমন করুণদৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনও দেখি নি।"

(খ) "ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিকমিক করছে।"—

(গ) "তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল—সে মূর্তি যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন।"

প্রকৃতির বর্ণনাতেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র ভাস্করের রীতিই অবলম্বিত হয়েছে : "মাথার উপরে সোণার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সুমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলের-জহরৎ-খচিত গাছপালা—সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা সাদা, কোনটি বা লাল, কোনটি বা গোলাপী, কোনটি বা বেগুনী।"—আসল কথা রূপবর্ণনাতে তিনি ক্ল্যাসিক্যাল মার্গের পথিক—রঙে ভঙ্গিতে ও স্পষ্টতায় এর স্বাক্ষরই পরিস্ফুট। প্রমথ চৌধুরীর ক্ল্যাসিক্যাল রূপজ্ঞান তাঁকে মোহাবিষ্ট করতে পারে নি, তার কারণ তাঁর একটি অতন্দ্র বুদ্ধিবাদ ও অনাসক্ত

৪। কৈফিয়ৎ : পদচারণ।

৫। রূপের কথা : বীরবলের হালখাতা।

দৃষ্টি ছিল। তাই ইন্দ্রিয়-নির্ভর রূপজ্ঞানের পরিচয় দিলেও তাঁর রূপজ্ঞান কীটস্‌ীয় সৌন্দর্যচেতনা থেকে স্বতন্ত্র। 'চার-ইয়ারী-কথা' প্রেম বৈচিত্র্যের কাহিনী হয়েও রূপ-রসচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত—সে রসচেতনা প্রথমযৌবনে হওয়া সম্ভব নয়, 'কল্পনা থেকে কামনার খাদ গিয়ে বাকী থাকে স্বর্ণাভা'—একমাত্র দ্বিতীয় যৌবনের দৃষ্টি ছাড়া যাকে দেখা যায় না।

॥ ৫ ॥

'চার-ইয়ারী-কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে প্লেটোর সুবিখ্যাত "সিম্পোসিয়াম"-এর কথা। মানব মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠযুগেও প্লেটোর এই গ্রন্থটি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এথেন্সের তৎকালীন এই শ্রেণীর ভোজসভা ও আলোচনায় তাঁদের মানসিক উৎকর্ষেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমকে অবলম্বন করে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের আলোচনা ও বিতর্ক নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে গ্রথিত হয়েছে। সংলাপগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে বক্তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য নিবেদন করেছেন। সর্বশেষে সক্রেতিস সকলের বক্তব্য সমন্বয় করেছেন—গ্রন্থের মধ্যে এই অংশটুকু সবচেয়ে মূল্যবান। 'চার-ইয়ারী-কথা' আর 'সিম্পোসিয়াম' এক নয়—সক্রেতিসের সময়ের গৌরবোজ্জ্বল এথেন্স ও উনিশশতকের লণ্ডন-কলকাতা এক নয়। প্লেটোর গ্রন্থে প্রেমতত্ত্বের দার্শনিক গভীরতা আছে, আর প্রমথচৌধুরী প্রেমের অসঙ্গতিও ব্যঙ্গাত্মক দিককেই প্রধানত দেখিয়েছেন। তথাপি প্রাচীন এথেন্সের জীবনচর্যা, বৈদগ্ধ্য ও পরিশিলিত ভাবজীবন কলকাতা বা লণ্ডনের উনিশ শতকের পরিবর্ত্তিত সমাজজীবনের মধ্যেও যেন কিঞ্চিৎ ছায়াপাত ক'রছে। চার-ইয়ারী-কথার নায়কেরা সক্রিতিস, অ্যারিস্ট্রফিনিসের মত অসাধারণ নন, কিন্তু অভিজাতরুচি, মার্জিত বুদ্ধি ও পরিশীলিত মনন—তাঁদের চরিত্রকে আভিজাত্য দিয়েছে। সিম্পোসিয়াম সম্পর্কে বলা হ'য়েছে: "The company, many of them suffering from the drinking bout of the previous evening, welcomes the suggestion that this evening be spent in praise of love. Each speaks according to his lights, and as personalities and opinion contrast and interweave, the diologue comes to life."[6]

"চার-ইয়ারী-কথা" সংলাপ-চতুর প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সংলাপ বৈচিত্র্যেই বিভিন্ন বক্তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। সংলাপগুলির পেছনে আছে দীর্ঘদিনের প্রযত্ন ও সাধনা, কিন্তু কত সহজ ও কত অক্লেশ এর প্রকাশ। প্রমথচৌধুরী একালের হ'য়েও পরিচ্ছন্ন চিন্তায় ও সুস্পষ্ট প্রকাশে ক্লাসিক্যাল। এ কালের কলকাতার মানুষ হ'য়েও মানসিকতায় তিনি গ্রীকো-রোমান ভাবুকতার অনুসারী—তাই 'চার-ইয়ারী-কথা', সিম্পোসিয়ামের কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অস্কার ওয়াইল্ড এর সংলাপ-বাহন সাহিত্যিক ও রসতাত্ত্বিক আলোচনাগুলির কথাও (7) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলতে পারে। কিন্তু ইংরেজ লেখকের গদ্যরীতির গীতি সুষমা প্রমথচৌধুরীর রচনায় অনুপস্থিত। 'চার-ইয়ারী-কথা'র পাঠকের

6. Dialogues of Plato : Edited by J. D. Kaplan.
7. The critic as artist.

কাছে মার্কিন লেখক অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস-এর Autocrat of Break fast Table-এর কথা মনে পড়বে। গ্রন্থটি সংলাপ-মুখ্য ও বৈঠকী রীতিতে লিখিত—একাধিক পাত্রপাত্রী থাকলেও বক্তা প্রধানত একজন। তবে এধরণের লেখাগুলি প্রধানত আলোচনা, উত্তর-প্রত্যুত্তর ও বিতর্কের মধ্যে শিল্পসংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান প্রসঙ্গ থাকে। কিন্তু 'চার-ইয়ারী-কথা'র মধ্যে যে নিটোল গল্পাংশ আছে অস্কার ওয়াইল্ড বা হোমসের রচনার মধ্যে তা অনুপস্থিত! অভিজাতরুচি বৈঠকী আলাপের স্বাদ ও গন্ধ এই সমস্ত ইংরেজী রচনার খুব বড় সম্পদ—প্রমথচৌধুরী বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর মানসিকতায় অগ্রগণ্য। কিন্তু গল্প হিসাবেও চারটি গল্পের মূল্য কম নয়। পরবর্তীকালেও এ শ্রেণীর গল্প তিনি খুব কমই লিখেছেন।

'চার ইয়ারী-কথা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এখন মনে হচ্ছে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হ'ত। তোমার শেষ গল্পটা সবচেয়ে human-গল্পে প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্‌ত—তারপর অন্যগল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দু'টি নায়িকাই ফাঁকি—একটি পাগল, আর একটি চোর, কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটি স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই তো তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়—এইজন্য তারা চটে ওঠে। তাদের পেটভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতের জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কিনা "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"—কিন্তু কথাটা একেবারে সত্য নয়—বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে একথা বলতে পারে না যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার।[৮] রবীন্দ্রনাথের মতে 'চার-ইয়ারী-কথা'র শেষ গল্পটি সবচেয়ে human মন্তব্যটি অযথার্থ নয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যে ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং করিয়েছেন—তাতে হয়ত তিনি পাঠক সাধারণের সুলভ মনোরঞ্জন করেননি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। পাঠককে মিলন-মধুর গল্প পরিবেশ করেননি সত্য, কিন্তু প্রেম-রোমান্সের প্রতি একটি ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ও অব্যর্থ প্যারাডক্স প্রয়োগ ক'রেছেন। রোমান্স বিরোধী শ্লেষাক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রমথচৌধুরীর মানসিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছোটগল্প হিসেবে চারটি গল্পই প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত! গল্পগুলির কোথায়ও শিথিলবন্ধ নয় বহুভাষণের দুর্লক্ষণ কোথায়ও নেই। গল্প বলতে খুব বেশী উপাদানের প্রয়োজন হয় না—দুজনের কথার কুশলী বিন্যাসে গল্প জমে উঠতে পারে। গাঢ়বন্ধ, সংযত সুডৌল—বুনোনির মধ্যেও একটি সমতা আছে, কুশলী হাতের যাদু আছে। কথার সূক্ষ্ম সোনার সুতো—মনকে যখন স্পর্শ করে তখন একটি সুমসৃণ স্পর্শানুভব জাগে;—আবার গল্পগুলির অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রতি যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তখন মনে হয় কথার জরির অলঙ্করণ অনায়াসে এগিয়ে চ'লেছে, তার চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে পরিমার্জিত বুদ্ধির রৌদ্র-পিচ্ছিল আলো। 'চার-ইয়ারী-কথা' প্রমথচৌধুরীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী কথা-কোবিদ অন্নদাশঙ্করের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য: "ইচ্ছা করলেই আর একখানা "চারইয়ারী" লেখা যায় না, কেননা, ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায়না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ ক'রে প্রথম যৌবনে Swan song গাওয়া হ'য়েছে ওতে।"[৯]

৮। চিঠিপত্র: পঞ্চমখণ্ড

৯। বীরবল: জীবনশিল্পী: অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

নিখিল বিশ্বাস

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা পরিক্রমায় রবীন্দ্রচিত্রের কোন উল্লেখই আমরা দেখি না। এটা নিঃসন্দেহে ক্ষোভের বিষয়। আধুনিক চিত্রকলায় রবীন্দ্রচিত্র আধুনিক বিজ্ঞানদৃষ্টি সম্মত ছবির জগতে একটি বিস্ময়। চিত্রজগতে রবীন্দ্রচিত্র স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়। উত্তর কালেও এই চিত্রের অনুগামী চিত্র প্রচেষ্টা আমরা পাই না আর রবীন্দ্রনাথের আগেও এই ধরণের মিশ্রিত ভাবানুগত চিত্র প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখি না। ক্ল্যাসিক্যাল যুগ পার হয়ে আমরা ভারতীয় চিত্র জগতে ক্ল্যাসিক্যাল এবংরোমান্টিক চিত্র প্রচেষ্টার যুগে এলাম। পরবর্তী অধ্যায় সম্পূর্ণশূন্য, বিশেষ করে ইংরাজ শাসনকালে, এরপর অবনীন্দ্রকাল, যেখানে নানা মতের সার সঙ্কলনে গঠিত মতের চূড়ান্ত প্রকাশ। এরই সমকালীন রবীন্দ্রচিত্র। অবনীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্র-অনুগামী চিত্র প্রচেষ্টা নানা মতের সার সঙ্কলনে গঠিত মতের আওতায় ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক ভাব সাধনায় মগ্ন হলো। ঠিক এই সময় রবীন্দ্রচিত্র ক্লাসিক ধারার সম্পূর্ণ উল্টো রোমান্টিক ভাবের চিত্র সৃষ্টি করলেন। এইচিত্র প্রচেষ্টা অবনীন্দ্রকালীয় চিত্র অপেক্ষা নতুনতর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একক প্রকাশ।

আধুনিক চিত্র চর্চ্চার অধ্যায়গুলির মধ্যেই রবীন্দ্রচিত্রের অবস্থান। বর্ত্তমানে আমরা দেখি যে চিত্রজগতে শিল্পী দুটভাবে প্রকৃতি রাজ্যের সঙ্গে নিজের যোগ সাধন করেছেন। হয় স্বরূপভাবে নয় বিরূপে রবীন্দ্রচিত্র সম্পূর্ণভাবে সহমর্মিতা ভাবাপন্ন। এই ধরণের বলেই রবীন্দ্রচিত্র প্রকৃতির আসল তত্ত্ববস্তুকে স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করেছে। সে প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছে প্রকৃতির নিছক রূপের ওপর, যে কারণে রবীন্দ্রচিত্র প্রথমতঃ প্রকৃতি-সিদ্ধ এবং তা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষালব্ধ বোধশক্তির ওপর নির্ভর করেছে বলে একে আমরা আদিম-কালীয় প্রকৃতি সিদ্ধমুখী বলতে পারি। কিন্তু এই প্রকৃতি-সিদ্ধ মনোভাবই যে চিত্রে সর্বক্ষেত্রে প্রাধন্য পেয়েছে তা নয়, কারণ বাস্তবতাকেই ভিত্তি করে ছবি কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিবাস্তবতার জগতে প্রবেশ করেছে বলে, সেখানে আমরা মুক্ত সংস্কার-শূন্য ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এ ছাড়া দ্বিতীয়তঃ যে সময় জ্যামিতিক ভঙ্গীমাময় Two diamentional ছবি দেখছি সেখানে ছবি প্রকৃতির নিছক মুক্ত রূপকেই প্রকাশ করেছে। আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই ধরণের মিশ্রন নেই বললেই হয়।

মুক্ত সংস্কারশূন্য রবীন্দ্রচিত্র নিছক সত্যেরই অনুলেখন। ফাঁকাযুক্তির হীনতা চিত্রকে কলংকিত করেনি। ছবিতে সংস্কারমুক্ত বাস্তবকে রূপ দেবার জন্যে একটিমাত্র রেখার পরিবর্তে বহু সহস্র রেখাও আমরা দেখি। এতে করে এই বিশ্বাসই জন্মে যে সমস্ত খাপছাড়া, অসংবদ্ধ প্রকৃতিপ্রবাহকে একমুখী করে, তাদের মধ্যে সমতা এনে, তাদের ঐক্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃতির আসল সত্য।

ক্লাসিক্যাল আন্দোলনের যে বন্ধন সমাজের দিক থেকে রীতিনীতির দিক থেকে তার সংস্কার থেকে রবীন্দ্রচিত্র সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কারণ ক্লাসিক্যাল সংস্কার অনুযায়ী স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টির যে

আবেগ তার স্ফুরণের অবকাশ থাকতে পারেনা। যে কারণে ক্লাসিক্যাল কালে রোমান্টিক চিত্র প্রচেষ্টা নেই। এই ধরণের রীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রচিত্র একটি বিস্ময়কর আন্দোলন। কারণ তখন পর্য্যন্ত অবনীন্দ্রকালে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক এই দুইভাবে একটা সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা চলছিল। তাদের বিপরীত দিকে রবীন্দ্রচিত্র বেড়ে উঠলো।

অনুভূতির বহিরাগতরূপকে নিছক প্রকৃতি-সিদ্ধরূপে রূপায়িত করতে হলে যে তীক্ষ্ণ পর্যাবেক্ষণ শক্তি, বোধশক্তির প্রয়োজন হয়, তার থেকে আধুনিক অনেক শিল্পীই দেউলিয়া, যে কারণে আজকে নিছক আদিম প্রকৃতিগতভাবে অনেকেই চিত্র প্রচেষ্টায় কাজ করেছেন। কিন্তু ছবিতে বুদ্ধিবাদীতার সংস্পর্শে এসে এই প্রকৃতি-সিদ্ধ ভাব ব্যাহত হচ্ছে। বিজ্ঞান সম্মত আইন অনুযায়ী চিত্র প্রচেষ্টার যুগেও রবীন্দ্রচিত্র একক। এখানে একপাশে দেখি সৌন্দর্য্যের প্রখর চেতনাবোধ অন্যপাশে দেখি সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ শিশুভাব, তেজস্বী, সরল সৌন্দর্য্য বুদ্ধির শক্তির প্রমাণ। রবীন্দ্রচিত্র টেকনিকের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে—পণ্ডিতি, কারিগারী তুলিবাদীর শৃংখল মুক্ত অনবদ্য প্রশস্তভাব সহজ সরল রস সৃষ্টি করেছে। আজকের ছবির জগতে যে চেষ্টা চলেছে আদিম চেতনাশক্তিকে, তার নিছক রূপানুশীলকে খুঁজে বার করবার জন্যে, সেখানে এই রবীন্দ্রচিত্র সমসাময়িক আধুনিক প্রাচ্য ও ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের মধ্যে প্রথম পথ প্রদর্শক। আদিম জগতের রূপ খোঁজার দিকে লক্ষ্য দিয়েছিলেন গোঁগ্যা, হাঁরি রুশো, কিন্তু তাঁদের ছবিতে প্রতিভার স্বাক্ষর বর্ত্তমান, কিন্তু রবীন্দ্রচিত্র যেমনি একপাশে আদিম চেতনাশক্তি সম্মিলিত তেমনি বাস্তব ভিত্তি করে সংস্কারশূন্য মুক্তজগতের রস অন্বেষণে ব্যস্ত। প্রতিভাবান শিল্পী ব্যতীত এরূপ দ্বৈতরসকে একত্রীভূত করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। শুধুমাত্র প্রকৃতির, মানুষের, বিভিন্ন প্রকৃতি বস্তর বাহ্যিক হীন অনুকরণে রবীন্দ্র চিত্র ব্যস্ত নয়, সেখানে খুঁজে পাই ঐকান্তিক আন্তরিকতার, মুক্ত মানবীয় সত্ত্বার বিকাশ। এই আভ্যন্তরিক বিকাশটি ভুবন-বিস্তার অনুরূপ রূপে, শিশু চিত্তের অপরিমিত বিস্ময় নিয়ে, রবীন্দ্রচিত্র প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছে। এর কারণে রং এবং রেখার ছন্দে আমরা সাবলীলতার সন্ধান আগে খুঁজে পাই।

বন্ধন মুক্তির যে আবেদন—ধর্ম্মের, সমাজের একটা বন্ধনমূলক গোষ্টিবদ্ধতার গোঁড়ামী থেকে এর প্রকাশ আমরা রবীন্দ্রচিত্রে খুঁজে পাই। এখানে শিল্পী নিঃসঙ্কোচে স্বস্তির, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। সমস্ত কিছু বাধা, সমস্ত কিছু নীতি উদ্ভূত স্বার্থ সংক্রান্তভাব থেকে রবীন্দ্রচিত্র আমাদের একটা চিন্তাগত জগতে উপনীত করে।

একটা পরিবেষ্টনীগত অবস্থা থেকে যখন আর একটা পরিবর্ত্তনীয় আকারের মধ্যে কোন চিন্তার অবস্থান্তর ঘটে তখন সেই অবস্থান্তর একটা সঠিক মাধ্যমের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় আর সেই মাধ্যমটি একটি সক্রিয় মূলতত্ত্বকেই অবলম্বন করে। এই সক্রিয় মূলতত্ত্বগত মাধ্যমটি চলতি ভাবের interaction এবং Opposite এবং এর কারণে এই সংঘাতের মধ্যেথেকে একটা নতুন পরিবেষ্টনীর আকার বেড়ে ওঠে। সমকালীন চিত্র-চিন্তা সমাজচিন্তার বিপরীতেই রবীন্দ্রশিল্প একটা মৌলিক ভাবধারা প্রবর্ত্তন করলো। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্বন্ধীয় বাহ্য ঘটনার এবং সামাজিক অবস্থার সক্রিয় ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং আত্মসংবেদনসিদ্ধ যে খেয়ালের মধ্যে এই যে চিন্তাগত ভাববৈষম্য

তার মধ্যে এই পরিবর্তনশীলতার গুণে একটা আধ্যাত্মিক সমাবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে শিল্পীই বিভিন্ন পরিবেষ্টণীর মধ্যে একটা সমতা আনেন। এই ভাব বৈষম্যের মধ্যে যে সমতা, সেই সমতা নিশ্চয়ই মৌলিক চিন্তার প্রকাশ। যদিও সেই প্রকাশ চলতি চিন্তা চলতিভাবের বিপরীত। কিন্তু বিপরীত হলেও এই মৌলিক চিন্তার মাধ্যমটি নিশ্চয়ই উৎকর্ষলাস্কর, কারণ এই প্রবর্দ্ধনের মধ্যে একটা স্বাধীন চিন্তা বেড়ে ওঠে, যাকে বলা যেতে পারে, 'আইডিয়া'। এই মৌলিকচিন্তা বাস্তব জগতের ভাব প্রকাশক, কারণ বাস্তব জগতের বাইরের প্রকাশটিই মৌলিকচিন্তার নামান্তর। সেইজন্যে রবীন্দ্রচিত্রে নিছক রূপগত চিন্তার একটা মৌলিক প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি মানুষ, প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে একাত্মা। সাধারণতঃ দেখা যায় শিল্পীরা নিজেদের প্রকাশ কৌশলের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আধ্যাত্মিক-মৃত্যু ঘটায়। সেখানে দেখি কৌশল মাধ্যমের আওতায় ছবি বেড়ে উঠেছে, কিন্তু রবীন্দ্রচিত্র 'কৌশল মাধ্যম' অপেক্ষা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই বেশী জোর দিয়ে চিত্র প্রচেষ্টায় রত।

'পাল্লারাম' ছবিটি রবীন্দ্রনাথের একটি সৃষ্টি। মানুষের পরিবেষ্টনীর মধ্যে তার যে জটিল মিশ্রণ তার মধ্যে থেকে 'পাল্লারাম' ছবিটিতে মানুষের সত্বাকে আদিম সজীব প্রাণবন্ত দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করা হয়েছে। যদিও ছবিটি বাস্তবকে মেনে করা হয়েছে, কিন্তু সেই বাস্তব আহরিত হয়েছে নিছক রূপ থেকে। 'সে' প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪ বৈশাখ প্রকাশিত বইটিতে নিঃস্বর্গ দৃশ্যটিতে মুক্ত সংস্কারশূন্য বাস্তবতার প্রকাশ। এখানে নিঃস্বর্গ দৃশ্যটির পদ্ধতি বিকৃত হয়েছে, অতিরঞ্জিত হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতভাবে ছবিটির সঙ্গে বাহ্য-বাস্তবতার সঙ্গে আত্মসংবেদন সিদ্ধ-খেয়ালের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিত প্রকাশ। সেই কারণে রং সুন্দরভাবে প্রকৃতিগত এবং পদ্ধতিটি প্রকৃতির সত্য রূপটিকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রচিত্রে শুধু রেখার মাধ্যমে মুখাবয়বের সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে বিশেষ থেকে বিশ্বজননীতার পদ্ধতির প্রতি রবীন্দ্রপ্রীতি লক্ষ্যণীয়। কারণ সেখানে ব্যক্তিকে ভিত্তি করে তার ভেতরের চরিত্রের সত্যরূপটিকে রবীন্দ্র চিত্র প্রতিফলিত করেছে। রবীন্দ্র- চিত্র কিছু খাপছাড়া চিন্তার প্রকাশ নয়, ছবি বাস্তবকে ভিত্তি করে অতি বাস্তবতার মুক্ত সংস্কারশূন্য-পদ্ধতিতে একটা সেতু নির্ম্মাণ করেছে। কিন্তু এই সেতু নির্ম্মাণটা ঘটেছে আদিম মানবীয়, স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ, পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর।

'নারী' চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের আর একটি সৃষ্টি। যেখানে 'নারী'র অন্তরলীন ভাবটিকে দেখছি একটি নারীর বিশ্বজনীন রূপের মধ্যে। সেখানে প্রকৃতির যে সরলতার বৈশিষ্ট্য, যা ছবিটিকে একটি স্বচ্ছ অনুভূতিময়—প্রতিমূর্তি করতে সাহায্য করেছে, তা চমৎকার ভাবেই ফুটেছে। বাহুল্যতা বোধের বাইরে আর একটি সৃষ্টি 'দুটি পাখী'। ছবিটি ঘনকালো পটভূমিতে রংএ রঙ্গীন দুটি ওষ্ঠলগ্ন পাখির চিত্র। ছবিটি বাহুল্যতা বোধ বাদে বাস্তবগত ব্যঞ্জনাময় সরল প্রকাশ। আশা করি রবীন্দ্র চিত্র ইদানিংকালে আধুনিক চিত্র মহলে নিশ্চয় এর প্রকৃত রসানুভূতির জন্যে আদরণীয় হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও জনগণ

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

আজ সারাপৃথিবী এক বিরাট যন্ত্রশালায় ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। তার প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ, মনের মুক্তধারা আজ ক্ষীণাঙ্গী। সমাজের নীচের তলার অগণিত লোকের সহজ জীবনযাত্রা আজ দুর্গম, কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীরস, মরুপ্রান্তরে অসহায় তৃষ্ণার্ত মানুষ বারবার আছড়িয়ে পড়ছে, তাদের চাপা কান্না মেঘ হয়ে জমে উঠছে ঈশান কোণে। একদিন হয়ত কাল-বৈশাখী উগ্রবেগে ঘূর্ণচ্ছন্দে ধেয়ে আসবে পৃথিবীর বুকে, কেঁপে উঠবে অতীতের জরাজীর্ণ প্রাসাদ। শতাব্দীর লোভলোলুপ হিংস্র অধ্যায় করুণ ইতিহাসের হবে চির সমাপ্তি।

সেই যুগ ও নবজীবনের শুভপ্রভাত আজও অনাগত। কুয়াশায় ঢেকে গেছে দিগন্ত। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। জনসাধারণ আজ সবাই অবসন্ন, ক্লান্ত। বিশ্বজোড়া সঙ্কটের ঘূর্ণ হাওয়াতে সবাই দুলছে। পুরাণো ঘর ভেঙে ধ্বসে পড়েছে, নতুন ঘর বাঁধবার রসদ ও অবসর নেই। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দিনের পর দিন পথ ভেঙ্গে চলেছে। প্রশ্ন আসেনা এদের কোন জাতি, কোন বর্ণ, কোথায় এদের মাতৃভূমি। চলমান জনতার স্রোতে দেশ ও জাতির ভৌগলিক সীমানা আজ অবলুপ্ত। হারিয়ে গেছে তাদের ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের ছোট ছোট গণ্ডী। তারা আজ সবাই চলেছে এক পথে। কণ্ঠ এদের রুদ্ধ, এরা বেড়িয়ে আসতে চায় বেদনাময় নিষ্ঠুর পরিবেশ থেকে নিরাপত্তার ক্ষণকালের শিবিরে। যুদ্ধ ও বর্ত্তমান সমাজের শোষকশ্রেণীর কুটিল ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে তারা আজ চায় স্বচ্ছ দিগন্ত, সরল পথ ও প্রাণের ক্ষণেক আরাম। জড় ও পশুজগতের নিত্য হানাহানি নিয়ে যথারীতি এদের দিনের ধারা বেয়ে চলেছে। কোথায় আলো, কোথায় বাতাস, সব যেন নিভেছে, থেমে গেছে। অকাল সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে প্রান্তরে। যে মানুষ আজ যন্ত্রের তলায় আর্ত্তনাদ করছে তাকে যন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে, অন্ধকার জীর্ণকক্ষে যারা সারাজীবন বন্দী তাদের সবার সম্মুখে তুলে ধরতে হবে পৃথিবীর আলো, উন্মুক্ত জীবনের প্রসারিত অঙ্গন ও আনন্দের সঙ্গীত। মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার অন্তরালে যারা আজও নির্বাসিত, জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ প্রাচীরে যারা আজও বিচ্ছিন্ন তাদের সবাইকে নিয়ে আসতে হবে সভ্যজগতের উদার প্রাঙ্গনে, মহামানবের মিলনতীর্থে। এই বেদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ, রঁম্যাঁরলা, গান্ধিজী, লেনিন প্রভৃতি নবযুগের অগ্রদূতরা। প্রত্যেকে স্বকীয় পথ অনুসরণ করে সেই বিরাট আদর্শকে রূপায়িত, ফলবান করবার জন্য সারাজীবন তপস্যা করেছেন। আমাদের চলতি সমাজের তথাকথিত বাস্তববাদীরা রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজিকে নিছক ভাববাদী, কল্পনাবিলাসী escapism বা পলায়নধর্মীর পুরোহিত বলে অভিহিত করছেন। এছাড়া প্রগতি তকমাধারী কোন কোন গোষ্ঠী তাঁদের সহজাত মানবতাকে কপট অভিনয় বলে সন্দেহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি যারা উনবিংশশতাব্দীর শেষ শিখরে আদর্শবাদের অনুপ্রেরণায় মানবতার পথেরযাত্রী হয়েছেন তারা কোন বিশেষ রাজনীতি মতবাদ

বা নীতির পথ ধরে আসেন নি। তাঁদের নিজেদের ঐ প্রাণঐশ্বর্য্য অফুরন্ত সৃজনী প্রতিভা, সহজ ক্ষমতাবোধ ধীরে ধীরে তাদের জীবনের মূল সুর বেঁধে দিয়েছে। এই বিচিত্র পৃথিবীর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর চলতে চলতে তাদের জীবন প্রসার থেকে প্রসারতর হয়ে সারা পৃথিবীকে আপন করে নিয়েছে।

আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগে পৃথিবী বা বিভিন্ন মানুষকে আমাদের নিজেদের কল্পিত কাঠামো বা মনগড়া মূর্ত্তির ছাঁচে দেখতে অভ্যস্ত। এক কথায় আমরা সবাই অল্পবিস্তর গুটিকয়েক শ্লোগানের ভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চলতি যারা কথা না কয় বা বলতে নারাজ তাদের প্রতি আমাদের নাসিকাকুঞ্চন বা শেলবর্ষণ অবার্থ। যারা আমাদের মনে রেখে ছোট ছোট লোভও কামনার সাথে তাল রেখে বরাবর গেয়ে চলেন তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সীমা নেই। সত্যাগ্রহী যাঁরা, তাঁরা কি পাড়াপড়শীর সবার মন রেখে চলবেন বা তাদের ভোট গণনায় নিক্তির উপর সত্যকে বিচার করবেন? সত্যের জন্য যদি প্রয়োজন হয় সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাঁরা প্রস্তুত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সত্য নির্ম্মম ও রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে চির বহ্নিমান। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত নিজের অন্তরের গোপনকক্ষে, পরীক্ষাগারে তারা সত্যের পরীক্ষা চালাচ্ছেন। নিজেকে সারাক্ষণ, ক্ষতবিক্ষত করে তারা এগিয়ে চলেছেন দৃঢ় অকম্পিত পদে।

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে"　　(বলাকা রবীন্দ্রনাথ)

রাজার ভয়, আইনের হুকুমজারী, প্রবলতর শক্তির তর্জ্জনী—ভয়ের অপদেবতা আমাদের জীবনকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। আমাদের যা কিছু সত্য, মূল্যবোধ সব একে একে বিকিয়ে দিই ভয়ের অপদেবতার হাঁড়িকাঠে! মিথ্যার কারসাজিতে ভরে যায় জীবনের চারিপ্রাঙ্গণ। যারা সত্যাগ্রহী তাঁরা নির্ভিক; প্রতি পদে পদে মিথ্যার সাথে সাথে মিতালী না করে তারা নিজের জীবনের বিনিময়ের সত্যের সাধনা করেন। "আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো" এই শেষ কথা বলে (মৃত্যুঞ্জয়) কবি যাত্রা করেছেন লোকান্তরে।

কাব্য বা জীবন সবার মূলে রয়েছে এই নির্ভিকতা, বীরের সাধনা। সেই সত্য দুর্ব্বলের প্রাপ্য নয় বা প্রয়োজনীয় মূল্যবোধে বাঁধা নয়। সেই সত্য ব্যক্তির কামনা বা লোভের কালিমাতে নয় কলুষিত। সেই সত্যকে অনুভব করতে হবে জীবনের সংগ্রামের নানা তিক্ততার অন্ধকারে, দুঃখ বেদনার দারুণ অগ্নিবাণে সেই সত্য চিরস্বচ্ছ, অম্লান, চিরন্তন হয়ে উঠবে। অবিরাম জীবনপ্রবাহে, নানা ঘাত প্রতিঘাতে সত্য নির্দয় নির্ম্মমভাবে বুকে বাজবে, তবু সেই কঠিনকে ভালবাসতে হবে এই ছিল তাদের আজীবন অপস্যা। সত্য বিশেষ দেশ ও সমাজে সীমিত বা আবদ্ধ নয়, তার রশ্মি ছড়িয়ে রয়েছে সর্ব্ব মানুষের হৃদয় কন্দরে, সবার বেদনার ও আনন্দ-ঔজ্জ্বল্যে সত্য ভাস্বর জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

জীবন ও কাব্যে দুইএর মূলে রয়েছে সত্যের ছন্দ। এই মূল উৎস থেকে বয়ে চলেছে কবির নিত্যশুচি সঙ্গীতধারা, কর্ম্মযোগীর আজীবন সাধনা। সত্য বেঁধে দিয়েছে এঁদের জীবনের মূল

সুরকে, সত্য ধ্রুবতারার মতো অনির্ব্বাণ জ্বলেছে এদের যাত্রা পথে। এঁরা চিরপথিক, চলার সাথে নিজেদের প্রতি মুহূর্ত প্রসারিত করে চলেছেন। বুদ্ধির দৌলতে বা তার্কিক বলে এঁরা মানুষকে ভালবাসতে শেখেন নি। হৃদয়ের প্রসাদগুণে এঁরা অতি সহজে সবার হাত ধরতে পেরেছেন। মানুষের ভিতর যে মনুষ্যত্ব, বা মানবতার বীজ অঙ্কুরে নষ্ট হতে চলেছে, তাকে জীয়ন কাঠি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, তাদের অবনমিত চেতনার শিখাকে বহ্নিমান করতে হবে এই ছিল তাদের সবার জীবন-সাধনা। তাঁরা মানুষের অন্ধ মত্ততা, হিংস্র নখদন্ত, ধনগর্ব্বকে পূজা করেননি বা মানবতার নাম করে আধুনিক শঠ কপট অভিনয়, মিথ্যা চাতুরী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দেন নি। তাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন মানুষের সুপ্ত দেবত্বকে, তার লাঞ্ছিত মানবতাকে। সে মানুষ আজ অর্দ্ধনগ্ন, ধূলিতে শয়ান, বুভুক্ষু, তার শৃঙ্খলিত জীবনদেবতাকে আজ মুক্ত করতে হবে এই ছিল তাঁদের ব্রত। ধর্ম্মের প্রেরণা। কালের নানা পীড়নে সামাজিক অসংখ্য বন্ধনে সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি আজ উধাও, দুঃখ দারিদ্র্যের কষাঘাতে পীড়িত অন্তরের মানুষ মিথ্যা ও লোভের প্রাচীরে বন্দী। তারা আজ অন্ধকার রাত্রির যাত্রী। কবির বজ্রভেরীতে বেজে উঠল দীপক ঝঙ্কার।

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা·········"

মানবিকতার ধারা বিভিন্ন দেশে ধর্ম্ম সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতিতে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মর্ম্মকথা হোল দেশ ও জাতির ঊর্দ্ধে মানুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ করা। উপনিষদের যুগ হতে সুরু করে মধ্যযুগের সন্ত, সাধক ও আধুনিক যুগের সীমানায় বহু বাউল, ফকির ও সাধক কবিদের বিচিত্র সঙ্গীতে মানুষের জয়ধ্বনি বার বার ঘোষিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের ভিতর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন বিরাট মনুষ্যত্বের আধার, দেবতার আসনে তাকে করেছেন চির প্রতিষ্ঠিত। বাংলার সাধক কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

"সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ স্বকীয় সাধনা অনুসরণ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

গান্ধীজি বলেছেন বুভুক্ষু মানুষের কাছে স্বয়ং ভগবান রুটির পরিবর্ত্তে নিজে আসতে সাহস করেন না।

ভারতীয় সাধনার এই মানবতার সুর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উদাত্ত সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। যারা দেবালয়ের রুদ্ধ দুয়ারে, আপন মনে পুজা আরাধনা করে চলেছে তাদের আহ্বান করে বলেছেন

"নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।"
"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।" (ধূলামন্দির)

নিজের অন্তর দেবতাকে যখন তিনি প্রণাম করতে গেছেন সেইখানে দেখেছেন যে দেবতার চরণ বিরাজ করছে "সবার পিছে, সবার নিচে, সব হারাদের মাঝে।"　　(দীনের সঙ্গী)

রবীন্দ্রনাথ জনগণের সভায় প্রবেশ করেছিলেন ভারতের চিরন্তন বাণীকে অনুসরণ করে. তার নিজের জীবনের কাব্যসাধনা ও রূপলোকের পথ ভেঙ্গে। বিবেকানন্দ, গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকে নিজের বিশিষ্ট পথ ধরে "সব হারাদের মাঝে" এসে মিলিত হয়েছেন ও তাদের নূতন জীবনের প্রেরণা দিয়েছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা কাল্পনিক, স্বপ্নবিলাস বা বৈজ্ঞানিক, বাস্তবসম্মত, তাদের মত ও পথ সম্বন্ধে বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয়। এখানে শুধু এইটুকু বিবেচ্য যে তারা সবাই ছিলেন পুরোমাত্রায় আন্তরিক, তাদের মন ও মুখ এক সুরে বাঁধা ছিল। সেখানে কোন ফাঁকি বা ফাঁক ছিলনা। অতি সহজে তারা সবার সাথে দাঁড়িয়েছেন, কোন নীতি বা মতবাদের সম্মতির অপেক্ষা তারা করেননি। বেদনাহত মানুষের ক্রন্দন তারা শুনেছেন, অস্থির হয়েছে তাদের হৃদয়তল, ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন দুঃখ নিবৃত্তির সন্ধানে। যে প্রেরণা তাদের জীবনে অবিরত জ্বলছে তার আগুন ফুটে বেরিয়েছে কোথায় গৈরিক উত্তরীয়ধারী সন্ন্যাসীর গীতিতে, তার উদাত্ত আহ্বানে, কোথায় প্রকাশ হয়েছে জননেতার রাজনীতির কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে, কোথায় সেই স্ফুলিঙ্গ লক্ষ পাখা মেলে আপনাকে প্রকাশ করেছে কবির অগ্নিগর্ভ বাণীতে। গান্ধীজির মুখে আঁকা রয়েছে অগণিত লোকের দুঃখ ও বেদনার করুণ ছবি, চোখে জ্বলছে অনির্ব্বাণ আশা; রবীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হবে জনসমুদ্র ভেদ করে উঠেছে এক অভ্রভেদী শৈলশিখর, নতুন প্রভাতের আলোক পড়েছে তার কপোলে, প্রাণের আগুন সঙ্গীতের তরঙ্গে।

বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাবধারা থেকে প্রাণবান ও রসপুষ্ট হয়েছে। এদের মানবতার পিছনে বৈজ্ঞানিক সমাজ-অনুবিশ্লেষণের সম্যক দৃষ্টি না থাকাতে তাঁদের বাণী আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাদের পথ এই সমাজকে শোষণ মুক্ত ও শ্রেণীহীন হবার জন্য কতটা সহায়তা করেছে তার সাক্ষ্য দেবে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কবি, রোমান্টিক ভাবধর্ম্মী, ধ্যানলোকে নিত্যযাত্রী। স্বপ্নখেয়ায় অহরহ ভেসে চলেছে তার জীবনতরী। প্রাণের দুরন্ত কৌতুহলে, নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে তার যাত্রা সুরু হয়েছিল কাব্যলোকে। সেদিন বাধাবন্ধনহীন মহোল্লাসে বলাকার পাখার তীব্র-গতিতে তিনি ছুটে চলেছেন নীলিমা থেকে অনন্তনীলিমাতে। জীবনের বেসুরো অসংগতি, অসহ্য হাটের ঐক্যতান, বিধবার দীর্ঘশ্বাস, বেদনাহতের নীরব ক্রন্দন সেদিন তার ভাবলোককে স্পর্শ করেনি। পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে একাকী বিষণ্ণ তরুছায়ে তিনি বাঁশি বাজিয়ে চলে-ছিলেন। একদিন ধূলিধূসর পৃথিবীর বুক থেকে ভেসে এল ক্ষুধার্তের সকরুণ আর্ত্তনাদ লাঞ্ছিতের নীরব ক্রন্দন, ধনবল গর্বিতের হুঙ্কার। তার স্বপ্ন সম্পূর্ণ ধ্যানলোক অস্থির হয়ে উঠল। চমক ভাঙলো, আগুনের হল্কা এসে লাগল হৃদয়ের নীরবতন্ত্রীতে। গর্জ্জে উঠল কবির অন্তরাত্মা, মনের "পলাতক বালক" ফিরে এল যন্ত্রনামুখর সংসারের তীরে।

ওরে তুই ওঠ্ আজি।

আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি

জাগাতে জগৎ-জনে। (এবার ফিরাও মোরে)

একদিন যাদের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন, সেদিন নেমে এলেন তাদের সবার মাঝে। চলতে সুরু করলেন অন্ধকারময়, জীর্ণবেসাতি বেয়ে। চোখে পড়ল রোগজীর্ণ কুশ্রীতায় ভরা, নগ্ন বীভৎস ছবি। মনে হোল পৃথিবীর সব আলো নিভে গেছে, দূষিত হয়েছে আবহাওয়া, নির্ম্মম পেষণের ফলে অর্দ্ধমৃত মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যু অতল-গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে।

"আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে

সেদিনের কথাগুলি

দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মত আছে ঝুলি'।...

তোমার সেকাল আজি ভাঙ্গা চোরা

যেন পেড়ো বাড়ী

লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি', (বীথিকা)

এতদিন কবিমানসের ধ্যাননেত্রে তিনি নির্বিশেষ মানুষের (abstract men) আরাধনা করে এসেছেন। সেই মানুষের ছবি বা Prototype আমাদের মাঝারে নাই। সে হোল চিরন্তন Ideal man, আমাদের সব আশার প্রতীক যাকে—বানার্ডশ' Super-man বলে আখ্যা দিয়েছেন অথবা অরবিন্দ যাকে ভাগবতজীবনে Super mind বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেদিন তার পরিপূর্ণ ভাবলোক থেকে ক্লেদে ও ধূলিময় বাস্তবজীবনের সংস্পর্শে এলেন সেদিন মানুষ দৈনন্দিনের গন্ধময় পরিবেশের মধ্যে নতুনরূপে ধরা দিল, নিরায়ব নির্বিশেষ (abstract universal) মানুষ হোল Concrete individual, রোগ দুঃখ ভরা সাধারণ মানুষের একজন।

একদিন তার কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করে ছিল কালিদাসের মেঘদূতের "বিচ্ছেদের শিখা"। সেদিন তাহার রসঘন নিবিড়তার মধ্যে কোন অপূর্ণতার ছবি দেখতে পান নি। আজ গণচেতনার উন্মেষের ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে যক্ষের বিরহগাথা নিছক ব্যক্তিগত বিরহ, এর মধ্যে সাধারণ জনগণের সুখ দুঃখের ছবি রূপায়িত হয়নি।

তার পাশে চুপ

সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।

সে দিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল

জীবনে উচ্ছল।

ওর মাঝে তার কোন আলো পড়ে নাই। (নবজাতক)

লোকালয় থেকে দূরে নীরবে আপন মনে চিরদিন বাণীদেবীর আরাধনা করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। নাড়া দিয়ে উঠল তার জীবন দেবতা। একদিন তার উপাস্য জীবনদেবতা কোমলগান্ধার সুরে বেঁধে দিয়েছিল তার জীবন ও কাব্যলোকে। তাঁর মন সেদিন বিহার করেছে চির-সুন্দরের

সুরপুরে। রূপের পদ্মে তিনি পান করেছেন অরূপ মধুপান। আজ নবজাগ্রত চেতনার ফলে তিনি আহ্বান করলেন নির্মম, নিষ্ঠুর পরুষকে, রুদ্র দেবতাকে।

"তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী তোমার করি স্তব

... .

বাণী-বিলাসীর কাণে ব্যক্ত হোক্ ভৎর্সনা তোমার॥ (নবজাতক)

কবির নতুন পৃথিবী আবিষ্কার ও কাব্য অভিযানের ভিতর কোন উগ্ররাজনীতি মতবাদ বা সহজসুলভ যুগধর্ম্মী হওয়ার বাসনা ছিলনা। তিনি তার অশ্রান্ত রোমান্টিক মন নিয়ে কাব্য সাধনার পথে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিলেন,..."অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ শিখর" থেকে সংঘাতে বহ্নিমান পৃথিবীর বুকে। বাস্তবের নানা কুশ্রী ছবি যেখানে "কাঁঠালের ভূতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ

রান্নাঘরের পাঁশ........ (সানাই)

এর সবার সংস্পর্শে এসেও তার চিরনবীন রোমান্টিক মন এক মুহূর্ত্ত নিস্প্রভ হয়নি। তিনি ছিলেন সুন্দরের চিরপূজারী। শতাব্দীর অন্তরালে যে ব্যথা ও বেদনা সঞ্চিত রয়েছে। জনগণের নির্য্যাতিত, নিষ্পেশিত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে ক্রন্দন তিনি শুনতে পেয়েছেন, সেই অপূর্ণ করুণ সুর তার বীণাতে নতুন সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। তিনি কোথাও মনের দৃঢ় সংযম, balance বা সমতা হারাননি। বাইরের ঘটনাপুঞ্জ সব যেন মহাকালের পটভূমিকায় নটরাজের তালে। নিরাসক্ত ধ্যানীদার্শনিকের হৃদয়তলে "উচ্ছ্বিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।"

দার্শনিকের দিব্য চোখে দেখা Impersonal ও abstract অরূপ সায়র থেকে নেমে এসে যখন রসিক কবির মন দিয়ে তিনি দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সংঘাত, ক্ষোভ ও হতাশার গান শুনেছেন, বেদনাশীল চোখ দিয়ে দেখেছেন মরুভূমির দারুণ উত্তাপে গানের প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে গেছে, তখন তিনি গেয়ে উঠেছেন—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ

তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো দান। (এবার ফিরাও মোরে)

বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশ্লেষণ বা তার্কিক বুদ্ধির দৌলতে তিনি সমাজে নীচের তলায় লোকদের সাথে হাত মিলান নি। নিজের আত্মগত (Subjective) মনকে বহির্মুখী করে, স্বকীয় কল্পনার অমরাবতীকে বৈচিত্রপূর্ণ পৃথিবীর সাথে সংযোগ করে, মানবতার সহজিয়া পথধরে সবার সাথে সুর মিশিয়ে ছিলেন। সবার সাথে সুর মেশানো অর্থ হাটের বিকৃত সুরের সাথে ঐক্যতান করা নয়, সবার সাথে চলা বলতে তার মতে জনতার বিশৃঙ্খল জীবনের অল্পমত্ততার সাথে তাল দিয়ে চলা নয়। তিনি বলতেন সবাইকে টেনে তুলতে হবে উঁচুডাঙ্গাতে, সেখানে সবাই মিলে ফলাতে হবে প্রাণের ফসল, অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণতর করতে হবে, চলতে হবে সারাজীবন রৌদ্রদীপ্ত চৈতন্যের শিখর পানে। সাধারণ মানুষকে নানারঙে রাঙিয়ে idolise করে তার পায়ে নৈবেদ্য দেওয়া নিছক ভাবাবেগ বা Sentiment এর সস্তা সংস্করণ ছাড়া অন্যকিছু নয়। অপরদিকে আরেকদল আছেন যারা জনতাকে চির অসহায়, অজ্ঞ ভেবে তাকে উদ্ধার করবার সাধনযজ্ঞে

কথায় কথায় মেতে উঠেন তারাও মনে প্রাণে মানুষকে শ্রদ্ধা করেন না। তাদের ভিতরেও রয়েছে ঘৃণা, অবহেলার সুর ও অনুকম্পার অভিনয়। "দরিদ্র নারায়ণ" বলতে আমরা যদি মানুষের হীন দারিদ্রতাকে চিরদিন পূজা করি পক্ষান্তরে তার ভিতরের নারায়ণ বা মনুষ্যবোধকে হীন, দরিদ্র ভেবে অমর্য্যাদা করি আমরা উভয়ে একই দোষে দোষী হব। সাধারণ মানুষ নানা আসক্তি, লোভে আচ্ছন্ন, দুঃখ বেদনাতে তার মনুষ্যত্ব প্রায় অবলুপ্ত, হিংস্র ও রক্তলোলুপ যুদ্ধক্ষেত্রে তার সহজ মমতা বোধ, স্নেহের ভাণ্ডার একে একে নিঃশেষ হয়েছে। নির্ম্মম পৃথিবীর উদাসীনতায় তার হৃদয় আজ শুকিয়ে গেছে। কঠিন, নির্ম্মম হয়েছে তার জীবন, মনের স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তি।

সামাজিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তনের সাথে ইতিহাসের পথে এই সাধারণ মানুষ একদিন মুক্ত মহান হবে এই ছিল দেশে দেশে সমাজবিপ্লবীদের আদর্শ ও সাধনা। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস সাহিত্যলোকে শুধুমাত্র শুষ্ক কর্ত্তব্যের ভার বহন করা সমীচিন মনে করেন নি। তিনি সদাসর্ব্বদা সচেতন ছিলেন যে তিনি প্রধানতঃ কবি ও জীবনশিল্পী, রাজনৈতিক নেতা বা সমাজ সংস্কারক নয়। সেই পথ থেকে তিনি কোথাও বিচ্যুত হননি। সাহিত্যদরবারে কর্ত্তব্য জ্ঞান ও সামাজিক আদর্শ যেখানে শিল্পের রসমাধুর্য্য ছাপিয়ে ওপরে ফেণার মতো ভেসে ওঠে সেখানে আর্টও প্রোপাগাণ্ডার ভিতর কোন তফাৎ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট পথে দেখি কর্ত্তব্যের ভার নেই; আছে মধুর নিষ্ঠা ও পরম আত্মসমর্পণ! তিনি সমাজের যে স্তরের বাসিন্দা ছিলেন তার প্রাচীরের বহুদূর পর্য্যন্ত তার দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। সেই দৃষ্টি ভাবাবেগ বা সহজ উচ্ছ্বাসের বাষ্পে আচ্ছন্ন ছিলনা। সাধারণ জীবনের মনের গহনে পাড়ি দেবার ছিল তার আকুল তৃষা। পথেপ্রান্তরে অর্দ্ধনগ্ন চাষী বা মজুরদের ওপর চোখ বুলিয়ে তাদের জীবন নিঙড়িয়ে রস আহরণ করা ও তার কবিতা ও গল্পের মডেল দাঁড় করিয়ে লোকসাহিত্য সৃষ্টি করা তার কাম্য বা ধর্ম্ম ছিল না। তিনি ভাবতেন বিধাতা তাকে অসি না দিয়ে বাঁশি দিয়েছেন, সেই বাঁশিতে যেন অনুক্ষণ বেজে ওঠে সুন্দরের বাণী, দুঃসহ জীবনের সর্ব্বপ্রান্তরে ছড়িয়ে দেয় গানের কলি, রোগজীর্ণ হতাশায় ভরা পৃথিবীতে ফুটে ওঠে আশার নবদিগন্ত। লক্ষজনের অন্তরের নীরব ক্রন্দনকে তিনি দেবেন ভাষা, মুখর করে তুলবেন তার বীণার ঝঙ্কারে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।" (ঐক্যতান)

জনগণের মনের নাগাল পাওয়া—একী সহজ সাধনা? একি বিলাসী মনের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস? দিনের পর দিন চলতে হবে তাদের সাথে, অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে ওদের অন্তরের কথা।

"সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

সে অন্তরময়'

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

...   .

জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।   (ঐক্যতান)

আধুনিক তথাকথিত প্রগতিবাদীরা হয়ত অধিকতর "শক্তিবান" তাই তারা সকাল সন্ধ্যা লোকসাহিত্যের নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে চলেছেন। এদের লেখাতে অন্তরের স্পর্শ বা সাধনার জৌলুষ নেই, যা আছে তা হোল ধারহীন ধারকরা মন, ব্যবসায়ী ফন্দী বা "শৌখিন মজদুরি।" কবি নিজের অক্ষমতা ও অপূর্ণতা ভেবে আগামী যুগের নতুন কবির প্রতীক্ষা করেছেন। কোন কবি তার আশাকে পরিপূর্ণ করবে? নতুন দিনের সৃষ্টির আহ্বানে জাগ্রত হবে কে?

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কাণ পেতে আছি।
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভাল নয়, ভাল নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।   (ঐক্যতান—জন্মদিনে)

এই প্রাণহীন হৃদয়হীন শুষ্ক মরুভূমিতে কবির সরস অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে আনন্দের প্রস্রবণ ও তার নিত্য শুচি রসধারা। আমরা যে দুর্ভাগ্য যুগে ও সমাজে বাস করছি সেখানে এই অম্লান সত্যনিষ্ঠা ও চির উন্নত চরিত্রের দৃঢ়তা দুর্লভ। যে সত্য নিষ্ঠা দেখেছি গান্ধীজির জীবনে, মনের দৃঢ়তা মহান আদর্শের অনুপ্রেরণা দেখেছি রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রে, যে বীর্য্যের প্রতীক দেখেছি বিবেকানন্দের সিংহ গর্জনে আজ সন্দেহ ও ভয়, অবিশ্বাস ও লোভ কাতর পৃথিবীতে তার প্রতীক খুজে পাওয়া দুষ্কর। মানবতা আজ ঝুটো নামাবলীতে দাঁড়িয়েছে। মানবিক অধিকার আন্তর্জাতিকতা বৃথা বাগাড়ম্বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শান্তির শুভ্র পতাকার পিছনে চলেছে বিধ্বংসী যুদ্ধের গভীর ষড়যন্ত্র। আজ রাজনৈতিক মঞ্চে মানুষের ঐক্য, স্বাধীনতা ও শান্তির আহ্বান সব শঠতার অভিনয় বা ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাবে। চারিদিকে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র দেখে কবি গেয়ে উঠেছেন—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—   (প্রান্তিক)

কবি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, "স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা" অহরহ

নখদন্ত শাণিত করে চলেছে, মনুষ্যত্বের দাবীকে প্রতিপদে অস্বীকার লাঞ্ছিত করেছে। সেখানে আজ উগ্র জাতীয়তার অন্তরালে "স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে

ঘটেছে সংগ্রাম······

ইউরোপীয় সভ্যতার শেষ পরিণতি তিনি দেখলেন তার অন্তর্নিহিত স্বার্থ ও লোভ বশীভূত অন্তর্বিরোধ ধারা থেকে। সেই সভ্যতার বাহিরের চোখ ঝলসানো আলোতে তিনি শুধু দেখলেন

"·········চিতার আগুন
পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।"

এর সাথে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল যে তার সমধর্মী

"কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি"

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার ধ্বজা নিয়ে, নির্য্যাতীত জনগণের বেদনা ও আশার প্রতীক হয়ে তিনি বার বার সবার সাথে দাঁড়িয়েছেন। অকম্পিত কণ্ঠে নিষ্পেষিত মানুষের আর্ত্তনাদকে তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পৃথিবীর সবার কাছে ধরে দিয়েছেন। অথচ কোন কোন সভাতে বা রঙ্গমঞ্চে আজও শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বুর্জোয়াধর্মী তথা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের শেষ বাহক। জানিনা এই "প্রগতিবাদীরা" রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে কতটা প্রবেশ করেছে না শুধুমাত্র বাইরের মুখরোচক ঐক্যতানের সাথে সুর মিশিয়ে কথা বলা তাদের একমাত্র রেওয়াজ? রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া না বিপ্লবী ছিলেন সেই তর্ক জুড়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার কোরব না। রবীন্দ্রনাথ যা তাই ছিলেন, অনন্ত রবিরশ্মি এই বিচিত্র জগতে যার পরাণে যে রং ছড়িয়ে দিয়েছে সে নিজের মনের রং দিয়ে তার বিচার করেছে। আমরা তাঁকে জেনেছি সুন্দরের চিরপূজারীভাবে, চিনেছি ভাবজগতের নিত্যযাত্রী, বিশ্বকবি রূপে। সুদীর্ঘকাল জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর ভাস্বর হয়ে উঠেছে তার সত্যনিষ্ঠা, আন্তর্জাতিকতা ও সবার উপর তার মানবতা। রাজনীতি বা কাব্যলোক, ব্যক্তি বা সমাজ জীবন, পৃথিবীর সর্বপ্রান্তরে মিথ্যার সাথে আপোষ করে অথবা 'অন্যায়ের সাথে মিতালী করে বাঁচব না—এই ছিল রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির উভয়ের জীবনাদর্শ।

সাধারণ লোক, অখ্যাত মানুষ, নামগোত্রহীন জনতা কবির মানসগগনে অপরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার ধ্যাননেত্রে মহাকালের পটভূমিকাতে দেখছেন যে ইতিহাসের চক্রপথে, প্রবল উদ্ধত সম্রাট, সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সব একে একে বিলীন হয়ে গেছে অতীতের অতলগহ্বরে। শক, হুন, পাঠান, মোগল, পণ্যবাহী ইংরেজ সব কালস্রোতে ভেসে গেছে। পৃথিবীর অপরদিকে চলে কালজয়ী, মৃত্যুহীন বিপুল জনতার দল। যুগযুগান্তধরে তারা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের দাবী মিটিয়ে আসছে। তারা চিরকাল দাঁড় টানে, হাল ধরে, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকাধান কাটে।

ব্যক্তি হিসেবে তাদের বিশেষ সত্তা নেই, সমষ্টিগত শ্রেণীও চির প্রবহমান জনতার স্রোতে তারা নিত্য সমুজ্জ্বল। পৃথিবীতে ইতিহাসের নানা ঝড়, বজ্রাগ্নির ভিতর, শত অভিশাপ বহন করে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী পথ ভেঙ্গে চলেছে তাদের পথচলার কাঁপনে নতুন যুগের দুয়ার উন্মুক্ত হচ্ছে, পৃথিবীর চিতাগ্নি তাদের প্রাণের পর পেয়ে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠছে। এই অখ্যাত জনতার ললাটে মহাকাল বিজয়টীকা এঁকে দিয়েছে।

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাব বম্বাই গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিন রাত্রে গাঁথা পড়ে দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি।

ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ

সোমেন বসু

এ কথা সবাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের একটা নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। সে আত্মীয়তা ভাবগত, হৃদয়গত। অত্যন্ত অল্প বয়সে যখন তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁর নিজের পরিবারেও ভাল করে স্বীকৃতি পায়নি তখনই ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রের কাছে তিনি অবারিত প্রশ্রয় পেয়েছেন। যোগাযোগের সেই প্রথম সূত্রটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু রক্ষাই করেন নি নানাভাবে তার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, উপকৃত করেছেন নিজেকে, ত্রিপুরাকে এবং শান্তিনিকেতনকে। সে কাহিনী পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করবে আশা করি।

মহারাজ বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন রাজনৈতিক সমস্যার সন্মুখীন হয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথের সাহায্যপ্রার্থী হন। কলকাতার সমাজে, সরকারী মহলে প্রিন্স দ্বারকানাথের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তার সহায়তায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর অতি সহজেই আপন সমস্যার সমাধান করতে পারলেন। সেইদিন থেকে ত্রিপুরার রাজপরিবার আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হলো।

অতি অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয় মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে বীরচন্দ্র ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন এবং প্রবল প্রতাপ ছিল তার। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বহুমুখী অবদানের জন্য বীরচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে আছেন। অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশ করলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রধানা মহিষীর মৃত্যু হয়েছে তখন। ভগ্ন হৃদয়ের কবিতা তাঁর প্রাণের বেদনার সুরের সঙ্গে আশ্চর্য্যভাবে মিলে গেল। তরুণ কবিকে অভিনন্দিত করার জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষকে পাঠিয়েছিলেন। জীবনের প্রথমে সেই যে অপ্রত্যাশিত সাদর সম্ভাষণ কবি লাভ করেছিলেন তা তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। জীবনস্মৃতিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। আরও পরবর্তী কালে ত্রিপুরাতেই এক অভ্যর্থনার উত্তরে বলেছেন—"সেই সময় আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন—তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হতে বিশেষভাবে পঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।" কিন্তু মহারাজ যে তাঁকে স্বীকার করেছিলেন এই বলেই তিনি খুসী রইলেন না। অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বীরচন্দ্রের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন "জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তার অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি

আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়েনা তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।"

এই অভ্যর্থনার পটভূমিকায় সাহস পেলেন রবীন্দ্রনাথ। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য নিয়ে উপন্যাস লিখতে ইচ্ছা ছিল মহারাজ বীরচন্দ্রকে সহায় পেলেন। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র স্মরণ করিয়ে চিঠি লিখলেন ১২৩৯ সনের ২৩ শে বৈশাখ—

"মহারাজ বোধকরি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রাজর্ষি নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনার কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তনের করিতে চেষ্টা করি।" ত্রিপুরার ইতিহাস এক বীরত্বের কাহিনী। সে কাহিনী অনেকেরই জানা নেই। গোবিন্দমাণিক্য কতখানি ঐতিহাসিক চরিত্র সে আলোচনা প্রবন্ধান্তরে আমরা করেছি। এখানে দেখাতে চাই বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই কাজে কতটা উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। মুকুট ও রাজর্ষি তখন সদ্য প্রকাশিত। তার মধ্যে যে ইতিহাস থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে এ ঘটনার উল্লেখ করে বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিলেন যে ভুল অতি সহজেই সংশোধন করা যাবে। ত্রিপুরাকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন এইজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বীরচন্দ্র লিখলেন রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবে :

"আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয় আমি আদরের সহিত পূর্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সংকলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা।" রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটা সুগভীর স্নেহ জন্মেছিল বীরচন্দ্রের। কিছুকাল পরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় বীরচন্দ্র গিয়েছিলেন কার্সিয়ং। সঙ্গে ডেকে নিলেন তরুণ কবিকে। গভীর রাত পর্য্যন্ত রাজা আর কবি কাব্যচর্চা করেন, রাজা কবির গান শোনেন মুগ্ধ হয়ে। সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর অধিকার ছিল মহারাজা বীরচন্দ্রের। আর শিক্ষানবীশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামনে গান ধরতে কুণ্ঠিত। তবু রাজার উৎসাহে গান করেন। পরবর্তীকালে বলছেন "প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে। মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় আমাকে সাহস দিয়েছিল।" সমস্ত দেশ যখন তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো তখন বীরচন্দ্র

তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন। যখন শান্তিনিকেতনে তাঁকে ভারত-ভাস্কর উপাধি দেওয়া হলো তখন সেই অভ্যর্থনার উত্তরে কবি বল্লেন "আমার বয়স তখন অল্প, লেখার পরিমাণ কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল এক লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি নূতন ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলঙ্কৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে।" যে সমর্থন রবীন্দ্রনাথ বীরচন্দ্রের কাছে পেয়েছিলেন সেই সমর্থন পরবর্তীকালে ত্রিপুর-রাজদের কাছ থেকে তিনি সমানভাবে পেয়েছিলেন। বীরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সমস্ত জীবন তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

বীরচন্দ্রের পরে ত্রিপুরার রাজা হলেন রাধাকিশোর। যোগ্যপিতার যোগ্যতর পুত্র। তাঁর সঙ্গে অতি অল্প আলাপ রবীন্দ্রনাথের। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে দেরী হলো না। রাধাকিশোরের নিমন্ত্রণেই রবীন্দ্রনাথ এলেন আগরতলায়। তখন বসন্তকাল। আগরতলা সহরের উত্তরাংশে কুঞ্জবনে বসন্তোৎসবের আয়োজন সুরু হলো। সেই বসন্তোৎসব আজও ত্রিপুরার বহু লোকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বীরচন্দ্র ছিলেন কবির পিতৃস্থানীয়,রাধাকিশোর ছিলেন বন্ধুস্থানীয়। পারিবারিক ব্যাপারে, রাজ্যশাসন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত রাধাকিশোর অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ যে কি ভাবে অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করে রাধাকিশোরকে তাঁর সভাসদদের সম্পর্কে সন্দেহ করতেন তা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

আগরতলায় যেমন রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা হলো তেমনি কলকাতায় সঙ্গীত সমাজে রাধা-কিশোরের অভ্যর্থনার আয়োজন হলো। বিসর্জন নাটক অভিনীত হলো। রবীন্দ্রনাথ নিজে হলেন রঘুপতি। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরোয়ায় বলছেন "এই বাড়ীতেই (বির্জিতলা—সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ী) ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে 'বিসর্জন' নাটক দেখানো হয়, পুরোনো সিন তৈরী ছিল সেই সব খাটিয়েই। আমাদেরও পার্ট মুখস্ত ছিল। রবিকাকা পার্ট নিয়েছিলেন রঘুপতির, অরুদা জয়সিংহের, দাদা রাজার, অপর্ণা এ বাড়ীরই কোন মেয়ে মনে নেই ঠিক। বালক বালিকা তাতা আর হাসি বোধ হয় বিবি আর সুরেন তাও ঠিক মনে পড়ছেনা। অবনীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টতঃই রাজার নাম ভুল করেছেন। বীরচন্দ্র কোনদিন সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক অভ্যর্থিত হননি। সেই সঙ্গীত সমাজের অভ্যর্থনায় রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের জন্যে একটি গান রচনা করলেন—গান গাইলেন নাটোরের মহারাজা।

"রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা।
ত্রিপুর পুর লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।
গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে,
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে ;
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা।
ক্ষীণ জন ভয়তারণ অভয় তব বাণী

দীনজন দুখ হরণ নিপুণ তব পানি
শুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা ॥

শান্তিনিকেতনের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি ছিল মহারাজ রাধাকিশোরের। যখন অর্থনৈতিক দুর্যোগ চরমে উঠেছে তখন রাধাকিশোরের বাৎসরিক সহস্রমুদ্রা রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ভরসা ছিল। বহু ছাত্র তিনি নিজে বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। বিজ্ঞানগার পরিদর্শন করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কিছু যন্ত্রপাতিও দিয়ে এলেন। রাধাকিশোর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন "কেবলমাত্র কবি বলেই নয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃভাবে তিনি আমাকে আত্মীয় করে নিয়েছিলেন। সে এমন আত্মীয়তা যা মিথ্যাস্তুতির প্রত্যাশা করত না, যা বিরুদ্ধ বাক্যকেও স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হতো না। মনে আছে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন 'রবিবাবু আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা করবেন।' তাঁর সময় ত্রিপুরা রাজ্যে আমি বারংবার এসেছি, তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহের টানে।" শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে রাধাকিশোরের অকৃত্রিম উদ্বেগ কবিকেও প্রেরণা দিয়েছে। মুক্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন "আজ বিশবৎসরের উর্ধকাল শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্যপীড়িত ও অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভকর্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন।"

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ "কাহিনী" গ্রন্থ রাধাকিশোরকে উৎসর্গ করেন। যখন রাধাকিশোর সে কথা শুনলেন তখন তিনি একটি পত্রে লিখছেন (১৩০২-১৫ই ফাল্গুন) "কাহিনী গ্রন্থের সহিত আমার নাম সংস্রব রাখিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমার অমত হইতে পারে কি? ছাপা হইবামাত্র ১০।১২ কপি পাঠইয়া সুখী করিবেন। এখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিব।" কিন্তু শুধু বিতরণ করেই ক্ষান্ত নন। স্বল্প ভাষায় তার একটি সমালোচনাও পাঠালেন রবীন্দ্রনাথকে—"বন্ধুত্বের খাতিরে যে একটা অযথা প্রশংসা করিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক কবিতার গাম্ভীর্য রক্ষার বিষয়ে আপনি সিদ্ধহস্ত। অথবা ইহা আপনার স্বাভাবিক শক্তির নৈপুণ্য। এই গাম্ভীর্যের সহিত মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইয়াছি। নায়ক নায়িকার পদোচিত ভাব ও ভাষা অতি পরিপাটি হইয়াছে। পৌরাণিক প্রস্তাব প্রসঙ্গাদি অবলম্বন করিয়া আধুনিক সময়ে যে কয়খানি কাব্যাদি রচিত হইয়াছে সেগুলি প্রায় উক্ত পদোচিত সম্মান ও গাম্ভীর্য রক্ষার্থে ভাষা ও ভাবের বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখিতে পাই না। আপনার গ্রন্থসকল সে দোষ বর্জিত।"

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল উভয়ের মধ্যে চিরদিন। কিন্তু দুজন রাজার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগই ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠতার শেষ কথা নয়। ত্রিপুরার রাজপরিবার যে সুদীর্ঘ-

কাল ধরে বাংলাভাষাকে নানা দুর্যোগের মধ্যেও রক্ষা করে এসেছেন এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ১৩১২ সালে 'ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি 'দেশী-রাজ্য' প্রবন্ধ পাঠ করেন—তার শেষাংশে দেশী রাজ্যগুলি সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করে বলেন-"দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেমন মাতৃকক্ষে আশ্রয় করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে।" দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি এই আশা পোষণ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়নি। পরিণত কালে ত্রিপুর রাজবংশের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাদের বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের জন্য। "এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলাভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্ত হয়ে কোনদিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন। এই পরিবারে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।"

ত্রিপুরা যেমন রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল তেমনি রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরাকে উপকৃত করেছেন নানাভাবে। রাধাকিশোর যখন ত্রিপুরার রাজা তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির ভাষা একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতার পরিচায়ক অন্যদিকে কঠোর সত্যভাষণের সংসাহসের ইঙ্গিতবাহী। রাধাকিশোরের কর্মচারীদের অধিকাংশকেই রবীন্দ্রনাথ সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি মনে করতেন যে এই সব কর্ম্মচারীরা নিজের নিজের স্বার্থপূরণের আশায় মহারাজকে সব সময়ে ঘিরে থাকে, মহারাজের কর্ত্তব্য তাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা। কুচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে তিনিই ত্রিপুরার যোগাযোগ সাধন করিয়ে দিয়েছিলেন। দেশীয় নৃপতিবর্গ গতানুগতিক উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে জীবন কাটিয়ে যাতে না দেয় সেটাই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। দেশীয় রাজ্যের রাজপুত্রদের আত্মবিকৃত পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহ থেকে তিনি ত্রিপুরার রাজপুত্রদের দূরে থাকতে বলেছেন—"আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজপুত্র ইংরাজ শিক্ষক সংসর্গে আপন জাতীয়ত্ব এমন কি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। তাহাতে আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে।··· দিবারাত্রি জুয়া খেলিয়া, মদ খাইয়া, নাচিয়া, ইংরাজের প্রমোদসভায় অহোরাত্র উন্মত্তভাবে সঞ্চরণ করিয়া নিজেকে সর্বতোভাবে হেয় করিয়াছে···তুমি সংযত অপ্রমত্ত থাকিয়া সুদৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে।" (আলমোড়া থেকে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখা ১৬ই শ্রাবণ ১৩১০-এর চিঠি)

আগেই উল্লেখ করেছি যে রাধাকিশোর রাজা হয়েই রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন আগরতলায় ১৩০৬ সালে। ১৩১২ ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হলো। প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এই সম্মেলনের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন রাধাকিশোর। কিন্তু কর্ণেল মহিমঠাকুর তাঁর দেশীয় রাজ্যগ্রন্থে

বলেছেন যে সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধ পড়লেন। বল্লেন—"এই ত্রিপুর রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে সংস্কৃতবাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি "কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীর্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেণ্ট সার নহে, বাণিজ্য তরী সার নহে, বীর্যই সার।" ঐ সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথকে উচ্চাসনে বসিয়ে রাধাকিশোর বসলেন সর্বসাধারণের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ সংকোচ অনুভব করে তাঁকে উচ্চমঞ্চে আহ্বান করলে বললেন, "সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র, এ উচ্চমঞ্চ আমার স্থান নয়।"

১৯২৬ সালে কবি আবার এলেন আগরতলায়। আগরতলায় কিশোর সাহিত্য সভা রবীন্দ্রনাথকে এক সম্বর্ধনা দেয়। সেই সম্বর্ধনার উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বোধহয় অনবধানবশতঃ দুএকটি ত্রুটি করেছেন। তিনি লিখছেন "বর্ত্তমান (১৯২৬) মহারাজার পিতা বীরচন্দ্রমাণিক্য কবির বন্ধু ছিলেন; তাঁহার পিতা কবির কাব্যে জীবনের প্রত্যুষে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন তাঁহার কথা কবি কোনদিন ভুলেন নাই। ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৬) স্থানীয় কিশোর সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আহূত জনসভায় কবির সংবর্ধনা হইল, ত্রিপুরার তরুণ মহারাজ সভাপতি।" এই অংশটির মধ্যে তথ্যের ভুল আছে দু একটি। ১৯২৬ সালে ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর। তাঁর পিতা বীরেন্দ্রকিশোর, বীরচন্দ্র নন। কবির কাব্য জীবন প্রত্যুষে যিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি ১৯২৬-এর মহারাজা বীরবিক্রমের তিন পুরুষ উপরে। দ্বিতীয় কথা কবির সম্বর্ধনায় ত্রিপুরার তরুণ মহারাজ সভাপতি ছিলেন না, সভাপতি ছিলেন তাঁর অভিভাবকস্থানীয় কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর। কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথের নিকট সম্পর্কে আসবার বহু সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯২৬-এর মে মাসে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশ যাত্রা করেন। তিনি সেই সম্মেলনে সভাপতির আসন থেকে বল্লেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শ্রদ্ধার সুর মিলিয়ে— "আমার জীবনে এমন অনেক দিন গিয়েছে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র বাণীই আমাকে সত্যের পথ ন্যায়ের পথ দেখাইয়া জীবন দিয়াছে। তাঁহার উপদেশপূর্ণ পত্রগুলি আমার অমূল্য সম্পদ।" তাঁর এই অভ্যর্থনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—"আমি ত্রিপুর রাজ্যের আর কোন হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণসাধন করেছি বলে গৌরব করতে পারবো।...আজ বসন্তে ত্রিপুরার বনশ্রী যখন দক্ষিণবাতাসে দিকে দিকে পুষ্পোৎসবের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তখন আমি এঁরই কাছ থেকে এঁর পিতৃসখারূপে সেই মাল্য গ্রহণ করতে এসেছি যা এঁর পিতা পিতামহ তাঁদের প্রীতিভাজন এই অতিথির জন্য সজ্জিত করে রেখে দিতেন। ১৩ই ফাল্গুন ১৩৩২ (১৯২৬) সালে কবি কুঞ্জবনের বারান্দায় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন; আকাশ কালো মেঘে থম্‌থম্ করছে। আনন্দে অধীর হয়ে কবি বল্লেন—"আমার নাম বদলে আমাকে তোমরা এখানে একটা কুটির বেঁধে দাও। জীবনের শেষ কটা দিন প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্য দেখেই কাটাবো।" সেইদিনই সন্ধ্যায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে মণিপুরী রাসলীলা

নৃত্য দেখানো হল তাঁকে। নৃত্যমুগ্ধ কবি নবকুমার ঠাকুরকে শান্তিনিকেতনে আনবার ব্যবস্থা করলেন —নৃত্যসভায় মুগ্ধ হয়ে বল্লেন—"আমার পূর্ববঙ্গ আসা সার্থক হলো। প্রভাত মুখোপাধ্যায় কবি-জীবনীতে লিখছেন—"আগরতলায় কবি দুইটি গান রচনা করেন—'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা' ও 'ফাগুনের নবীন আনন্দে'। আমাদের মনে হয় এই ভ্রমণকালে নিম্নলিখিত গানগুলিও লিখিত হয়—'বনে যদি ফুটল কুসুম, 'এসো আমার ঘরে' 'আপনহারা মাতোয়ারা' 'ওগো জলের রাণী'।"

১৯৩০ সালে কলিকাতায় যে জয়ন্তী হলো তার একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন বীরবিক্রম কিশোর।

১৯৪০ সালে মহারাজ বীরবিক্রম রবীন্দ্রনাথকে ভারত-ভাস্কর উপাধি দিতে ইচ্ছুক হলেন। ১৩৪৩ এর ২২শে চৈত্র তাঁর আদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য এক কমিটি গঠিত হলো। সেই আদেশেই এক জয়ন্তী দরবার অনুষ্ঠিত হলো। সেই দরবার থেকে রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি দেওয়া হলো। সেই উপাধি পত্রের যথাযথ উদ্ধৃতি করছি:

রবীন্দ্র-জয়ন্তী দরবার

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্‌টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী।

ইতি—১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ

যেহেতু বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত;—

যেহেতু মর্ত্ত্যদেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ—'মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্', ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃ প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়— তিনিই তরুণ রবিকে রাজঅভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণকামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরবলাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভাযোগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর-রাজের কর্ত্তব্য—"জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্‌দয়ান্ধকারম"—

অতএব

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত

কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে

"ভারত-ভাস্কর"

আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—

এবং

শ্রীভগবান তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।"

অশীতিবর্ষ কবি এই সম্মান সাদরে গ্রহণ করলেন। প্রথম কৈশোরে যে তিনি এই রাজ্যের রাজার হাতে সম্মান পেয়েছিলেন সেই কথা কবি কোনদিন ভোলেন নি। উত্তরায়ণের পুষ্পসজ্জিত বারান্দায় ইনভ্যালিড চেয়ারে কবি এসে নিজে গ্রহণ করলেন উপরের পদ্মচিহ্নিত রাজকীয় রোবকারী। কবি এই প্রসঙ্গে বল্লেন "যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয় সংকুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজস্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। সেই রাজবংশের সেই সম্মান মূর্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবিশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে।"

আঠারো থেকে আশী বছর, জীবনের এই বিরাট অংশে ত্রিপুরার সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে দিনে দিনে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাহায্যের দ্বারা উভয়েই উভয়কে উপকৃত করেছেন। কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথের আদর্শে গড়া মানুষ। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। প্রশ্ন করেছিলুম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলুন। পক্ককেশ সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধের দৃষ্টি চলে গেল দূরে কোন ভাবলোকে। বল্লেন—"আমি তখন ছোট বালক ; রবীন্দ্রনাথ আমায় নিয়ে গেলেন মহর্ষির কাছে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন ত্রিপুরার রাজকুমার, আমাদের আশ্রমের প্রথম ছাত্র। কিন্তু আমি যে রাজার ছেলে, নানাকারণে শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্র হওয়া হলোনা আমার। রাজার ছেলে হওয়ার কত সুখ!"

শুধু একটি বিশেষ রাজবংশের পরিচয়ই ত্রিপুরাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রিয় করে তোলেনি। ত্রিপুরার নিজস্ব একটা ঐতিহ্য ছিল, বাংলা ভাষার বিকাশের ত্রিপুরা ছিল লীলাভূমি। সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতই ত্রিপুরাকে প্রিয় করেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেই অতীতের কাহিনীর সূত্র টানতে গিয়েই বর্ত্তমান নৃপতিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ। আজও বসন্তশেষে যখন আগরতলার শ্যামল পর্বতাঞ্চল রুক্ষ বৈরাগ্যের গৈরিক বেশ ধারণ করে, যখন কালবৈশাখীর উন্মনা পদক্ষেপ কুঞ্জবনের উপরে শুকনো পাতার ঘূর্ণি উড়িয়ে দেয় তখন মনে পড়ে কবির সেই মিনতি—আমার নাম বদলে তোমরা এখানে আমায় একটি কুটির বেঁধে দাও। ত্রিপুরার সর্বসাধারণের ভালবাসা পেয়ে তিনি ছিলেন আনন্দিত আর ত্রিপুরা তার সস্নেহ পদস্পর্শে চিরকালের জন্য ধন্য।

মুগ্ধা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

তার এক হাতে একটি নিকেল মোড়া সরু লম্বা কাঁচি। অন্য হাতে একটি চন্দ্রমল্লিকা। বাড়ির পিছনদিকের বারান্দায় সে উঠে এলো।

তার রান্না ঘরের দরজা এখন বন্ধ। ঝি কয়লায় আঁচ দিয়েছে, টালির ছাদে বসানো চোঙ্‌ দিয়ে এখনও হাল্কা ধোঁয়া এঁকে বেঁকে বেরুচ্ছে।

সিঁড়িগুলোতে টবে বসান অনেক ফুলের গাছ, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেও একটা ছোটখাট ফুলের আবাদে পৌছান যায়। সেই আবাদ শেষ হয়েছে একটা ছোট তরকারি বাগানে। টম্যাটো গাছের ঝোপ তিনটিতে তেল চুক্‌চুকে ফলগুলো এখন সবুজ। কফিগুলো ভাল হয়নি, পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে।

শোবার ঘরের ছাদ থেকে নেমে আসা লতাটার সমাদর যত না তার ফুলের জন্য তার চাইতে বেশী তার পল্লবের। কাঁচি দিয়ে একটি পল্লব কাটতে গিয়ে সে অবাক হ'য়ে দেখল একটি দলছাড়া মৌমাছি সেই পল্লবের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কিম্বা এইমাত্র এসে বসেছে। সে মৌমাছিটিকে বোকা মনে ক'রে তাকে বিব্রত করলো না, অন্য আরেকটি পল্লব কেটে নিল।

স্নান হয়নি, সম্ভবত তার দেরি আছে। কারণ গলায় মাফলার জড়ান দেখছি। ডান হাতের উপর থেকে শাড়ির আঁচলটা সরে যাওয়াতে উলের ব্লাউজের কিছুটা চোখে পড়ছে। কপালের উপরে ঈষৎ রুক্ষণ দু'এক গোছা চুল। সেই চুলে কয়েক বিন্দুজল পাথরের মত চক্‌চক্‌ করছে। ফুল তুলতে গিয়ে শিশির লেগেছে কিম্বা মুখ ধুতে গিয়ে জল। এত সকালে প্রসাধন নিয়ে সে ব্যস্ত হ'তে পারে না। তার খোঁপা ভাঙা চুল পিঠের উপরে আধখানা নেমে আছে, একটা রুপোর কাঁটার মাথা চোখে পড়ছে। হাল্কা সবুজে সাদা ডোরা বসানো তার শাড়িটা রাত্রির ঘুমে একটু অগোছালো।

পাশাপাশি তিনটি ঘরের মধ্যেরটিতে সে ঢুকলো। এটিতে তারা খায়, দুপুরে উল নিয়ে সে বসে, পাড়ার মেয়েরা কখনো এসে আড্ডা জমায়, তার ছেলে কাঠের ঘোড়ায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে, অন্য কখনো ছবির বই দেখে অক্ষর পরিচয় করে। সব জানলা দরজা এখনো খোলা হয় নি, শুধু দরজার মাথায় বসানো ঘষা কাঁচের আলো-জানলা দিয়ে দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবলো। হাতের ফুল ও কাঁচি একটা চেয়ারের উপরে রেখে খাবার টেবিল থেকে চাদরটা তুললো। কাল রাত্রিতে ছেলেটা ঝোল ঢেলে ফেলেছিল তা মনে পড়লো। বাঁ দিকের দেয়াল আলমারি খুলে ধোয়া চাদর বার ক'রে টেবিলে বিছালো তারপর ছোট ফুলদানিতে ফুল আর পল্লব বসালো।

তার ঘাসের চটিতে রঙীন কাতার ম্যাটিঙের উপরে কোন শব্দ হচ্ছিলো না। ডানদিকের ঘর থেকে খুক্‌ ক'রে কাশির শব্দ হ'ল। তার স্বামী তাহ'লে উঠেছে, দিনের প্রথম সিগারেট

ধরিয়েছে। সে আর দেরি করলো না। ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে তার দাঁত মাজিয়ে পোশাক পালটে প্রস্তুত করতে হবে, রান্নাঘরের কাজগুলো শেষ করতে হবে। এর মধ্যে স্বামী প্রাতকৃত্যাদি শেষ ক'রে বাইরের বারান্দা থেকে সকালের কাগজখানা নিয়ে আসবে, টেবিলে গিয়ে বসবে চায়ের প্রতীক্ষায়।

সে ছেলের ঘরে ঢুকে তাকে জাগিয়ে, কোলে করে বাথরুমের দিকে চলে গেলো।

তার নাম গায়ত্রী। বিয়ের সময়ে স্বামী সরকারী কলেজে অধ্যাপক ছিল। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিভাগে। পাঁচ বছর ধ'রে এই বাংলোয় তারা বাস করছে। মাইল দু' এক দূরে খনন কার্য চলেছে। গুপ্তযুগের এক নগরের ধ্বংসাবশেষ মাটির তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করছে।

সহর থেকে দূরে এসে গায়ত্রী খুঁতখুঁত করেনি। কারণ সে রকম করা তার স্বভাব নয়। নতুবা অনেক হেতু ছিল তার অস্বস্তি বোধ করার। সে সহরের মেয়ে। সভা-সমিতি ছবি-থিয়েটার। সামাজিক প্রাণী ছিল সে বিয়ের আগে এবং পরেও। এখনও মনিঅর্ডার ক'রে সে অনেক সমিতিতে চাঁদা পাঠিয়ে আসছে। দু' একটি সমিতির কার্যকরী সংস্থার সভ্য সে। অনুপস্থিতি সত্বেও সে নির্বাচিত হ'য়ে যাচ্ছে। অবশ্য এখানেও সে একটি সমিতি করেছে— 'নারীত্রাণ সমিতি'। স্থাপয়িতা হিসাবেও বটে, এ অঞ্চলের সব চাইতে বড়ো কর্মচারীর স্ত্রী হিসাবেও বটে সে এই সমিতির সভাপতি।

বড়ো কর্মচারী বৈ কি। অধ্যাপক হিসাবে তার স্বামী সম্মানার্হ ছিল, এখন সেটার সঙ্গে ক্ষমতার সংযোগ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটদের যে রকম ধরণের অধিকার আছে তেমনি কিছু কিছু যেন পেয়েছে তার স্বামী। খনন কার্য্যের তদ্বির তদারক ছাড়াও অধীনস্থ কর্মচারীদের ছুটি, নিয়োগ, বদলী ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পুলিশের ফাঁড়ি বসেছে। সেই ফাঁড়ির লোকরাও আইনগত ভাবে তার স্বামীর কর্মচারী না হ'লেও তারাও তার কাছে পরামর্শ নিতে আসে। সাহেব ব'লে উল্লেখ করে।

চায়ের টেবিলে কাগজ পড়তে পড়তে সাহেব কথা বলছিলো। বড়ো অক্ষর লেখা বড়ো খবরগুলো একনিমেষে প'ড়ে ফেলে সে। ছোট খবরগুলোতেই তার আকর্ষণ বেশি। ডিমে চামচ দিয়ে তেমনি একটি ছোট খবর প'ড়ে সে গায়ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সদরে 'নারী পুনর্বাসন সমিতি'র বাৎসরিক সভা হচ্ছে।

'তুমি কি এই সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত নও?' সাহেব কৌতুকের সুরে বললো।

'তা সংযুক্ত বৈ কি।'

সাহেব হাসল, 'এ অঞ্চলে, এ জেলাই বলতে পারো, তোমাকে ছাড়া কোন সমিতি হয় না ব'লেই আমার ধারণা।'

ভার সাম্য রক্ষা করার জন্য তুমি সমিতি মাত্রকেই বর্জন করেছ। সদরের ক্লাবের চিঠি এসেছে সেদিন দু' তিন বছরের চাঁদা দাও না।' গায়ত্রী হাসল।

'ওরা এখনো লিষ্টিতে নাম রেখেছে নাকি?'

'চাঁদা পাঠিয়ে দেব।'

'তা দিও।'

গায়ত্রী বললো, 'তোমার কয়েকখানা পত্রিকা প'ড়ে আছে। পাতাও কাটা হয়নি।'

'তাই নাকি? দিওতো পড়তে।'

সাহেব বললো কিছুক্ষণ পরে, 'হাসছ যে।'

'ভাবছি তোমার ছেলে তোমার মত হবে কি না।'

'তা একটু হবে।'

প্রাতরাশ শেষ হ'ল। সাহেব সার্টের গলায় টাই বেঁধে দাঁড়াতেই গায়ত্রী এসে কোটটা ধরলো। ততক্ষণে তার আর্দালি তার মোটর বাইক গেটের পাশে নামিয়ে ঝাড় পোঁছ করে পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। সাহেব বাইকে চেপে দস্তানা প'রে ডান হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। বারান্দা থেকে গায়ত্রী বিদায় হাসিমুখে বললো, 'বাই-বাই'। তার ছেলে বললো, 'ছকাল ছকাল এছো।'

আদালি গেট বন্ধ করে, গেটের পাশের ছোট ঘরটি থেকে তার নাগরা জুতো প'রে বাজারের ঝোলা হাতে করে ঘুরে এসে দাঁড়াবে রান্না ঘরের কাছে। গায়ত্রী তাকে বাজারের টাকা দেবে।

আর্দালি বাজারে গেলে গায়ত্রী পত্রিকা নিয়ে বসলো, ছেলেও তার ছবির বই নিয়ে এলো।

আজ শুক্রবার তা গায়ত্রীর খেয়াল ছিল না। থাকলে অবশ্য এরই মধ্যে স্নানটা সেরে নিত। এই দিনটিতে তাকে এখানকার নারীত্রাণ সমিতিতে যেতে হয় কিম্বা সমিতির পক্ষ থেকেই কেউ আসে তার কাছে। দিনটিকে মনে করিয়ে দিতে সমিতির পক্ষ থেকে পঙ্কজিনী এলো। তার অত্যন্ত নিঃশব্দ চলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় সে এসেছে। তার চলার দিকে হঠাৎ কারো চোখ পড়লে মনে হয়—এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিলো, এই মাত্র চলতে সুরু করলো। অত্যন্ত কালো, যার চাইতে কালো কল্পনা করা যায় না। ছিপছিপে চেহারা। পরণে নরুণ পাড় শাদা শাড়ি। সে ধীরে চললেও তার হাঁটার যে বিরাম নেই তার লক্ষণ—তার পায়ের আঙুলের ছোট ছোট কড়া যা ধূলিধূসর স্যাণ্ডেলের মধ্যে থেকে চোখে পড়ে। গায়ত্রী বলল, 'এসো'।

শুক্রবারের দিন যদি যে গায়ত্রীর সঙ্গে কোথাও সভা করতে না যায় তবে অনিবার্যভাবেই এখানে আসে। আধখানা বেলা কাটিয়ে যায়। শুক্রবারে সুরু করে রবিবারের সন্ধ্যা পর্যন্ত সে সমিতির কাজ করে বেড়ায়। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সে একজন নার্সমাত্র। উপনিবেশ এবং গ্রামের সংসারগুলোই তার কর্ম্মক্ষেত্র। বউদের সঙ্গে আলাপ করে বেড়ানোই তার কাজ। একটু বৈশিষ্ট্য আছে সে আলাপের, কখনো উঁচু গলায় নয়, কখনো প্রকাশ্য স্থানে নয় সে সব কথাবার্ত্তা। বাড়ির মধ্যেও কোনো ঘরের কোণ, কিম্বা দুই ঘরের মধ্যেকার সংকীর্ণ জায়গায় অথবা কোনো দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে সে বউদের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে আলাপ করে। কখনো নিজের হাত থেকে কোন বউএর হাতে সংগোপনে কিছু দেয়। সেও হাত মুঠ ক'রে সেই দান নিয়ে গোপন ক'রে ফেলে। এর ফলে গ্রামের এবং উপনিবেশের কিশোর কিশোরী-দের কাছে সে কৌতুহলের ও রহস্যের কিছু। সে কোনো বাড়িতে ঢোকামাত্র ছেলে-মেয়েরা সে

কি করে দেখবার জন্য, সে কি বলে শুনবার জন্য হট্টগোল থামিয়ে চুপ ক'রে যায়। কিন্তু তাদের কিছু সুবিধা হয়নি তাতে, রহস্য বেড়েই যাচ্ছে।

'আজকের খবর কি?' গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলো

'ভালো, চারুদিদি চাঁদার খাতা হাতে বেরিয়েছেন।'

'পঙ্কজ, তোমাদের মতো কর্মী পাওয়া যে কোন সমিতির পক্ষেই সৌভাগ্য।'

গায়ত্রীর ছেলে এত ছোট যে পঙ্কজিনী তার সামনে প্রকাশ্যে কিছু বললেও সে কৌতূহল বোধ করে না। সুতরাং পঙ্কজিনী বললো, 'আপনি সেদিন ম্যালথাসের কথা কি বলছিলেন যেন?'

'তা বলছিলাম, কিন্তু তার কথা কেন?'

'মন্দাকিনী বলছিল, তার স্বামী রাজী নয়। বলেছে—তারা গরীব ব'লেই তাদের সম্বন্ধে এরকম বাজে কথা লোকে ভাবে আর বলে।'

মন্দাকিনীর স্বামী সুরেন ব্রহ্ম তার স্বামীর অধীনে একজন কেরানী; সুতরাং আর্থিক অবস্থায় তারা গায়ত্রীদের তুলনায় হীন। একথাও হয়তো মন্দাকিনী তার স্বামীকে ব'লে ফেলবে পঙ্কজিনীর পিছনে মেমসাহেব গায়ত্রী আছে। তারপর সুরেন ব্রহ্ম সে কথা অন্যান্য কর্মচারীকেও বলতে পারে। এই গোপন দাম্পত্য বিষয়ে সুদূর থেকেও সংযুক্ত হওয়ার লজ্জা অনুভব করলো গায়ত্রী, বিব্রত বোধ করলো সে।

'পঙ্কজ, থাক তা হ'লে মন্দাকিনীর কাছে আর যেয়ো না।'

'কিন্তু এ রকম কথা তো অনেকেই বলতে পারে। তার চাইতে শিক্ষিত লোকদের উল্টোপাল্টা কথার উত্তর তৈরি ক'রে রাখা ভালো।'

'তা বোধ হয় ভালো। কিন্তু।'

গায়ত্রী উঠে গিয়ে আলমারি খুললো। মস্তবড়ো এবং চওড়া আলমারি। আলমারি থেকে কিছু নেবার জন্যই পঙ্কজিনী এসেছে। দিয়ে দিলেই সে চ'লে যাবে। চ'লে যাতে যায় এ রকম একটা তাগিদই ছিলো আলমারি খোলার মধ্যে। আলমারির একটি তাকে সমিতির খাতাপত্র, ক্যাশ বাক্স, দু'তিনটিতে কাপড় চোপর ফ্রক-ইজের দানের জন্য সংগৃহীত। দুটিতে অনেক ধরনের ওষুধের শিশি বোতল, ইংরেজিতে প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখা আছে। সব চাইতে উপরের তাকে জন্মশাসনের উপকরণ।

পঙ্কজিনী উঠে এসেছিলো। গায়ত্রীর ছেলের চোখে এই আসবাবটি একটা বন্ধ ঘর যা চকিতের জন্য খুলে আবার বন্ধ হ'য়ে যায়। তারার মতো চোখ মেলে ছেলেটি চেয়ে রইল আমরা যেমন ভগবানের রহস্যময় কার্যকলাপের দিকে তাকাই। ঝপ্ ঝপ্ ক'রে কিছু পঙ্কজিনীর মেলে ধরা আঁচলে ফেলে দিলো গায়ত্রী।

'ওষুধ?'

'থাক আজ।'

চিন্তা করার সময় পেয়ে মন্দাকিনীর বাবদে আর বিব্রত বোধ করলো না গায়ত্রী। বরং

তার মনে হ'লো এখন তার হাতে অনেক কাজ। আর্দালি বাজার ক'রে ফিরেছে। তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কি-কি রান্না হবে ঠিক করে ঝিকে তরকারি কুটতে ব'লে দিতে হবে। ইতিমধ্যে তার স্নান হ'য়ে যাবে। তারপর সে রান্না করবে। ঘণ্টা দু'একের কাজ, নিজের হাতেই করে সে। তার ধারণা পাচিকাকে নিজের রুচি মতো রান্না শিখানোর চাইতে তাদের ধ'রে ধ'রে ম্যাট্রিক পাশ করানো সোজা।

সে সুতরাং স্নানের ঘরে ঢুকেছে তখন। তার ছেলে এ সময়ে বাজারের জিনিস পত্র নিয়ে ঝি এবং আর্দালির সঙ্গে নানা কৌতূহলের প্রশ্ন ক'রে গল্প করে। স্নানের ঘরে জল ঢালতে ঢালতে এ সবই কাণে যায় গায়ত্রীর।

আজ সে শুনতে পেলো ডাকপিওনের গলা, চিঠি আছে। আর্দালি তখন খোকাবাবুর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। ডাকপিওন দ্বিতীয়বার ডাকলো। গায়ত্রী স্নানের ঘর থেকেই একটু উঁচু গলায় বললো বাইরে রেখে যাও। কথাটা বলতে সে বাইরের দিকে যে দেয়াল তার দিকে ফিরেছিল। সে সময়ে তার খেয়াল ছিল না সে দিকটাতেই আয়না। ত্রস্তভাবে সে নিজেকে আবৃত করলো। তারপরেই অবশ্য তার মনে পড়লো তার চারিদিকেই দেয়াল। তখন সে স্নান করতে লাগলো। কিন্তু অন্যদিন যা সে করে না তেমনি ক'রে স্নান করতেও করতেও দু'একবার আয়নার দিকেও তাকালো। সে লক্ষ্য করলো পিঠের দিকে ডান কাঁধের নিচে একটা নীল রঙের তিল বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে।

মেসিনের উপরে শাড়ি জড়িয়ে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে সে রান্নাঘরে গেলো। রান্না শেষ ক'রে সে স্নানের ঘরে হাতমুখ ধুয়ে প্রসাধন করবে। এখন তাকে রান্নাঘরে দেখে নেপথ্যের কথা মনে হচ্ছে।

রান্না করতে করতে এক সময়ে সে চিঠির কথা মনে করলো। সদরের দিকে বারান্দার টেবলে দু'খানা চিঠি ছিলো। সে চিঠি নিয়ে এলো। প্রথমখানা খুলে সে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হ'লো। সদরের 'নারী সমিতির' সেক্রেটারি অনিমাদি চিঠি দিয়েছে। সাধারণ বাৎসরিক সভা নয়: এবার তারা একটি বাড়ি করতে পেরেছে এবং সে বাড়িতে তারা সহরের কয়েকজন পতিতাকে আশ্রয় নিতে রাজি করিয়েছে। আশ্রয়চ্যুতা মেয়েদের যারা পাতিত্যর দিকে পিছলে পড়ার মতো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু আশ্রয় নয়, পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও। তার আরও ভালো লাগল বাড়িটার প্রস্তাবিত নামটা প'ড়ে—আশ্রম নয়, আশ্রয় নয়—নীড়। সমিতির সভ্য হিসাবে তার কাছে ছাপান চিঠির সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি তাকে ব্যক্তিগতভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে যাবার জন্য—এককালের সহ-সভাপতি এবং প্রধানতম কর্মীদের একজন হিসাবে। মাছের তরকারিটা রান্না করতে করতে সে গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে চললো।

তরকারিটা নামিয়ে সেমিজের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় চিঠিটা বার করল সে। দু'তিন ছত্রের চিঠি। দামি চিঠির কাগজ, কোণায় নাম ছাপান: ডক্টর মোহিত সেন। সে লিখেছে: শুনলুম

তোমার সেই 'নারী সমিতির বাৎসরিক সভা হচ্ছে। যদি তুমি আসো, তা হ'লে জানিয়ে রাখি আমি ফিরে এসেছি। আশা করি তুমি, তোমার ছেলে এবং আমাদের সাহেব কুশলে আছ।

রান্না নামিয়ে রেখে সাবান তোয়ালে নিয়ে সে যখন স্নানের ঘরে ঢুকেছে তার স্বামীর বাইকের শব্দ শোনা গেলো, তারপরে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার স্বামী ঘরে এলো।

সে যখন স্বামীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো তখন নবাগত বসন্তের ভাললাগার কারণটুকুই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

টেবিলের মাথায় ছেলে, দু'পাশে দু'জন। খেতে খেতে সাহেব উপনিবেশের দু'চারটে খবর দিলো। পক্স নাকি হয়েছে দু'একটি। সুতরাং ভ্যাক্‌সিনেশান। গায়ত্রী ছেলের হাত উল্টে দেখলো গত বছরের টিকার দাগ চোখে পড়ে কিনা। সাহেব বলল, 'তা হ'লেও এবার দেওয়া উচিত।' গায়ত্রী একমত হ'ল।

সাহেব বলল, 'খুঁড়তে খুঁড়তে সহরের একটা প্রধান অংশে একটি গলি রাস্তার ধারে কয়েকটি একই চেহারার ঘরের ভিত্তি পাওয়া গেছে। যদি বৌদ্ধস্তূপের অংশ হ'তো তাহ'লে বলতাম শ্রমণদের ঘর।'

'তোমার কি মনে হয়।'

'কত কি হ'তে পারে। মনে করো বার বনিতাদের ঘর ছিল।'

'রাখ রাখ।' দোকানও হ'তে পারে।'

'তা পারে না এমন নয়।'

কথা মোড় নিলো। ছেলের জলের গ্লাসে জল দিয়ে অত জল খাসনে ব'লে গায়ত্রী বললো সাহেবকে, 'সদরে একবার যাব না কি ভাবছি।'

'কিছু কেনা কাটা আছে?'

'না, নারী সমিতির বাৎসরিক সভা।'

'কবে যাবে?'

'পরশুদিন যেতে হয়।'

'সকালের ট্রেনে গেলে সন্ধ্যায় ফিরতে পারবে?'

'তোমাদের অসুবিধা হবে না তো?'

'কি এমন হবে।' বাপ বেটায় একদিন চালিয়ে নেব।'

কিছুক্ষণ পরে সাহেব বললো, 'সদরে যদি যাও একটা কাজ ক'র তো'।

'কি?'

'মোহিতের খোঁজ নিও। ও আর চিঠিও দেয় না।'

'যদি দেখা পাই, কি বলব?' চিঠির কথা গোপন ক'রে মনে-মনে হেসে বলল গায়ত্রী।

'বারবার ক'রে আসতে বলবে।' সাহেব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললো, ওর সঙ্গে আমার কত গভীর প্রণয় ছিলো বলা কঠিন।'

'তা ছিলো। আমার চাইতে ভুক্তভোগী কে ?'

'হ্যাঁ, সেকালে তোমার ধারণা হয়েছিলো মোহিত পুরুষবেশী কোনো নারী।'

'এটা তোমার বাড়াবাড়ি।'

কথাটা বলার সময়ে না হলেও অন্য কথায় যাওয়ার ক্ষণ অবসরে সে সব দিনের কথা মনে ক'রে গায়ত্রীর কাণ দু'টি হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো। মোহিতের দিকে স্বামীর আকর্ষণ তার স্বামীপ্রেমের পথে বাধা হয়েছিলো।

সাহেব বললো, 'মোহিত বিয়ে করেছে কিনা কে জানে!'

'তা হয়ত করেছে।'

'না করলেই স্বাভাবিক হয়। ওর ভিতরে একটি সন্ন্যাসী আছে যে সেবা ক'রে পরের কাজে লেগে তৃপ্তি পায়।'

সকালের গাড়ীতে গায়ত্রী সদরে চলেছে। স্বামী এবং ছেলে তাকে তুলে দিয়ে গেছে।

রেলপথের ধারে কোথাও বা আমগাছে মুকুল, কোথাও বা মাঠে ঘাস ফুল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। প্রথম শ্রেণীর কামরায় দ্বিতীয় যাত্রী এক অতি বৃদ্ধ হলুদ রঙের ট্যাঁস। তার দিকে পিছন ফিরে বসে গায়ত্রী চিন্তা করতে লাগলো। সকালের মধুর বাতাস কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সে ভাবলো, মোহিতের চিঠিটার কথা স্বামীকে বলাই উচিত ছিলো। বলা একটুও কঠিন ছিলো না। মোহিত সম্বন্ধে তার বক্তব্য শোনার পরে হাসতে হাসতে বললেই হ'তো—তা হ'লে শোনো, মোহিতেরও এখন তোমার স্ত্রী উপরে আর অভিমান নেই।

হাতের ছোট হাতঘড়িতে সে দেখল প্রায় একঘণ্টা হ'ল ট্রেন ছেড়েছে। এখনো একঘণ্টা তো বটেই তারপরে সদরে যাবার জংশন, সেখান থেকে অবশ্য আধঘণ্টা পরেই সদর। সভা বেলা তিনটেতে। ফিরবার ট্রেন সন্ধ্যার একটু পরেই, সাড়ে সাতটায়। সভা যদি তিন ঘণ্টা চলে, তা হ'লে ট্রেণ ধরা যাবে, তখন আর মোহিতের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। যদি দেখা করতেই হয় তবে সভার আগেই—অল্প সময়ের মামুলি আলাপ।

এই রকম সভাটার জন্যই যেন দীর্ঘকাল সে প্রতীক্ষা ক'রে এসেছে। সদরের কলেজে তার স্বামী তখন অধ্যাপক। তখন সে যে ছোট নারী সমিতি তৈরি করেছিলো তারা নানা কর্মসূচী ছিলো। বয়স্ক মেয়েদের শেলাই শেখানো, খবরের কাগজ পড়ার নেশা ধরানো, হস্‌পিট্যালে মেয়েদের জন্য দু'একটা শয্যা বাড়ানো এমন কি তাদের নিয়ে রবীন্দ্র উৎসব প্রভৃতি করা। কিন্তু তাদের সেই সমিতি এমন মহৎ কাজ শেষ পর্য্যন্ত করবে এ কল্পনা করা যায় নি। পতিতাদের পুনর্বাসনের কথা সব সমাজ দরদীই ভাবে। হাতে কলমে এ যেন উদাহরণ স্থাপন করা। সারা বাংলায় না হ'ক অন্তত একটি সহরে হচ্ছে।

সেক্রেটারি অণিমাদি ভুবনবাবু উকীলের স্ত্রী। সহজে সমিতিতে আসেন নি, যখন এলেন তখন সদরের হোমরা-চোমরাদের চোখে প'ড়ে গেল সমিতি। ভদ্রমহিলা কংগ্রেসের বৈপ্লবিক দিনে

কংগ্রেসী ছিলেন। যার ফলে পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করার একটি নিসঙ্কোচ ভঙ্গি জন্মেছে তাঁর। তিনি ছাড়া এতবড় কাজে হাত দিতে আর কেই বা সাহস পেত।

আরো অন্য অনেকে হয়তো আসবে। অন্য অধ্যাপকদের স্ত্রীরা, উকিলদের স্ত্রীরা। পরিচিতারা হয়তো অনেকেই আসবে।

সুতরাং খুসিতে একটা স্মিতহাসি ফুটে রইল তার মুখে।

আর সে নিজের দিক থেকেও খবর দিতে পারবে। সকলকে বলা যাবে না তবে সে রকম অতি পরিচিত কাউকে যদি পাওয়া যায় তাকে সে পঙ্কজিনী এবং তার নিশব্দ সমাজসেবার কথা বলবে। সমাজসেবা বৈ কি। দরিদ্র এবং স্বাস্থ্যহীনতা জীবনকে শ্মশান ক'রে দেয়। তার থেকে রেহাই পাওয়ার সহজ পথই দেখিয়ে দিচ্ছে সে। স্বাস্থ্যের কথাই ধরো—ও বস্তুটি ছাড়া স্বামী কিম্বা ভগবান কারো সেবাতেই লাগা যায় না।

কিন্তু তুলনা হয় না। সংঘশক্তির সাহায্যে অণিমাদি যা করতে পেরেছেন। ভাবাই যায়নি। দেশে এখনো পতিতাবৃত্তি নিরোধের আইন পাশ হয় নি, এরই মধ্যে স্খলিতাদের শুধু নৈতিক বলে ফিরিয়ে আনা। 'নীড়'—কি সুন্দর নামটি এই 'নীড়'।

নারী যদি প্রেমকে বিলিয়ে দেয়, পণ্য করে কি থাকে তার ? কি থাকে সমাজের.? মানুষের গর্ব করার কি থাকে ?

চায়ের পিপাসা পেল যেন। তার হাত ব্যাগটায় চায়ের ছোট ফ্ল্যাস্কটাই শুধু সাহেব নিজের হাতে পুরে দেয়নি, চাটুকু পর্য্যন্ত নিজে ক'রে দিয়েছে। গায়ত্রীর মুখে মধুর হাসি তার তৃপ্তির প্রকাশ হ'য়ে ফুটলো। চা খেতে খেতে তার মনে হ'ল, গোপন ক'রে কিছু ক্ষতি হয় নি, তবে এ রকম লোকের কাছে তিলমাত্র গোপন করাও যেন মানায় না। মোহিতের চিঠিটার কথা।

মোহিতকে স্বামী এক সময়ে ভালবাসত তার জন্যই কি হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারে সে গোপন করল চিঠিটাকে। লুপ্ত-বিদ্বেষ ? নিজের মনকে এভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সে অবাক হল, মনঃবিশ্লেষণের মত কঠিন ব্যাপারে এমন হাতে হাতে ফল পেয়েই যেন।

এখন সে জানে স্বামীর কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। মোহিতের চেহারা মেয়েলি ব'লেই তাকে সাহেব ভালোবাসতো এটা ঠিক নয়। ভালোবাসার কারণ মোহিতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। আর বোধ হয় গায়ত্রীর নিজের চরিত্রেও সেবাব্রতের দিকে তেমনি একটা ঝোঁক আছে ব'লেই মোহিতের জায়গায় সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

স্টেশনে নেমে হাতব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরুতে বেরুতে হাতঘড়ির সঙ্গে ষ্টেশনের বড়ো ঘড়িটার সময় মিলিয়ে সামনে চাইতেই চোখ পড়লো মোহিতের মুখের উপরে। মোহিত বললো 'ব্যাগটা দাও'

'থাক না। কি এমন ভারি।' ব'লে গায়ত্রী ব্যাগটা দিলো।

'ভালো আছ তো।'

'তা আছি।'

মোহিতের গলার স্বরেও কোনো পরিবর্তন হয় নি, তেমনি নরম ও অনুচ্চ।

একটা গাড়িতে ব'সে হুইল ধ'রে মোহিত বললো, 'এই গাড়িটা কিনেছি।'

'কেন হঠাৎ গাড়ি কিনলে যে?'

'আমার কি গাড়ি কেনা বারণ?'

'তুমি তো সন্ন্যাসী ছিলে, গৃহী হয়েছ নাকি?'

'কোনোটিই নয়।'

গায়ত্রী একটু বা চোরা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো মোহিতকে। তেমনি ঈষৎ লাল চুলের মধ্যে তেমনি চেরা সিঁথি, মুখে তেমনি লাজুক হাসি। তার মনে হ'লো এই মেয়েলি ভাবটা না থাকলে মোহিতের কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকতো না। বিগ্ধার তীক্ষ্ণতাও তার দৃষ্টিতে নেই।

কিছু দূর যাবার পর মোহিত বললো, 'সাহেব ভালো আছে তো?' কথাটা বলতে গিয়ে মোহিত লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

গায়ত্রী বললো, 'বেশ ভালোই আছে।'

গাড়ি মোড় নিলে গায়ত্রী বললো, 'তুমি কি আজ ছুটি নিয়েছ, মোহিত?'

'তা নিয়েছি।'

'যদি না আসতাম তা হ'লে কি আবার কলেজে যেতে ছুটি নাকচ ক'রে?'

'না মাছ ধরতে যেতুম।'

হঠাৎ এবার গায়ত্রী লজ্জিত হ'লো। কারণ এতক্ষণ সে মোহিতের মেয়েলি লজ্জার কারণটা চিন্তা ক'রে ক'রে নিজের মনের মধ্যে তাকে অবগুণ্ঠন হীন ক'রে ফেলেছে এবং সেকালের সেই রেশারেশির দু'একটা ঘটনাও তার মনে পড়েছে। সেও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

অনিমাদির বাড়িতে পৌঁছুতেই ওরা খবর দিলো তারা সবাই নারী সমিতির অফিসে। সেখানেই গায়ত্রীকে নামিয়ে দিলো মোহিত।

'এখনি কি মাছ ধরতে যাবে?'

'তাই যাব।'

গায়ত্রীর মনে হ'লো সে বলবে—দেখা করার কথা লিখেছিলে, এই তো তা হ'য়ে গেলো। সে মনোভাবটাই সে প্রকাশ করলো, 'সাড়ে সাতটায় ট্রেন। যদি সাড়ে ছটায় এখানে এসো একসঙ্গে ষ্টেশনে যাওয়া যায়।'

'তাই হবে।' মোহিত চ'লে গেলো।

সমিতির পুরণো সঙ্গী সবাই নেই। অনেকের স্বামীই বদলী হয়েছে। কিন্তু যারা ছিলো তারা গায়ত্রীকে দেখতে পেয়ে হৈ-চৈ ক'রে অভ্যর্থনা করলো। তখন কার্যকরী সমিতির একটা সভা চলছিলো। সভা বানচাল হ'য়ে যাবার মতো হ'লো। শুধু অনিমাদি সেক্রেটারী ব'লেই

প্রস্তাবগুলো আলোচনা হ'লো, সভা শেষ হ'লো। কিন্তু তা শেষ হ'তেই অনিমাদি নিজেই এগিয়ে এলেন গায়ত্রীকে নিয়ে হৈ-চৈ করতে।

আলাপের মাঝখানে এক সময়ে অনিমাদি বিদায় নিলেন। তাঁর বাড়ীতে অসুখ, একবার না গেলেই নয়।

'কার অসুখ?' গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলো।

'তুই মেয়েই এসেছে। বড় মেয়ের এক ছেলের পান-বসন্ত। ডাক্তার বলেছে ভয়ের নয়, কিন্তু বাড়িভরা কাচ্চা বাচ্চা, ওদিকে রোগটাও ছোঁয়াচে। তোর স্নানটানের ব্যবস্থা হয়েছে এস-ডি'ওর বাড়িতে। আমি যাব আর আসব।'

'তা জানি।' গায়ত্রী হাসিমুখে বললো।

এ. ডি. ও গৃহিণীর সঙ্গে অতঃপর আলাপ হ'লো। তার বাড়িতে স্নানাহার শেষ ক'রে গায়ত্রী আবার সমিতির বাড়িতেই ফিরে এলো; সমিতির ঘরে তখন স্বেচ্ছাসেবিকাদের মতো কয়েকজন কলেজ-ছাত্রী ফুলের মালা ইত্যাদি তৈরী করছে। গায়ত্রী তাদের সঙ্গে জীবনের আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করলো।

সহরের উপান্তে একটি পাটগুদাম কিনে 'নীড়' স্থাপিত হয়েছে। চারিদিকে ঢেউতোলা টিনের উঁচু প্রাচীরের মধ্যে বড় একটা ঘর। পার্টিশান ক'রে কতগুলো খোপ তৈরি হয়েছে। একটা রুক্ষ ঘাসে ঢাকা আঙ্গিণা পার হ'য়ে সমিতির অফিস ঘর উঠেছে, তারই কাছাকাছি উঠেছে হাতের কাজ শেখানোর জন্য যারা নিযুক্ত হয়েছে এবং হবে তাদের জন্য মেস বাড়ি। প্রাচীরের বাইরে বুড়ো দারোয়ানের ঘর। দ্বারোদ্ঘাটন হ'লে অনিমাদি ঘুরে দেখালেন—কোথায় মেয়েরা রান্না করবে, কোথায় তারা কাজ শিখবে। তারপরে এলেন তাদের শোবার ঘরে। প্রত্যেক ঘরে পাশাপাশি তু'খানা কেরোসিন কাঠের চৌকী। প্রত্যেক চৌকির উপরেই একটা নতুন বিছানা। ঘরের কোণে কোণে রং চটা তু' একটা টিনের বাক্স। যাদের এসব তারা ঘরে ছিলো না। অনিমাদি ডাকলে তারা ঘরে এলো।

আগেই গায়ত্রীর গা শির-শির করছিলো, এবার তাদের চেহারা দেখে তার গা-ঘিন-ঘিন ক'রে উঠলো। অস্বাস্থ্যের কদর্যতা চোখে পড়লো। তার চাইতে বেশী—তার মনে হ'লো—আর কি হয়। মনের দাগ কি ঘষে তোলা যায় এদের?

কিন্তু অনিমাদির সংস্পর্শে এসে আদর্শের উত্তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো সে। রোগ দেখে গা ঘিন্ ঘিন্ করলেও ক্লেদ ছাপ করার মতো একটা সাহস ফিরে পেলো সে।

মহিলাদের সমিতি হ'লেও পুরুষরা অনেকে এসেছিলো। এস-ডি-ও সবশেষে চমৎকার বললো এই মহৎ সূচনাকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং যথাশক্তি সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। জজ সাহেব আসতে পারে নি। অনিমাদির নির্দেশে গায়ত্রীকেই বক্তৃতা দিতো হ'লো সমিতির

পক্ষ থেকে। বক্তৃতার এক জায়গায় তার চোখে জল এসেছিলো। সে চোখ মুছে দেখেছিলো চশমার নিচে অনিমাদির চোখেও জল এসেছে।

সমিতির প্রত্যক্ষ সভ্য নয় এমন দু'একজন পরিচিত মহিলা এসেছিলো সভায়। তাদের সঙ্গে আলাপ করলো গায়ত্রী। দু'একজনকে সে নিমন্ত্রণ জানালো, দু'একজন তাকে নিমন্ত্রণ করলো।

গল্প শেষ ক'রে মহিলা সমিতির ঘরেও যেতে হ'লো। সেখানে গায়ত্রীর জন্যই ছোটোখাটো একটা চায়ের আসর ছিলো। সে অণিমাদিকে এবং অন্যান্য মহিলাদের বারংবার ধন্যবাদ দিলো এই মহৎ কাজের জন্য। ধুলিলুণ্ঠিত নারীত্বকে যারা বাঁচায় তারা নিশ্চয়ই সম্মানের ও সম্বর্ধনার যোগ্য।

'আজ থেকে গেলে হ'তো গায়ত্রী।'

'বাড়িতে ব'লে আসি নি।'

'না-না গায়ত্রীদি, আজ আমার বাড়িতে থাকো।'

'তা হয় না ভাই।'

নানাদিক থেকে প্রস্তাবগুলো আসছিলো।

ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে। মহিলা সমিতির দরজার কাছে গায়ত্রী দেখতে পেলো মোহিত তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'বিদায় নেয়া হ'লো?'

'হয়েছে।'

'চলো একটু চা খেয়ে নেয়া যাক।'

মোহিত একটা বড়ো রেঁস্তোরার সামনে গাড়ি থামালো।

'সে কি এখানে? আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় যাবে।'

'বাসায় গিয়ে কি হবে? সেখানে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। তোমাকে চিঠি লিখে মনে হ'লো পরে চাকরটাকে পর্যান্ত ছুটি দিয়েছি সাতদিনের জন্য।'

চা খেয়ে তারা যখন ষ্টেশনে পৌঁছালো তখনও ট্রেনের আধঘণ্টা দেরী। প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করতে করতে গল্প করলো তারা।

একটু হেসে গায়ত্রী বললো, 'জানো' মোহিত, এক সময়ে মনে হ'তো তুমি আমার প্রেমের পথে কাঁটা।

'সে ভাবটা সত্যি কি অনেকদিন ছিলো তোমার?'

'এ সহর থেকে চ'লে গিয়েই তবে সে আকাঙ্ক্ষা একেবারে গেছে।'

নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটলো তারা।

'আচ্ছা, মোহিত, একটা ভারী কৌতুহল হয় আমার, তুমি—'

'কি আমি?'

গায়ত্রীর প্রশ্ন ছিলো—বিয়ে করলে না কেন। প্রশ্নটা উচ্চারিত হওয়ার ঠিক আগের পলকে

তার মনে হ'লো, কোথায় যেন সে পড়েছে, মেয়েরা অর্থাৎ যাদের এমন প্রশ্ন করার সুযোগ হয়, তারা সকলেই এ জন্যে প্রশ্নটা করে।

গাড়ি আসবার সময় পার হ'লো দুজনের হাতঘড়ি এবং ষ্টেশনের বড়ো ঘড়িটাতেও। কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে কাটালো তারা, তারপরে মোহিত ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে খবর নিলো। ডাউনে কি একটা গোলমাল হয়েছে গাড়ি আসতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।

'সে সময়ে আমি কখনো কখনো তোমাকে অবহেলা দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। তা কি তুমি বুঝতে পারতে, মোহিত ?'

'পারতুম।'

'বিচলিত হতে না তো ?'

'কি লাভ হ'তো তা হ'য়ে ?'

স্টেশন মাষ্টারের বলা এক ঘণ্টা সময় পার হ'য়ে সাড়ে আটটা হ'লো রাত্রি। মোহিত সে বললো, 'আরও আধঘণ্টা, তোমার আজ কষ্ট হ'লো।'

'কিছু নয়। কিন্তু তুমি ফিরে কোথায় খাবে ?'

রান্না করবো।'

'বলো কি ?'

'চাকরটা ছুটি-ছাটা নিলে তা করতে হয়।'

'মোহিত, তুমি তা হ'লে আর দেরি ক'রো না।'

'না হয় একটু দেরি হবে।'

'তা কি হয়! মাছ ধরেছিলে সেগুলো এতক্ষণ প'চে গেলো।'

অবশেষে বিদায় নিলো মোহিত।

'মোহিত।'

'কিছু বলবে।'

'মোহিত, তোমার চিঠিটার কথা কিন্তু সাহেবকে বলি নি।'

'তা করতে গেলে কেন ?'

'তা আমিও বুঝতে পারছি না। তুমি কিন্তু গল্পে গল্পে কোনোদিন ব'লো না সাহেবকে।'

মোহিত চ'লে গেলে একটা পত্রিকা খুলে বসলো গায়ত্রী, কিন্তু পত্রিকায় তার মন বসলো না। আজকে দিনটার এক একটা ছবি ভেসে উঠতে লাগলো তার মনে। ভারি ভালো একটা কিছু করলো এরা।

তারপর তার মনে হ'লো বাড়ির কথা, ছেলে এবং সাহেবের কক্ষ। এরপরে সে ফিরে এলো মোহিতের কথায়। মোহিতের সঙ্গে এমন একা একা মিশবার সুযোগ এর আগে ঘটে নি, এত কথাও বলে নি। একটু দ্বিধা করতে হ'লো তাকে। কথাটাকে ওজন করতে হ'লো। কথা

যদি না ব'লে থাকে তবে হঠাৎ তাকে নাম ধ'রে ডাকলো কি ক'রে ? সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই তা হ'লে একটা পরিচয় হয়েছিলো যা সে নিজেই এতদিন জানতে পারে নি।

নটা বাজলে সে খোঁজ নিলো। ষ্টেশন মাষ্টার খেতে গেছে। সহকারী বললো, 'আপে কি একটা গোলমাল হয়েছে।'

'শুনেছিলাম ডাউনে কি হয়েছে।'

হাতঘড়িতে এগারোটা বাজলো। ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে গায়ত্রী এবার সামনে যাকে পেলো তাকেই জিজ্ঞাসা করলো। সে একজন পোর্টার। সে বললো, 'স্ট্রাইক হয়েছে জংশনে গাড়ি যাওয়া আসা বন্ধ। কখন আসবে কেউ জানে না।'

গায়ত্রী বিশ্রাম ঘরে ফিরে কপাল টিপে ধ'রে বসলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পরেই সে বেরিয়ে এলো। প্ল্যাটফর্মের ভিড় অনেক ফাঁকা হ'য়ে গেছে। গাড়ি আসবে না, এই কথা বলাবলি ক'রে অন্যান্য যাত্রীরাও চ'লে যাচ্ছে। তা হ'লে ? সারারাত প্ল্যাটফর্মে কাটানো যায় না বিশ্রাম ঘরে ব'সে। একবার সে ঘরটার খিলটিলগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলো। না। এরপরে সহরে যাবার গাড়িটাড়িও পাওয়া যাবে না।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললো সে, 'চলো'

কিন্তু কোথায় যাবে সে এইরাত্রিতে। অনিমাদির বাড়িতে যাওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে হয়তো তার স্থানাভাব। তা ছাড়া পক্স হয়েছে। পান-বসন্ত বড্ড ছোঁয়াছে।

অনেকে নিমন্ত্রণ করেছিলো তাকে কিন্তু এত রাত্রিতে গিয়ে কি তাদের বলা যায় আমি ফিরে এলাম। কি বিশ্রী! কিন্তু কোথায় যাবে সে। এখনি ড্রাইভার গন্তব্য জিজ্ঞাসা করবে। গায়ত্রী একটা সিদ্ধান্তের জন্য মনকে মথিত করতে লাগলো। সে কি 'নীড়ে' আশ্রয় নেবে, সেই আশ্রয়-হীনাদের সঙ্গে। সে বাড়ির দারোয়ান তাদের মহিলা সমিতির পিওন ছিলো। কিন্তু সেই স্বৈরিনীদের কথা মনে পড়তেই গা ঘিন্‌ঘিন্ ক'রে উঠলো তার। তারপরই সে অনুভব করলো, মাথা গরম না হ'লে এমন উদ্ভট কল্পনা কেউ করে ?

'কোনপথে যাব, মাইজি।'

এখনি বলতে হবে। কার বাড়িতে যাবে যে—এস, ডি,ওর বাড়িতে ? কোথায় ? ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়েছে। এখনি হয়তো সে পিছন ফিরে তাকাবে। ছোট সহর, পথ ইতিমধ্যে নির্জন। গাড়ি একটা পানের দোকানের দিকে এগোচ্ছে। তার সামনে কয়েকটি লোক যেন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। রাত এগারোটায় একা-একা চলেছে সে। তাকে কি ভ্রষ্টা মনে করবে ড্রাইভার। আর—। শিউরে উঠলো সে।

'মাইজি—'

'তোমাকে যে বললাম কলেজের দিকে যেতে।'

কসুর মাপ করার কথা ব'লে ড্রাইভার গাড়ি ঘোরালো।

'হ্যাঁ, এই বাড়ি।'

'মোহিত, মোহিত।'

'কে?'

'মোহিত দরজা খোলো'

'কে গায়ত্রী? গাড়ি আসে নি?'

মোহিত দরজা খুললো। সেই নীল আলো জ্বালা ঘরে ঢুকে নিজের হাতে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলো গায়ত্রী।

'কি হ'লো।'

'কিছু না।' গায়ত্রী অত্যন্ত বিবর্ণভাবে হাসলো।

'কি করব এখন, মোহিত?'

'বিশ্রামের ব্যবস্থা।'

এটা মোহিতের শোবার ঘর। ঘরের একদিকে একটা বইএর সেল্ফ অন্যদিকে তার বিছানা ঘরের অন্য দেয়ালে একটা গোল দেয়াল-ঘড়ি। তার নিচে একটা ছোটো লিখবার টেবিল। তার উপরে খান দু'চার বইএর পাশে টেলিফোন। একখানামাত্র চেয়ার। বিপরীত দিকে একটি বড়ো সোফা।

সেই সোফায় বসেছিলো গায়ত্রী। মোহিত উঠে এসে গায়ত্রীর হাত ধ'রে তাকে টেনে তুললো, 'ওঠো। স্নানের ঘরে চৌবাচ্চায় জল আছে। আমি এদিকে তোমার খাবার ব্যবস্থা করি।'

হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পালটে ফিরে আসতে তার দেরি হ'লো কারণ সে চিন্তাও করছিলো। সে ফিরে এসে দেখলো মোহিত ষ্টোভ ধরিয়ে রান্নার যোগাড় করছে।

'তুমি সরো, মোহিত, আমি একটু চা করে নি।'

'শুধু চা?'

'তা কেন। কাল সকালের জন্য রুটি মাখন কি কিছু কেনা নেই?

এক টুকরো রুটি আর এক কাপ চা নিয়ে গায়ত্রী শোবার ঘরে এসে দেখলো মোহিত শোফার উপরে একটা বিছানা পাতছে।

চা খাওয়া হ'য়ে গেলো: গায়ত্রী বললো. 'শেষ পর্যন্ত এই হবে জানলে, আজ তোমাকে রান্না করে খাওয়াতে পারতাম।'

'তা যদি জানতাম তা হ'লে কি মাছগুলো বিলিয়ে দেই?'

'ঘুমুবে না?

'ঘুম কি হবে?'

'এত চড়া আলোতে ঘুম হয় না। র'সো'

মোহিত বই পড়ার আলোটা নিভিয়ে আবার ঘুমের নীল আলোটা জ্বাললো। নিজের বিছানা সে গায়ত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলো। সোফায় কোনো রকমে শুয়ে সে বললো, 'এ যেন একটা ষড়যন্ত্র।

তোমাকে চিঠি দিয়ে ডাকলুম, তা তুমি গোপন করলে। ট্রেন ফেল ক'রে চ'লে এলে আরও গল্প করার জন্যে।' মোহিত হাসলো।

গায়ত্রী হাসবার চেষ্টা করলো।

'আচ্ছা, মোহিত,'

'কিছু বললে ?'

'না। ঘুমাও।'

দেয়াল ঘড়িতে খুব চাপা সুরে একটা বাজলো।

'ঘুমুতে পারছ না ?' মোহিতের গলা।

'গরম লাগছে না ?'

'জানালা খুলে দেব ?'

'আমি দিচ্ছি।'

গায়ত্রী জানালা খুলে দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালো। বাইরে অন্ধকারের পর্দা।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে ?'

'বাতাসটা—'

'জানো,' মোহিত উ'ঠে গিয়ে দাঁড়ালো তার পাশে, 'অবাক লাগছে। তোমাকে যেন আজই প্রথম দেখলুম। প্রথম দেখাটা ভারি আশ্চর্য জিনিস।'

দেড়টা বাজলো। সে শব্দে ঘড়ির দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে গায়ত্রী কিছুক্ষণ ধ'রে টিক্‌টিক্ শব্দটাও শুনতে পেলো : তার বুকেও একটা শব্দ হচ্ছে যেন।

আকস্মিক ভাবে টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো।

'এত রাত্রে ?' মোহিত বিস্মিত হ'য়ে ফোন ধরলো।

'হ্যাঁ, আমি। বলছি। সাবাস। খুব যোগাযোগ করেছ তো। হ্যাঁ তা তিনি তো রওনা হয়েছিলেন সাড়ে সাতটায়। ও। তা হ'লে এই সহরেই কোথায় আছেন। আচ্ছা কাল সকালে ষ্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা পেলে জানাবো তোমাকে ফোন ক'রে। না ভয় কি ? এখানে তাঁর পরিচিত লোকের তো অভাব নেই। হ্যাঁ, তা বৈকি, তারা সবাই সমৃদ্ধিশালী।"

মোহিত ফোন ছেড়ে যখন ফিরলো তখনও তার মুখ ধীরে ধীরে বিবর্ণ হচ্ছে।

'কে মোহিত ?'

'সাহেব।'

'সে কি ? আমাকে খোঁজ করেছিলো ? গোপন করলে কেন ? আ-মোহিত এ তুমি কি করলে ?'

দুটো বাজলো।

'ঘুমিয়েছ মোহিত ?'

'না। ফ্যানটা কি খুলে দেব ?'

'না। আলোটা বরং নিভিয়ে দাও।'

'আচ্ছা, মোহিত, কি পড়াও তুমি কলেজে ?'

'অর্থনীতি।'

কথা এগুলো না।

'শোনো মোহিত, তুমি এখানে এসো।'

'কেন ?'

গায়ত্রী নিজেই বিছানা ছেড়ে সোফায় মোহিতের কাছে গিয়ে বসলো। চাপা গলায় বললো,

'আমরা কি জোরে জোরে কথা বলছি না।'

'না তো।'

'আমার যেন মনে হচ্ছিলো, পাড়ার লোকরা শুনতে পাচ্ছে।' ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো গায়ত্রী। চারটে বাজলো।

'বৃথা চেষ্টা।' মোহিত উঠে দাঁড়ালো। 'চা করি একটু স্টোভ ধরিয়ে।'

আলো জ্বাললো মোহিত। গায়ত্রীকে যেন চেনা যাবে না এমন রক্তহীন দেখাচ্ছে তাকে।

'তুমিই না হয় একটু চা করো। তারপর ভোর হ'তে হ'তে গাড়ি ক'রে রওনা হবো। ছটা নাগাদ পৌঁছে যাব সাহেবের বাংলোয়।'

চা খেয়ে দরজায় কুলুপ এঁটে গারাজ খুলে গাড়ি বার করলো মোহিত।

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পৃথিবীর চোখ বন্ধ।

'মোহিত।'

মোহিতের কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত বাহুতে গায়ত্রী বারবার নিজের দু'হাত ঘষতে লাগলো।

গাড়ি যখন সহরের সীমা ছাড়িয়েছে মোহিত বললো, 'এই ভালো হ'লো, সহরের কারো চোখেই তুমি পড়বে না।'

'এ বুদ্ধিটা রাত্রিতে করলেই ভালো হ'তো।'

'তা হ'তো। আচ্ছা ট্যানট্যালস্ কি নরকেও গিয়েছিলো ?'

'একথা বলছ যে ?'

'জানো, গায়ত্রী, আমি যেন এক নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি রাত চারটে পর্যন্ত।'

কথাটাকে রসিকতার জাতে তুলবার চেষ্টা ক'রে বিফল হ'লো মোহিত।

'মোহিত' গাড়ির ভিতরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে পারো ?'

আলোটা নিভিয়ে দিলো মোহিত। রাস্তার ধুলো হেড লাইটের আলোয় পোকার মতো কিলবিল করছে।

'আচ্ছা, মোহিত, তুমি সাহেবকে গোপন করলে কেন ?'

চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে গাড়িটা থর থর করে কাঁপছে। গায়ত্রীর মনে হ'লো একটা অন্ধকার নিসঙ্গ কুপেতে সে শুয়ে আছে। মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরে কখনো আলোকিত

ষ্টেশন ছিটকে যাচ্ছে। সে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় তার মনে হ'তে লাগলো: কৃত্রিম। এই শব্দটাই বারবার মনে হতে লাগলো একটা অব্যক্ত অনির্দিষ্ট আবেগের মতো। সম্মুখের গতিটাই যেন কৃত্রিমতার পরিহাস। শুধু অন্ধকারটা তাকে যেন শান্তি দিচ্ছে ব'লে সে জানালা খুলে চিৎকার ক'রে কিছু বল্‌ছে না। শুক্তির দুটি ডালায় আটকানো অন্ধকার যেন।

তারপর তার স্বপ্নের পরিবর্ত্তন হ'লো। সে যেন দেখতে পেলো কৃত্রিম রেললাইনের পাশে ঘাসফুল ছুটে চলেছে। যেন রাজপথের ফাটল ফুটে উঠতেও পারে তারা।

'মোহিত।'

'কি?'

'না কিছু নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যেন।'

'গায়ত্রী, কালকের রাত্রিটার কথা যদি সাহেবকে বলি সে কি রসিকতা হিসাবে নেবে না।'

'নাও নিতে পারে। আমরা দুজনে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি সে কথা অন্যকে ব'লে লাভ কি?'

শুক্তির ডালা কথাটা তার মনে আবার লাগলো। যে গোপনতায় বাইরের বালি কাঁকড় ঢুকে একটি মুক্তো তৈরি করার সূচনা করে সেখানে পৃথিবীর দৃষ্টি যায় না। মনের গভীরে যেন অবগাহনের শীতল অন্ধকার আছে মোহিতের ঘরের জানালা খুলে যে রকমটা চোখে পড়েছিলো। গায়ত্রী গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে চললো।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সাহেব আর্দালিকে পাঠাচ্ছিলো ষ্টেশনে ট্রেনের খবর করতে। এমন সময়ে গাড়ি থামলো দরজায়। নামলো গায়ত্রী, নামলো মোহিত। তারপর সাহেব দুজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

নিজের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করলো গায়ত্রীর। সে যেন নীল কিছু দেখতে পাচ্ছে। যেন মোহিতের ঘরের সেই নীল আলোয় এ ঘরের সব কিছু ছোপানো। রাত জাগলে মাথা ঘোরে, তার জন্যেই হয়তো এমন হ'লো। এবং তার জন্যই নিজের পরিচিত ঘর নতুন নতুন লাগছে। অবাক-অবাক বোধ হ'লো।

মোহিতকে কি চিঠিটা গোপন রাখার কথা বলা দরকার। সে একটু স্পষ্ট গলাতেই গান করতে করতে ছেলের ঘরে গেলো।

দিন ও রাত্রির অনুভব

শক্তি ঘোষ

জ্যোছনা ঝরে আর ওই বালুচর
জলধারার শোনে ছলাৎ ছল ;
বকুল বীথি ছড়ায় ফুলশর
ঘাসের বুকে ; মেঘের করতল

আকাশ ছোঁয় ; গানের কথাকলি
হৃদয়ে বয়ে জোনাকি পথ হাঁটে,
তাহলে আমি কী যাতনায় জ্বলি
বিজনরাতে শূন্য মনের মাঠে

তোমাকে ভুলে দেখেছি আকাবাঁকা
দিন মিলেছে ব্যথার সীমানায়,
লোকের ভীড়ে হৃদয় তবু ফাঁকা
মেঘের মত হাওয়ার তাড়নায়

ভেসেছে দূর সাত সাগরের টানে,
কখনো থেমে পলাশের উৎসবে
কান পেতেছে মৌ-বধুদের গানে ;
শাণিত রেখ গভীর অনুভবে

শুনেছে শুধু তোমার কণ্ঠস্বর
পৃথিবী জুড়ে কাঁপছে নিরন্তর ॥

চিঠি আসে

বিমল চক্রবর্তী

মাঝে মাঝে চিঠিগুলি আসে
তোমার মনের গন্ধ বয়ে নিয়ে সুদূর প্রবাসে
কখনো মনের আকুলতা
সূক্ষ্মতম ব্যথা
কখনো মধুর
কিংবা বেদনা বিধুর—
যা দিয়ে স্বপ্নিল মনে গান রচ তুমি
যে সব কোমল হাত চুমি
প্রতি মাসে মাসে
চিঠি হয়ে আসে।

মাঝে মাঝে মনে হয় চিঠি যেন সাঁকো
যেতে চাই যেতে পারিনাকো
হাঁটি হাঁটি—পা পা চিঠি ভর দিয়ে
একাকী এগিয়ে
তোমার মনের ছোঁওয়া নিতে ইচ্ছা যায়
ভয় হয়—যদি কভু সাঁকো ভেঙে যায়?

আলোচনা

রবীন্দ্রসাহিত্য জিজ্ঞাসা

মহাভারতের বাইরে আর একটিমাত্র মহাভারত আছে, তা হল রবীন্দ্ররচনাবলী। রবীন্দ্র-রচনাবলী বলতে রবীন্দ্ররচনা সংগ্রহের ঐ নামধেয় কোন বিশিষ্ট সংস্করণ বোঝাতে চাইছিনা। কবিগুরুর সামগ্রিক কাব্য ও সাহিত্যই এখানে বিবেচ্য।

মানবমনের এমন ভাবধারা নেই, যার গোপনতম খবরটুকু পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনায় ধ্বনিত হয়নি ; প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্য নেই, যাকে রবীন্দ্রনাথ ভাষায় রূপায়িত করেননি ; সমাজজীবনে এমন গ্লানি নেই, যা রবীন্দ্রকাব্যকশাঘাতে জর্জরিত হয়নি ; এমন মহান আদর্শ নেই, যাকে রবীন্দ্রনাথ উচ্চে তুলে ধরেনি ; এমন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নেই, যার রহস্য সমাধানের তিনি প্রয়াস পাননি।

বিশ্বের আর কোন সাহিত্যস্রষ্টা এত ব্যাপকভাবে লেখনী ব্যবহার করেননি বলেই বিশ্ব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একক এবং অদ্বিতীয় ; একেবারে সবকিছুর আকর তপন, যাকে গগন নইলে আর কেউ ধারণ করতে পারেনা। শুধুই কি বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় ? এমন সজীবভাবে বেঁচে থেকে, সচলভাবে যুগের সঙ্গে যুগকে টেনে নিয়ে এগিয়ে নিয়েছেনই বা কোন স্রষ্টা-শিল্পী ! ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুতেই চসার থেকে এলিয়ট, বানিয়ন থেকে হাক্সলি, বেন জনসন থেকে আর্নল্ড পর্যন্ত—সমগ্র ইংরেজী সাহিত্য একজনের হাত দিয়ে বেরোন যদি কল্পনা করা যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকৃত পরিমাপ করা সম্ভব।

উপরের উক্তিগুলিকে আমি নিজস্ব গবেষণা বলে দাবী করছিনা। বাঙলার আপামর জনসাধারণ এ সম্পর্কে অবহিত এবং নিঃসংশয়। তবু ইদানীং আমার মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে, যার নিরসন করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও রবীন্দ্র-রচনা-মহাসাগরের বেলাভূমে বিস্ময়ে হতবাক্ আমার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রশ্ন কটি নিবেদন করলাম ; রবীন্দ্র রচনা সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর, তাঁরা এ বিষয়ে কিছু দিগ্‌দর্শন দিতে পারবেন এই আশায়।

ভারতবর্ষের আদর্শ ও সাধনাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে তার যথাযথ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। ভারতীয় ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায় ভারতের মহতী সার্থকতার সত্য সংবাদটি রবীন্দ্রনাথ-ই প্রকাশ করেছেন। ইয়োরোপে যেখানে ধর্মের নামে অজস্র মারামারি কাটাকাটি চলেছে, সেখানে ভারতবর্ষ বিষমকে মিলিয়েছে, সবকিছুকে গ্রহণ করে আপন করে নিয়েছে—এই সত্য রবীন্দ্রনাথ বারবার উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই 'পূজারিণী' কবিতায় এবং 'নটীর পূজা' নাটিকায় বুদ্ধের পূজাবেদীমূলে

পূজানিরতা নারীর ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজার আদেশে হত্যা ঘোষণা করেছেন। বৌদ্ধদের রচিত অনেক কাহিনীরই সত্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতবৃন্দ সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা মানসে অনেক কাহিনী কল্পিত হয়েছে, অবদানশতকে অজাতশত্রু আদেশে পূজারিণী হত্যার কাহিনীটি এই ধরণের ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষ-প্রসূত কাল্পনিক কাহিনী হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কারণ প্রাচীন নথীপুঁথি ঘাটলেও ধর্ম্মবিদ্বেষের ফলে পূজারিণী হত্যার আর একটি কাহিনী প্রাক্-মুসলমান ভারতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, পরবর্তী যুগেও দুর্লভ। এহেন অবস্থায় অবদানশতকের যে কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ প্রচারিত ভারতীয় সাধনার মূর্ত অস্বীকৃতি, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কবিগুরু তা নিয়ে ঘাটাঘাটি না করলেই যেন মানাত। দাসী শ্রীমতীর কাহিনী যতই করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় আদর্শের প্রতি যে কঠিন আঘাত আছে, সেটাই কি অধিকতর বেদনাদায়ক নয়? ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিরহবেদনায় উদ্বেল-হৃদয় আদিকবির মত পূজারিণীর বেদনায় অভিভূত কবিগুরু কাব্য ও গীতিনাট্যের মাধ্যমে হিন্দুরাজার ধর্মবিদ্বেষকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, তারপর যদি কেউ রবীন্দ্রনাথ প্রচারিত ভারতীয় আদর্শ ও সাধনার যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

মানবজীবনে প্রেমপ্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব লোকোত্তর পুরুষ প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ কিছু না কিছু রচনা করেছেন। তাই বিস্ময় লাগে যখন দেখি শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে কবি একেবারেই নীরব। শুধু চৈতন্যদেব কেন? তাঁর পার্ষদ, সহচর, অনুচর ও ভক্ত সকলের সম্পর্কেই তিনি সমান উদাসীন। রাজপুত, শিখ, মহারাষ্ট্র, নানক, কবীর প্রভৃতি সকলের আন্দোলনের ফলে সংশ্লিষ্ট অনেক মহান ও করুণ বিষয় কবির 'কথাও কাহিনী'-তে বা অন্য কবিতাসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। কিন্তু চৈতন্যের নেতৃত্বে যে বিরাট আন্দোলন বাঙলার পরবর্তী জীবনকে দীর্ঘকাল আলোড়িত করেছে, ত্যাগ প্রেম ভক্তি ও নিপীড়িতদের অহিংস অভ্যুত্থানের অজস্র ঘটনায় যা সমুজ্জ্বল, সে সম্বন্ধে কবিগুরু একেবারে নীরব। ''স্পর্শমণি' কবিতায় সনাতন গোস্বামীর উল্লেখ ছাড়া কোন বৈষ্ণব সাধক বা মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ বৈষ্ণবভাবধারাই হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। "তোরা শুনিস নি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি, সে যে আসে, সে যে আসে, সে যে আসে"—এই মহাবারতা বার বার অনেক রকমে ঘোষণা করেও 'এই সে যে আসে' মন্ত্রের উদ্গাতা শ্রীচৈতন্যকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন।

এযুগে এসেও দেখতে পাই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমান উপেক্ষা। রামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবন যাত্রা ও প্রচারভঙ্গী যদিবা রবীন্দ্রমানসকে তাঁর থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে থাকতে পারে, বিবেকানন্দের মত মূর্তিমান বেদান্ত ও উপনিষদকে, বেদান্ত ও উপনিষদের রসে একান্তভাবে অভিসিক্ত রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে অগ্রাহ্য করলেন! অথচ সমসাময়িক ছোট বড় অনেকের সম্পর্কেই তিনি লেখনী ধারণ করেছেন।

অনার্য শিবসাধনার আর্যরূপ কবিগুরুকে কতখানি অভিভূত করেছিল, শিবতত্ত্ব তিনি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তার পরিচয় আমরা 'তপোভঙ্গ' কবিতায় পাই। কিন্তু বাঙলার লোকসাহিত্যে শিবতত্ত্বের মহত্তম আদর্শ যে চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর, তাঁর সম্পর্কে কবি একেবারে নীরব। নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তুর সন্ধানে কবি বহু অখ্যাত অজ্ঞাত প্রাচীনকাহিনী খুঁজে বার করেছেন। কিন্তু হাতের কাছে যে বেহুলার মত অসামান্য বিষয়বস্তু ছিল, রবীন্দ্রমনীষার স্পর্শে যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যনাট্য হয়ে উঠতে পারতো, তা অবহেলিতই রয়ে গেছে। যে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীমতী নামে সে দাসী'র দুঃখে আত্মসংবরণ করতে পারেন নি, বেহুলার ও মা সনকার বিরাট বেদনামহাসাগর তাঁকে স্পর্শ করেনি, পরিপূর্ণ নারীত্বের—তেজ বীর্য ও মাধুর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বেহুলা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে যে নব মহিমা লাভ করতো, সে রসাস্বাদনে বাঙালী পাঠক ও রসিকসমাজ বঞ্চিত রয়ে গেছে। তথাকথিত ইতরসমাজের ব্রাত্যসপিল জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও বেহুলার কাহিনী সর্ব্বরসের আকর, মহিমায় গগনস্পর্শী। কর্ণকুন্তীসংবাদ এবং গান্ধারীর আবেদন-এর বিশিষ্ট আদর্শ ছাড়া রামায়ণ এবং মহাভারত রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করে নি। আলোচনা যা করেছেন তাও মহাকাব্যের মূল্য এবং মর্যাদার তুলনায় নগণ্য।

শিল্পসাধনার পীঠস্থান ভারতবর্ষে তাজমহলের মহিমা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির জন্য একমাত্র তাজমহল নির্ম্মাণের আদেশ ও অর্থদাতা সম্রাট সাজাহান ছাড়া ভারতের আর কোন শিল্পস্রষ্টা শ্রদ্ধা উদ্রেক কেন করতে পারেন নি, ভেবে ভেবে আমি তার কূল কিনারা পাইনি। অজন্তা ও ইলোরা কোণারক, ভুবনেশ্বর আবুপাহাড় দাক্ষিণাত্যের অজস্র মন্দির—এসবের মধ্যে কি কবির মনে বিস্ময় উদ্রেক করার, ভাবালোড়ন সৃষ্টি করার কিছুই ছিল না? পত্নীপ্রেমের অনন্ত প্রকাশ হিসেবে তাজমহলের বৈশিষ্ট্য আছে এবং তার রচয়িতা তাই সম্রাট-কবি আখ্যাদাবী করতে পারেন। কিন্তু ধর্মপ্রেরনায় নির্মিত বলেই কি কোণারক বা অজন্তার শিল্পী এবং নির্মাণের আদেশ ও অর্থদাতা কবিপ্রেরণার দাবী করতে পারেন না? অথচ ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "বাদশানবাবকুলের বিলাস-ইন্দ্রজালের মধ্যে ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটি হারিয়ে" যাওয়ার জন্য দুঃখ করেছেন।

প্রকৃতির বর্ণনায় অকৃপণ এবং অনন্যশক্তি রবীন্দ্রনাথ বাঙলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তস্থিত হিমালয় ও সাগরের বর্ণনা করেন নি। হিমাদ্রি ও সাগর তাঁর মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসা উদ্রেক করেছে বটে, কিন্তু চিরদিন বিশ্বজনকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে হিমাচলের যে বহিরূপ, যে সাগর রূপ-রহস্যের শেষ কথা সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় লেখনীর রূপায়ণ থেকে কেন আমরা বঞ্চিত হলাম? কোপাই নদী আর ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে হরিণেময়ূরে চোখাচোখি-র বর্ণনাতেই রবীন্দ্রনাথের বর্ণনমণীষা নিঃশেষ হবে এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে! বর্ষার রুদ্ররূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়, মধুরচিত্র অঙ্কনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সাগর ও হিমালয়ের মহামহিমময় মূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে না পাওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর নাই।

রবীন্দ্ররচনার ত্রুটি বার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, এমন ভুল যেন কেউ না করেন। হিমালয়ের পাদমূলে পিপালিকার চেয়েও রবীন্দ্রমনীষার বিরাটতায় আমরা বিস্ময়বিমূঢ়। তাঁর সমগ্র সাহিত্য মন্থন করা কর্মমোহজালে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সবকিছুই তাঁর রচনায় আছে এ বিশ্বাস আমরা কোন মতেই ত্যাগ করতে পারিনা। তাই যে কটি অতিপ্রত্যাশিত বিষয় খুঁজে পাইনি, তাই নিবেদন করলাম, যদি বিজ্ঞজন আমার অজ্ঞতা নিরসনে সহায় হতে পারেন। জানি কোন একজন কবি-সাহিত্যিকের রচনায় সবকিছু আশা করা অনুচিত। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যমহাসাগরে জগদাকর রবির মধ্যে সব কিছু পাবার প্রত্যয় দৃঢ় এবং প্রত্যাশা ব্যাপক বলেই, না পাওয়ার হতাশা এত গভীর।

উর্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ও পত্রলেখা কাব্যে উপেক্ষিতা হওয়ায় যে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন, তাঁরই রচনার বিশ্বব্যাপক বিষয়বস্তুর মধ্যে সর্বজনবরেণ্য অনেক কিছুই যে উপেক্ষিত হয়েছে, সাধারণ রবীন্দ্রভক্তের বেদনাবোধ তাতে স্বাভাবিক।

রাখাল ভট্টাচার্য

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন

পক্ককাল ধরে বঙ্গসংস্কৃতি গত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন গত মাসে হয়ে গেল। মার্কাস স্কোয়ারের বিস্তৃতির সুযোগ নিয়ে এবারে এক বিরাট মণ্ডপ রচনায় বেশ একটা বারোয়ারী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মহম্মদ আলী পার্কের অবস্থান ও গত তিন বছর ধরে যাতায়াতের অভ্যাসগত সুযোগ হারিয়ে যাঁরা এবারকার সম্মেলনের সুষ্ঠু উদযাপন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, একান্ত নির্ব্বঞ্ঝাটে সম্পন্ন হবার পর সেই সন্দেহ যে নিতান্তই অমূলক তার প্রমাণ হয়েছে। মঞ্চের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বিস্তৃতির যে বিরাট পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল তা' লোকশিল্প পরিবেশনের পক্ষে সত্যই আদর্শ বলতে হবে আর মঞ্চসজ্জাতেও যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেছে। এছাড়া এবারে সভ্যসভ্যাদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই যে সমগ্র মণ্ডপ-পরিকল্পনাটি করা হয়েছে সেটাও বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল।

অথচ এই সমস্ত সত্বেও কেন যে সমগ্রভাবে সম্মেলনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করা সম্ভব হলনা সেটাই ভাববার কথা। মণ্ডপ বেঁধে এ ধরণের সম্মেলন ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। নানারকম সঙ্গীত সম্মেলনে সারা শীতকালটাই কলকাতার নাগরিক ব্যস্ত থাকেন। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন তো প্রতি পাড়াতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর থেকে মনে হতে পারে যে বুঝি বাংলার নাগরিক ক্রমশঃই সংস্কৃতমনা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সত্য কি তাই? অন্ততঃ বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের ১৫ দিনের কার্যক্রম অনুধাবন করলে সে কথাটা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবেনা।

সংস্কৃতি সম্মেলন ঠিক টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে বসে থিয়েটার, ম্যাজিক বা সঙ্গীত উপভোগ করা নয়। দর্শক, দর্শনী দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে বসে তাঁর দক্ষিণা উসুল করবার অবশ্যই দাবী জানাতে পারেন এবং মনের মতন উপভোগ্য পরিবেশন না হলে পরিবেশনকারী শিল্পীদের অবশ্যই দায়ী করতে পারেন কিন্তু সম্মেলন, সভ্য ও শিল্পীদের নিয়ে সামগ্রিক, এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি একটা কর্ত্তব্য থেকে যায় এবং এই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হলেই সম্মেলনের মূলসূত্রের বিচ্যুতি ঘটে।

অথচ গত চারবছর ধরে সভ্যদের যে অসহিষ্ণুতার পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে তার এতটুকুও উন্নতি চোখে পড়ল না। এখনও যান্ত্রিক গোলোযোগে 'মাইক' কাজ না করলে, বা পাখা বন্ধ হয়ে গেলে বিশৃঙ্খলতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা যায়। কোনও শিল্পীর পরিবেশন ব্যক্তিগতভাবে ভাল না লাগলেও তাঁর পরিবেশনে বাধার সৃষ্টি করা হয়। আর বক্তৃতা হলে ত' কথাই নেই,—বক্তাকে হাততালির ভূয়া সম্মান দেখিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়। এবারে দেখা গেল যে কালকিপাতারি নাচের মহাদেব ও কালীর নৃত্যের সময় এবং যাত্রার প্রারম্ভে কনসার্টের সময় হাততালির হুল্লোড়।

কোনও সভ্য অপর সভ্যকে শান্ত করতে গেলে উত্তর শুনেছেন, "থামুন মশাই,—এতক্ষণ ধরে এই একঘেয়ে জিনিষ আর ভাল লাগে।" তাঁরা ভুলে যান যে ভাল লাগার প্রশ্ন নয়,—শিল্পের ধারণাটা পর্য্যবেক্ষণ করাই সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম কথা। যে জিনিষ এখনও শিল্প বলে সাধারণের কাছে আদরণীয় হচ্ছে সেটা সভ্যদের ভাল লাগল কিনা সেটা না ভেবে সেটা কেমন জিনিষ এবং এর ভেতর থেকেও কিছু সংখ্যক লোকের ভাল লাগার মূলসূত্রটি কোথায় এর সম্বন্ধে চিন্তা করা বা সেইটা সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কাজে লাগানই হল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই সম্মেলনে যে মানসিক উৎকর্ষ লাভের সুযোগ রয়েছে বা যে শিক্ষা লাভ ও তার প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে সম্মেলনের সভ্যবৃন্দের অধিকাংশই মনে হয় সেইদিকে যথেষ্ট সচেতন নন।

কিন্তু শুধু সভ্যবৃন্দের দোষ দিলেই হবেনা, উদ্যোক্তাদের কথাও কিছু বলা দরকার। কলকাতা সহরের একই পল্লীতে, একই দেশে থেকে নিমন্ত্রিত শিল্পীরা একই শ্রোতাদের একই শিল্প নিদর্শন প্রতি বছরে পরিবেশন করছেন এবং ব্যবস্থাপনা করে চলেছেন সেই একই গোষ্ঠী। পরিচালনার ব্যাপারে বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন কিন্তু বিভিন্ন শিল্পীদের অবশ্যই নিমন্ত্রণ করা সম্ভব আর অন্য পল্লীতে অধিবেশন করলেই নতুনতর সভ্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ যে সম্ভব হতে পারে সেকথা বলাই বাহুল্য। লোকসংস্কৃতি, বলতে গেলে মানুষের সহজাত বৃত্তির পর্য্যায়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলার সংস্কৃতি এই লোকসংস্কৃতির মধ্যে এখনও অনেকাংশে জুড়ে রয়েছে তাই বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে লোকসংস্কৃতির পরিবেশন-প্রাধান্য অবশ্যই কাম্য কিন্তু এর আর একটা দিক রয়েছে। কলকাতা সহরের নাগরিক নিত্য নতুন দেশীয় ও বৈদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সেখানে লোক-সংস্কৃতির সেই সরল অনাড়ম্বর রসটুকু যদি বা সহজে হৃদয়স্পর্শ করবার উপযুক্ত কিন্তু বারংবার পরিবেশনের যোগ্য নয় এবং সম্মেলনের আদর্শানুগও নয়। তাই যখন কালকিপাতারি নাচের বা যাত্রারম্ভের আগের কনসার্টের মাঝখানে সভ্য সাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তো শুধু সভ্যবৃন্দের ধৈর্য্যশক্তির ওপর বক্রোক্তি করলেই হবেনা নিজেদের ভুলটুকু শুধরে নেবার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

এবারকার অনুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করেছে নাটক। নাটক লেখা এবং তার অভিনয় অনুষ্ঠান বঙ্গসংস্কৃতির যে অনেকখানি জুড়ে সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে বঙ্গীয় নাট্যান্দোলনের পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্খা নিয়েই তাদের এই ব্যবস্থা। অথচ মঞ্চবেদী মোটামুটি নাটক অভিনয়ের উপযোগী হলেও প্রেক্ষা-গৃহ বলে কিছু না থাকায় অভিনয়গুলির দু'একটি ছাড়া প্রায়ই বিশেষ জমে ওঠে নি। আশ্চর্য্য এই যে নাটক অভিনয়ের দিনগুলিই শ্রোতাদের ভীড়। এই শ্রোতারা সকলেই সভ্য নন এবং অনেকেই দৈনিক-ধার্য্য দর্শনী দিয়ে এই দিনগুলিতে মণ্ডপে ভীড় জমিয়েছেন। এর থেকে স্বভাবতই এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই শ্রেণীর দর্শক সস্তায় ভাল নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। যেহেতু সম্মেলনে যোগদান করার মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা যাননি তাঁদের কাছে থেকে সম্মেলন-সুলভ আচরণের আশাও করা যায় না। সুতরাং নাটকের আগে যে সমস্ত লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলি হয়েছে

সেগুলি হয়ত তাঁদের সমাদর লাভ করেনি এবং তার প্রতিক্রিয়াও কিছু লক্ষ্য করা গেছে। এই ধরণের উপসংহার টানা সত্ত্বেও যদি আগামী বৎসরের অনুষ্ঠানসূচীতে নাটকের প্রাধান্য দেখা দেয় তো একে নাট্যান্দোলনের পুনরুজ্জীবন আখ্যা না দিয়ে অর্থাগমের উপায় বলে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে সম্মেলনের আদর্শ অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে।

আর একটি অভাব বড়ই চোখে পড়লো। সেটি হচ্ছে সম্মেলনে সুসম্বদ্ধ আলোচনার অভাব। সুচিন্তিত বিষয় সুবক্তার দ্বারা উপস্থাপিত করার পক্ষে এই মণ্ডপের মতন উপযুক্ত জায়গা বড় একটা চোখে পড়েনা অথচ এবারে নাচ, গান ও অভিনয়ের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে ফেলে এই দিকটা অবহেলিত হয়েছে। সভ্যরা বক্তার প্রতি সাধারণতঃ অমনোযোগী,—একথা স্বীকার করেও বলা যেতে পারে যে যখনই সুচিন্তিত আলোচনা সুবক্তারা করেছেন তখনই তা সাদরে সভ্যরা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই বক্তৃতার জন্যেই যদি একটি সম্পূর্ণ দিন ধার্য্য করা হয় তো বোধকরি সেদিন কেবল যোগদানেচ্ছু সভ্যরাই মণ্ডপে উপস্থিত হবেন,—বক্তৃতা-অসহিষ্ণু শ্রোতারা নন।

অনুষ্ঠানসূচীর পুস্তিকাটি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষ করে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের লেখা দুটি সত্যই সারগর্ভ। এক জায়গায় কেমন যেন একটু খটকা লাগলো। পুস্তিকাটির মুখবন্ধে বলা হয়েছে, পুরাতনের পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব নয়। সম্মেলন পুনঃপ্রচলনের আদর্শে বিশ্বাসী নয়। অথচ যুগ্মসম্পাদক সর্ব্বশেষে "আমাদের কথা"য় বলেছেন,—"বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের প্রধানতম আদর্শ বাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন…" কথা দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি

জনশ্রুতি অনুসারে মানুষের ব্যক্তি সত্তা আর সমাজসত্তার নিরন্তর টানাপোড়েনে মানবচিত্ত আবহমানকাল পীড়িত। উভয়ের এই দ্বি-ধা প্রাধান্যদাবীতে মানুষ চিরবিচলিত, এবং আজও তার সংঘাতের শেষ নেই। অন্তর্লোকের এই সংঘাতে পক্ষাবলম্বনের প্রশ্নেই নাকি বহির্জগতেও সমগ্রমানবজাতি আজ মারাত্মক মতদ্বৈততায় বিভক্ত। তথাকথিত এই মতদ্বৈততার ফলেই হোক অথবা শ্রেণীগত বৈষয়িক স্বার্থসংঘাতেই হোক সমগ্র মানবসমাজ যে সর্বনাশা বিভেদে রণোন্মুখ এ তথ্য অন্ধেরও অজ্ঞাত নয়। সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রচলিত যে তাদের মতবাদে ব্যক্তিসত্তার দাবী চূড়ান্তভাবে অবহেলিত এবং তাদের বিশ্বাস, সমাজ-স্বার্থের জাঁতাকলে ব্যক্তিসত্তা নিঃশেষে নিষ্পেষিত না করলে শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি তথা মানুষের সার্বিক উন্নয়ন অসম্ভব। সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা নির্দ্ধারণে আমরা আপাতত প্রয়াসী নই। রাজনৈতিক জগতের এই মতদ্বৈততার ব্যাপ্তি বর্ত্তমান সমাজমানসে যত সর্বগ্রাসীই হোক আমাদের আলোচ্য বিষয় নিছক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব। আপাতত আমরা শুধুমাত্র ব্যক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়েই আলোচনা করব।

প্রথমত, ব্যক্তি এবং সমাজের যে সংঘাত কল্পনা করা হয় তার যাথার্থ্য অনুসন্ধান করা চলে। সভ্যসমাজের আনুষঙ্গিক কতগুলি বিধিনিষেধ সমস্ত ব্যক্তিকেই মেনে চলতে হয়। সচেতন বিচারে এই বিধিনিষেধগুলি প্রয়োজনীয় বলে গ্রাহ্য হলেও, মানুষের কাছে এই বিধিনিষেধগুলি চিরদিনই অপ্রীতিকর। মনের অবচেতনে মানুষ এর বিরুদ্ধতাই করে আসছে এবং আপাত-বিচারে এই বাধার মূলে সমাজকে দায়ী করে সমাজের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিরূপতা একান্তই সাময়িক যদিও এর পুনঃপৌনিক আবির্ভাব স্বাভাবিক। কার্যত এই বিরূপতা অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ার বেশী কিছু নয়।১ আসলে, সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ, আইন কানুনই ব্যক্তিস্বার্থেই সৃষ্ট, কারণ অন্তিম বিশ্লেষণে শ্রেণীস্বার্থও ব্যক্তিস্বার্থের সমষ্টিগত রূপ ছাড়া কিছু না। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রকৃতবিচারে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোন সংঘাতই নেই এবং একই সূত্রে বলা চলে যে ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজ সত্তার তথাকথিত বিরোধও কল্পনাপ্রসূত। সমাজ-বিজ্ঞানী Ruth Benedict-ও একই মত পোষণ করেন—

"In reality, society and the individual are not antagonists. His culture provides the

(1) c.f. Ruth Benedict, "Patterns of Culture", Chap. VIII,

raw material of which the individual makes his life. If it is meagre, the individual suffers ; if it is rich the individual has the chance to rise to his opportunity". (2)

ব্যক্তি ও সমাজের এই তথাকথিত সংঘাতের ধারণার মূল অনুসন্ধানেও Benedict-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"One of the most misleading misconceptions due to this nineteenth century dualism was the idea that what was subtracted from the society was added to the individual and what was substracted from the individual was added to society. Philosophies of freedom, political creeds of *laissez faire*, revolutions that have unseated dynasties have been built on this dualism The quarrel in Anthropological theory between the importance of culture pattern and of the individual is only a small nipple from this fundamental conception of the nature of society". (3)

ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের (অর্থাৎ মনুষ্যসমাজ) প্রশ্নই ওঠে না, তেমনি সমাজ বহির্ভূত মানুষেরও মনুষ্য-জীবন অসম্ভব। শিশুর অস্তিত্বই যে পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের মাধ্যমে সমাজ-নির্ভর একথা তর্কাতীত। শিশুর সেই প্রাথমিক অস্তিত্ব থেকে মানুষের সমগ্র জীবনই সমাজকর্তৃক লালিত এবং নিয়ন্ত্রিত একথাও সমাজবিজ্ঞানে সর্বজন স্বীকৃত।

উদাহরণস্বরূপ সমাজবহির্ভূত (feral) যে কয়টি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করা যাক। আমাদের দেশে এলাহাবাদের কাছে পাওয়া নেকড়ে শিশু কমলার কথা অনেকেই শুনেছেন। ১৯২০ সালে কমলা এবং অন্য একটি শিশুকে শীকারীরা নেকড়ে বাঘের আস্তানায় আবিষ্কার করেন। কমলার বয়স তখন আট এবং অপরটির প্রায় দুই। অপর শিশুটি অল্প কয়েকমাস পরেই মারা যায়। কমলা ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। শৈশবে এরা নেকড়ে বাঘের কবলে পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের স্তন্যেই প্রতিপালিত হয়। ধরা পরার সময় আচরণ, খাদ্য এবং অন্য সব ব্যবহারেই এরা নেকড়ে বাঘের স্বভাব পায়। দুই পায়ে হাঁটা বহুদিন পর্য্যন্ত কমলার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, কাঁচামাংস ছাড়া অন্য কিছু সে খেত না। নেকড়ে বাঘের মত গর্জ্জন করা ছাড়া অন্য কোন ভাষা তার অজানা ছিল। মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারও নিতান্ত হিংস্র ছিল। অধুনা আগ্রার কাছে আর একটি অনুরূপ নেকড়ে-শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে (২১-৪ ১৯৫৭ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। তার ব্যবহারও কমলারই অনুরূপ। হাঙ্গেরীর Kasper Hauser-এর ঘটনাও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে Hauser এর জন্ম ১৮১২ সালে। হাঙ্গেরীর এক কৃষকের এক অন্ধকার কুঠরীতে তাকে আশৈশব আটক রাখা হয়। কথিত আছে যে বন্দীজীবনে সে কোন মানুষের মুখও দেখেনি। ১৮২৪ সালে সে মুক্তিলাভ করে এবং তাকে নুরেমবার্গে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় সে কোন রকমে টলতে টলতে হাঁটতে পারত, দুই একটা আধো আধো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে পারত এবং তার মন তখন শৈশবের স্তর উত্তীর্ণ হয় নি। পাঁচ বছর পর তার মৃত্যু ঘটলে তার মস্তিষ্কের পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষায় দেখা যায় যে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রসার একেবারেই ঘটেনি, দুজন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীর মতে সমাজ থেকে তাকে বঞ্চিত করায় তাকে মনুষ্যত্ব থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে—"The denial of society to Kasper Hauser was a denial to him

(2) & (3) c.f. Ruth Benedict, "Patterns of Culture", Chap. VIII.

also of human nature itself"4 সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে Hauser জড়পদার্থকে প্রাণী বলে মনে করত। সমাজবিজ্ঞানে অনুমান করা হয় যে আদিমানবও প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য পশুর মত জড়পদার্থকেও প্রাণী মনে করত।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে সংশ্লিষ্ট শিশুদের অতীত (অথবা ডাক্তারীশাস্ত্রে যাকে বলা হয় history) খুব স্পষ্ট না, তাই এদের সম্বন্ধে গবেষণাও আংশিক বলে অভিযোগ করা চলে। কিন্তু Kingsley Davis যে উদাহরণটি হাজির করেছেন তা বৈজ্ঞানিকমহলে গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।5 Anna নামে পাঁচ বছরের সুন্দর একটি শিশুকে আমেরিকার একটি ছোট শহর থেকে সতের মাইল দূরে খামারের দোতালার পুরানো একটা ভাঙ্গা চেয়ারের সঙ্গে আটকান অবস্থায় Humane societyর লোকজন গিয়ে আবিষ্কার করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে অবৈধজাত এই হতভাগ্য শিশুটিকে তার ছয়মাস বয়স থেকে এই অবস্থাতে খামারে এনে আটক রাখা হয়। পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল এবং সে ও সুস্থ অবস্থাই জন্মায়। অথচ যখন তাকে পাওয়া যায় তখন তার কোন বোধ বা অভিব্যক্তি ছিল না, বহুকালব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার ফলে তার নড়বার ক্ষমতাই লোপ পেয়ে গিয়েছিল, কথা বলার এবং চলার ক্ষমতা ত দূরের কথা। পরে তাকে প্রথমত একটি শিশু—আবাস, তারপর তার নিজের মা এবং শেষপর্যন্ত একটি সহানুভূতিশীল পরিবারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে তার মনুষ্যোচিত ক্ষমতা এবং গুণাবলীর বিকাশ হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে কখনই সম্পূর্ণ সুস্থতা এবং স্বাভাবিতা লাভ করতে পারে নি। ১৯৪২ সালে সে মারা যায়।

এই সব উদাহরণে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সমাজের বাইরে মানুষের মনুষ্যোচিত জীবন অসম্ভব। সংস্কৃতির মাধ্যমেই সমাজে মানুষ, মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। সংস্কৃতির অধিকারেই পাশবোত্তীর্ণ জগতে মানুষের স্থান। প্রসঙ্গত, 'সংস্কৃতি' বলতে আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

'সংস্কৃতি' বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে,তার বিশদ প্রকাশ 'চিৎপ্রকর্ষ' শব্দের মধ্যে পাওয়া যাবে (শব্দটির জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেবের কাছে ঋণী), কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে যাই হোক সমাজতত্ত্বে 'সংস্কৃতি' বা culture শব্দটির অর্থ বহুলাংশে ব্যাপকতর। 'সংস্কৃতি' বলতে মানুষের ঐতিহ্যলব্ধ সামাজিক উত্তরাধিকারের সামগ্রিক সমষ্টিই বোঝায়, 'চিৎপ্রকর্ষ' যার বিশেষ অংশমাত্র।6 সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের সূচনা থেকেই 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞায় এই সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সমাজতত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ E. B. Tylor 7 থেকে সুরু করে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী Rulph Linton 8 পর্যন্ত সকলেই সংস্কৃতির সংজ্ঞায় যে কয়টি দিকের উপর জোর দিয়েছেন তা হল; (১) সামাজিক সূত্রে আহৃত

(4) R. M. MacIver and Charles H. Page, "Society", Book one, Part I, Chap. 3, p. 45.
(5) Kingsley Davis, "A case of Extreme Social Isolation of a Child", American Journal of Sociology, Vol. 45, Pp. 554-65, January 1940.
(6) UNESCO কর্তৃক প্রকাশিত Michel Leiris এর "Race and Culture" 1951,(পৃ-১০।১১) দ্রষ্টব্য।

অভিজ্ঞতা, বা শিক্ষা (২) সামগ্রিকতা, এবং (৩) ঐতিহ্য বা সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage) সমস্ত সংজ্ঞাতেই সামগ্রিকতা ছাড়া, এমনকি সামগ্রিকতার চেয়েও বেশী, যে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে তা হল সামাজিক সূত্রে আহৃত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা। এই সূত্রেই মানুষ, 'মানুষ' হয়ে গড়ে ওঠে। ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে সুরু করে সমস্ত জীবন মানুষ সামাজিক অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা লাভ করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ করে। এই ভাবেই মানুষের সংস্কৃতি মানুষকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতির সামগ্রিকতার ফলে সংস্কৃতি ব্যক্তিকে শুধু সরাসরিভাবে নয়, সমস্ত সমাজকেও নিয়ত পরিবর্তিত করে ব্যক্তির উপর আবার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতির এই গতিময় (dynamic) ভূমিকাকে উপেক্ষা করলে 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে ধারণা আংশিক হয়ে পড়ে। চিৎপ্রকর্ষের মধ্যে এই গতিময়তার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ শুধু এই সংস্কৃতির জোরেই। সংস্কৃতি না থাকলে, মানুষের অন্য এমন কোন গুণ নেই যা কোন না কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। সংস্কৃতির বলেই আজ মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, জীবনসংগ্রামে কল্পনাতীতভাবে অন্যসব প্রাণীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন উঠবে, যে-সংস্কৃতির জোরে মানুষ পশুত্বের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তা' এত যুগেও কোন না কোন প্রাণীর অনায়ত্ত রইল কেন? এর কারণ মানুষের চিন্তাশক্তির মধ্যে আবার একটি বিশেষ ধরণের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটেছিল, (পশুর চিন্তাশক্তি বা বিচারবোধ নেই, এ ধারণা ভুল) তা'হল বিমূর্ত (abstract) চিন্তার ক্ষমতা। এই বিমূর্ত চিন্তাশক্তির বলেই প্রতীক কল্পনা সাধ্য হল, যার ফলে একদিকে ভাষা এবং অন্যদিকে হাতিয়ার (tools) সৃষ্টি করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। বস্তুত, মানুষের সংস্কৃতির ভিত্তিই হ'ল ভাষা এবং হাতিয়ার এবং এই দুটি সম্পদের অভাবে পশু কোনদিনই মানুষের নাগাল পাবে না।

ভাষার অভাবে পশুর শিক্ষা অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান হয়েছে। তার মধ্যে Kellog দম্পতির গবেষণা উল্লেখযোগ্য।[9] তাঁরা ৭½ মাসের একটি শিম্পাঞ্জি শিশুকে (নাম রেখেছেন, Gua) তাদের দশমাস বয়স্ক শিশুপুত্র Donald এর সঙ্গে একত্রে একইভাবে প্রতিপালন করেন। প্রথম প্রথম কতগুলি বিষয় Gua, Donald এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করে, (তার কারণ, হয়ত, ৭½ মাসের শিম্পাঞ্জি ১০ মাসের মানব শিশুর চেয়ে দৈহিক ও মানসিক গঠনে বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কিন্তু দুই বছরের মধ্যে Donald, Guaকে সব ব্যাপারেই ছাড়িয়ে যায়। ভাষা আয়ত্ব করার পর থেকেই Gua-কে Donald শিক্ষার প্রতিযোগিতায় একেবারেই পরাভূত করে। কিছু কিছু কথা বুঝতে পারলেও Gua

(7) "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities acquired by man as a member of society"—'Primitive Culture', p. 1.

(8) "A configuration of learned behaviour and results of behaviour whose component elements are shared and transmitted by the members of a particular society." (M. Leiris কর্তৃক 'Race and Culture', ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

(9) Cf. Mr. & Mrs. W. N. Kellog, "The Ape and the Child", N. Y. 1933.

স্বভাবতই ভাষা আয়ত্ব করতে পারে নি। Kelloggদের গবেষণা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে শুধুমাত্র সুযোগের অভাব পশুদের পশ্চাবর্ত্তীতার কারণ নয়।

সংস্কৃতি কিভাবে মানুষের স্বভাবকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে, তা Ruth Benedict কয়েকটি উপজাতি (যেমন Zuni, Kwakintl, Dabu এবং Pueblo প্রভৃতি) সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। 10 বিভিন্ন আদিম মানবগোষ্ঠির সমাজ পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণাসূত্রেই ব্যক্তিত্বের বিকাশে সংস্কৃতির অপরিহার্য ভূমিকা সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। ব্যক্তি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে Emile Durkheim এর সিদ্ধান্তই এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে গ্রাহ্য বলে সমাজতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন। Durkheim তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'De la Division du Travail social' (ইংরাজী অনুবাদ G. Simpson-The Division of labour in society, New york, 1933)—এর মধ্যে অনবদ্য বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, যে-সব সমাজ অনগ্রসর (যেমন আদিম উপজাতিগণ), যাদের বৈষয়িক কর্ম্ম-বণ্টন (division of labour) যত প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থিত তাদের সামাজিক বিধিনিষেধ (taboo) এবং আচার ব্যবহার তত কঠোর এবং সেই সব সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ তত সীমাবদ্ধ। সেই তুলনায় সভ্যতর সমাজগুলিতে বৈষয়িক কর্ম্মবণ্টন যত বিস্তৃত এবং জটিল সেই সব সমাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ তত বেশি। পরবর্তী বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় Durkheim এর সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে।

অবশ্য ব্যক্তিসত্বা এবং সমাজসত্বার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য এখন পর্যন্ত কোন সমাজেই সম্ভবপর হয়নি। প্রত্যেক সমাজেই বিভেদ ও সংঘাত, দমন এবং বিদ্রোহ চিরদিন চলে এসেছে। পরস্পর বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ, গোষ্ঠিস্বার্থ এমন কি বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাতে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ অস্থির হয়ে ওঠে। "social integration is never complete, is never totally harmonious" সার্বিক অখণ্ডতা বা বৈচিত্র্যহীন সাদৃশ্য আদৌ কাম্য এবং সামাজিক সুস্থতার পরিচায়ক কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে। হিটলার এবং মুসোলিনীর একনায়কত্বে সার্বিক অখণ্ডতার বা সামাজিক সমীকরণের যে নমুনা দেখা গেছে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটলেই যে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক, সমাজের আভ্যন্তরিক সংঘাতকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত বলে ভুল করা চলে না। এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বা ব্যক্তিসত্বার সঙ্গে সমাজসত্বার যে কোন মৌলিক সংঘাত নেই সে বিষয়ে অন্তত সমাজবিজ্ঞানে কোন সংশয় নেই।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

---

(10) Cf. 'Patterns of Culture'. এই প্রসঙ্গে Abraham Kardinar-এর গবেষণা ও উল্লেখযোগ্য

গ্রন্থপরিচয়

আচার্য নন্দলাল বসুর জীবনী ও সাধনা

শিল্পাচার্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের শিক্ষণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ সূত্রে একবার বলিয়াছিলেন যে একজন শিল্পীকে বুঝিতে গেলে তাঁহার জীবনের সামগ্রিক পটভূমিকা, তাঁহার প্রাত্যহিক পরিবেশ-চেতনা ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের শক্তিসীমাটিকে বুঝিয়া লওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বর্তমান যুগের অন্যতম গৌরবস্থল আচার্য নন্দলালের শিল্পী-মানস। তাঁহার মতো কালান্তরকারী চিত্রকর্মার জীবনপট এবং অন্তর্জীবনের ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক স্বরূপ-বিকাশ দেখানোর মতো দুরূহসাধ্য কাজ খুব কমই আছে। অথচ বিশ্বভারতী আশ্রমিক সঙ্ঘ মহাশ্চর্য এবং ব্যাপক অর্থে অবহিত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই গুরুগম্ভীর দায়িত্বটি পালন করিয়াছেন।

দার্শনিক আদর্শগত বিচারে প্রধানতঃ রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ শিল্প বীক্ষার ক্ষেত্রে অনেকাংশে অবনীন্দ্রনাথ—এই রকম নানা মিশ্র সংযোগে নন্দলালের যথার্থ পরিমিতি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শিল্পী হিসাবে তাঁহার বক্তব্য ও রীতি নিজস্ব। পশ্চিমী চিত্রজগতের বর্ণিকা বৈচিত্র্য ভারতীয় শিল্পায়নের অধিকর্তৃত্ব করিবেনা, অধীনস্থ হইয়া সাহায্যসাধনে বৃত হইবে, হ্যাভেলের মধ্যস্থতায় এই কাজ আচার্য নন্দলালের পূর্বেই সূচিত। একথা আজ স্বীকার করিতেই হয় যে নির্মাতা-স্বভাবে কয়েকটি পার্থক্য সত্ত্বেও নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায় উভয়ের মধ্যেই সম্ভোক্ত সাধনধারার বিশেষিত পরিণতি দেখিতে পাই। এই যোগাযোগে নন্দলাল বসুর বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রসারিত—পুরাণের শিখর হইতে তিনি অবিস্মর্তব্য ভাবস্রোত টানিয়া আনিয়া সমকালীন জীবনের হাটে-মাঠে পথে-প্রান্তরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। কোনো পূর্বনির্ণীত মতবাদ তাঁহার উপলব্ধির সম্পূর্ণ ব্যাপ্তিটিকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, একথা যেমন সত্য, তেমনি এই কথাটিও ভুলিলে চলিবেনা যে বঙ্গ-ভারতীর ভাবস্বরূপ বা Positive প্রাণচেতনা তাঁহার সমস্ত চিত্রজগতকে একটি চিন্তন-জাত ঐক-গ্রন্থি দিয়াছে। বর্ণ এবং বিষয় লইয়া তাঁহার পরীক্ষার অন্ত নাই এবং তাই তাঁহার চিত্রগুলিতে যেন একটি প্রাণস্পন্দিত মুক্তধারার বিবর্তন লক্ষ্য করি। পুনর্জীবিতা অহল্যা বা পার্থসারথী—দুয়েরই বিন্যাস 'ওয়াশ পেন্টিং' এর ব্যবহারে এক, অথচ বিষয়ানুগ অভিব্যঞ্জনা বা ভঙ্গি (mood) রচনার প্রয়োজনে বর্ণ সমাবেশে যে সুনিপুণ সতর্কতা দেখা গিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। 'টেম্পেরা'র কাজগুলিতে যে অপ্রতিম সিদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও তো কোনো প্রথাপ্রচলিত বা আত্মনিবদ্ধ-সংস্কারের নিয়মে বন্দী নয়, প্রসঙ্গের তাড়না অনুসারে নিত্যনব। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনা-বিভাগ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অনুযায়ী ষ্টাইলের অকল্পনীয় বিস্তৃতির দিকটিকে সুযোগ্য গ্রন্থনের মধ্য দিয়া প্রস্ফুট করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সংকলন-গ্রন্থের প্রথমাংশের অন্তর্গত রেখাচিত্রাবলী এবং দ্বিতীয়ার্ধে সংযোজিত উনত্রিশটি মহার্ঘ বর্ণচিত্রের সমন্বয় নন্দলাল বসুর চিত্রকল্পের (image) পাশাপাশি ভাবকল্পের (idea) নানারসোজ্জ্বল

নন্দলাল বসুর দুখানি চিত্র

হিমালয়

চিত্রাধিকারী—রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জেলে

চিত্রাধিকারিণী—ইন্দুলেখা ঘোষ

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সৌজন্যে

সন্নিবেশটিকে তুলিয়া ধরে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ শিল্পকর্মের একটি ঘরোয়া অন্তরঙ্গ (intimate) রূপ আছে। সেই দিকটিও এই সংকলনে স্বমর্যাদায় স্থাপিত। তিনি যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছেন, যেসব দৃশ্যরূপ দেখিয়া রূপায়ণের আকাঙ্খায় অগ্রসর হইয়াছেন, এই সকল বহুসংখ্যক রেখাচিত্রের মধ্যে তাহাদের প্রতিটি স্মৃতিচিত্র কি-অনন্য স্বাক্ষরে অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে! ঘরের সমীপবর্তী ঘন আবেষ্টনী হইতে শুরু করিয়া দেশ-প্রদেশের অফুরন্ত পরিপ্রেক্ষিতের দিদৃক্ষার মধ্যে তাঁহার শিল্প-জিজ্ঞাসা একটি সানন্দ সুন্দর মুক্তি লাভ করিয়াছে। অতীত হইতে বর্তমানে, ঘর হইতে বাহিরে তাঁহার রূপচর্যা ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে উদ্ভাসিত শিল্পলোক উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে, মানব-মনের বহুবিচিত্র অনুধ্যানে অনুরঞ্জিত যে বৃহৎ আনন্দ-বেদনার দিগন্ত তাহা আবিষ্কার করিয়াছে, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদিত এই অবিস্মরণীয় সংকলনকর্মের মধ্যে সেই অপূর্ব অলঙ্কৃতি বিধৃত হইয়া গিয়াছে। মুদ্রণের পরিপাট্যে সমস্ত আয়োজনের যথাযথ মর্যাদা সুরক্ষিত হইয়াছে। যে সুরুচিশোভন মনোভাব এই সঞ্চয়নীতে পরিব্যাপ্ত, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। এই গ্রন্থে এ যুগের অন্যতম অগ্রণী শিল্পীর যে ধ্যানমূর্তি নির্ভুলরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহার সহিত 'বিশেষ' বোদ্ধা ও সাধারণ দর্শক উভয় শ্রেণীরই ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য। শিল্পগুরু নন্দলাল বসু এই প্রসঙ্গে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। তাঁহার অবদান এইভাবে প্রদর্শন করার সুব্যবস্থার জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

"নন্দলাল বসু" জীবনী-সম্বলিত-এলবাম: প্রকাশক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ॥ ৪৭ সাউদার্ন এভিনিউ কলিকাতা ২৯॥ মূল্য কুড়িটাকা

বাংলার জাগরণ : কাজী আবদুল ওদুদ ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ॥ তিনটাকা

চোদ্দ শতক থেকে সতের শতকের মধ্যে ইউরোপের জীবনে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। সাহিত্য, চিত্র, নীতি ন্যায়, আইনকানুন, সমাজ সংগঠন, মানুষের সঙ্গে মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে জগতের যে বিচিত্র সম্পর্ক তার সব দিকেই, সবক্ষেত্রেই এই তিনশ বছরের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের রূপান্তর দেখা যায়। এই প্রবল গভীর এবং ব্যাপক রূপান্তর পরবর্ত্তী কালে নাম নিয়েছে রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজন্ম। এই বহুমুখী পরিবর্ত্তনের মধ্যে আবার একটি বিশেষ ঐক্যের সূত্র অসংখ্য ঘটনাকে একটি সমগ্র ধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে। এই সূত্রের ইংরেজী নাম হিউম্যানিজম, বাংলায় একেই বলা হয়েছে মানবিকতা।

কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা দেশে এই রেনেসাঁ বা নবজন্মের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তাঁর 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলার নবজন্মকে তিনি তিন ধারায় ভাগ করেছেন "প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা আনন্দ, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন বোধ।" ফলে স্বভাবতঃই রেনেসাঁর সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে।

তাই লেখক নিজে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সব ক্ষেত্রেই রূপান্তরের সম্বন্ধে সচেতন হয়েও, আলোচ্য গ্রন্থে প্রত্যেকটি ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যক্ত করতে সক্ষম হননি। অবশ্য গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিধি এর অন্যতম কারণ হতে পারে। তবে শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায় যে এই "ontlinne পর্য্যায়ের গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতি সম্যক সুবিচার সম্ভব কি না?

বাংলাদেশে রেনেসাঁ বা নবজন্মের প্রথম বিকাশের কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার উপর নেমেছিল অন্ধকারের আবরণ। এই অন্ধকারের যবনিকা প্রথম অপসারণ করেন রামমোহন রায়। তাঁর শিক্ষা, মানবপ্রেম, চরিত্রবল এবং সাধনসম্পদ তাঁকে নবযুগ আহ্বানে সাহায্য করেছিল। সমগ্র দেশ ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ হলে অবশেষে এসেছিল নবযুগ। তারপর সারা উনবিংশ শতাব্দী এই নবজীবনের জয়যাত্রায় মুখর। এককথায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলার এক স্বর্ণযুগ। শ্রদ্ধেয় ওদুদ সাহেব অবশ্য রামমোহন থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যান্ত, অর্থাৎ সারা ভারতের জাগরণ থেকে নেতার আবির্ভাব পর্য্যন্ত ঘটনাবলী তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। মনে হয় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনায় নবজন্মের ধারার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তিতে কোনো বাধা ছিলনা। রামমোহন সম্বন্ধে আলোচনাও সম্পূর্ণ নয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে রামমোহনের দানের কথা লেখকের গবেষণায় আর একটু বেশী স্থান পেলে রামমোহন চরিত্রের একটি স্বল্পালোকিত দিকের বিকাশ হ'ত।

লেখক ঘটনার উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বহু নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই সব মতামত তর্কের অতীত নয়। ব্যক্তি বিশেষের বক্তৃতা বা লেখক থেকে মতামতের উপযোগী টুকরো টুকরো অংশ উদ্ধৃত করে একটা উপসংহারে আসা এই শ্রেণীর "outline" গ্রন্থের আবেদন অনেকাংশে ব্যর্থ করে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখকের কিছু কিছু উক্তি অনেক পাঠকের ভাল না লাগারই সম্ভাবনা। একটি সুদীর্ঘ ধারার বিকাশে মতামতের টিপ্পনি পাঠকের রসোপলব্ধিতে এবং মননশীলতায় বাধা দিতে পারে।

শ্রদ্ধেয় ওদুদ সাহেব বাংলার জাগরণে মুসলমানদের ভূমিকা নিয়েও দুটি পৃথক পৃথক অংশে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার হয়তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে জাগরণ এসেছিল সারা দেশে, যে জাগরণ রূপ পেয়েছিল বিভিন্ন মনীষার মাধ্যমে, সেখানে কোনো একটি বিশেষ শ্রেণী বা ধর্মকে লক্ষ্যণীয় ক'রে তোলায় এই ধারার সামগ্রিক রূপটি ব্যহত হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া এই অংশে তাঁর কিছু কিছু উক্তি সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে। কবি নজরুল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "স্বদেশী আন্দোলন, বিশেষ করে তার সন্ত্রাসবাদীদের থেকে তিনি প্রেরণা পান যদিও তাঁর জন্ম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে।" এই মতের খুব বেশী কিছু প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না।

সবশেষে বাংলার নবজন্মের এই ক্ষুদ্র ইতিহাস লিখে শ্রদ্ধেয় ওদুদ সাহেব দেশের সত্যিকারের উপকার করেছেন। আজকের দিনে এই গবেষণার প্রয়োজন ছিল। লেখক প্রাণপাত পরিশ্রম করে তা করেছেন। সারা গ্রন্থে তাঁর আন্তরিকতার ছাপ ছড়িয়ে আছে। আশা করা যায় যে আজকের উৎসুক পাঠক ও আগামী দিনের তরুণ গবেষকদের কাছে এর আবেদন ব্যর্থ হবেনা।

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

সমকালীন

পঞ্চমবর্ষ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪ চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও
টেম্পল প্রেস ২ ন্যায়রত্ন লেন কলিকাতা—৪ হইতে মুদ্রিত।

সমকালীন

সমকালীন ॥ জৈষ্ঠ্য, ১৩৬৪

বাঙ্‌লা সমালোচনা ও সাময়িক পত্রিকা

অলোক রায়

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে কীট্‌স মারা গেলেন। আজকে আমরা সকলেই জানি তাঁর মারা যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে সাময়িক পত্রে তাঁর কাব্যের অতিরিক্ত রূঢ় সমালোচনা, যা তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনে গভীর আঘাত করেছিল। ১৮১৮ সালে 'এন্‌ডিমিয়ন' কাব্যটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টারলি রিভিউ তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে প্রমাণ করে দিল, সেটি কিছু হয়নি—কীট্‌স একজন অপদার্থ কবি। এই সমালোচনা কত তীক্ষ্ণ ও নিষ্ঠুর ছিল যা প্রকারান্তরে কীট্‌সের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো, তার উল্লেখ আছে শেলীর বিখ্যাত কাব্য 'এ্যাডোনেইসে'র ভূমিকায় আর বায়রণের এই প্রসঙ্গে লেখা মন্তব্যটিতো সবারই জানা—

' 'Tis strange the mind, that very particle,
should let itself be snuffed out by an article.'

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় কবিস্রষ্টার জীবনে সমালোচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে—এই দাম দিতে গিয়েই কবির জীবন পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সমালোচনা মাত্রেই এমন নির্মম হবে তার কোনো মানে নেই—সত্যিকারের বিদগ্ধ সমালোচকের রসাস্বাদন কবিস্রষ্টাকে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধই করে থাকে। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রস-বোদ্ধা পাঠককে বলা হয়ে থাকে 'সহৃদয় সামাজিক'। কাব্যপাঠের সময়ে পাঠককে লেখকের সহমর্মী ও সহধর্মী হতে হবে, অন্ততঃ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য কিছুদিন আগে পর্যন্তও সমালোচনা ছিল রীতি মিলিয়ে কাব্য বিচার, এখন হয়েছে আত্মা মিলিয়ে কাব্য বিচার। এই কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রস'।

সমালোচনা আগে ছিল অবরোহপন্থী অর্থাৎ ডিডাক্‌টিভ্‌। (অবশ্য তারও আগেকার সমালোচক ছিলেন 'টীকাকার'—যিনি প্রত্যেক শ্লোকের দুরূহ পদমাত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা করতেন। এখন বলাবাহুল্য টীকাকার ও সমালোচক ভিন্ন ব্যক্তি।) অবরোহপন্থী সমালোচক পুরাতন রীতি পদ্ধতির বিধি, নিয়ম, আইন-কানুন অনুসরণ করে', সেই সমস্তের অনুমোদিত বিধান অনুসারে, গ্রন্থের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করতেন। অবশ্য তার ফলে তাঁরা যে কখনোই মৌলিক নতুন সৃষ্টিকে সমাদর করতে পারতেন না, তা নয়—কারণ নিয়ম মেনেও যে অতুলনীয় কাব্য নাটক সৃষ্টি করা

যায় তার তো উদাহরণ রয়েছে কালিদাসের সৃষ্টিতে,—শেক্‌সপীয়রের টেম্পেস্টের মত নাটকে। গতশতাব্দীর সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এই জন্যেই বলেছেন—'প্রকৃত মৌলিকতা যদ্বারা উৎসাহ পাইয়া বিকশিত হয়, মাননীয় আসনপ্রাপ্ত হইয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, তাঁহারা তাহার বিহিত করেন। অতএব উপরি উক্ত সমালোচনা প্রণালীর মূল অভিপ্রায় মৌলিকতার গতিশক্তি রোধ করা নয়, মৌলিকতার গতিশক্তি সুশৃঙ্খল সুনিয়মিত ও সংরক্ষণ করাই উহার অভিপ্রায়। রক্ষণশীলতা উন্নতিশীলতার বিরোধী নয়, উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী।'[১] বলাবাহুল্য এ নিয়ে তর্ক উঠবেই, কারণ শেক্‌সপীয়রের নাটকের রীতির উচ্ছৃঙ্খলতা সে যুগের ক্লাসিক রীতিতে শিক্ষিত সমালোচকদের চমকিত, বিমূঢ়, ও ক্রুদ্ধ করে তুললেও পরবর্তী যুগে তার যোগ্য সমাদর হয়েছে। আর তাই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ই উক্ত প্রবন্ধে 'নতুন প্রণালীর সমালোচনা'র জয়গান করে বলতে বাধ্য হয়েছেন—'যদি কল্পনাকে ব্যাকরণ অলঙ্কারের বিধিবিধানে, সমালোচনাশাস্ত্রের বিবিধ বন্ধনে অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে পিটে পিটে মোড়া দিয়া বাঁধা যায় তাহা হইলে তাঁহার কোমলাঙ্গী কবিতা কন্যার কি বিষম অপমৃত্যু ঘটে তাহা বারেক অনুমান করুন।' এ থেকে অনুমান করা যায় আধুনিক সমালোচনারীতি কেন ধীরে ধীরে অবজেক্‌টিভ থেকে সাবজেক্‌টিভ হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য সমালোচনা মাত্রেই পাঠকের মনের নানা সুরের প্রতিফলন যা কখনো হতে পারে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ যেমন ম্যাথু আর্ণল্ডের শেলীর সমালোচনা কিম্বা রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধের উপর ৫টি সমালোচনা ('ভারতী'তে প্রকাশিত) অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মতে 'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া সমালোচক আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার দর যাচাই করা। কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিষ। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক।'[২] —এই জাতীয় সমালোচনার নিদর্শন টি, এস, এলিয়টের মিল্টনের সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি বা প্রমথ চৌধুরীর 'ভারতচন্দ্র'। এক কথায় দাঁড়ালো অস্কার ওয়াইল্ডের ভাষায়—'That is what the highest criticism really is, the record of one's soul,…it is simply concerned with oneself'।[৩] এই হচ্ছে আরোহপন্থী সমালোচনা বা ইনডাকৃটিভ রীতি। ব্যক্তিমনের দ্যুতি বিস্ফুরণে আলোকিত হয়ে ওঠা যে সমালোচনার পথ। ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস একেই স্পষ্ট করে বলেছেন—'There is no such thing as objective criticism as there is no thing as objective art'। এর উদাহরণে বলা যায় আর্ণল্ডের মতন অমন ক্লাসিক

১ পাক্ষিক সমালোচক :১২৯১

২ প্রাচীন সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ (পৃঃ ১১)

৩ The Critic as Artist : Oscar wilde.

অবজেক্‌টিভপন্থী সমালোচকও শেলীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তাঁর সাব্‌জেকটিভ্ বিচারেই। অনুরূপ দৃষ্টান্ত এলিয়টেও পাওয়া যাবে।

আধুনিক যুগে এই 'আত্মানুগত সমালোচনা' ('আরোহপন্থী'র থেকে অধিক ইঙ্গিতময় শব্দ এটি) নানাভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে দেখি,—কখনো তা হয়েছে ইম্‌প্রেসনিষ্টিক্, কখনো এ্যাস্থেটিক্, কখনো হিষ্টোরিক্, কখনো বা ফিলজফিক। শব্দগুলি ইংরেজীতেই ব্যবহার করতে হোলো, কারণ সেটিই সহজবোধ্যই হবে ; বাঙ্‌লায় এখনো এদের রসশাস্ত্রে বিশেষ নামকরণ হয়ে উঠেনি। মোটকথা আধুনিক সমালোচনা হয়ে উঠছে বিশ্লেষণী, যা আগে ছিল সংশ্লেষণী আধুনিক সমালোচনাকে এই জন্য রোম্যান্টিক বলা হয়ে থাকে এখন সমালোচনা হচ্ছে 'Creation withina creation'—কখনো সে অন্বয়মুখী, কখনো সে ব্যাতিরেকমুখী, তাতে কিছু এসে যায় না।

কীট্‌সের মৃত্যুর কারণ সাময়িকপত্রে তাঁর কাব্যের রূঢ় সমালোচনা। এই বহুজ্ঞাত তথ্যটি থেকে আমরা দুটি বিষয়ে ভাববার অবকাশ পাই, প্রথমতঃ অধিকাংশ দেশেই সমালোচনার সঙ্গে সাময়িকপত্রের ইতিহাস একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং দ্বিতীয়তঃ কীট্‌সকে যে সমালোচনা করা হয়েছিল তা প্রধানতঃ ব্যতিরেকমুখী এবং যার কারণ সমালোচনাপদ্ধতি ছিল সেখানে প্রাচীন ধারার। বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এই দুটি সত্য বিশেষ আলোকপাত করবে।

॥ ২ ॥

শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে সাময়িকপত্রের সঙ্গে বিকাশের একান্ত যোগ থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের মতই সে যোগ এতই স্পষ্ট বোধ হয় আর কোনো দেশেই হয়নি। বাঙ্‌লা সাময়িকপত্রের একেবারে গোড়ার যুগ থেকেই অর্থাৎ দিগ্‌দর্শন (১৮১৮), সমাচরদর্পণ (১৮১৮) ও বেঙ্গল গেজেটের (*) কথা ছেড়ে দিলেও, সংবাদ কৌমুদী (১৮২১) ও সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২) থেকেই বাঙ্‌লা সমালোচনা সুরু হয়ে গেছে। সে সময়কার সমালোচনা ছিল প্রধানতঃ পুস্তক পরিচয় প্রদান, মন্তব্য থাক্‌তো খুবই কম। যদিও প্রথমোক্ত পত্রিকাটির সঙ্গে রামমোহন রায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (এই সময়ে মিশনারীরা 'গস্পেল ম্যাগাজিন' (১৮১৯) নামে একটি খ্রীষ্টিয় তত্ত্বপূর্ণ একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন, এই পত্রে ও 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নানা কথা প্রকাশিত হতে থাকলে রামমোহন রায় 'সংবাদকৌমুদী' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাপত্র ও 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একখানি মাসিকপত্র বের করে তাতে মিশনরীদের প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন,) এবং বেদান্ত বিষয়ক তাঁর রচনাগুলি আজও অত্যন্ত মূল্যবান ও মৌলিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এই দুটি পত্রিকারই সম্পাদনা করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর নাম আর কিছু না হোক বাঙ্‌লা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয়

* ১৮১৬ খ্রীঃ (কেদারনাথ মজুমদার : বাঙ্‌লা সাময়িক সাহিত্য : পৃঃ ১৯৭) ১৮১৮ খ্রীঃ (জুন ?) (ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্‌লা সাময়িক সাহিত্য : পৃঃ ৫) ডাঃ সুকুমার সেনের মতে 'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রতিষ্ঠাকাল সংগ্রহের পক্ষে উপযুক্ত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

হয়ে থাকবে, সরস রচনায় 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'নববাবু বিলাস' ইত্যাদির বিশেষ স্থান আছে। ভবানীচরণ বিশেষ প্রাচীনপন্থী ছিলেন, কাজেই তাঁর রচিত পুস্তক-আলোচনাগুলিতে যে সংশ্লেষণী-পদ্ধতি অবলম্বিত হোতো তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেরোলো 'সংবাদ প্রভাকর,' ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায়। বাঙ্‌লা সমালোচনার ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও দাশরথী রায় প্রভৃতির জীবনীগুলির (১৮৫৪—১৮৫৫) অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও সেখানে জীবনী-তথ্যই প্রধান, তবুও কাব্য আলোচনার অংশগুলি চোখ এড়ায় না—তাঁর সমালোচনাগুলি গবেষণামূলক এবং সেই হিসেবে সেগুলিকে আধুনিক হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিসিজ্‌মের পথিকৃৎ রূপে ধরা যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার বড়ো দান হচ্ছে লেখক তৈরী করা—পরবর্তী কালের খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে (যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি) অনেকেই সংবাদ প্রভাকরে প্রথম লেখা সুরু করেন। এরপর এলো ১৮৪৩ এ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। (ক) প্রথম বারো বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর প্রবন্ধগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে লেখা এবং সমালোচনা পদ্ধতিকেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে পারি। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার নাম আরও স্মরণীয় যে এর সঙ্গে লেখক হিসেবে বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম জড়িত। এঁরা অনেকেই সাহিত্যের অনেক তত্ত্ব ও সংস্কৃত রসশাস্ত্রকে বাঙ্‌লায় আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এবং বাংলায় একটি সমালোচনার মানদণ্ড গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক রসগ্রাহী সমালোচনারূপে দেখতে পাই। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে, 'এই বইটিতে বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা পাইলাম।' এ ছাড়া 'মেঘদূতে'র ভূমিকায় ও পাঠবিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় সুগভীর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। প্রকৃত সাহিত্যসমালোচনা সুরু হোলো এবার। জ্ঞানের সঙ্গে মিল্‌লো রসবোধ, মণীষার সঙ্গে মনের কথা। এইসঙ্গে নাম করতে হয় 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকাটির—এই পত্রিকাটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সক্রিয় প্রচেষ্টা ছিল। আর এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬) যার নাম ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্যেই চিরকাল বিখ্যাত হয়ে থাকবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'মৃচ্ছকটিক' ও 'উত্তরচরিত'এর সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়। ইংরেজী জানা

(ক) এর ঠিক আগেকার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হচ্ছে—জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১): সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২): সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫): সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ ভাস্কর (১৮৩৯): সম্পাদক শ্রীনাথ রায়। বেঙ্গল স্পেক্টেটর (১৮৪২) সম্পাদক রামগোপাল ঘোষ। বিদ্যাদর্শন (১৮৪২): সম্পাদক অক্ষয় দত্ত ও প্রসন্ন ঘোষ। মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪): সম্পাদক প্যারিচাঁদ মিত্র।

সমালোচকের হাতে সমালোচনার মোড় ঘুরলো। যদিও ভূদেব ছিলেন পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী, তাই তাঁর লেখায় প্রাচীন কাব্য আলোচনাতে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় দিলেও, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও পরিচয় দেননি। তারজন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেই বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পর্যন্ত, যখন এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি বিশ্লেষণী-পদ্ধতির সমালোচক সেকথা তাঁর 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের প্রণাম করে, সম্পূর্ণ নতুন পথে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি সত্যি সত্যি স্রষ্টা—সমালোচনা করতে গিয়েও তাই তিনি সৌন্দর্যের স্বরূপ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। অস্কারওয়াইল্ডের মতে—'It is the highest criticism, for it criticises not merely the individual work of art, but beauty itself and feels with wonder a form which the artist may have left void, or not understood or understood incompletely.'* এই হচ্ছে প্রকৃত সমালোচনা। তাই নবীন সেনের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতা কাকে বলে তার সূত্র নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন, বিদ্যাপতি-জয়দেব আলোচনা করতে গিয়ে বৈষ্ণবপদাবলীর গভীরে প্রবেশ করেছেন। বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে আজও নিশ্চয় তাঁর স্থান সর্বোচ্চে।

এই যুগের অন্যান্য পত্রিকাতেও নতুন প্রণালীর সমালোচনা দেখা গিয়েছিল। রহস্যসন্দর্ভ (১৮৬২), আর্যদর্শন (১৮৭৫), বান্ধব (১৮৭৫), জ্ঞানাঙ্কুর (১৮৭৩) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। আর্যদর্শনের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম জড়িত। এই পত্রিকায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা'র সমালোচনা (লেখকের নাম না থাকা সত্ত্বেও যতদূর জানা গেছে নীলকণ্ঠ মজুমদার এই সমালোচনাটি লিখেছিলেন।[১] আধুনিক সমালোচনা-রীতির চরম প্রকাশ বলে মানা যেতে পারে, কারণ তাতে সমালোচক ডারউইনের থিওরী দিয়ে কাব্যবিচারের এক প্রচেষ্টা করেছিলেন যা স্বয়ং কবি কর্তৃকও প্রশংসিত হয়েছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বান্ধবে' লিখতেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ—তাঁর প্রবন্ধ রচনার ক্লাসিকরীতি ও সেই সঙ্গে রোম্যান্টিক মনের ভাবভাবনা তাঁর সমালোচনাগুলিতে এক বিশেষ সাহিত্যিক রস এনে দিত। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এইযুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক, তিনি প্রধানত মালঞ্চ, পাক্ষিক সমালোচক ও নব্যভারত পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর সমালোচনা 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ঐ বিষয়ের প্রবন্ধ থেকেও কোনো কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ বলে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন।[২] আধুনিক সমালোচক তাঁর সমালোচনার সম্বন্ধে বলেন—'তাঁর একদিকে বঙ্কিম, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ। ম্যাথু আর্নল্ডের মত তুলনামূলক বিচারেই তাঁর বিশিষ্টতা, কাব্যতত্ত্বের নিরিখ নির্ণয়েই

* The critic as artist

(১) হেমচন্দ্র (দ্বিতীয় খণ্ড): মন্মথনাথ ঘোষ।

(২) সমালোচনা সাহিত্য—ভূমিকা: ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর, সাহিত্যায়ন শেলীর মত বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতিকে কাব্যের সঙ্গে তুলিত করে তাঁর প্রচুর আনন্দ।'[৩]

'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে শুধু বঙ্কিমের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ছাড়াও অনেকেই ওতে সাহিত্যসমালোচনা লিখতেন এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তাঁরা সকলেই উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নাম আগেই করা হয়েছে, তিনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেও (১৯০০) নিয়মিত পুস্তক সমালোচনা করতেন। অক্ষয় সরকার (নবজীবন : ১৮৮৫), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু—এঁরা ছিলেন এযুগের ভালো সাহিত্যসমালোচক। এঁরা অনেকাংশেই ইম্‌প্রেসনিষ্টিক্ সমালোচনার প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক খ্যাতিও কম নয়। তিনি 'ভারতী' (১৮৯৭) সম্পাদনা করেছেন—সাধনা এবং নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'ও তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই সময়ে অজস্র সাহিত্যসমালোচনা লিখে গেছেন, যা পরবর্তীকালে অধিকাংশই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমালোচনা সম্বন্ধে ধারণা তো আগেই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি—বলাবাহুল্য তাঁর সমালোচনায় কবি মনের প্রতিফলনই বেশী ঘটেছে, নিজের 'ভালোলাগাটার' ওপরই তিনি জোর দিতেন সব চেয়ে বেশি।[৪] এটা আধুনিক পাঠক মনেরই কথা, ভারজিনিয়া উল্‌ফ যে কথা বারবার বলেছেন যে পাঠককে অখণ্ড স্বাধীনতা দিতে হবে, তাঁর ব্যক্তিগত মত গড়ে ওঠার ও তাকে প্রকাশ করার জন্য। পাঠক কখনোই অপরের মতের দ্বারা চালিত হবেন না, যদিও তিনি অবশ্যই শিক্ষিত হতে পারেন।[৫]

এইখানে একটি পত্রিকার উল্লেখ করতেই হবে যা রবীন্দ্রনাথের সমকালীন হয়েও স্বতন্ত্র মতের পরিপোষক, পত্রিকাটি হচ্ছে 'সাহিত্য' (১৮৯১)। সম্পাদক হলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমাজপতি ছিলেন পুরোপুরি রক্ষণশীল—বঙ্কিমচন্দ্রের থেকেও মতামতের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী। এইযুগে তিনি এবং তাঁর পত্রিকার লেখকেরা আবার পুরোণো অবরোহী পদ্ধতিতে সাহিত্য সমালোচনার রীতি প্রচলিত রাখেন। এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে কঠোর ভাবে সমালোচিত হন। চিত্তরঞ্জন দাশও 'নারায়ণ' পত্রিকায় এই ধরণের প্রচুর ব্যতিরেকমুখী সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে পদ্ধতি যাই-ই হোক, প্রকৃত সমালোচনা হচ্ছে রসাস্বাদন—ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকেও আমরা 'কালিদাস ও ভবভূতি'র মত অপূর্ব সুন্দর একটি সমালোচনা পেয়েছি।

কিন্তু যুগের হাওয়া পালটেছে। সংস্কার শেষ হয়ে নতুন শিক্ষায় মন যখন গড়ে উঠছে তখন

(৩) অধ্যাপক ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য।

(৪) ছিন্নপত্র : পত্র
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী (পৃঃ ১০৮)

5 How should one read a book ?—Common Reader : V. Woolf.

সমালোচনা কখনোই নীতিনির্দেশ মেনে চলতে পারে না। প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,—প্রত্যেকে বিভিন্ন মন নিয়ে বিভিন্ন রীতিতে সমালোচনা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এক জায়গায় তাঁদের সকলেরই মিল,—তাঁরা সকলেই আত্মানুগত সমালোচনাকে সার মেনেছেন। আমাদের মনে হয় সার্থক সাহিত্য আত্মলীন হবে কি বস্তুলীন হবে তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সার্থক সমালোচনা সর্বদাই আত্মলীন হতে বাধ্য। তবে স্বানুভাবাত্মক অনুভূতির প্রকাশে কম বেশী দেখা যেতে পারে।

আরও পরে 'সবুজপত্র' (১৯১৫) যখন এলো, তখন সমালোচনা একেবারে নতুন মোড় নিলো। নতুন আলো ঢুকলো। তুলনামূলক সমালোচনা আগেও ছিলনা তা নয়—কিন্তু আগেকার দিনে পূর্ণচন্দ্র বসু তাঁর 'সাহিত্যে খুন' (সাহিত্য ১৮৯৭) প্রবন্ধে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র মানতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যকে নস্যাৎ করে দিতেন, এমন কি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও 'কালিদাসও সেক্‌সপীয়র' প্রবন্ধে (সাহিত্য ১৮৯৪) তুলনা করতে গিয়ে কালিদাসের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব করার ফলে শেক্‌সপীয়রের কাব্য রসাস্বাদনে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বা অতুল গুপ্তের ক্ষেত্রে এটা হোলনা—হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। যদি আমরা মানি সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার অগ্রগতিও অবশ্যম্ভাবী, তাহলে স্বীকার করতে হবে বিংশশতাব্দীর বাংলাসাহিত্য এখন এতদূর অগ্রসর হয়েছে, যে তার সমালোচনা-ধারাটিও আর পিছিয়ে থাকতে পারে না। নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্য দিয়েও আধুনিক সমালোচনা-ধারা এগিয়ে চলেছে—বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার মারফৎ। পরিচয়, কবিতা, চতুরঙ্গ, সমকালীন প্রভৃতি পত্রিকার মত সাহিত্যপত্রিকা আগেকার দিনে কমই বেরোতো—এবং এখনকার সমালোচকদের প্রচুর পড়াশুনো ও সমবেদনশীল মন আশ্চর্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যসমালোচনা রচনায় সাহায্য করছে। এখনকার সমালোচনা সত্যিই সংশ্লেষণী,—সমালোচক তাই তাঁর পদ্ধতি যতই আত্মানুগত করুন, তাঁকে জানতে হবে অলঙ্কার শাস্ত্রের 'রস' ভাষ্য, জানতে হবে পাশ্চাত্ত্যের আঙ্গিক বিভাগের নানান্ পদ্ধতি, সাহিত্য বিচার করতে হবে এক সঙ্গে সবদিক থেকে, রসতত্ত্ব যেমন বাদ পড়বে না, তেমনি রচনার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতও বাদ দিলে চলবে না। এই যে বাঙলা-সমালোচনার অগ্রগতি এতে আমাদের আশান্বিত হওয়ারই কথা ; বাঙ্‌লা সাহিত্য-সমালোচনার স্বল্পকালীন জীবন-ইতিহাস স্মরণ রাখলে, তার বিভিন্ন পদ্ধতিতে এতটা অগ্রসরতা একান্তই আশার কথা—প্রতিযোগী ইংরেজীর সাহিত্য সমালোচনা উদ্ভব যেখানে বহু প্রাচীন, সেক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে তুলনায়ও বাঙ্‌লা সাহিত্য-সমালোচনা আজকের দিনে কোন অংশে হেয় মনে করবার কারণ নেই।

ট্যানিক এ্যাসিড

রবি ঘোষ

মিথ্যেটাকে ঘিরেই মানুষ—সেটা সরে গেলেই নাকি পরমাত্মা। তাতে আছে ধোঁকা। পেঁয়াজের খোসার উপমা। বাগানের কুলীরা ফ্যাক্টরীর সামনে বসে নির্বিকার মিটিং করছে, গাল দিচ্ছে শোষক শ্রেণীকে। সমরেশের ভয় হয়। এরা সাংঘাতিক জীব। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। এখন সবাই শান্তই বটে—কিন্তু অশান্ত হলে? আজও মাথার পেছনে বড় করে রাখা চুলের অন্তরালে টাঙ্গির হিংস্র দাঁত-বসানোর দাগ রয়ে গেছে। সে কি খুব বেশী দিনের কথা?

ভোরের আকাশ ফাগ ছিটায়। গুঁড়ো গুঁড়ো এসে লাগে কৃষ্ণচূড়ার চিকণ পাতায় অঞ্জলিতে চা-এর কচি পাতা আর শেড-ট্রি গুলোর উপর আলতোভাবে গা ঘষে বাতাস এসে কনকচাঁপার গন্ধ গায়ে মাখে।

সব কিছুতেই অপরিচিত পরিবেশের মুগ্ধ আবেশ। তারই মাঝে বেসুরোভাবে বাজে সাইরেণ—ফ্যাক্টরীর নিকষ আহ্বান—আরেকটা দিন সুরু হল।

ফ্যাক্টরীর সামনে নিমগাছটা থর থর করে কাঁপছে। ভোরের আলোর সোহাগ লেগেছে তার চোখে মুখে।

'পাতিঘরে' গোপালবাবু বসে গেছেন কোম্পানী-লাইনের লোকদের হাজরী লিখতে। ওর কমিশন পায় কোম্পানী নিজে—ঐ আয়ে চলে কালীবাড়ীর খরচ। পিঠে টুকরী বেঁধে কালো চিলতে কাপড় আঁট করে পরে বেড়োয় সাঁওতাল মুণ্ডা মেয়ের দল। পুরুষেরা পরে নেংটি। কেউ কেউ পরে হাফ প্যান্ট। সমরেশদের কাছে ওরা উদাহরণ। ওরা 'হাঁড়িয়া'তেই সব পয়সা ওড়ায় না। কারো পিঠে টুকরী, কারো কাঁধে 'ফারুয়া।' যারা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, অফিসের চৌকিদার,—তারা এদের মধ্যে অভিজাত।

ময়লা হাফ প্যান্ট, মুখে সিগারেট, হাতে চা গাছের ডাল থেকে বানানো ছড়ি, বগলে ছাতা, মাথায় কারো কারো শোলার টুপি। ছায়াবীথি দিয়ে চলে বাগানের বাবু। কুলিদের তদারকি কাজ। পেটেন্ট পোষাক পরে সমরেশও যাচ্ছিল।

'হাই—হাই—' ম্যানেজারের বাজখাঁই আওয়াজ। আওয়াজ নয়তো গর্জন। কাউকে কোন নাম ধরে ডাকে না লোকটা।

হাতের তেলোয় চট করে সিগারেটটা লুকোয় সমরেশ। বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করে। ফিরে দাঁড়ায় রক্তশূন্য মুখে।

'আইজ্ঞে—আমারে ডাকলেন'—নিজেই নিজের গলার আওয়াজ শুনতে পায় না যেন।

'তবে কি ঐ কুত্তাডারে ডাকলাম'—আবার ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন ফিরে আসে।

'আইজ্ঞে—হেঁ—হেঁ—' জোর করে হাসি আনতে হল মুখে। সকালবেলায় বউনিটা আজ ভালোই হ'ল সমরেশের। রাগে সারা শরীর রি রি করে। সইতেই হবে। চা বাগানের

ম্যানেজারের মন পাওয়া আর জল দেখে ব্রহ্মপুত্রের কালো জলের গভীরতা বলে দেওয়া সমান দুঃসাধ্য। নিম্নস্বরে একটা অশ্লীল মন্তব্য করে ড্রেনটা পার হবার জন্য সমরেশ লাফ দেয়। পার হতেই একটা পাথরে পা ঠেকে হোঁচট খেল।

'জানোয়ার এক্কেবারে— দেইখ্যা চলবার পারো না?" আবার সেই হিংস্র গর্জন।

'আইজ্ঞে পাডা পিছলায় গেল। হে-হে—' গা ঝাড়া দিয়ে সমরেশ উঠে ম্যানেজারের কাছে এসে কৃতার্থ ভাবে দাঁড়ায়। কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহসও নেই তার। ম্যানেজারবাবুর চোখ ততক্ষণে তাঁর 'রোড আইল্যাণ্ড' মোরগটার দিকে ফিরছে। লাফিয়ে লাফিয়ে ম্যানেজারের বাংলো থেকে ফ্যাক্টরীর দিকে নেবে আসছে উদ্ধতভাবে।

গোপালবাবু করিৎকর্মা লোক। কখন পাতিঘর থেকে উঠে ম্যানেজারবাবুর পিছনে দাঁড়িয়েন।

সত্যিই মোরগটা যা অইচে—খুঁক্—খুঁক্—।" অত্যন্ত নস্যি দে'য়ার ফলে প্রতি কথায় পর খুঁক খুঁক শব্দের অলঙ্কার বসান ভদ্রলোক।

ম্যানেজারবাবু কিঞ্চিৎ গললেন।

'এইট্যো আর কি? বাসায় যা একডা আছে—কুত্তা ঢুইকবার আগেই লাফায়া পড়ে—বাসা অর্থ সহরের বাড়ী। কথার শেষে মাণিকগঞ্জের টান। ম্যানেজারবাবু কথাটি বলে হাসবার ভাব করেন। প্রতি কথার শেষেই ঐ হাসিটুকু তার মুখে হিংস্র চিতাবাঘের ক্রূরতায় ঝলসে উঠে।

চেহারায় ভদ্রলোক—বেশভূষায় উৎকট ভদ্রলোক—অভ্যাসে ততোধিক। কালো বেঁটে চেহারা। জবাফুলের মত টকটকে লাল চোখ। পরণে হাফ প্যাণ্ট—পাতলা হাফসার্ট—পায়ে গামবুট। হাতে ভাজ করা লাঠি। আগাটা মাটিতে দাবিয়ে ভাঁজ করা হাতল খুলে বসা যায়। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের চিহ্ন মুখের রেখাবলীতে। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই যেন সব সময় মাথাটা থর থর করে কাঁপে।

'আমরা বুঝি কাম। আমাগো "প্রোডাকশন" গেলবাররে সারপাস্ট করান লাগবো, এই অইল সার কথা। শোন সমরেশ, আইজ মোল্লাবাড়ী ব্লকে ফারুয়ার কাম অইবো। যদি আমি দেখি ঐ-খেনে আইজও জঙ্গল রইছে তো তোমারে স্যাংসন করতে বাইধ্য হমু।'

'আইজ্ঞে ফারুয়া অখন পামু কই?' ভীতভাবে সমরেশ জবাব দেয়।

'হেয়াতে কি খুক্—খুক্। রামুরে ডাইকা কইয়া দেন। আওরতরা—খুক্ খুক্—পাতিতে যাউক মরদরা ফারুয়া লইয়া আসুক—খুক খুক—"

'হ, তাই করগা।'—ম্যানেজারবাবু বলেন।

বিড়বিড় করে গাল দিতে দিতে সমরেশ এগিয়ে যায়—চায়ের ব্লকের সোজা রাস্তায় যেখানে একটা বিন্দু ক্রমশঃ বড় হয়ে রামুর চেহারা পাচ্ছে।

পিচ বাঁধানো কালো রাস্তাটা অনেকখানি দৌড়ে এসে এসে যেখানে বাঁ দিকে বেঁকে গিয়ে তোরসার বড় পুলটার কাছে এসে ক্ষণেকের জন্য হাঁফ ছেড়েছে, সেই মোড়ের উপর উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে হলদে রংয়ের নেমপ্লেট—লালন টি এষ্টেট।

একটু এগোলে বাঁশবাগান। পাহাড়ে রাস্তা ধীরে ধীরে উঠে ডান দিকে মিশিয়ে গেছে বাঁশ বাগানের অন্তরালে। তারপর ঢালু—লালন নদী। নদী নয় নালা।

মাঝখানে বিরাট ভাঁজের গোড়ায় ফ্যাক্টরী। বেদীর ভিড়ের মত সমতল জায়গাটা। বাগানের প্রাণকেন্দ্র। 'রবসন' মেসিনটা ধুকছে। ফ্যাক্টরীর চালায় লাল রং করা—জীবন্ত রক্তাক্ত।

তার পশ্চিমে নীচু থেকে উঁচুতে উত্তর দক্ষিণে লাইন করা বাবুদের বাসাশ্রেণী। পাহাড়ের ঐ ভাঁজটা যেখানে শেষ হয়েছে বাতিদানের উপরকার স্বর্ণ প্রদীপের মত তার চূড়ায় দেবদারু, আহই, চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, এ্যাকাশিয়া শিরীশ গাছ ঘেরা ম্যানেজারের বাংলো। বাংলোর চালার রং লাল। সবুজ পান্না ঘেরা পদ্মরাগমণি—চা বাগানের জীবনের চরিতার্থতার হাতছানি।

মোল্লাবাড়ী ব্লক থেকে ম্যানেজারের বাংলোর পেছন দিকটা দেখা যায়।

গাঢ় প্রশান্তির এক ধরণের ভাব আছে। যা মন থেকে সরানো যায় না। একটা সিগারেট ধরায় সমরেশ। সকাল বেলার ঘটনাগুলো আবার আউড়ে নেয় মনে মনে। দাঁত কড়মড় করে "শালা"।

"জী বাবু—" রামু জিজ্ঞেস করে।

সম্বিৎ ফিরে পায় সমরেশ।

"না তোরে না।"

"উ দেখ"—মুচকি হেসে রামু ম্যানেজারের বাংলোর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

ম্যানেজারের মেয়েটা স্নান সেরে দোতালার ব্যালকনিতে কাপড় মেলে দিচ্ছে।

সমরেশ চোখ ফিরিয়ে নেয়। মেয়েদেরকে ও ভয় পায়। কাছে যেতে যেন ঝিম ঝিম করে কেমন যেন একটা অসোয়াস্তি। দূর থেকে মেয়েদের দিকে তাকালে মনে হয় ভেতর থেকে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

চা বাগানের জীবন কিন্তু পাক খাচ্ছে মেয়েদেরকে ঘিরেই। সেটা সে টের পেয়েছিল আসবার দু'একদিনের ভেতরেই। সবাই জানে, সবাই অভ্যস্ত, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে লাগতে গেলে নির্লজ্জভাবে মেয়েঘটিত ব্যাপার নিয়ে বদনাম রটানোই সবার পক্ষে নিজের গা বাঁচিয়ে অন্যের সর্বনাশ করবার রীতি, তখন সবাই ভিড় কাটবে—সবাই কেলেঙ্কারীর বিচার চাইবে শিশুর সারল্যে।

ম্যানেজারের মেয়েটি দাঁড়িয়ে ওদেরকেই দেখছে।

"গোপালবাবুকে নজর পর আলাক তো—' রামু চোখ মুখের একটা ভঙ্গী করে।

"তু কোই কামকা নেহিরে বাবুমন্? সমরেশকে সচেতন করে রামু।

"নাই তো নেই তর কি?" চটে যায় সমরেশ।

ব্যালকনির দিকে আবার চোখ পড়ে। সদ্যস্নাতা এলোচুল—সকালের রোদ এসে পড়েছে তার গায়ে—মুখে।

সমরেশের কেমন যেন নেশা লাগে। কে জানে হয় তো চা বাগানের এই নেশা।

"কারে বাবুমন—ভবিষ্যৎ ঠিক নেহি?"

চমকে উঠে সমরেশ রামুর প্রশ্নে। তাই তো! এতক্ষণ ধরে পাথরটাতে হেলান দিয়ে সে বসেই আছে!

"ম্যানেজারকে লেড়কীকে দেখে দিমাক মুরুক খারাপ হোলাক রে বাবু তোহর ?" হুস হাস ফারুয়া চালাতে চালাতে এতোয়া মন্তব্য করে। হেসে উঠে আশপাশের কর্ম্মরত শ্রমিকেরা।

ম্যানেজারের লেড়কী! হায়রে! বামন হয়ে চাঁদে হাত! তবুও মনে হয়, মন্দ হত না। সত্যিই তো এমন কি অপরাধ করেছে যে 'লেড়কী'দের কথা ভাবতে পারবে না।

"বাবুমন, জঙ্গলকে জানবারকে জোড়ী লাগাওথ। তু একলা কানে রংবি ?" ফারুয়ার হাতলে ভর দিয়ে কপালের ঘাম কেঁচে ফেলতে ফেলতে এতোয়া আবার মন্তব্য করে।

'বাবুমনকর দিলমে চোট লাগথি—মুরুক চোট লাগথিরে"—রামু সহানুভূতি প্রকাশ করে। হৈ হৈ করে উঠে সাঁওতালের দল। সমরেশও এবার হাসে। এক কথা। সকলের মুখেই এক কথা।

মুক্ত প্রকৃতির শিক্ষা।

বৃষ্টিমুখরিত রাতগুলোতে তারও মন টনটন করে। বেদনার মীড়ে মথিত হয় পূর্ণিমার আকাশ বাতাস। তারায় তারায় ঝকঝকে হাসি হাসে তামসী রাত্রি। সকলেই যেন বলে ঐ একই কথা। 'জোড়ি' মিলিয়ে নাও।

ম্যানেজারের মেয়েটা আবার এসে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছে। ফর্সা টকটকে গায়ের রং। পঁচাত্তর ফুট উঁচু পাহাড়ের খাড়াইয়ের উপর প্ল্যাংকিং-এর দোতলা। তারই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছে। উপরের ঘেরাটোপটা লাল—মাদকতার বিলোল ইঙ্গিত। সমরেশের কেমন যেন মনে হল হাত বাড়িয়ে টেনে এনে দুমড়ে থেতঁলে দেয় ঐ শরীর! নাঃ আর তাকাবে না ওদিকে।

ম্যানেজারের স্ত্রী 'নিউরোসিসে'র রোগী। সারারাত মহিলা জেগে থাকেন। জেগে দেখেন তাঁর লম্পট স্বামীর কীর্ত্তি, দেখেন প্রতি রাতে কিভাবে তাঁকে তাঁর স্বামী অপমান করছেন। কিন্তু ঘুমোতেও পারেন না তিনি। বোধ হয় মনের কোণায় ওর জন্য আনন্দও পান। সন্ধ্যে লাগতেই শিরায় শিরায় অনুভব করেন শিহরণ। কেমন যেন জোড়া পায়রার 'বক্‌বকম্' শোনবার সুপ্ত নেশা! আরেকটু পরেই স্বামী ফিরবেন। ডাকবেন—ভোলা। সেলাম দিয়ে দাঁড়াবে ভোলা সর্দ্দার, ফিসফাস কি কথা হবে। পকেট থেকে কড়কড়ে নোট যাবে ভোলার হাতে। তারপর সুরু হবে মদ।

আচমকা ঝকঝকে নীল গাড়ীটা এসে দাঁড়ায় তার সামনেই।

শামুকের মত অতি সাবধানী কাঁচুমাচু মনটাকে একটু ছেড়ে দিয়েছিল সে—মোটরের ব্রেক কষতেই সড়াক করে গুটিয়ে নিল। অনুভব করলো তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

"চল—বারোটা বাজে। কাম তো অইছে-ই একরকম। চল ভাওানী ব্লকটা ঘুইরা যাই।" ম্যানেজার ডাকেন।

অতি দয়া। সমরেশ মনে মনে কৃতার্থ হয়ে যায়। ভুলে যায় সব কিছু। লজ্জা পায় নিজের কাছে, তাঁরই মেয়ের দিকে সে তাকিয়েছিল, লজ্জা পায় তাঁরই লাম্পট্য নিয়ে নিজের সুপ্ত ইচ্ছেগুলোকে শাণিত করেছিল সে।

মনে মনে ক্ষমা চায়। বড়র দোষ দেখবার অধিকার তার নেই।

"আরে সোমরা লাইনের জুড়নেরে চিন ?" ম্যানেজার হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন। মোটরের সোহাগমাখানো ঝাঁকুনী। সমরেশ আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

"আজ্ঞে ?" চমকে উঠে সমরেশ।

"জুড়ন রে চিন ?"

"চিনি।"

"শালার বড় বাইড় বাড়ছে। আইচ্ছা—" বীভৎস হয় ম্যানেজারের মুখ। "দেখুম এর কত তেজ। আমি ও ম্যানেজার—"

সমরেশ বুঝলো সাংঘাতিক একটা কিছু হবে।

ওহোঃ! সমরেশের মনে পড়ে। জুড়নের এক সাগাই এসেছে বানারহাট অঞ্চল থেকে। তার সঙ্গে এসেছে নাকি টুকটুকে একটি মেয়ে। তিনপুরুষ ইংরেজের পলেস্তারায় রং চেহারা সবই পাল্‌টেছে। ফর্সাটে রং—খয়েরী চোখ লালচে চুল। রঙ্গীন কাপড় পড়ে বাঙ্গালী মেয়েদের মত পেঁচিয়ে।

সম্ভবতঃ সেখান থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এলেন ম্যানেজার। জুড়ন হয়তো রাজী হয়নি তাকে পাঠাতে। আত্মীয় এসেছে দূরদেশ থেকে—তার মেয়েকে সে পাঠাতে রাজী হয় নি—এ তার অপমান—এ অসম্ভব।

ম্যানেজারের ক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছিল; প্রথম দেখা হয়েছে সমরেশের সঙ্গে। চাপা রাগের মুখ খুলে একটু হাল্কা হলেন। ম্যানেজারের এটা স্বভাব। রাগ চড়লে প্রথম যাকে দেখবেন তার সামনে প্রাথমিক আস্ফালন না করা পর্য্যন্ত শান্তি নেই।

যথারীতি বেলা গড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যের সময় আফিসের সামনে বাবুদের ভেতর দেখা গেল উত্তেজনা। গোপালবাবু টুকটুক করে হাঁটছেন না যেন দৌড়াচ্ছেন। মুখে চাপা হাসি। জুড়নকে ধরতে লোক গেছে।

জুড়ন নাকি কাল রাতে ভোলাকে মেরেছে। যদিও ভোলা থাকে ম্যানেজারের বাংলোয়। কিন্তু নেকড়ে বাঘ আর মেষশাবকের গল্প তা' হলে হলো কি করে? সমরেশের কেমন যেন অসহায় বোধ হয়।

অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। ইলেট্রিকের আলো জ্বলছে এখানে সেখানে তাতে অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। সমরেশ নিমগাছটার তলায় বাঁধানো বেদীতে বসে থাকে চুপচাপ। সিগারেট ধরায় একটা। এখান থেকে অফিসের ভেতরে আলোর তলায় ম্যানেজারকে দেখা যাচ্ছে। পাশবতার জলন্ত ছবি।

রবসন মেসিনটা আর্ত্ত চীৎকার করছে—ধ্বক্—ধ্বক্—

সকলেই শশব্যস্ত। সকলেই একটু যেন দ্রুত চলাফেরা করছে। চাপা আনন্দের উত্তেজনা সকলের চোখে মুখে। এর আগে এক ম্যানেজার এমনি অপরাধে 'ওজন ঘরে' বাপ মেয়েকে সামনাসামনি থামে বেঁধে রেখেছিল উলঙ্গ করে, সারা দিন-সারা রাত।

সকলে দেখেছে—বাবুদের বাড়ীর মেয়েরাও রাতে কালীমন্দিরে যাবার নাম করে আড়ে সাড়ে দেখে গেছে। যে কোন জিনিষ চরমসীমায় এসে মানুষ বুঝি নিজেকে দেখে।

বাসায় ফিরে চাকরটাকে ডাকে—"সোমরা—এই সোমরা, ভাত হইছে?" সোমরা নেই। বোধহয় সেও ফ্যাক্টরীর আশেপাশে ঘুরছে। কখন আসবে কে জানে। বিছানায় গা এলিয়ে দেয় সমরেশ। খোলা দরজাটা দিয়ে তাকায় বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে।

সেতারের আলাপের মত টুং—টাং—ছট্—মিষ্টি আওয়াজে বৃষ্টি সুরু হল ফোঁটায় ফোঁটায়।

হঠাৎ কিসের আওয়াজে সমরেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

অস্ফুট কান্নার মত? রক্তকণাগুলো হাত পা বেয়ে মাথার দিকে উঠতে থাকে যেন। নিঃশ্বাস চেপে শুনতে চেষ্টা করে। কোনো জানোয়ারের গলায় ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে যেন অস্ফুট একটা ঘড় ঘড় শব্দ।

বাইরে প্রকৃতি তোলপাড়! বিদ্যুৎ চাবুক মারছে। কানে শোনা যায় না সে শব্দ কিন্তু অনুভূতিতে স্পষ্ট শোনা যায় তাঁর সাঁই সাঁই আওয়াজ।

সমরেশ গা ঝাড়া দিয়ে বসলে। আবার কাণ পাতলে। নাঃ! নিশ্চয়ই কুকুর ঢুকছে ঘরে।

"যত সব ঝামেলা"—বিড়বিড় করে সমরেশ। তাড়াতেই হয়। আবার ভাবলে তাড়ালে ব্যাটা যাবেই বা কোথায়? পেট চিন চিন করছে। খেয়াল হল সে খায়নি। রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে? সোমরা কি এখনও ফেরে নি? দরজা তো খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সমরেশ—খেয়াল হয় তার। বিদ্যুৎঝলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দরজা বন্ধ। বন্ধ করলে কে? ওটা সত্যি কুকুর তো? যদি না হয় তা' হলে? এইবার সমরেশের ভয় হল। এই বিশাল একাকীত্ব, বাইরে রুদ্র প্রকৃতির দাপাদাপি।

'কে?' প্রাণপণে নিজেকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সমরেশ চীৎকার করে। 'কে ওখানে?'

বিদ্যুৎচমকে একটা ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে আসে। 'হাম্।'

"কে? সোমরা?"

অস্ফুট আলো আঁধারিতে মূর্ত্তিটা আরও কাছে আসে—"নখাঁই—রতিয়া?" "রতিয়া?" লাফ দিয়ে ওঠে সমরেশ। 'কে রতিয়া? কি চাই?"

দরজার কোণায় সুইচ্‌টা অন্ করে। আলো জ্বললো—ঝলসে গেল দুচোখ। ছিন্নভিন্ন কাঁচুলী গায়ে সম্পূর্ণ সিক্ত একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু বুকটুকুতে ঐ ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাঁচুলী, কয়েকটা সবুজ টান। ভিজে লেপটে আছে গায়ে। বুকের নীচে কিছু নেই। ভিজে জ্যাবজেবে চুল—কপাল মুখ প্রায় ঢাকা। সারা গা ভিজে নীলচে হয়ে গেছে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। আবার চোখ বোলায় সমরেশ। একি দুঃস্বপ্ন না চা-বাগানের নেশা প্রেতের নির্দ্দেশে হাজির হয়েছে সম্মুখে!

"একঠো লুগা দে বাবুমন—সরম লাগথি"—কাঁপতে কাঁপতে বলে মেয়েটি। সম্বিৎ ফিরে পায় সে। কাপড় দেবে কিন্তু সেতো ঐ ঘরে। ভেতরের দিকের দরজা ধাক্কা দেয়। ওধার থেকে আটকানো। বারান্দা দিয়ে যেতে হবে। দরজা খুলে দাঁড়াতেই ছুটে এসে পেছন দিক

দিয়ে ঝাপটে ধরে মেয়েটা। সাপের মত ঠাণ্ডা স্পর্শ। কেওয়ারী না খুলবে—কাঁপছে মেয়েটা। চোখে ঝরে মিনতি। ছাড়িয়ে নেয় সমরেশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত। ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়ায় মুখোমুখি।

"তাইলে কাপড় পাবি না—প্যান্ট পর—" চেয়ারের হাতল থেকে হাফ প্যাণ্টটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার খাটে এসে বসে। তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটা পড়ে ফেলে রতিয়া।

"কে তুই ?"

"রতিয়া। জুড়নকে ঘরপর আলাক সাগাই থায়েকে—"

ওহোঃ! তাইতো। ফর্সা রং সাঁওতালী কথা বলছে। সমরেশের আগেই বোঝা উচিত ছিল। "সর্ব্বনাশ! তুই এইখানে ক্যান ?"

"ভাগকে আলাক।" শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে যে ইতিহাসটুকু বিবৃত করে তার অর্থ ভোলার দল জুড়নকে, তার বাবাকে আর তাকে ধরে নিয়ে আসে বৃষ্টি আসবার পর পরই। জুড়নকে আর তার বাবাকে ওজনঘরের থামে বেঁধে ম্যানেজার তাকে নিয়ে যায় বাংলোতে। মদ খেয়ে পায়ে পায়ে হিংস্র বাঘের মত এগিয়ে আসে বাঁধা হরিণীটার দিকে। তারপর সুরু হয় ধস্তাধস্তি। যুদ্ধে পারবে না বুঝে পালানোর পথ খোঁজে রতিয়া। ম্যানেজারের শক্ত মুঠিতে রয়ে যায় তার পরিধেয়। ম্যানেজার আক্রোশে ফেটে পড়ে। লোকজন ডাকাডাকি করতে থাকে এরই মধ্যে আলো আঁধারিতে পালিয়ে আসে এতখানি। হঠাৎ খোলা দরজা দেখে এই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। গুটি সুটি লুকিয়ে থাকে খাটের তলায়। লোকজন খোঁজাখুঁজি করে গেছে—ধাক্কা দিয়েছে সমরেশের বন্ধ দরজায়। ঘুমন্ত সমরেশ জানতে পারে নি।

"জানবার কুত্তা"—আক্রোশ ফেটে পড়ে রতিয়ার।

ফর্সাটে রং। সুন্দর গড়ন। বয়স হবে আঠারো উনিশ। সমরেশের চোখে নেশা লাগে বুঝি। নিটোল অনাঘ্রাত পুষ্পের মত। অদ্ভুত পোষাকে আধা আবৃত দেহে ভেজা চুলে—ভয়ার্ত্ত চাহনীতে—রুক্ষ ভঙ্গীতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমরেশ চোখ ফেরাতে পারছিলো না।

পরক্ষণে ম্যানেজারের কথা মনে হয়। শিউরে উঠে সে। জানতে পারলে রক্ষে নেই। ওকে আশ্রয় দেবার শাস্তি পেতে হবে।

"বাতি বুতা দে বাবুমন—কোই নজর করবে"—নিজেই আলো নিভিয়ে দেয়। কেমন যেন পরমনির্ভরতা আছে তার উপর। পায়ের কাছে এসে বসে। মোকে ধরওয়াইস নাই রে বাবুমন—পায়ের কাছে ঘন হয়ে বসতে বসতে বলে।

কেমন যেন মায়া লাগে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে যায়। সম্পূর্ণ ভেজা চুল। আত্মস্থতা ফিরে আসে সমরেশের। একটু ব্যস্তও হয়।

"ঈস্ সম্পূর্ণ ভিজা গেছিস—দাঁড়া গামছা দেই—"

"জরুরৎ নেহি—"

"তোর জামাটাত তো ভিজা—ছাইড়া ফেল—"

"কা পিন্‌বো রে ?"

তাইতো। "আইচ্ছা বেডকভারটা নে। জামাটা খুইলা এইটা গায়ে দিয়া বইসা থাক।" বেডকভারটা দিতে দিতে সমরেশ বলে। অন্ধকারেই কথা চলতে থাকে।

বাইরে হাওয়া বৃষ্টি ভয়ানক বাড়ছে। যেন এর শেষ নেই। মেয়েটা যাবে কি করে?

"শালা কুত্তা জানবার কাইট দেলাক—কাঁচুলীটা খুলতে খুলতে রতিয়া বলে।

"কি হইল রে?"

"শালা দুষমন—কিতনা কাইট দেলাক আপন হাত সে দেখ"—হাতটা টেনে নেয় সমরেশের অনুভব করাবার জন্যে। বেডকভারটা তখনও ওর অন্য হাতে।

সমরেশের হাতটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অসাড় হয়ে যায় তার সমস্ত অনুভূতি।

তাইতো! পালিয়ে এসেও ওর রক্ষে নেই। সমরেশের ভীরু ভদ্র মন ধিক্‌কার দিয়ে ওঠে। তার মুখ তখনও ঐ আবরণহীন নিটোল দেহের মধ্যে নিবিড় হয়ে আছে। লজ্জায় লাল হয়ে যায় সে। তেমনি আচমকা ছেড়ে দিয়ে সরে বসে একটু। আবার একটা বিদ্যুৎচমক। কান ফাটানো গর্জন।

একটা অসোয়াস্তিকর নীরবতা; রতিয়া আবার এসে বসে তার ঝোলানো পায়ের কাছে। এই ক্ষণিকের ভাবালুতা বুঝি তাকে তেমন স্পর্শ করে নি।

"এখন তুই কি করবি?" সমরেশই নিঃশব্দতা ভাঙে।

চুপ করে থাকে রতিয়া।

"বাইর হইস না। অরা দেখলে মাইরা ফেলবো।"

গোপালবাবুর কাছে শুনেছিল আগেকার ম্যানেজার কুকুর লেলিয়ে দিত পালিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজে। বইতে আমেরিকান লিঞ্চিং প্রথার কথা পড়েছিল। এরাও তাদেরই সগোত্র।

হঠাৎ বাইরে কোলাহল শোনা যেতে লাগলো। বজ্র, বৃষ্টি ঝড় সব কিছুকে প্রতিহত করে আসছে আওয়াজ। কারা?

"চকির তলে তুই লুকা আমি দেখি।"

সমরেশ দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়ায়। দরজা খুলতেই বিরাগী সিকার চড় পড়ে তার গালে। তীব্র বাতাসের ঝাপ্‌টা। বৃষ্টির ছাঁট লাগে গায়ে। তারই মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ও পাশে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে কাতারে কাতারে মানুষ। রুদ্ধ বিক্ষোভে—দৃপ্ত ভঙ্গীতে—উদ্ধত তীর ধনুক হাতে।

ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা যেতে লাগলো। বাগানের ইজ্জৎ নষ্ট হতে দেব না—ভিন্ বাগানের সাগাইয়ের মেয়েকে নিয়ে তারা এভাবে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না।

ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ। সমস্ত প্রকৃতিতে চলছে রুদ্র তাণ্ডব কে জানে কেন আজই-এমন রাত্রে মানুষ জেগেছে। বুঝি তার সত্তায় ঘা পড়েছে—বুঝি ভয়ের সীমা ছাড়িয়ে গেছে—আত্মপ্রকাশ করেছে ক্রোধের জ্বালামুখী।

সমরেশ দাঁড়িয়ে রইল। কোলাহল এগিয়ে আসতে থাকলো। এরা তছনছ করে দেবে মেরে কেটে শেষ করে দেবে বাবুদের—

অসহ্য অত্যাচার আজ ইস্পাতকঠিন চেতনায় প্রতিহত হয়ে এসেছে। প্রথম বাসা সমরেশের।

"রতিয়া"—রতিয়া বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নীলরংয়ের বেড কভারটার একপ্রান্ত হাফ প্যান্টের সঙ্গে গুঁজে আঁচলার মত জড়িয়ে নিয়েছে। কিসের সম্ভাবনায় যেন সাঁপিনীর মত দুলছে সে।

"রতিয়া দেখছস্"—সমরেশ আবার শুধোয়।

"হাঁ।"

উত্তেজিত প্রেতের দল এগিয়ে এল। "মার-শালা মার—।

রতিয়ার আর্ত্ত চীৎকার—মার থামাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সমরেশ রতিয়ার পায়ের কাছে। টাঙ্গিটা বিদ্যুৎঝলকে চিতাবাঘের মত লাফিয়ে উঠলো আরেকবার। 'খবরদার।' সকলের কোলাহল ছাপিয়ে উঠলো নারীকণ্ঠ। রুখে দাঁড়িয়েছে রতিয়া।

পাহাড়ের ঢল বাধা পেল যেন শক্ত পাথরে। থমকে গেল মারমুখী জনতা। হেনে নেহি—ছুমন্তর মেনেজার—চল হামার সাথ—বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামে রতিয়া। রক্ত দেখে রক্তের নেশায় ক্ষেপে উঠেছে প্রতিশোধস্পৃহা বাঘিনী! পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আবার পথ পায়। ফুঁসতে ফুঁসতে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে অনুসরণ করে রতিয়াকে—বাংলোর দিকে।

পড়ে রইল সমরেশ-রক্তাপ্লুত দেহে।

চায়ে শুধু চা-ই নেই। চায়ে নাকি আছে বিষও।

মানুষের চতুর্বর্গ কমে দ্বি-বর্গে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পাল্‌টে গিয়ে মানুষের জন্য অর্থ আর কাম আছে।

দুটোকে বাদ দিয়ে যে ফাঁকি তারই ফাঁকে ছিল কি সমরেশ?

সংস্কৃতসাহিত্যে গল্প ও অন্যতম গল্পকার সোমদেব

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

মানুষের মনের দুয়ারে গল্পের আবেদন চিরন্তন। আদিম যুগের শিশু হ'তে আজকের যুগের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরি গল্পশোনার আকাংক্ষা আছে। গল্প-উপকথার মধ্য দিয়ে কল্পনা ও বুদ্ধির সুধা পান ক'রে চলেছে চিরকালের মানব-শিশু। বহিঃপ্রকৃতির সংগে অবিরাম দ্বন্দ্বের ফলে আদিম মানবের মনন-শক্তির ঘটলো দ্রুত উৎকর্ষ। ফলে, ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা এবং শব্দ সম্পদ গেল বেড়ে, উন্মেষ হ'ল সৃজনশীল মনন-শক্তি এবং সমুন্নত কল্পনার; সৃষ্টি হ'ল বেদ-বেদান্ত-বিজ্ঞান সাহিত্য-সংগীত-শিল্প। আনন্দে সময় কাটানোর জন্যে, কিংবা শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে, অথবা ছেলে ভোলাবার জন্যে সৃষ্টি হ'ল গাল-গল্প, কথা কাহিনী। কোথাও লৌকিক জীবনের বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করে, কোথাও বা কল্পনার মায়ারথে চড়ে অলৌকিক ভুবনের কল্পলোকে গল্প-দাদুর আসর রচিত হ'ল। নানাভাবে এই সব গল্পই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়্‌ল কাল হ'তে কালান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে, বিশ্বমানবের হৃদয় দুয়ারে।

এই দেশে পরাবিদ্যার সংঙ্গে তাল মিলিয়ে অপরাবিদ্যারও সম্যক অনুশীলন হ'ত, তার পরিচয় মেলে চৌষট্টি রকমের কলবিদ্যার উদ্ভব ও উৎকর্ষের মধ্যে। মোক্ষশাস্ত্রের সংগে সাহিত্য-শাস্ত্রকেও সমুচ্চ স্থান দিতে ভারতীয় চিন্তানায়ক কখনো কুণ্ঠিত হন্‌নি। এমন কি সাহিত্য-সংগীতাদি সুকুমার কলাজ্ঞানহীন মানুষকে তারা শৃংগ এবং পুচ্ছবিহীন পশুর সংগে তুলনা ক'রেছেন।—

"সাহিত্য-সংগীত-কলা-বিহীনঃ
সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছ-বিষাণ-হীনঃ।"

এরি জন্যে, তাঁদের সমগ্র সাধনার অন্তরালে দেখি একটি সাহিত্যপিয়াসী, শিল্পসন্ধানী, সৌন্দর্য-বিলাসী চিত্ত। এইভাবে তাঁদের ভাব-মধুর এবং রস-সুন্দর দৃষ্টি পূর্ণতা লাভ ক'রল সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলন সৃষ্টির মধ্যে।

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ভারতবর্ষ যে অম্লান-সুন্দর সাহিত্য কুসুমের ডালিখানি সাজিয়েছে, তাতে বহু বিচিত্র পুষ্পের মধ্যে "কথাসাহিত্য"ও অন্যতম। তার দিব্য সৌরভে রসিকজনের চিত্ত আজো লুব্ধ ও মুগ্ধ হয়। প্রকৃতির অকৃপণ দানে তখনকার দিনে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন অবারিত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। অখণ্ড অবসর এবং আহার্যের পর্যাপ্ত প্রাচুর্যের ফলে উচ্চতর চিন্তার প্রচুর অবকাশ ছিল। "অন্ন চিন্তা চমৎকারার" সমস্যা মিটে যাওয়াতে "তত্ত্ব-চিন্তা পরাৎপরা"র সুযোগ তাঁরা পূর্ণভাবেই গ্রহণ ক'রেছিলেন। সুজলা সুফলা দেশ কৃষির সংগে সাহিত্যসৃষ্টিরও উপযুক্ত ক্ষেত্র। মৃত্তিকার সংগে সংগে মনেরও কর্ষণ সেখানে সমভাবেই চলে। "কৃষি" ও "কৃষ্টি" ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রেও মূলতঃ একই ধাতু হ'তে জাত। তখনকার দিনের লেখকও বুঝি আজকের দিনের কবির মত অবসর সময়ে বলতেন—

"মাথাটি করিয়া নীচু ব'সে ব'সে রচি কিছু
বহু যত্নে সারাদিন ধ'রে।
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।।" (বর্ষাযাপন-রবীন্দ্রনাথ)

আর, তা'ছাড়া তাদের চাহিদাও ছিল স্বল্প। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ক'রেই তাঁরা খুঁজে পেতেন বাস্তবজীবনের তৃপ্তি। এমন'কি, বিত্তের ভাণ্ডার কিছুটা রিক্ত রেখেও চিত্তের ভাণ্ডার পূর্ণ করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তারই ফল হল, ভারতীয় সাহিত্যের এই অতুলন মণিমঞ্জুষা, সংস্কৃত-সাহিত্যের বিশাল রত্নভাণ্ডার—যা'র অন্যতম রত্ন হ'চ্ছে এই কথাসাহিত্য।

আটপৌরে "গল্প" কথাটিকেই পোষাক পরিয়ে বলা হ'য়ে থাকে "কাহিনী"। আবার কাহিনী শব্দটিও এসেছে সংস্কৃত "কথা" শব্দ থেকে নানা রূপান্তরের পথে পরিক্রমা ক'রে। যেমন কথা কথন-কহন কহানী—কাহিনী। অমরসিংহ প্রভৃতি কোষকারগণ "প্রবন্ধ কল্পনা" বলেই অর্থ নির্দেশ ক'রেছেন এই "কথা" শব্দের। কোলাহলাচার্য ব'লেছেন—

"প্রবন্ধকল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা ক্বচিৎ।।"

আচার্য ভরত এই কথাটিকেই সংক্ষেপে বলেছেন—

"প্রবন্ধস্য কল্পনা রচনা বহ্বনৃতা স্তোক সত্যা।"

অর্থাৎ, অনেক মিথ্যে এবং কিছুটা সত্যি মিশিয়ে যে প্রবন্ধের কল্পনা, তারই রচনা হ'ল এই "কথা"।

এই সত্যি-মিথ্যে-মেশানো "কথা" তথা "কাহিনী"গুলোই গদ্যে এবং পদ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন পাত্রে, যেমন, ছোটগল্পে-উপন্যাসে, পুরাণে-জাতকে, গাথায়-অখ্যানে, এমনকি খণ্ড কাব্যে মহাকাব্যেও বিভিন্ন আকার নিয়েছে। ইউরোপের "এপিক" কথাটির মূলেও রয়েছে এই "গল্প"। উপাখ্যানই হচ্ছে মহাকাব্যের প্রাণ। "ইপস্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "গল্প" এবং "এপিক" কথার অর্থ হচ্ছে "গল্প সম্বন্ধীয়"। গম্ভীরভাবে গুছিয়ে যে গল্প করা হয়, তারি নাম এপিক—এই হচ্ছে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। তাই, সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই গল্প অনেকটা স্থান জুড়ে র'য়েছে।

ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের পথে দেখি জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য "ঋগ্বেদে"র মধ্যে র'য়েছে বহু কাহিনীর কংকাল। তার অন্যতম পুরুরবা-উর্বশীর প্রেমকাহিনী শুধু বৈদিক ঋষিকেই নয়, পরবর্তীকালের অগণিত কবিকেও কাব্য-নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ ক'রেছে। একে অবলম্বন ক'রেই তো রসিকজনের কান্তকবি কালিদাস রচনা ক'রলেন "বিক্রমোর্বশীয়ম্"—এক অনুপম কলাকৃতি এইভাবে বাস্তব-অবাস্তবের পটভূমিকায় অপসরো-রমণীর প্রণয়-মুগ্ধ মানব-বীরের বিরহ মিলনের দোলায় আন্দোলিত হ'য়েছে পাঠক-হৃদয়; প্রেম-গীতি-গুঞ্জনে মুখর হ'য়েছে আমাদের সাহিত্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেফের কাহিনী, নাভানেদিষ্টের কাহিনী, কঠোপনিষদের যম-নচিকেতার কাহিনী, ছান্দোগ্য উপনিষদের গৌতম-সত্যকামের কহিনী প্রভৃতির আবেদন ও আকর্ষণ এই প্লাবনের যুগেও মোটেই শেষ হ'য়ে যায়নি। শুধু কাহিনীর জন্যে নয়, ভাষার

সারল্যে ও ঋজুতায় এবং বর্ণনাভংগীর মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের গল্পগুলো আজো অপরাজিত। এইসব গল্পগুলো শিক্ষামূলক হ'লেও নির্মল আনন্দদানের ক্ষমতাও এদের প্রচুর ছিল। শিক্ষামূলক কাহিনীর উৎকর্ষ ভারতবর্ষে যেমন হ'য়েছিল, আর কোথাও তেমন হয়নি। রামায়ণ মহাভারতে, পঞ্চতন্ত্রে, জৈন গাথায়, বৌদ্ধজাতক ও অবদান গ্রন্থাদিতে পশুপক্ষিঘটিত এবং নানারকম মনোরঞ্জক ও নীতিমূলক গল্পের ছড়াছড়ি। এইগুলোকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন, লৌকিক কাহিনী, পশুপক্ষিঘটিত কাহিনী এবং পরীকাহিনী। এদেরই অনেক গল্পের অনুবাদ সুদূর অতীতেই ভারতের বাইরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়েছে। গ্রীসে যেগুলো পৌঁছেছিল সেগুলোরই অনুবাদ হ'চ্ছে সুবিখ্যাত "ঈসপস্‌ফেব্‌ল্‌স্‌"। "আরব্যোপন্যাসের"ও উৎস হচ্ছে এই সংস্কৃত গল্প-কল্পনা। আরবদেশীয় ঐতিহাসিক মাসুদী (masdui) ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। "কিতাব-এল্ সিন্দবাদ" কাহিনীটি ভারতবর্ষ হ'তে গেছে ব'লে তিনি পরিষ্কার ব'লে গেছেন। Chosraa Anosharwaa এর তত্ত্বাবধানে Buroe নামধারী জনৈক চিকিৎসক ৫৩১—৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পহ্লবী ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করেন। ৫৭০ খৃষ্টাব্দ সিরীয় ভাষায় Bad এবং আরবী ভাষায় আবদুল্লা-ইব্‌ন্‌-অল মোকাফা এই পঞ্চতন্ত্রেরই অনুবাদ করেন আবার। এইগুলো হ'তে অল্প-সময়ের মধ্যেই গ্রীক, পারস্য, স্প্যানীশ, জার্মান, ওলন্দাজ, হাংগেরীয়, মালয়ী, ফরাসী, হিব্রু, ড্যানীশ, আইস্‌ল্যাণ্ডীশ, ইটালীয়ান এবং ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হ'য়ে সমগ্র ইউরোপ এবং মধ্যএশিয়ায় এই কাহিনীগুলো ছড়িয়ে পড়ে দশম হতে ষোড়শ শতকের মধ্যে।

রোম্যান্টিক গল্প এবং Folktale বা উপকথা বৌদ্ধ মহাবস্তু, দিব্যাবদান এবং জাতক ও জৈনসূত্র গ্রন্থগুলোতে প্রচুর মেলে। এমন কি, তার অনেকগুলো অল্পস্বল্প পরিবর্তিত হ'য়ে ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে মুখে আজো প্রচলিত র'য়েছে। সুবন্ধুর বাসবদত্তা, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, বাণভট্টের কাদম্বরী, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, নারায়ণের হিতোপদেশ, শ্রীবরের কথাকৌতুক, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততি, জৈনঋষি সিদ্ধের উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা শিবদাসের কথার্ণব, বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা, বল্লালসেনের ভোজপ্রবন্ধ, জিনকীর্তির চম্পকশ্রেষ্ঠীকথানক এবং পালগোপালকথানক, কথাকোষ প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় গল্পগ্রন্থ ছড়িয়ে আছে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দিকে।

বৃহত্তম গ্রন্থটির নাম হ'চ্ছে "বৃহৎ কথা"। তখনকারদিনে উত্তরপশ্চিম ভারতে প্রচলিত "পৈশাচী" প্রাকৃতে রচিত "বৃহৎকথা" নামক এই বিরাট গ্রন্থটি পাওয়া যেত। রচয়িতা মহাকবি গুণাঢ্য সেকালের বহু রোম্যান্টিক কাহিনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে যান। দুঃখের বিষয়, কালের করাল আক্রমণে এবং বৈদেশিকদের অত্যাচারে আরো বহু গ্রন্থের মত এই "বৃহৎ-কথা"ও বিলুপ্ত হয়েছে। তবে এর কাহিনীগুলো অন্য তিনটি গ্রন্থের মধ্যে ভাষান্তরে রক্ষিত হ'য়েছে এবং বলা বাহুল্য ভাষাটি হ'চ্ছে সংস্কৃত। ৭ম শতকে দণ্ডী "কাব্যাদর্শে" "বৃহৎকথার" উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং, গ্রন্থটি কয়েকশতাব্দী পূর্বেই রচিত হ'য়েছে অনুমান ক'রে ১ম হ'তে ৪র্থ শতকের মধ্যে গুণাঢ্যের কাল নিরূপণ করা চলে।

খৃষ্টীয় ৮ম হ'তে ৯ম শতকের মধ্যে বুদ্ধস্বামী গ্রন্থটিকে "বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহ" নামে ২৮টি ভাগে ও ৪৫৩৯টি শ্লোকে অনুবাদ করেন।

তারপর, ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্র ৭৫০০ শ্লোকে "বৃহৎকথামঞ্জরী" নামে গ্রন্থটিকে আবার অনুবাদ করেন।

সর্বশেষে মহাপণ্ডিত এবং মহাকবি সোমদেব ভট্ট "কথাসরিৎসাগর" নামে গ্রন্থটির আরেকটি বিশ্বস্ত, পূর্ণতর ও মূলানুগ ভাবানুবাদ করেন। আর্যসংঘসেনের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিষ্য গুণবৃদ্ধি পরে চীন ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন আবার।

এই "কথা-সরিৎ-সাগর" সোমদেবের প্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। অনুবাদ কি ক'রে স্বতন্ত্র, রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত হ'তে পারে, তার পরিচয় মেলে এই গ্রন্থে। ১ম তরংগেই তিনি বল্‌ছেন— "যথা মূলং তথৈবেদং ন মনাগপ্যতিক্রমঃ

গ্রন্থবিস্তর সংক্ষেপমাত্রং ভাষা চ ভিদ্যতে॥ ১০ ॥

ঔচিত্যান্বয়-রক্ষা চ যথাশক্তিবির্ধীয়তে

কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা॥ ১১ ॥ (কথাসরিৎসাগর ১ম তরংগ)

"মূল যেমন, এও তেমন। একটুও অতিক্রম করা হয়নি। শুধু ভাষাটাই ভিন্ন। ঔচিত্য এবং পারম্পর্য যথাশক্তি রক্ষিত হ'য়েছে। রসহানি যাতে না হয়, তার জন্যেই কিছু কিছু যোজনা করা হ'য়েছে মাত্র।"

পদ্যবন্ধে রচিত হ'য়েছে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি। মহারাজ নরবাহনদত্তের চরিতকথা এই গ্রন্থের প্রধান কাহিনী হ'লেও উদয়ন-বাসবদত্তা, বিক্রমাদিত্য, পঞ্চবিংশতি বেতাল, সুরতমঞ্জরী, রত্নপ্রভা প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে আনুষংগিক আরো বহু কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। ২১৩৮৮টি শ্লোকে গ্রথিত সমগ্র গ্রন্থটি ১৮টি লম্বকে এবং ১২৪টি তরংগে বিভক্ত। লম্বক বা পরিচ্ছেদগুলোর নামও ভারী সুন্দর! যেমন, কথাপীঠ, কথামুখ, লাবাণক, নরবাহনদত্তজনন, চতুর্দারিকা, মদনমঞ্চুকা, রত্নপ্রভা, সূর্যপ্রভা, অলংকারবতী, শক্তিযশা, বেলা, শশাংকবতী, মদিরাবতী, মহাভিষেক, পঞ্চ, সুরতমঞ্জরী, পদ্মাবতী এবং বিষমশীল। ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলোর "তরংগ" নাম দিয়ে গ্রন্থের "কথা-সরিৎ-সাগর" নামটিই সার্থক ক'রে তুলেছেন বিদগ্ধ কবি। সত্যি, এই মহাগ্রন্থটি গল্পের সমুদ্রই বটে। আর, এই গল্পলেখার রীতিটিও অপূর্ব। "এ যেন একটি নায়কী ফ্রেমের মধ্যে আরেকটি ফ্রেম, তার মধ্যে আরেকটি, তার মধ্যে আরেকটি চলেইছে। আর, সেই একেকটি মধ্য ফ্রেমে আঁটা হ'য়ে চলেছে হরেক রকমের গল্প—অদ্ভুত সব গল্প। কী যে নেই তা'তে জানিনে। আরবী, পারসী, পশ্চিমী রূপকথা ও আষাঢ়ে গল্পগুলোর উৎপত্তিস্থল এই সংস্কৃত গল্প-কল্পনা—" এই কথা বল্‌ছেন জার্মান আচার্য ওয়েবর।

রামায়ণ মহাভারতের মত এই 'কথা-সরিৎ-সাগর'ও পরবর্তীকালের অসংখ্য কাব্য-নাটকের

উৎস। মহাকবি কালিদাস অবন্তীর বর্ষীয়ানদের সম্বন্ধে "মেঘদূতে" যে ব'লছেন—"উদয়ন কথাকোবিদান্ গ্রামবৃদ্ধান্", সেই "উদয়ন-কথা" এই "কথা-সরিৎ-সাগরের"ই একাদশ হ'তে ষোড়শ তরংগে লেখা আছে। কাদম্বরী, পঞ্চতন্ত্র, দশকুমারচরিত, স্বপ্নবাসবদত্তা, এমনকি আরব্যোপন্যাসেরও উৎস হ'চ্ছে এই মহাগ্রন্থ। এই "কথা-সরিৎ-সাগরে"ই আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের পূর্বাভাস মেলে।

এর রচয়িতা সোমদেব ভট্ট ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তাঁর পিতার নাম ছিল রামভট্ট। সাতবাহনবংশীয় রাজা বিদ্যোৎসাহী সংগ্রামরাজের পুত্র অনন্তরাজ ছিলেন কাশ্মীরের পরাক্রান্ত নৃপতি। ত্রিগর্ত (বর্তমান জলন্ধর) রাজকন্যা সূর্যবতী ছিলেন তাঁর প্রেয়সী ও মহিষী, যাকে বলা চলে —"গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়শিষ্যা ললিতকলাবিধৌ।" অশেষগুণবতী এই সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্যে কবিকুলমূর্ধন্য সোমদেব ভট্ট ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১০৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই "কথা-সরিৎ-সাগর" রচনা করেন। আর, তা'র তরংগমালাদর্শনে কতকাল ধ'রে মানব-হৃদয় ভাববিমুগ্ধ।

"নানাকথামৃতময়স্য বৃহৎকথায়াঃ সারস্য সজ্জনমনোম্বুধিপূর্ণচন্দ্রঃ।
সোমেন বিপ্রবরভূরিগুণাভিরাম-রামাত্মজেন বিহিতঃ খলুসংগ্রহোয়ম্॥
প্রবর্তিততরংগভংগিঃ কথা-সরিৎসাগরো বিরচিতোয়ম্।
সোমেনামলমতিনা হৃদয়ানন্দায় ভবতু সতাম্॥

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

—কিলো ভাব লাগল নাকি !

সরলা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে ।

—চ' ঘাটে যাই ।

—চলুন ।—বলে মৃগনয়নী ।

—একখানা গামছা আর শাড়ী নিতে হবে যে !

মৃগনয়নী বলে,—চান করবেন নাকি এত ভোরে ?

—আমি ভাই সকালেই চান করি । তোমার বুঝি অভ্যেস নেই ?

ঘাড় নাড়ে মৃগনয়নী ।

সরলা হাসে,—এখানে ভাই ননদিনী ঘাড় ধরে চান করবে ।

—কেন ?

—চান না করলে কিছু ছুঁতে দেবে না ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, বলবে, সোয়ামীর ঘরে রাত কাটিয়ে । বলতে বলতে বেদম হাসতে থাকে সরলা ।

মৃগনয়নীর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে । ঘরে গিয়ে একখানা কাপড় আর গামছা নিয়ে বাইরে আসে । সরলা ওর ঘর থেকে তেল নিয়ে আসে । মাথায় তেল ঘসে দুজনে ঘাটের দিকে চলে ।

—ফিরতে হবে সকাল সকাল ।—বলে সরলা ।

—কেন ?

—ঠাকুরঝি ওঠবার আগে । উঠে যদি দেখে বউরা বাড়ী নেই । অনর্থ করবে । মৃগনয়নী কথা বলে না ।

—ঠাকুরঝিকে তো চেনো না । দুদিন পরেই টের পাবে ।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে বলে । কি করতে হবে আমায় সব বলে দেবেন । নইলে জানব কি করে । না জানলেও বকবে ?

সরলা হাসে, ভয় নেই । আমি সব বলে দোব ।

একটু সময় চুপ করে থেকে সরলা বলে একটা কথা বলবি ?

সরলার তুই সম্বোধনে অন্তরের স্পর্শ পায় মৃগনয়নী । তাকায় ।

—কাল ন'ঠাকুরপো কি বললে ?

মৃগনয়নী চুপ করে পথ চলে । ঘাটে এসে পৌছয় ওরা । পুকুরের জলের ওপর একটা ঘন কুয়াশার আস্তরণ তখনও পাতলা হয়ে যায় নি ।

সরলা আবার বলে,—কিলো ? বলবিনি ?

মৃগনয়নী মুখটা নীচু করে বলে—কি আর বলবে ?

—তবু আমার নামে কিছু ?

অবাক হয় মৃগনয়নী—কই না তো !

—নিন্দে সুখ্যাত কিছু করলে না ?

—না। আপনার কথা কিছু হয়নি কি আর বলবে ?

—বলবে, আমি বাঁজা, আমার লক্ষ্মী ছিরি নেই। আমি সংসার উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি। আবার আক্ষেপ ! মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—বলবে। বলবে। কোলে একটি আসত। কেমন বলতো সবাই দেখতুম।

নিগূঢ় বেদনার কথা শোনায় সরলা। নোতুন মানুষকেই শোনায়। ওর সব চেয়ে বড় বেদনা কোথায়, সেটা নগ্ন করে দেখায়। দেখো, তুমি দেখো তুমি বিচার করে বলো ভাই। আমার বেদনার কি সীমা আছে ? একই অভিযোগের রূপান্তর মাত্র। শুনতে হবে মৃগনয়নীকে। ঘাড়ও নাড়তে হবে। আহা বলতে হবে। নয়তো নিজের ব্যাথার গাঁথা শোনাতে হবে। ব্যথার পুঁজি কিছু না থাকলে কি বলবে তুমি ? কি ব্যথা বেদনা নেই এমন মানুষ তো চোখে পড়ে না ওর। শুধু তাই নয়, সবাই ভাবে আমার কষ্টের সীমা নেই অন্য কেউ এ কষ্ট পেলে মরে যেত, ক্ষয়ে যেত। আশ্চর্য এইটেই যে কেউই মরে না। ক্ষয়ে যায় না।

একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয় ওর সংসারে বেদনার প্রয়োজন আছে। বেদনায় মানুষকে নীচে নামাতে পারে ঠিকই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই বেদনাই মানুষকে তার নিজের মর্য্যাদা দেয়। অনেক উচুতে ওঠায়। এ সব কথা বাবার কাছেই শেখা। বাবার অনুভবে কিছু কিছু অনুভব করা। বাবা বলতেন সংসারে যা কিছু অমঙ্গল বলে মনে হয়, তারও প্রয়োজন আছে মা। মঙ্গলের জন্যেই তার প্রয়োজন রয়েছে। ভাল মন্দ সুখদুঃখ ভগবানই দেন। এর কোনটিই বৃথা নয়, কোনটিই বাজে নয় মা। অবস্থাকে মাথা পেতে নিতে হয়। সবই যে তাঁর দান। বাবার কথাগুলো ঠিক তখন তখন বোঝা যায় না। এক একটা অবস্থায় পড়লে, এক এক মানুষকে দেখলে এক একটি কথা উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে মনের ওপর। সরলার সরল চোখদুটি জলে ভরে উঠেছে এরি ভেতর।

ধরা গলায় বলে—অনেক লাগানি ভাঙানি শুনতে পারি। ওরা বলতে জানে। বললে বিশ্বেস করবিনি, এক একটা কথায় আমার মাথার চাঁদি জ্বলে যেত। মাথায় গিয়ে জল দিতুম। পরশুই তো বললে তোর মেজাভসুর, ন'বৌয়ের যদি ছেলেপুলে না হয়, আমাকে আবার বিয়ে করতে হবে। বললুম করো। ওর হলেও তুমি বিয়ে করো। আমার একটুও কষ্ট হবে না। হাসতে লাগল বললে—সত্যি করতেও তো পারি। রাতটা তাই ঘুম হোল না। মাথাটা জ্বলে যেতে লাগল। মৃগনয়নী আবার ভয় পায়।

এরা তাহলে দুবার বিয়ে করতে পারে। পারে বইকি। বংশরক্ষার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন।

একথা তো কতকাল শুনে আসছে। যে মেয়ে মানুষ মা হলো না, সে শুধুই একটা মেয়েমানুষ মাত্র। স্ত্রীর মর্যাদা পাবে কোত্থেকে! তাই আর একটি মেয়েকে আনতে হয় তার স্ত্রী হবার যোগ্যতা আছে কিনা পরখ করতে। এমন তো হামেশাই হচ্ছে।

—হবে নাই বা কেন? লাউ কুমড়ো কিনতেও পয়সা লাগে। একটা মেয়ে আনতে পয়সা তো লাগেই না, বরং পয়সা পাওয়া যায়। তুই আসবার পর থেকে তোর মেজ ভাসুর যেন উথলে উঠেছে। আবার বিয়ে করবেই। করুক। এখন এর দাসী হয়ে আছি, তখন সতীনের দাসী হবো। ঝি হতেই জন্মেছিলাম।

সরলার গাল দুটোয় অনেক জলের দাগ।

স্নান সেরে নেয় ওরা। মৃগনয়নী কথা বলতে পারে না। সরলা আর কথা বলে না, ভিজে গামছা কপাল আর চোখ মোছে।

উঠোনে এসে পা দিতেই মৃগনয়নী শুনতে পায় কর্কশ এক গলা।

—বলি নোতুন বৌ নিয়ে কি পুকুর খুঁড়ে চান করে এলে?

মাথায় ঘোমটা ছিল তবু বুঝতে দেরী হোল এমন গলা ঠাকুর কন্তার ছাড়া আর—কার হতে পারে!

—বড্ড বাড় বেড়েছে মেজবৌ! ন'বৌকে পেয়ে বড্ড বাড় বেড়েছে। ইদিকে এসো। আজ তোমায় হেঁসেলে ঢোকাব। খোস গল্প উনুনের সঙ্গে বসে করাব আজ।

আজও কয়েকজন আত্মীয় কুটুম বাড়ীতে খাবে। মঙ্গলার মারই রাঁধবার কথা ছিল। প্রমদাসুন্দরী মঙ্গলার মাকে বলতে যায় আজ আর রান্না করতে আসতে হবে না। দিনভর হেঁসেলে রেখে ও জব্দ করবে সরলাকে।

সরলা নিরুত্তরে মৃগনয়নীকে টেনে গিয়ে ঘরে চলে যায়। প্রমদা ওঠে। মঙ্গলার মার কাছে যাবে। বুড়ী শাশুড়ী বেরিয়ে আসে,—বলি অ, সুন্দরী, চল্লি কোথা? ইদিক পানে আছে। দুটো মিষ্টি খেয়ে একটু জল গলায় ঢাল দিকি।

—আজ মেজ বৌ হেঁসেলে যাবে।

—তা কখনও হয়। মঙ্গলার মা রাঁধুক আরও দু'চাটে দিন।

—না। খবদ্দার তুমি বৌদের নাই দিও না মা।

বলতে বলতে বনবিহারী ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ী ঢোকে। দুজনের দুহাতে মাছের থলি মাছ নামায়।

—কি হোল আবার? বলে ছোট দেওর।

প্রমদা ডাকে, মেজ বৌ! বলি অ মেজ বৌ!

মাছ ঢালে দুভাই। বড় বড় পুঁটি প্রায় সের আষ্টেক।

মেজবৌ কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে বাইরে আসে।

—ওই সব মাছ তুমি কুটবে। উনুনে আগুন দাও, ভাত চড়িয়ে মাছ কোট, বাটনা বেটে নাও। জলও তোমায় এনে নিতে হবে। সব তোমাকে করতে হবে।

বনবিহারী চুপ করে সরে দাঁড়ায়' প্রমদার আদেশের ওপর কে কথা বলবে ?

ছোট দেওর একটু মুচকী হেসে বলে নাও কুটতে লেগে যাও।

টিট্‌কিরী অকারণে। প্রমদাকে একটু খুসী করতেই হয়তো বা।

সরলা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। ও জানে এ আদেশ অমোঘ, এর ব্যতিক্রম করবার ক্ষমতা এ বাড়ীর কারো নেই। বুড়ী শাশুড়ীও প্রমদার মূর্তি দেখে আর কথা বলতে সাহস পায় না।

মাছের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে সরলা।. এত মাছ কুটতে হবে, ওদিকে ভাত পুড়ে গেলে চলবে না। বাটনা বাটতে হবে। কিন্তু রান্না তাড়াতাড়ি চাই। কি করে করবে সরলা ? করতেই হবে। কালো মসৃণ গালের ওপর গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল।

প্রমদা এগিয়ে আসে,—যাও জল তুলে গিয়ে এসে ভাত চড়িয়ে দাও।

একটা ঠেলা মারে কাঁকালে।

মৃগনয়নী ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল। ওর কান দুটো আগুনের মত গরম হয়ে ওঠে। জমিদার কন্যা মৃগনয়নী। ওর ধমনীর সেই রাজসিক রক্তস্রোত গরম হয়ে ওঠে। সটান উঠোনে নেমে পড়ে ও।

সরলাকে বলে একটু জোরে সকলকে শুনিয়ে,—তুমি জল আনতে যাও মেজদি। আমি মাছ কুটে দিচ্ছি। বাটনাও করে দোব।

প্রমদা এতদিন এ সংসারে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে ছিল। সরাসরি সেই ব্যক্তিত্বের দম্ভে আঘাত করেছে আজ মৃগনয়নী। এই প্রমদার দ্বিতীয় আঘাত।

কি জানি কেন ও মৃগনয়নীর সামনে এসে কিছু বলতে সাহস পায় না। মৃগনয়নীর কণ্ঠস্বরে এমন এক গাম্ভীর্য ছিল যা ওর আদেশের গাম্ভীর্যকে অনেক হালকা করে দিয়েছে। এ গাম্ভীর্য মৃগনয়নীর রক্তে আছে। ওর বংশে সকলে আদেশ করেই এসেছে, আদেশ কখনও শোনেনি।

—বঁটিটা কই মেজদি ?

চোখ দুটো জলে ঝাঁপসা হয়ে গেছে। মৃগনয়নীর আজকের এ রূপ প্রাণভরে দেখতেও পারছে না সরলা।

মৃগনয়নীর কণ্ঠে সহজ কঠোরতায় সবাই বুঝছিল যে এ আঘাতের প্রত্যুত্তর দিতে প্রমদা পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

সরলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল দ্রুতপায়ে। ওর অনেক চোখের জল আজ আর বাধা মানছে না। প্রতিবাদ করবার মত এক শক্তির আবির্ভাব দেখে আনন্দে বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে উঠছে ওর।

বুড়ী শাশুড়ী এগিয়ে এলেন। কুঞ্চিত মুখের ভাঁজে ভাজে বেশ খুসীর আমেজ।

—ওই যে হোথায় আঁশ বঁঠি।

বড় আঁশ বঁটিখানা টেনে নিয়ে মাছের স্তূপের কাছে বসে পড়ে মৃগনয়নী। বনবিহারী মুখটা শুকনো করে ভয়ে ভয়ে একবার প্রমদার দিকে তাকায়। তারপর বেরিয়ে যায়।

ছোট দেওর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। আজ কি হবে কে জানে।

প্রমদা উঠে গিয়ে দাওয়ায় বসল। একটা কথাও বলল না। বুকের ভেতর ওর একরাশ বরফগোলা জল ঢেলে দিয়েছে যেন। সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা ভয় ভয় ভাবখানা। নিজেই বুঝতে পারছে না প্রমদা তার এ কি হোল।

একটা বাচ্চা বউ। ওকে তো চেলা কাঠ দিয়ে পেটালেও এ বাড়ীতে কেউ কিছু বলবার নেই। তার এত স্পর্ধা? এটা দুঃস্বপ্ন নয় তো?

মৃগনয়নী মাছ কুটছে। ওদের বাড়ীতে আধমণ মাছ রোজই আসে। এই কটা মাছ দেখে ভয় পাবার মেয়ে মৃগনয়নী নয়! নায়েব মশাই বাজার সকাল সকাল এনে ফেললে তাকে পুঁটিকে সব মেয়েকেই মাছ কুটতে বসতে হোত। এ মাছ তো সে মাছের কাছে কিছুই নয়! মৃগনয়নী গরম হয়ে রয়েছে তখনও। খচাখচ মাছ কুটে চলেছে।

প্রমদা ঘরের ভিতর গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বুড়ী চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন।

—এই না হলে আর কাজের বৌ!—বলতে বলতে মৃগনয়নীর মাথায় একটা হাত রাখেন বুড়ী। হাতখানা কাঁপে। খুব আস্তে বলেন,—সুখী হও মা! তুমি আমার লক্ষ্মী বৌ।

সাত

হৃদয় বারিক চলে যাবে আজ। মৃগনয়নীর সঙ্গে দেখা করতে এলো যাবার আগে। মৃগনয়নী বসে ছিল ওর ঘরে। সরলার সঙ্গে এল হৃদয় বাইরে থেকে। প্রমদাসুন্দরী আজ সকালেই বলে দিয়েছে হৃদয়কে, বোল তোমাদের কত্তাকে, ছ' মাসের ভেতর বৌয়ের যাওয়া হবে না।

পাঁচটা কাটা আঙুল মুখের ভেতর একবার বুলিয়ে নিল হৃদয়। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরোল।

তাই দেখা করতে এসে প্রথমেই হৃদয় কোন কথা বলতে পারলে না। মনটা ওর ভারি ছিল সকাল থেকে। কিছু কিছু দেখে কিছু কিছু শুনে ওর ধারণা হয়েছিল যে মৃগনয়নী খুব সুখের ঘরে পড়েনি। বিশেষ করে প্রমদাসুন্দরীর সানাইয়ের পোঁ ধরার মত গলাটা বাইরে বসেও শুনতে পেত হৃদয়।

মৃগনয়নীর কানেও সব কথা এসেছিল। বলেছিল সরলা,—ননদিনী কি বলেছে শুনেছিস্?

—না তো?

—তোর বাপের বাড়ী যাওয়া ছ' মাস বন্ধ।

মৃগনয়নীর কাণের ভেতর দিয়ে কথাটা পৌছতে একটু দেরী হল যেন।

আর একবার বললে সরলা,—ছ' মাস আটকেছে। আমি অবশ্যি তোর ভাসুরকে বলবো। এমন অন্যায় অত্যাচার চলবে না।

বুদ্ধিতে কথাটা পৌঁছে মনে গিয়ে ধাক্কা খেল, সঙ্গে সঙ্গে এক মন্থর ছ'মাসের ছবি ভেসে উঠল মৃগনয়নীর মনে। ছ'মাস এ সংসারে থাকবার ছবি। অনেক মন ভারি; বিরাট এক ভয় ওকে কোথায় নামিয়ে দিল ও যেন টেরই পেল না।

—দেখি তোর ভাসুরকে বলে, কি বলে?

পাণ্ডুর ঠোঁটদুটো ফাঁক হোল একটু হাসবার চেষ্টায়। ও বুঝল সেদিনের প্রতিশোধ নিলে প্রমদাসুন্দরী। তাকে এবার এমন এক আঘাত করেছে, যা তার পক্ষে দুঃসহ হয়ে যে উঠবেই একথা চোখ না বুঝেই ভাবা যায়।

বাবার মুখখানি মনে আনবার চেষ্টা করল মৃগনয়নী। সেই প্রশান্ত হাসি মুখ। বাবা কথাটা শুনবেন, শুনে একটু হাসবেন। কর্তাবাবু শুনবেন, ভেতরে গরম হয়ে উঠবেন। মা শুনবে, কর্তামা শুনবে, পুটি শুনবে, তরঙ্গিনী শুনবে।

আবার বলবে সবাই, হতভাগীর বরাতটাই খারাপ।

এমন পোড়া কপাল দেখিনি বাপু, অষ্টমঙ্গলের গাঁট খুলতেও ছাড়বে না।

কেমন বে আক্কেলের ঘরে পড়ল গা! নোতুন বিয়ের পর কেউ শ্বশুর বাড়ী ছ'মাস থাকতে পারে!

স্পষ্ট শুনতে পেল মা মাসীদের আলোচনা।

ওর ইচ্ছে হোল বলে,—পারে। মৃগনয়নী পারে। ছ'মাস কেন ছ'বছরও থাকতে পারে।

আবার কথাটা মনে হয়, শান্তি যদি চাও মা, নিজের দোষ দেখো। পরের দোষ দেখো না। সত্যিই তো সে পরের দোষ দেখতে গিয়েছিলো। নিজের দোষ তো দেখেনি! নোতুন বৌ হয়ে ব্যবহারে আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল তার! তাই কি? মন যে সায় দেয় না। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, ঠিকই করেছে। সে কারো দোষ দেখেনি। শুধু মাত্র যা ন্যায় তাই বলবার চেষ্টা করেছে। এর জন্যে যে কোন কষ্ট সে সইতে পারবে। সে জানে একটুও অন্যায় করেনি।

মনে এক অভাবনীয় শক্তি এসে পড়ে। পরের দোষ সে দেখবে না। কিন্তু অন্যায় দেখে চুপ করে থাকতেও বাবা বলেননি কখনও। সোজা হয়ে দাঁড়ায় মৃগনয়না।

হৃদয় এসে দাঁড়াল। যেন সহজভাবে হেসে বললে মৃগনয়নী,—চলে যাচ্ছ হৃদয়দা'!

হৃদয় মৃগনয়নীর মুখে হাসি দেখে অবাক হয়ে যায়।

—যা দেখলুম, সবই কি বলব?

মৃগনয়নী হাসে,—সব বলা কি ভাল? সেখানকার সব কথাই কি এখানে বলা যায়।

—শুনেছ? হৃদয়ের গলাটা ধরে যায়।

—কি হৃদয়দা?

—ছ'মাস তোমার এখানেই থাকতে হবে,—হৃদয় অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

মৃগনয়নী খুব সহজভাবে বলে,—সে তো জানি।

—তুমি জান?

—হ্যাঁ। বারে বারে যাওয়া আসা কত অসুবিধে বলোত ? কাছাকাছি পথ তো নয় ?

হৃদয় চোখ দুটো বড় বড় করে বলে,—তাই বলে ছ'মাস ?

মৃগনয়নী বলে,—আস্তে ! কেউ শুনতে পাবে।

—শুনুকগে !

—তুমি কিন্তু মিছামিছি রাগ করছ হৃদয় দা'! এদের কোন দোষ নেই।

টুণ্ডো হাত দুখানা চেপে বলে হৃদয়,—তুমি একথা বলচো ?

—তা বলব না ? এরা তো বড়লোক নয় ! বারে বারে আমাকে একটা আনবার খরচা আছে, সেটা ভুললে চলবে কেন ?

হৃদয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মৃগনয়নী মুখটা নীচু করে চলে,—মাকে বোল--

এইখানে ওর গলাটা একটু ধরে আসে। হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে॥

—মাকে বোল। আমি ভাল আছি।

হৃদয় আবার অবাক হয়। বলে কি মেয়েটা ! সে যে কিছু কিছু নিজে চোখেও দেখেছে।

—আর বাবাকে বোল—

হৃদয়ের বড় বড় চোখ দুটো নিস্তব্ধ হয়ে আসে।

মৃগনয়নীর মুখে হাসি,—বাবা যেন আমাকে দু' একটি চিঠি দেন।

—বলবো।—হৃদয় সহজ হয়ে এসেছে। হৃদয় বোঝে ও রামতারণের কন্যার সঙ্গে কথা বলছে। নইলে এত গভীর জলের ওপরে আনন্দে পাল তুলে ভাসতে পারত না।

মৃগনয়না বলে,—আচ্ছা হৃদয়দা', পুঁটি নিশ্চয়ই এসেছে।

—তা বোধহয় এসেছে।

—দিদিও আসবে !

—আসবে তো বটেই। এখানকার মত—

—আঃ ! চুপ করো বার বার বলছি !

হৃদয় চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,—তবে যাই।

মৃগনয়নী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হৃদয় ঘর থেকে বেরোয়। পোঁটলাটা নিয়ে সদর দোরের সামনে যায়। প্রমদাসুন্দরী বাইরে এসেছে। সরলাও। হৃদয় কারো সঙ্গে কথা বলে না। একবার পিছন ফিরে তাকায়। মৃগনয়নীর ঘরের দোর ভেজানো। মৃগনয়নী বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখছে।

দেখছে, হৃদয় চলে গেল।

চলে গেল।

সরলা ওর ঘরের দিকে আসছে। মৃগনয়নীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। ছোট চৌকো জানলাটার কাছে যায়। জানালার সামনে যে সবুজ কলাপাতাটি বাতাসে দুলত, সেটি আজ কেটে নিয়ে গেছে।

ঘরের দোর খোলার শব্দ হয়। মৃগনয়নী হাতের উল্টো পিঠে দিয়ে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি মুছে নেয়।

(ক্রমশঃ)

অথ জীবন-জিজ্ঞাসা

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

আজ চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে অমানিশার গভীর অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীর বুকে। সুস্থ প্রাণের স্বতস্ফুর্ত, নির্ম্মল আনন্দধারা হারিয়ে গেছে শুষ্ক জীবনের বিরস চলার পথে। এই সংসার প্রতিনিয়ত মানুষকে হীন অসহায় পশুত্বের স্তরে নিয়ে চলেছে। ছলে, বলে অথবা কৌশলে জীবনের ভিতকে পাকা করবার সাধনা যজ্ঞে অল্পবিস্তর ঘুরে মরছে। মনে হয় যে পৃথিবী, মানুষের সমাজ সব যেন জড় বস্তুপুঞ্জের প্রবল নর্ত্তনে অন্ধবেগে ছুটে চলেছে। এর পিছনে দৈবী প্রেরণা বা মনুষ্যত্বের দাবী নেই। জৈবিক প্রেরণা ও অন্ধপ্রবৃত্তির ঝোঁকে এদের জীবন বয়ে চলেছে। আজ সবাই অল্পবিস্তর প্রয়োজন সাধক, নিজের তথাকথিত প্রয়োজনের গণ্ডী ছাড়িয়ে এদের ভাবনার ইচ্ছে বা অবসর নেই। সারাক্ষণ নিজেকে কেন্দ্র করে তার অফুরন্ত বাসনা ও লোভের ইন্ধন সংগ্রহ করবার জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সরল শিশুমন বিষিয়ে গেছে ব্যবসায়ী চাতুরীতে। শৈশব থেকে মৃত্যুর শেষ প্রহর পর্য্যন্ত এরা দেখে যায় ভদ্রতার অন্তরালে হীন কপটতা, মিথ্যার ষড়যন্ত্র, তথাকথিত সভ্যতার দারুণ অভিশাপ। এই সমাজে প্রাণের পূজা নেই, নেই চিরবহ্নিমান বিবেকের দীপশলাকা। মৃতের সমাজ মৃতেরা বহন করে চলেছে। অন্ধলোভ ও কামুকতার সকল ইন্ধন ও তার পূজার ভোগ নৈবেদ্য পরিবেশ করছে সমাজের ওপর তলার বাসিন্দারা। সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায় সব এদের কাছে সিদ্ধির উপর নির্ভর করছে। জীবনে সফল হওয়াই এদের মূল আদর্শ। এই সফলতার নিক্তিতে জীবনের সমস্ত মূল্য এরা বিচার করে। এদের মতে সততা ও সত্য পথ দিয়ে বারবার বিফলতাকে বরণ করতে হয় তবে তাকে ধরে সহমরণ করা মূর্খতা। জীবনে কোন আদর্শ বা নীতির প্রতি এদের বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা নেই, কার্যসিদ্ধির জন্য যে কোন পথ ধরে চলতে বাধা নেই।

তারা মনে প্রাণে চতুর হবার সাধনা করছে। অপরকে ঠকিয়ে এরা ইহলোককে পাকা করছে, পরলোককে ফাঁকি দেবার মতলবে দেউল, মন্দিরের ভিত স্থাপনা করছে। এদের অন্তর ও বহির্জগতের ভিতর কোন বিরোধ নেই। উভয়কে এরা ফাঁকি দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এর ফলে এদের অন্তর বাইরের প্রবৃত্তিকে সদাসর্বদা সায় দিয়ে চলেছে আর বাইরের চতুর জীবিকা এদের অন্তরকে প্রবোধ দিয়ে তাকে বিশ্বস্ত সহচরী করে তুলেছে। শুধু খাও, দাও, স্ফুর্ত্তি করো— এই হোল এদের জীবন নিশানা। এদের স্ফুর্ত্তি ক্ষণকালে ঝিমিয়ে পড়ে অবসাদের আবেশে। ক্লান্তিও জীর্ণতার ভারে নুইয়ে পড়ে এদের জীবনপাত্র। এদের স্ফূর্তির পিছনে আনন্দের আবেগ নেই আছে শুধু জৈবিক উন্মাদনা। এদের অর্থহীন প্রলাপ ও লক্ষ্যহীন উন্মাদ উল্লাসের অন্তরালে ধ্বনিত হয় অসহায় আত্মার নিস্ফল ক্রন্দন। এদের হাসির পিছনে বিষাদের ছায়া লুকিয়ে রয়েছে। দূর থেকে ওদের অট্টহাসি বিরাট আর্ত্তনাদের মতন শোনাবে।

এই সমাজের অপর অঙ্গনে যারা কোন আদর্শ ধরে সারাজীবন চলবার চেষ্টা করেছে তাদের

দুঃখের সীমা নেই। দুঃখ ও বেদনাকে চিরসাথী করে এদের চিরকাল চলতে হবে। যারা দুঃখের অনিবার ঝাপটা এড়িয়ে অল্প আয়াসে সুখের সপ্তম স্বর্গে বাস করবার কল্পনা করছেন তারা সহজ পথের পথিক নয়। তারা মিথ্যার, কপটতার বাঁকা পথের নিত্য যাত্রী। সংঘাতের বহ্নিস্রোতে, জড়তামসিকতার বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রাম করে, জীবনের পলে পলে বেদনার অশেষ জ্বালা বহন করে জীবন ও সত্যকে অনুভব করতে হবে। আজীবনের ত্যাগের মহিমা ও অবিচল নিষ্ঠার উপর সত্যের মূলবোধ নির্দ্ধারিত হবে। চিরকল্পিত আদর্শকে জীবনে রূপায়ণ করবার কোন সোজা 'সর্টকাট্' নেই। জীবনবেদকে অস্বীকার করে, তাকে সদাসর্বদা দূরে রেখে শুধু চালাকির পথে অর্থবোধ বা 'নোট' মুখস্থ করে পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। চোখ মেলে দেখো ব্যক্তি বা জাতির ইতিহাসের প্রতি অগ্রগামী পথ বহুলাঞ্ছিত ও বেদনারঞ্জিত। কত অজানা বীর শহীদ নীরবে নিভৃতে নিজের পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমানায় অথবা দেশ ও সমাজের বৃহত্তম ক্ষেত্রে আপন বুকের রক্ত ঢেলে ভবিষ্যতের পথ তৈরী করে চলেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে দুঃখ বেদনা কি জীবনের প্রথম ও শেষকথা, তাহার চরম অভিজ্ঞতা? এই ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে চিরমুক্তির পথের সন্ধান প্রতি যুগ তাহার চরম সময়োপযোগী আদর্শ মহান ব্যক্তির জীবন ও সামাজিক সংগ্রামের ভিতর তুলে ধরেছে।

জীবন জিজ্ঞাসুর মনে দ্বন্দ্ব এল। সে দেখল এতদিন ধরে নিষ্ঠার সাথে আদর্শকে পূজো করে নিজের প্রাণকে করেছে অনাদর। রুক্ষতায় ভরে গেছে জীবনপাত্র। প্রকৃতিকে করেছে অবহেলা, উপেক্ষিতা প্রকৃতি তাই আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে; জীর্ণতায় ভেঙ্গে পড়েছে তার শরীর মন। কঠিন পথে চলতে গিয়ে সে ভুলেছে তার সহজ গান, প্রাণের আরাম। সংসারী, পাকা লোক তাকে বুঝিয়ে বলল "প্রথমে বেঁচে ওঠ, নিজের ঘর সামলাও তারপর আদর্শ নিয়ে বিলাস কর। প্রথমে আত্মত্রাণ, তারপর সময়ও সুযোগ বুঝে বিশ্বত্রাণের উপরে নজর দেবে।" জীবন জিজ্ঞাসু বিভ্রান্ত হোল. মনে সংশয়ের দোলা লাগল। আত্মবিশ্বাসের ভিত কেঁপে উঠল। জীবনকে ভুলে তার নজর ষোল আনা পড়ল জীবিকার উপর। সে ভাবল প্রথমে বেঁচে উঠি। শিরায় শিরায় রক্তের প্লাবন বইতে শুরু হোক তারপর রঙ্গিন আদর্শ সম্বন্ধে ভাবা যাবে। দেখতে দেখতে সে জীবিকা-সাধন যজ্ঞে মেতে উঠল। সদাগর ব্যবসায়ীমহলে সে কিছুদিন পাঠ নিল। সেখানে তার চোখে পড়ল তাদের একমাত্র মন্ত্র হোল ছলে কৌশলে যেভাবে পারো টাকা কামাও, পুঁজি বাড়াও। দিন রাত তারা টাকার হিসেব করছে। টাকার নিক্তিতে সারা দুনিয়ার মূল্য বেঁধে দিচ্ছে। তার চোখে সবাই অন্নবিত্তর প্রয়োজন-সাধক, নিজেদের ছোট ছোট দাঁড়িপাল্লায় পৃথিবীর সব কিছু ওজন করে তার মূল্য বেঁধে দেন। জীবনের পরিধি এদের কাছে জ্যামিতির আঁকা ছকমাত্র। এই নিত্যনৈমিত্তির জগৎ, এদের চোখ বাইরের জগতে কদাচিৎ পড়ে। ঐ দূরে দিগন্তপ্রসারী সবুজ প্রান্তর,নানারাঙা মেঘমালা, অস্তগামী সূর্য্যের শেষ চাওয়া, সঙ্গীতের নির্ঝরধারা সব এদের মহামূল্য বাস্তবজীবনে অপ্রয়োজনীয় তথা নিরর্থক ও নিছক ভাববিলাস বলে পরিত্যাজ্য। ব্যবসায়ীদের মহলায় টহল দিয়ে জীবন জিজ্ঞাসু অস্থির হয়ে উঠল। সে দেখল জীবিকার লোভে সে জীবনকে হারাতে বসেছে।

অন্ধ কামনা তাকে ক্রমশঃ অন্ধকার পৃথিবীর তীরে নিয়ে চলেছে। সে এতদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ, মিথ্যার সাথে মিতালী, পাটোয়ারী বুদ্ধির কৌশলে সে এতদিন নিজেকে শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু বাঁচতে শেখেনি।

নীরস জীবন ঘড়ির কাঁটার মতো দুলছে। ভিতরকার মানুষ আপন গোপনকক্ষে চিরবন্দী। বাইরের পোষাকী মানুষের কঠিনভারে সে তার সত্ত্বাকে চিরতরে হারাতে বসেছে। মাঝে মাঝে নকল সাজসজ্জার আভরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে প্রাণের কান্না। হাটে বাজারের অনুক্ষণ কলরবে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় কান্নার ধ্বনি বেদনাহত তরঙ্গ। জীবন-জিজ্ঞাসু চোখ মেলে দেখে সে মানুষের সরস হৃদয়, দরদ, ঐকান্তিকতা সব ধূলোতে মিশে গেছে। বীরের শৌর্য,—আত্মত্যাগের সুতীব্র শলাকা তার সম্মুখে অমৃতের দুয়ার উন্মোচন করেনি। প্রেমের দেবতা তার মৃত হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে নতুন করে বাঁচবার পথের ইঙ্গিত দেয়নি।

"How can Love, one of the greatest lords of life, take its freedom from the hands of society any more than Death, the other can do so? ......Love and death......only these two powers are comparable in majesty. The power of great love to enhance a person's value for mankind can only be compared with the glow of religious faith or the creative joy of genius, but surpasses both in universal life-enhancing properties. Sorrow may sometimes make a person more tender towards the sufferings of others, more actively benevolent than happiness with its concentration upon self. But sorrow never led the soul to those heights and depth, to those inspirations and relations of universal life, to that kneeling gratitude before the mystery of life, to which the piety of great love leads it."

প্রেম ও মৃত্যুর অমৃতময় পরশ আমাদের মনে যে গভীরতা ও শাশ্বত জীবনের অনন্ত পটভূমিকা উন্মুক্ত করে সেই অবারিত উদার দিগন্ত আমাদের নৈমিত্তিক প্রয়োজনের ছোট দেয়ালে ঘেরা জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হবে? আজ আমাদের জীবনধারা বহুখণ্ডিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন তার সমতা ও স্থির লক্ষ্য নেই। পশ্চাতে মৌন অতীত বিরাজ করছে। সম্মুখে নৈরাশ্যময় অন্ধকার ভবিষ্যৎ বিস্তৃত, তাই মাঝে ছকে বাঁধা গোলকধাঁধাতে সাধারণ জীবন অবিরত ঘুরে মরছে। আজ আমাদের জীবন এতো আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থের জালে আবদ্ধ তার বাঁধন ছিন্ন করে বাইরে বিশ্বজোড়া সদা প্রবাহমান ইতিহাসের মহাস্রোতের সাথে ভেসে চলার আনন্দ ও অধীর আবেগ কারুর নেই। আছে শুধু নিজেকে ঘিরে অন্ধকামনার রঙীন স্বপ্ন-জগতে বিচরণ করা। এই হাওয়ার ওপর ভাসা হাল্কা, লঘু জীবনের কাছে সব আদর্শ অর্থহীন, পৃথিবী চির অজ্ঞাত ও অপরিচিতা। দুঃখ বেদনার দারুণ অগ্নিবাণে, শোকের কঠিন আঘাতে মাঝে মাঝে আমাদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায়, প্রয়োজনের তাগিদে গড়া বদ্ধ দেয়াল ধসে পড়ে। আমাদের দৃষ্টি পাড়ি দেয় সীমাহীন আকাশে অনন্তলোকের সন্ধানে। পরিপূর্ণ জীবনকে অনুভব করতে হলে আমাদের অহঙ্কারের আত্মকেন্দ্রিক দুর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ ধূলিসাৎ করতে হবে। সেই পীড়িত অন্ধ ছোট আমিকে কোণের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে করতে হবে চিরমুক্ত। জীবন করতে হবে প্রসারিত। আমাদের চির অভিমানী, গর্ব্বিত আমিকে তার স্বকল্পিত স্বর্গ থেকে করতে হবে চিরবিদায়। নৈরাশ্য অবসাদ বারে বারে আশাভঙ্গের পথ চিরে আমাদের কাছে প্রকাশ হোক প্রভাতের জ্যোতির্ময় দিগন্ত।

পরিক্রমা

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

মনে হয় একেও ছাড়িয়ে যাই, এই মাঠ ঘন ঝাউ-বন—
উথাল-পাথাল করা ঢেউ ঢেউ নদীটির শ্রাবণী-প্লাবন ;
ভোমরা কাজল-আঁকা শিশির-সোহাগ মাখা, আধফোটা ফুলে,
সোনা-ঝরা তার রোদ, আলোছায়া ঝিলমিল কত ঢেউ তুলে,
নিয়ে এল, রামধনু-ঝলোমলো, সাতরঙা বর্ণ-মৌসুমী ;
চোখ তুলি হয়তো, হয়তো বলি : অপরূপ, অপরূপ তুমি।

সত্যিত' অপরূপ, তোমার ও ঝাউবন, কচিঘাস-ফুল,
আষাঢ় অথৈ মেঘে কঙ্কাবতীর কালো ঘন এলো চুল
আজও যেন উড়ে আসে। রাই-ষোড়শীর না-বলা ব্যথায়,
এখনো আকুল হই। দু'চোখে অঝোরে কত কান্না ঝরে যায়।

এখনো আমার চোখে, তুমি রোজ স্বপ্ন নিয়ে আস —
তোমার বুকের মধু কী করে বোঝাই বল, শুধু বলি, তুমি ভালবাস ॥

জানিনা তবুও কেন মাঝে মাঝে আনমনা কাজের প্রহরে,
অন্য এক আমাকেই কী এক আলোকে যেন ধুধু মনে পড়ে—
মনে হয়, তোমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে কী জানি বা দেশ অন্য কোনো—
আমাকে প্রত্যহ ডেকে বলে যেন 'কই তুমি এলেনা এখনো।'

এইটুকু। দুধ সাদা সে পৃথিবী কোথায় হারিয়ে যেন যায়,
উতল ফুলের রেণু দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ে, প্রগলভ-হাওয়ায়,
ওঠা নামা গেঁয়োপথে, নদী-মাঠ ঘাস-ফুল ঝাউ বনে বনে,
নয় তো ছিলেম আমি, হয় তো বা কোন রাতে মেঘের কাঁকনে।

আমার এ বাউল মন, প্রথম-বাসর-জাগা কুমারীর চোখে—
অবাক বিস্ময়ে আজো, চুপে চুপে চেয়ে দেখে, হে মাটি তোমাকে।

আমার একান্ত তুমি তোমাকেই সরিয়ে যে তবু যে আবার—
আর এক পৃথিবী চাই ; হয় তো আজই শেষ তোমার : আমার।

দূর নক্ষত্র

অসীম সেন

তোমার কথা ভাবিব না কতবার ভেবেছি মনে মনে
যে সকাল গেছে চ'লে যে ছবি আঁকা আছে হৃদয়ের কোণে
সে'দিন তো ভুলে যেতে চাই সে' মন হারাক অন্ধকারে
কে আর বেদনা জাগায় বল অযথা হৃদয় কারাগারে।

তুমি যেন দূরতর নক্ষত্রের মত করুণ ছলছল
তুমি তো দেবে না আলো জানি আমার এ পৃথিবীর
বিমর্ষ অন্ধকারে। কেন তবু বেদনা জাগাও বল বল
দূরতর ছবি এঁকে অযথা ডেকে আনো নয়নের জলও।

এ স্বপ্ন ভুলিতে চাই এ'মন হারাতে চাই আমি
তারার ঐ নীল চোখ শুধু শুধু বেদনায় ছেয়ে দেবে জানি
তবু তুমি কেন ডাকো দূরতর নক্ষত্রের আলো
তোমার ঐ নিঃসীম বেদনার চেয়ে বোবা মন ভালো।

ধূসর বেদনা ঝরে ঝরে ধূপছায়া ম্লান পৃথিবীতে
নিঘুম বাতাসে শব্দ শুনি ক্ষীণ আলো সুদূর স্মৃতিতে
সে মেঘের চূর্ণ চুল নরম ঠোঁটের হাসি নয়ন কাজল কালো
দেখালে তুমি তো মনে অতন্দ্র শ্রাবণে দূরতর নক্ষত্রের আলো।

আলোচনা

রবীন্দ্রসঙ্গীত 'লয়' বৈশিষ্ট্য

"স্বরের উদয়াস্ত কাল ব্যাপিনী ক্ষমতার নাম লয়।"[১] অর্থাৎ সঙ্গীতের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত গীত বা বাদ্যের নিয়মিত পরিমাণ সংরক্ষণই হল 'লয়'। লয়ের গতি,—ইংরাজীতে যা'কে Tempo বলে তা' তিন প্রকার,—দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে এরই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

"দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ।
দ্বিগুণো দ্বিগুণো জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্য বিলম্বিতৌ ॥[২]

অর্থাৎ দ্রুতের দ্বিগুণ কালে মধ্য এবং মধ্যের দ্বিগুণ কালে বিলম্বিত লয়।

সঙ্গীত মাত্রেরই লয় থাকবে। প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, সাধারণ ভাষায় যা'কে কালোয়াতী বলা হয়ে থাকে, তারও লয় রেখে গাওয়া হয়। কিন্তু এই গানের লয় গায়কের ইচ্ছার উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। এখানে কোনও গান যে কোনও লয়েই গাওয়া সম্ভব। ঠিক এইখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে কালোয়াতী গানের একটা মস্ত প্রভেদ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর, ও সেই সঙ্গে তা'র তাল ও লয় প্রতি গানখানিতেই তার আপন বৈশিষ্ট্য সঙ্গে ক'রে এনেছে। সেখানে গানের সুর, তাল বা লয়, কালোয়াতী গানের মতন গায়কের ইচ্ছানুবর্তী নয়। সেখানে দুটি' পৃথক গানের একই সুরে বা একই তালে রচিত হয়েও বিভিন্ন লয়ে রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত—রস পরিবেশনের আদর্শে,—গায়কের ইচ্ছামত রস পরিবেশনের জন্য নয়। দেশ সুরের কাঠামোতে রচিত **আমার এ ঘরে আপনার করে** অথবা **বাদল মেঘে মাদল বাজে**, ইমন সুরে **আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো** অথবা **চিনিলেনা আমারেকি** যখন বিলম্বিত লয়ে পরিবেশিত হয় তখন সেই দেশ সুরে **এসো শ্যামল সুন্দর** বা **মোর হাতে ছিল হাসির ফুলের ভার** বা ইমন সুরে **একদিন চিনেনেবে তারে** অথবা **খোলখোল দ্বার** দ্রুত লয়ে গীত হয়ে থাকে। এমনি অজস্র উদাহরণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে চোখে পড়ে এবং এই লয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচার করে দেখলে কালোয়াতী গানের সঙ্গে একটা নীতিগত পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

এখন, কেন এই পার্থক্য হল,—একথা পর্য্যালোচনা করতে হলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসসৃষ্টির পদ্ধতি বিচারের সঙ্গে সঙ্গে কালোয়াতী গানের পদ্ধতির তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

---

১ সঙ্গীত চন্দ্রিকা। ১ম খণ্ড: গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ সঙ্গীত দর্পণ।

কালোয়াতী গান একান্তভাবে সুরের ওপর নির্ভরশীল। সুরের যথানির্দিষ্ট রূপসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তালের মাধ্যমে স্বরের কৌশলী বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে কালোয়াতী গানের উৎকর্ষ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর ছাড়াও দ্বিতীয় অংশ আছে সেটি তা'র ভাষা। সুরের যেমনি আছে তাল, ভাষার তেমনি ছন্দ। সুরের অর্থ যথানির্দিষ্ট হয়েই আছে কিন্তু ভাষার বিন্যাসে অর্থের পরিবর্তন নিতান্তই স্বাভাবিক তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই ভাষার অর্থের যাথার্থ্য রাখতে গিয়ে সুরের চিরাচরিত রূপটিও কখনো বদলাতে হয়েছে এবং কবিতার ছন্দ বা অর্থের মর্ম্ম বোঝাতে গিয়ে লয়টিকেও নির্দিষ্ট করতে হয়েছে। তাই কখনো বা কবিতার ছন্দে আর গানের তালে মিল হয়নি,—কখনো বা সেই তালের গতিকে, অর্থাৎ লয়কে কবিতার ছন্দ থেকে পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে।

কালোয়াতী গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই পার্থক্য দেখাতে গিয়ে শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কালোয়াতী গানকে বলেছেন স্বর-সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বলেছেন অর্থ-সঙ্গীত। এই দুই প্রকার গানের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা' এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"স্বর সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে অর্থ সঙ্গীতের চাল কি প্রকার হয়েছে স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে যে রবিবাবুর গানের চাল অত্যন্ত মধুর। স্বর সঙ্গীতের চাল নির্ভর করে গায়কের ওপর, উচ্চারণের ওপর ও তালের ওপর, ধরবার ও ছাড়বার ওপর।······রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সাধারণের আর এক ভীষণ আপত্তি এই যে, তার সঙ্গীতে তাল নেই। তালে গাওয়া হয় আর ছন্দে গান রচিত হয়, অতএব তাল নেই বলা মূর্খতা।······আমার আর একটি বক্তব্য আছে—ধরুণ তাঁর সঙ্গীতে দীপুবাবুর গলাতেও তাল ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে সুরের তাল একরকম, কবিতার ছন্দ অন্যপ্রকার। সুরকে যে কোন তালেই গাওয়া যায়, তার নির্দিষ্ট কোনও তাল নেই কিন্তু সঙ্গীত তার কথার ভাব অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তাল অপেক্ষা লয়ই বেশী প্রয়োজনীয়। তাও ধ্রুপদে আভোগীর লয় অন্তরার লয়ের চেয়েও দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে তো হয়ই। রবিবাবুর সঙ্গীত লয় ভ্রষ্ট হয়না, কেননা তার সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়।"

রবীন্দ্রসঙ্গীত যে কবিতা হিসাবেও আদরণীয় এর প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাই ধূর্জ্জটিবাবুও ঐ শেষ লাইনের একটি বাক্যে সেই সত্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই কবিতার জন্যেই যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে লয়ের গুরুত্ব সেকথাও বলেছেন। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের লয় বিচার প্রসঙ্গে কবিতার অংশটিও আলোচনাভুক্ত করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে ভাষার কৌশলী প্রয়োগে কবিতার সৃষ্টি। আলঙ্কারিকদের বিশ্লেষণে ভাষার দুটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। একটি বাচ্য অর্থ বা অভিধা অপরটি লক্ষণা। অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের যেমন একটি বাচ্য অর্থ আছে অন্যদিকে তেমনি কতকগুলি সামাজিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত আছে; পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে গলার স্বরের তারতম্যে, ইঙ্গিতে বা হাত পা নাড়ার মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করতে হয় কিন্তু সঙ্গীতে কিছুটা বিভিন্ন পর্দার ব্যবহারে এবং বিভিন্ন তাল ও লয়ের মাধ্যমেই তার প্রকাশরীতি। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাচ্যার্থ প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে প্রধানতঃ দুটি রীতি চোখে পড়ে। প্রথমটি শব্দের অর্থমূলক ছন্দের মাধ্যমে। যেখানে

শব্দের অনুরণনে ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালও হয়েছে তার অনুগামী এবং সেই সঙ্গে লয়টিকেও যথানিয়মে বাঁধা হয়েছে। অসংখ্য দৃষ্টান্তের কয়েকটি তুলে ধরলে বক্তব্য আশা করি পরিস্কার হবে। গানগুলি হ'ল,—**আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু, নীল অঞ্জন ঘন, মম মন উপবনে, থামাও রিমিকি ঝিমিকি, মম চিত্তে নিতি নৃত্যে, নূপুর বেজে যায়** যায় ইত্যাদি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাচ্যার্থ প্রকাশের আর একটি রীতি হ'ল গানের সহজ অর্থটি সুরের সাহায্যে কিছুটা স্পষ্ট করা। এখানে দেখা যাবে যে কবিতার সাধারণ ছন্দটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রেখে সেই তালেই সুর লাগানো হয়েছে। এর ব্যতিক্রম যে দেখা যায় তা' নয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ব্যতিক্রমের একটি সুস্পষ্ট অর্থ দেখা যায়। **বসন্তে বসন্তে তোমার** (ঢিমা লয়ে), **নীল নবঘন আষাঢ় গগনে, বাদল মেঘে মাদল বাজে, বিদায় করেছ যারে, ঝরে ঝর ঝর, হৃদয় আমার নাচেরে, খোলো খোলো দ্বার** ইত্যাদি গানগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গানের মধ্যে কবিতার ছন্দকে অতিক্রম করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই লয়কে দ্রুততর বা বিলম্বিততর করবার জন্যেই। এর থেকে এটাও বেশ পরিস্কার বোঝা যায় যে রবীন্দ্র সঙ্গীতে লয়ের তারতম্যের এই বাঁধাবাঁধি মোটেই আকস্মিকভাবে আসেনি, এসেছে ভাব ও রসের প্রকাশ বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গে করে নিয়ে। ব্যতিক্রমের উদাহরণগুলি পাশে সরিয়ে রেখে আপাততঃ সহজভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাচ্যার্থ প্রকাশের উদাহরণে আসা যাক। হাস্যরস, বীররস, রৌদ্ররস, দেশভক্তি, উৎসাহ বা জয়গাথা পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বাচ্যার্থে ভাষার ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

এইভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভাষার বাচ্যার্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত গানগুলির লয় দ্রুত। তাই **মোদের কিছু নাইরে, কাঁটাবন বিহারিণী, মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন, দেশ দেশ নন্দিত, কালি কালি বলরে** ইত্যাদি গান বা ঋতু বর্ণনার অসংখ্য বর্ণনায় যেমন **আষাঢ় কোথা হতে, শীতের হাওয়া গগনে গগনে ধায় হাঁকি** ইত্যাদি গানগুলির লয় দ্রুত। দুখানি বর্ষাসঙ্গীত এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। **আষাঢ় কোথা হতে** গানখানির একখানি বাচ্য অর্থ ছাড়া অন্য কোনও অর্থ গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে না কিন্তু **বহুযুগের ওপার হতে** গানখানি অনুভূতিকে নিয়ে যায় সেই রেবা নদীর তীরে একটি বৃষ্টি সজল আষাঢ়ের মুহূর্তের দিকে। গানখানি অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক বা ভৌগলিক স্মৃতি বহন করেছে তাই অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে বা মধ্যলয়ে গানখানি গীত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর নৃত্য পরিবেশনের উদাহরণে আসা যাক। নাচের মধ্যে অন্য যা' কিছুই থাক না কেন তার ছন্দ বা তাল ও লয়টিই প্রধান। তাই নৃত্য পরিবেশনের সময় গানগুলিকে ছন্দ-প্রধান করবার জন্যই তার লয়গুলিকে কিছুটা দ্রুত করে নেওয়া হয়। সেখানে আত্মিক ব্যঞ্জনার প্রাবল্য সত্ত্বে অনেক সময় শুধু বাচ্যার্থটিকে দ্রুত লয়ে পরিবেশন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকেনা,—নৃত্যশিল্পীর দায়িত্ব সেখানে ভঙ্গী ও মুদ্রার সাহায্যে আত্মিক ব্যঞ্জনার

অংশটিকে তুলে ধরা। এইভাবে শ্যামা নৃত্যনাট্যের **আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া** অথবা **ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে** গান দুখানি দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীত প্রায়ই নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেখানেও এই নীতিই অনুসৃত হয়। **মন মোর মেঘের সঙ্গী** গানখানি দ্রুত লয়ে গাইবার ফলে মন তাল তমাল অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়না সে বড় জোর বর্ষার রিম্‌ঝিম্ সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে ওঠে। তেমনি **নীল দিগন্তে** গানখানি দ্রুত লয়ে গাইবার ফলে হঠাৎ মনোবেদনায়, 'অনেক কালের মনের কথা' স্মরণ করবার সময় পায়না; বসন্তের নীল, লাল রঙের তীব্রতায় তার চোখ যায় ধাঁধিয়ে। অবশ্য নাচের রস সৃষ্টির পদ্ধতি আলাদা,—এখানে নৃত্যাংশ বাদ দিয়েই কেবল গানগুলিরই সমালোচনা করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে মূলতঃ ভাষার লক্ষনা বা ব্যঞ্জনার গভীরতা প্রকাশের উদ্দেশেই যে মধ্য ও বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার দেখা যায়, এই কথাটা প্রকারান্তরে এতক্ষণ বলা হয়েছে। এখানেও কালোয়াতী গানের সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন আছে। কালোয়াতী গানের এক একটি সুরই এক একটি ভাবের দ্যোতক। অন্ততঃ প্রত্যেক সুরেরই রূপ সৃষ্টি এক একটি Standard বা মান আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই চিরনির্দ্ধারিত মানটিকে যতখানি গণ্য করা হয় ভাষাটিকেও গণ্য করা হয় সমধিক। যেখানে ভাষার ব্যঞ্জনার আধিক্য সেখানে তার অর্থের বোধগম্যতার দিকে নজর রাখতে গিয়ে ভাষার দিকটাই ওজনে ভারী হয়ে ওঠে তাই সেখানে সুরের বিশুদ্ধতার চেয়েও রসসৃষ্টির তাগিদে লয়ের দিকটাই প্রকট হয়ে ওঠে। দেখা যায় যে এই অবস্থাতে রবীন্দ্রনাথ মধ্য বা বিলম্বিত লয়ের ব্যবহারটাই করেছেন বেশী। উদাহরণ সহযোগে আরও বিশদভাবে দেখা যাক। **বাদল মেঘে মাদল বাজে, বাজেরে বাজে** এই একটি পঙক্তি ছন্দের ক্রমে সুর লাগালে দেখা যায় যে সহজেই তাকে দশ মাত্রার তালে গান করা চলে এবং মাদল বাজার ছন্দটিও বেশ ধরা যায় এই তালের মধ্যে অথচ রবীন্দ্রনাথের সুরে দেখা গেল যে বিলম্বিত লয়ে ছয় মাত্রার তাল লাগিয়ে এই পঙ্‌ক্তির বিস্তৃতি বাড়িয়ে সব্বসাকুল্যে ছত্রিশ মাত্রায় ফেলা হয়েছে। এবং এখানে মাদল বাজার ছন্দটা কিছুটা ক্ষুন্ন করেও বাদল মেঘের বিস্তৃতি, তার মন্থর গতি ও তারই সঙ্গে মাদলবাজার দেশের একটি গুরুগম্ভীর দেহাতী-ছবি পরিকল্পিত হয়েছে এই গানখানিতে।

এমনি করে **বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক** গানখানি দু'টি বিভিন্ন সুরে এবং বিভিন্ন লয়ে বাঁধা হয়েছে। দ্রুত লয়ের গানখানি শুনলে বোঝা যাবে যে সেখানে এই প্রথম ছত্রের বাচ্যার্থটিই গানখানির প্রধান বক্তব্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ প্রতি বসন্তকালীন উৎসবে তোমরা তোমাদের প্রিয় কবিকে আহ্বান করে উৎসব সুরু কর। নাইবা থাকলো তোমাদের কবি তার গান তো রইলো। আজ তাই হোক তোমাদের বীণার ধ্বনি। অন্যদিকে ঢিমা লয়ের গানখানিতে কবির আক্ষেপ, মনোবেদনা বা অভিমানের সুরটিও ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। গায়কের গানের ভেতর দিয়ে তিনি বলছেন যে আজ তিনি নেই বলে যেন আমরা তাঁর গানকে না ভুলি, আমাদের মনোবীণায় যেন তাঁর সুরটি ভুলে না যায় এই তাঁর মিনতি।

এমনও দেখা গেছে যে কাব্য ব্যঞ্জনার গভীরত্বকে সঙ্গীতের মধ্যে রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই গানের বাচ্যার্থ এমনকি সহজ ছন্দটুকুও মুছে নিয়েছেন তাঁর সুরের মধ্যে দিয়ে সেখানে তাঁর লয়ই সুরের একমাত্র সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পর্য্যায়ের অসংখ্য গানের মধ্যে **কে উঠে ডাকি মম, অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়, বিদায় করেছ যারে, মেঘের পরে মেঘ জমেছে, বন্ধুরহো, মরি হায় চলে যায়** দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া গেল।

এপর্যন্ত যে সমস্ত গানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল তার কোনটিই কেবলমাত্র সুরের বিশুদ্ধতার মহিমা নিয়ে আসে নি বা চিরচরিত রূপ দেখাতে আসেনি এসেছে সঙ্গীতের মহিমা নিয়ে। অর্থাৎ ইমন দেশ বা ভৈরবী সুরের প্রচলিত রূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিয়েই সেই গানগুলি রচিত হয়নি, হয়েছে সঙ্গীতের সমগ্র রসোপলব্ধির জন্য। সে জন্যেই লয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে প্রচুর। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাউল সুরের গানগুলিতে লয় বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ বোধকরি এই যে বাউল সুরটাই, সে যে তালে বা লয়ে গীত হোক না কেন, বাঙ্গালীর মনে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে। সেই রসটুকু এতই প্রবল যে লয়ের তারতম্যে রসোপলব্ধির তারতম্য হয়না এবং সেইজন্যই বোধ হয় ছন্দটিকে ধরবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের গানগুলি অধিকাংশই দ্রুত লয়ে গীত হয়ে থাকে। তবুও কয়েকটি গান যেমন **কবে তুমি আসবে বলে** বা **কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা** ধরণের গানগুলি মধ্য লয়ে গাইলেই ভাল হয়। সেখানে নীল আকাশ-সাগরের তীরে বসে স্বপ্নালোকের চাঁদের খেয়া পারানীর ছবিটি বা তেপান্তরের পাথার পেরিয়ে পরীর বন্ধ দ্বারে হানা দেবার হারানো—মনটুকুর ছোঁয়া নিতে হলে বোধকরি মধ্য লয়ের অয়োজন সমধিক।

এই ধরণের সুক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে তবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ পরিবেশন সম্ভব অথচ সাধারণে দেখা যায় যে এই লয়ের অংশটি অনেক গায়ক—গায়িকাই চিন্তা করেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধুরন্ধরেরাও অনেক ক্ষেত্রে লয়ের মর্য্যাদা না রেখে গান করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পীড়িত করেন। **যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন** গানখানি এক অল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশন করার জন্যে দ্রুত লয়ে গাওয়া ছাড়া আর কোনও যুক্তি থাকতে পারেনা। তেমনি **আকাশভরা সূর্য্য তারা** গানখানিও দ্রুত লয়ে শোনবার পর এই কথাটিই মনে লাগে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গান-গুলিই অল্পাধিক ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। তাই যদিবা অপেক্ষাকৃত ঢিমা লয়ে গাইলে তার বিশেষ ক্ষতি হয় না কিন্তু দ্রুত লয়ে সমধিক ক্ষতি হবারই সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। হয়ত ভাষায় অভিধা বা লক্ষনা ভেঙ্গে লয়ের তারতম্যের যুক্তি সম্যক না হতেও পারে তবুও লয়ের বৈচিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে একটি বৈশিষ্ট্য একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং সেইজন্যই তার উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বরলিপির মধ্যে এই লয়গুলি নির্দিষ্ট হলে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে। ইউরোপীয় সুরকারগণ এই লয় বা tempoর প্রয়োজনীয়তা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সম্যক উপলব্ধি করেছেন বলেই সুর রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তারা tempoটিও বেঁধে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও আশাকরি সেটা সম্ভব।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সমাজসমস্যা

সনাতনী সমাজ

এতদ্দেশীয় সনাতন ধর্মের ধ্বজাধারী রক্ষণশীল মহাশয়গণ বর্তমান সভ্যতার উপর বীতস্পৃহ। পুণ্যভূমি ভারতের মহান ঐতিহ্য স্মরণে এঁদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায় এবং প্রাতঃস্মরণীয় মুনি ঋষিগণের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের-পর্যালোচনায় এঁদের মুহুর্মুহু স্বেদকম্প হয়। এঁদের ভক্তির প্রাবল্য আমাদেরও মুগ্ধ করে বৈকি। স্বদেশের প্রতি মমতা একান্ত স্বাভাবিক, স্বদেশের গৌরবে আমরা আত্মগৌরবই অনুভব করি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং কিয়ৎ পরিমাণে তা কাম্যও বটে। তবে সমস্যা ওঠে যদি অতীতের পতাকাবাহীরা বর্তমানকে অর্থাৎ বাস্তবকে সম্পূর্ণ লোপাট করার চেষ্টায় ব্রতী হন এবং অতীত ভবিষ্যতকে গ্রাস করার উপক্রম করে।

আজ পর্যন্ত যত রকম সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে, কোন সমাজব্যবস্থায়ই জীবনসংগ্রাম ছাড়া জীবনধারণ সম্ভবপর হয়নি একথা মহাশয়গণ স্মরণ রাখেন না। অতীতে যে জীবন সংগ্রামের ঘাটতি ছিল না এ তথ্য তাঁদের কল্পনায় পীড়াদায়ক, কারণ বর্তমান জীবনসংগ্রাম থেকে পলায়নের একমাত্র উপায় তাঁরা অতীতের পথেই অনুসন্ধান করেন। কথায় কথায় এঁরা মুনি-ঋষিদের আদর্শ জীবনযাত্রার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। (মুনি ঋষিদের জীবনযাত্রা আদৌ আদর্শ কিনা সে সংশয়-প্রকাশে হয়ত এঁরা মুর্চ্ছা যাবেন, তাই সে প্রশ্ন মুলতুবী থাক)— আহা, তপোবনের সেই পবিত্র জীবন, 'plain living and high thinking—সে জীবন কি আর আসবে? ম্লেচ্ছাচারে দেশ ভরে গেল, দেবদ্বিজে আর ভক্তি নেই, ধর্মে নেই মতি—দু'পাতা ইংরেজী পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে! মুনি ঋষিরা তাঁদের অলৌকিক শক্তির বলে যে সব বিধান দিয়ে গেছেন সেই শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করার স্পর্দ্ধা অর্বাচীনের দল কোথায় পায়?

মহাশয়েরা তাই আধুনিকতার উপর বিষম চটা। আধুনিক ভাবধারাই যত নষ্টের গোড়া! আধুনিকতাকে পুরোপুরি বর্জন না করলে জনসাধারণের কোন উপায় নেই, সেই পবিত্র তপোবনের জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যান্তর নেই। অতীতের জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার মোহ যে শুধু সনাতনীদেরই আচ্ছন্ন করেছে, একথা ভাবলে ভুল করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বহু ফ্যাশনেবল নাগরিকের মধ্যে পর্যন্ত এই মনোবিলাস দৃষ্টিগোচর। তাছাড়া, জনসাধারণের মধ্যেও এই মনোভাব তথা আধুনিকতা-বিরোধী মনোভাব কিরকম প্রবল তা' বোঝা যায়, যে সব সম্প্রদায়ের নাটক নভেল এবং চলচ্চিত্র আধুনিক মনোভাবকে

ব্যঙ্গ করে, বিশেষত নারীপ্রগতিকে হাস্যাস্পদ করে, তাদের জনপ্রিয়তা দেখলে। (একথা ঠিক যে বিভিন্ন শক্তিশালী লেখকের বা চলচ্চিত্রকারের বলিষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে প্রগতি বা আধুনিক ভাবধারা সুনির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে, তবু একথা অনস্বীকার্য যে জনসাধারণের বিপুল অংশ এখনও আধুনিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ।)

এই 'তপোবনের জীবনযাত্রা' বলতে মহাশয়েরা কি বোঝেন, তা তাঁরাই জানেন। ভারতের অতীত যুগে ফিরে যাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য এটুকু বোঝা যায়, কিন্তু ভারতের অতীতও কোন নির্দিষ্ট একটা যুগে বাঁধাধরা আটকে থাকেনা। ভারতের অতীত বলতে এঁরা কি বোঝেন সে বিষয়ে নিজেরাই স্পষ্ট কিনা সন্দেহ। 'plain living and thigh thinking'—অর্থাৎ সহজ জীবন এবং মহৎচিন্তা—কথাটা তাঁদের মনে ধরেছে কারণ জীবন-সংগ্রামের কোন আভাস এই কথাটার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কথাটাকে তাঁরা পানের মতই চর্বিতচর্বন করেন। মুস্কিল হল, ইতিহাস সর্বদা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়না। ভারতবর্ষে তপোবনের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজজীবনে 'plain living and high thinking' বিশিষ্ট এই 'তপোবনের যুগ' আদৌ কোনকালে ছিল কিনা তা এখনও প্রমানসাপেক্ষ। যদি থেকেও থাকে তবু আমাদের পক্ষে সেই ধরনের জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া কাম্য অথবা আদৌ সম্ভবপর কি না তাও ভেবে দেখবার।

প্রথমতঃ, এই তপোবন প্যাটার্ণের জীবনযাত্রা কি জাতীয় সে বিষয়ে নিজেদের স্পষ্ট করে নেওয়া যাক্। যদি ধরা হয় এই জাতীয় সমাজে মানুষের আহার্য হ'ল ফলমূলাদি প্রকৃতি-দত্ত খাদ্য এবং সেই সঙ্গে পরিধানে গাছের বাকল এবং গুহা কিম্বা বনজঙ্গলে আবাস নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পরম সন্তোষে বেদ বেদান্তের আলোচনাতেই সুখে কালাতিপাত করতেন তবে অবশ্য কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যে যুগে মানুষ জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতিনির্ভর ছিল, সেই যুগে বেদ-উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য ঋকবেদে পশুপাল মানবগোষ্ঠির আভাস পাই। রুদ্র প্রভৃতি দেবতাদের স্বরূপ প্রাক-কৃষি বা আদি-কৃষিযুগের সাক্ষ্য বহন করে। যাই হোক, ঋকসাহিত্যে তদানিন্তন জীবনযাত্রা যদিবা কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা কখনও সহজ জীবনের ছবি নয়।

'high thinking'—ওয়ালাদের জন্য অবশ্য পৃথক এলাকা বা উপনিবেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে, যেখানে তাঁরা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সহজ জীবন যাপন করে উন্নত চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারেন, যদি এই high thinking শ্রেণী বিশেষের ভরণপোষনের জন্য একদল মেহনতি 'মোটা-বুদ্ধি' মানুষের অস্তিত্ব থাকে। ভারতবর্ষে আর্য high thinking—ওয়ালারা অনার্য বা দাসজাতিকে এইভাবে বহুকাল শোষণ করার ফলেই বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্ভবপর হয়েছিল এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত না। সহজ জীবনের নামে যে যতই লাফান, সেই বল্কলসম্বল, ফলমূল-নির্ভর বুনো জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার প্রস্তাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় উটপাখীগণ রাজী হবেন কিনা সন্দেহ। যদি রাজী হন তখন প্রশ্ন ওঠে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে,—শ্রদ্ধেয় সনাতনীদের

দৃষ্টিসীমানায় আর্যাবর্তের বাইরে মনুষ্যজাতির, অন্তত সভ্য মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকৃত) এমন কোন অঞ্চল কি আছে যেখানে বর্তমান বিপুল জনসমষ্টির পরিমাপে যথেষ্ট পরিমাণফলমূলাদির সংস্থান আছে ? এই প্রশ্ন অবশ্য আধুনিক (ম্লেচ্ছভাবাপন্ন !)। এই ধরণের সংশয় প্রকাশ ধৃষ্টতারই পরিচায়ক !—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর", তবু যত বড় সাত্বিকই হোন, পেটের প্রশ্নটাকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা পবিত্র তপোবন-সমাজ গড়তে এগোবেন কিনা সন্দেহ।

অতএব, অন্তত কৃষিকার্য আবশ্যক। কিন্তু কৃষিকার্য করবে কে ? high thinking ওয়ালারা যদি হল ধরতে রাজীও হ'ন তবু সমাজে কর্মবণ্টন (division of labour) অনিবার্য, কেননা লাঙ্গল, ইত্যাদি কৃষিকার্যের হাতিয়ার (tools) তৈরী করার জন্য একদল আলাদা লোককে ব্যস্ত থাকতেই হবে (সকালবেলা লাঙ্গলের ফালা তৈরী করলাম, দুপুরবেলা চাষ, আর রাত্রিবেলা কাপড় বুনলাম—কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা এত সহজ নয় ; ক্ষেত সারাদিনের শ্রম দাবী করে। চাষ অবশ্য সারা বছরের কাজ নয় ; যে সময় চাষী বেকার থাকে সেই সময়টা লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরী করতে পারে বলে কল্পনা করা চলে। কিন্তু লাঙ্গল-ইত্যাদি তৈরী করাও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই সব কাজেও কিছুটা Specialization দরকার। এই Specialization এর অনিবার্য প্রয়োজনেই অতীতে কর্মকার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।. আজ মানবজীবনযাত্রার গোড়ার ব্যবস্থায় ফিরে গেলেও কর্মবণ্টনের পুনরাবৃত্তি না ঘটবার কোন কারণ নেই।) লাঙ্গল ছাড়া কৃষিকার্য অসম্ভব। গাছের মরা ডাল দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে যথেষ্ট পরিমান শস্যের উৎপাদন যে হবে না, সে কথা আশা করি আমাদের শ্রদ্ধেয় উটপাখীগণ স্বীকার করবেন।

এখানে আবার জনসমষ্টির সেই অশ্লীল প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জনসংখ্যা চিরকাল বেড়েই চলেছে (পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক পরিস্থিতি জানি না)। যে যাই বলুন, পুরাণাদি পবিত্র গ্রন্থ থেকে যে সব নজির পাই তাতে প্রাতঃস্মরণীয় মুনি ঋষিদেরও, কি নিজেদের সংসারে, কি জনসাধারণের ক্ষেত্রে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিল বলে বোধ হয় না ; বরং তাঁদের বর-আশীর্বাদ মারফৎ বংশবৃদ্ধির কামনাই প্রকাশ পায়। বহুবিবাহের প্রথাও নিশ্চয়ই বংশবৃদ্ধির সহায়তার উদ্দেশ্যেই প্রচলিত ছিল (শ্রদ্ধেয় সনাতনাগণ যদি কিছু মনে না করেন ত বলব যে সমাজ-বিজ্ঞানের মতে কৃষি-নির্ভর সমাজে সর্বদেশেই লোকবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, আমাদের দেশেও বিবাহপ্রথা বা অন্যান্য যে কোন শাস্ত্রবিধানও কৃষি-নির্ভর সমাজের বৈষয়িক বিবেচনা থেকে বিচ্যুত নয়।) বর্তমান যুগেও, আধুনিকভাবাপন্ন পরিবারের চেয়ে 'সনাতন-পন্থী' রক্ষনশীল পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রনে উৎসাহ এবং সচেতনতা বেশী একথা অবিশ্বাস্য। জনসংখ্যা বেড়েই চলছে এবং যে হারে তা বেড়ে চলেছে তাতে কৃষিপদ্ধতির প্রাচীন উপায় যে আর জনসমষ্টির বিপুল খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারবে না তা নিশ্চিত। কিন্তু কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতি শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই সম্ভব। আর আধুনিক যন্ত্রপাতি মানেই আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি। অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতাকে এড়িয়ে যাবার জো নেই।

'high thinking-'এও specialization দরকার। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর

ধ্যানে বসলাম, আর অমনি আকাশ থেকে এক একটি মহদ্ভাবনা পাকাফলের মত টুপ টুপ করে মগজের মধ্যে এসে খসে পড়বে, আর মধ্যে মধ্যে আমাদের শ্রীমুখনিসৃত বাণী বেদ বেদান্তের সূচনা করবে—এ কল্পনা মধ্যবিংশ শতাব্দিতে একটু দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে না কি? তাই, যতদিন না বিপুলসংখ্যক আর একদল অনার্য দাসজাতিকে পাকড়াও করা যাচ্ছে ততদিন plain living এর সঙ্গে আমাদের high thinking এর সামঞ্জস্য ঘটান শক্ত। এই দিক থেকে অবশ্য সনাতন জাতিভেদ-প্রথাকে জিইয়ে রাখার জন্য সনাতনীদের বিপুল উদ্যমের একটা সূত্র পাওয়া যায় (অবশ্য সনাতনীরা এতদূর তলিয়ে বিচার করেন এ অপবাদ দিতে কিছুটা সংকোচ বোধ করছি)

সহজ জীবন আর উচ্চ চিন্তা কার না কাম্য? কিন্তু উচ্চ চিন্তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই মানসিক প্রস্তুতির জন্য আবার আগে দরকার সামাজিক প্রস্তুতির, অর্থাৎ সমাজের বৈষয়িক বুনিয়াদকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যে সেই কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিরুদ্বেগে আত্মবিকাশের চেষ্টায় মনোনিবেশ করতে পারে। সেই সামাজিক সংগঠন কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমেই লভ্য, পলায়নে অসম্ভব।

অবশ্য আধুনিকতার সব কিছুই কাম্য এই দাবী একান্তই বাতুলতা। মানবসভ্যতার প্রতি স্তরেই ভাল মন্দের সমন্বয় ঘটেছে। সমাজসংগঠনে অবাঞ্ছনীয় দিক বা অসঙ্গতি না থাকলে সংশোধন তথা অন্যতর সমাজ সংগঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অসঙ্গতিই সামাজিক প্রগতির পথিকৃৎ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তিম পর্যায়ে যে অসঙ্গতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তারই সূত্র ধরে আগামী সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। সেই নুতনকে আহ্বান করে আনাই আমাদের দায়িত্ব, তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে গতাসুকে আঁকড়ে ধরে জীবনের কোন সার্থকতা, সংগ্রামের কোন সুরাহা খুঁজে পাওয়া যাবে না—আমাদের শ্রদ্ধেয় সনাতনপন্থীদের সমীপে এই আর্জিই অর্বাচীনের দল পেশ করছে।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

কবিতা পণ্য নয় ঃ

কলকাতার রাজপথে একদিন দেখা গেল একদল তরুণ কবিদের মিছিল। পথচারী থমকে দাঁড়িয়ে শুনলো তাঁদের শ্লোগান : আরও কবিতা পড়ুন।

এ-এক নূতন শ্লোগান, এ-এক নূতন মিছিল। দাবী আদায়ের বজ্রমুষ্টি আস্ফালন নয়; এ-মিছিলের কণ্ঠে পাঠক-বাঙালীর পঠনরুচির কাছে আবেদন : আপনারা আরও কবিতা পাঠ করুন!

যতদূর জানি, মাত্র কয়েক সপ্তাহ এ-হেন শ্লোগান শোনা গিয়েছিল। কয়েকটি পত্র-পত্রিকার স্তম্ভে এ-সংবাদ পরিবেশন করাও হয়েছিল সমর্থনসূচক অথবা সহানুভূতিপূর্ণ মন্তব্য সমেত। বিষয়টি নিঃসন্দেহে সহানুভূতির যোগ্য। 'বিষয়টি' মানে মিছিলের মূল কারণটি। কবিতা না-পড়া নয়, কবিতার বই না-কেনার জন্যই আমাদের অভিযোগ, অভিমান। পাঠক কবিতা পাঠ করেন না, এ-দোষারোপ আমরা করবো কি করে? পাঠকহিসাবে আমি-আপনিই বলবো : আপনাদের কবিতা ত' আমরা পাঠ করি, কবি! কিন্তু, মুদ্রিত পুস্তকের অবিক্রীত স্তূপের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে কবি নিশ্চয় পাঠককে লজ্জা দিতে পারেন। সে-লজ্জা তখন আমার, আপনার—সকলের। প্রত্যেক বাঙালীর। কিন্তু, এটা কোনো নূতন উপসর্গ নয়। শুধু এ-দেশে কেন, সব দেশেই বোধহয় কবিতার বইয়ের বিক্রী সব চেয়ে কম। শুনতে পাই, ইংরাজী অনুবাদের আগে, নোবেল পুরস্কারের তিলক-চিহ্নিত হবার আগে—রবীন্দ্রকাব্য বিক্রী হতো বড় কম। আর্থিক কারণে সামাজিক লোক-লৌকিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে এই রক্ষে। তাই বিশ্বকবির বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কবিতাসংকলনের বিক্রী অন্য বইয়ের তুলনায় বেশী। কালজয়ী কাব্যসৃষ্টি ক'রে অমর হয়ে রইলেন এমন কবির সংখ্যা বাংলা দেশে ত' বিরল নয়; কিন্তু তাঁদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের পুনর্মুদ্রনের কথা শুনতে পান? আশঙ্কা হয়, কান্ত কবি রজনী সেনের 'বাণী' 'কল্যাণী' রজনী সেনেরই মতন দেহ ধারণ আর কোনদিনই করবে না!

এ কম দুঃখের কথা নয়। তাই সাহিত্যপ্রেমিক বাঙালীমাত্রেই সহানুভূতি বোধ করবেন, ঐ মিছিলের কবিদের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলবেন : আরও কবিতা পাঠ করুন! আরও কবিতার বই কিনুন।

এই যে মহীরুহ সমস্যা আমাদের সামনে এর শিকড় একটা নয়। অনেক। শুধু অনেক নয়, পাতাল বিস্তারী। গত পঁচিশ ত্রিশ বছর সাময়িকপত্রিকাগুলো উল্‌টে-পাল্‌টে দেখুন, কতটুকু ঠাঁই পেয়েছে কবিতা? গল্প-প্রবন্ধের শেষে যতটুকু স্থান ছাড় পড়ে গেছে, যেস্থানটুকু শূণ্য রাখলে দৃষ্টিকটু লাগে—শুধু সেইখানে পাদপূরণ যোগ্যতার বিচারে ছোট বা মাঝারি কবিতা ঠাঁই

পেয়ে ধন্য হয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্য 'প্রবাসী', 'প্রবাসী' তখন বিশ্বকবির কাব্যপ্রসাদধন্য। পত্র পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অসহায় সম্পাদককে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মেনে নিতে হয়েছে: পাঠক চায় গল্প, শুধু গল্প। যারা কিনবে পড়বে, তাদের চাহিদা মেটাবো না?

এ-হেন যুক্তির কোনো উত্তর নেই। পত্রিকার কাজ যে শুধু লেখা পরিবেশন করা নয়, সেই সঙ্গে পাঠকের রুচিকেও প্রভাবান্বিত করা, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে-কাব্য সেই কাব্যের প্রতি পাঠকের অনুরাগ বর্ধন করা—এই কথা বোঝাবার ব্যর্থপ্রচেষ্টা করে এসেছেন বাংলার কবি-কূল। আজও করছেন।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বেলায়ও ঐ একই কথা। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশকের অপ্রিয় মন্তব্য এড়িয়ে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক ব্যাকুলতায় দরিদ্র কবি কোনরকমে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন আর প্রকাশ করেন নিজের কাব্য সংকলন। বিজ্ঞাপনের দৈন্যে সে-সংকলন ম্লান হয়ে পড়ে থাকে। বিশেষ যদি সে-কবি কোনো গোষ্ঠীভুক্ত না হন।

এই বৈশ্যযুগে পুস্তক-প্রকাশক আর সাময়িক পত্র-পত্রিকার মালিক-পরিচালক সকলেই কবিতাকে পণ্য রূপে গণ্য করে খতিয়ে দেখছেন তার চাহিদা। আমি আপনিও ব্যবসায়ী হলে একই অন্যায় করতাম হয়তো। কিন্তু এখন, উপেক্ষিতা কাব্য-সরস্বতীর পক্ষ অবলম্বন করে মা-লক্ষীর কাছে আপীল জানাতে ইচ্ছা হয়: যে-সব ভাগ্যবান প্রকাশ-সংস্থা তোমারই সহোদরার আনুকুল্যে অর্থশালী হলো, তাদের চক্ষুলজ্জা দাও মা!

পাঠকের কবিতাবিমুখতার জন্য 'আধুনিক' কবিরা নিজেরাও অনেকাংশে দায়ী। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে। কথাটা অপ্রিয়। তবু বললাম। মনে হয়, বৈশ্য বিংশশতাব্দীর বস্তু সর্ব্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অজ্ঞাতসারেই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলছে তাঁদের, অক্টোপাশের মত। কবিতা নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছেন তাঁরা। কখনও ডাষ্টবিন, ঘেয়ো কুকুর আর পচা ডিম ঘেঁটে, কখনও অভিধান খুলে দুর্বোধ্য শব্দ সাজিয়ে, কখনও বা কবিতাকে জোর করে হৃতছন্দা করে। ভিতরের সেই সনাতন কবিমানস পর্যুদস্ত হচ্ছেন যুগপ্রভাবান্বিত মানুষ কবিটির কাছে। এ যুগপ্রভাব বৈ কিছু নয়। যন্ত্রযুগের প্রভাবে। সে-প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এতো ব্যাপক যে কারো রেহাই নেই। কবির নেই, পাঠকের ত' নেই-ই। কবি-মিছিলের 'আরও কবিতা পড়ুন' ধ্বনি তাই মন ছোঁবে না কারুরই।

কবিতার দুর্দশায় ব্যথিত সবাই। কিন্তু 'আরো কবিতা পড়ুন' ধ্বনি তুলে মিছিলের সঙ্গে রাজপথ পরিক্রমার প্রস্তাবে পিছিয়ে পড়ারই কথা! কারণ, কবিতা পণ্য নয়। কবি শ্রমিক নন। কর্ম্মী ও শিল্পীর কাজ সম্পূর্ণ পৃথক। শিল্পীর দৃষ্টি অহেতুকী। বৈশ্যযুগের যে-প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ-মিছিলের মধ্যেও সেই প্রভাবের গোপন ক্রিয়া বর্ত্তমান। কবিতার দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে কবিরা ব্যাকুলভাবে পথ অন্বেষণ করছিলেন, কাব্যানুরাগের আতিশয্যে আলেয়াকে মনে হয়েছিলো পথ-দেখানিয়া আঁলো, শিল্পী নিজেকে ভুল করেছিলেন শ্রমিক বলে।

আনন্দের কথা, সে-ভুল অল্পকালের মধ্যেই ভেঙেছিল। তেমন মিছিল আর তাই পথে নামেনি।

সরিৎশেখর মজুমদার

গ্রন্থপরিচয়

"কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো?" ॥ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা, প্রকাশক: দেবকুমার বসু, ৭জে পণ্ডিতিয়া রোড। কলকাতা—২৯। এক টাকা।

বাংলাভাষায় তথ্যমূলক প্রবন্ধের বইয়ের অভাব আমাদের দেশের পাঠকদের এক বহুদিনের অভিযোগের বিষয়। সাহিত্য, কলাশিল্প বা নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু বই—যথেষ্ট না হলেও—প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে সাধারণের উপযোগী তাত্ত্বিক জটিলতা-মুক্ত পরিচিতিমূলক ছোট বইয়ের প্রয়োজন বড় তীব্রভাবেই অনুভূত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পেশাদার প্রকাশমহল এ চাহিদা সম্বন্ধে কোনদিনই সজাগ হ'ননি। সুতরাং তাদের হাতে পরীক্ষা সমুদ্র উত্তরণে সহায়ক জাতীয় বস্তু ছাড়া আর কোন নিবন্ধজাতীয় বই ছাড়পত্র পায়নি।

'রত্নসাগর গ্রন্থমালা'র প্রকাশ করা শুধু এ জাতীয় অজ্ঞতা ও দুরদৃষ্টির অভাব থেকে মুক্ত বলেই নন্, বাংলাভাষার প্রতি তাদের সত্যিকারের দরদের জন্যই আমাদের এ কলঙ্ক দূর করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত নিবেদন থেকে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি যে আর পাঁচটা দেশের মত এদেশেও নিজের ভাষাতেই আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে ছোট বইয়ের মধ্যে সারবান পদার্থ পাব।

কোন গ্রন্থমালার সবচেয়ে ভাল পরিচিতি বোধ হয় তার প্রথম বইটি। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্র-নাথ ঘোষের "কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো?" অবশ্যই রত্নসাগর গ্রন্থমালা সম্বন্ধে পাঠক সাধারণকে সশ্রদ্ধ করে তুলবে। কলেজপাঠ্য নোট-বইস্তরের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লেখা বাদ দিয়ে অর্থনীতির কোন শাখাতেই বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি অঙ্গুলিমেয়। তারপর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা অনেকেই জানি যে এই বিদ্যাটিতে পণ্ডিত বাঙ্গালীর অভাব না থাকলেও, তাঁরা যখন মাতৃভাষায় কলম ধরেছেন, তখন পরিভাষার পাথরে হোঁচট খেতে খেতে তাদের লেখা এমন একটা রূপ ধরে যা প্রায়ই সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। আলোচ্য বইটি এ দিক দিয়ে প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। এ বই পড়ে পাঠক শুধু যে কিছু জানতেই পারবেন তা নয়, পড়তে পড়তে কখনই তাকে পঙ্গুভাষা বা বিকৃতপ্রকাশভঙ্গীর সম্মুখীন হয়ে বইটি হাতে করার জন্য আফশোষ করতে হবে না।

বইটিতে লেখক অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞ পাঠকদেরই চোখের সামনে রেখেছেন। কিন্তু নিজের সামান্য সঞ্চয় কোন জাতীয় ব্যাঙ্কে রাখা নিরাপদ তা বলতে গিয়ে তিনি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং-এর কয়েকটি মূলগত তত্ত্ব যেরকম প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন, তাতে এ-টি অর্থনীতির ছাত্রদের কাছেও মূল্যবান হয়ে উঠবে। 'লিকুইডিটির' প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কর্তব্য, কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যেহেতু 'কমার্শিয়াল' প্রতিষ্ঠান সুতরাং তার

কারবারের মাধ্যমে মুনাফা সঞ্চয়ের প্রতিও তাকে নজর রাখতে হবে। এবং সমাজের অর্থের ভাণ্ডারী হিসেবে ব্যাঙ্কমাত্রেই সামাজিক দায়িত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সমাজস্বার্থ ও জাতীয় অর্থনীতির প্রগতির প্রতিও তার দায়িত্ব অনস্বীকার্য্য। এই পরস্পর বিরোধী চাহিদাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও, অসম্ভব নয়। বরং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংয়ের সাফল্যের মূল সর্ত্ত-ই হচ্ছে এ জাতীয় সামঞ্জস্য বিধানে। সত্যিকারের সফল তথা নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক হচ্ছে কেবলমাত্র সেই প্রতিষ্ঠান যা তার সম্পদের অংশ প্রয়োজনমত 'লিকুইড্' বা নগদটাকায় পরিবর্ত্তনযোগ্য রেখেও তার সম্পদবিনিয়োগ পদ্ধতি এমনভাবে পরিচালিত করতে পারেন যা জাতীয় বৈষয়িক প্রগতির সহায়ক, এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে লাভজনকও বটে। কিভাবে এরকম নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক চেনা যায় সে সম্বন্ধে সুদক্ষ আলোচনা "কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো?"-তে পাওয়া যায়।

বইয়ের শেষ অংশে ব্যাঙ্ক বিপর্য্যয়ের কারণ—বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার এ সঙ্কটের মূলগত উপাদানগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান আলোচনা রয়েছে। লেখককে ধন্যবাদ তিনি শুধু কারণ নির্দেশ করেন নি। সমাধানও বাৎলেছেন। এ সমাধান যে শুধু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে দুর্নীতিদমন করেই হবে না সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখক প্রয়োজনমত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রসার ও অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের ভার সরকারী পরিচালনায় আনার প্রস্তাবও করেছেন। এ দুটি প্রস্তাবই বিশেষ সমর্থনযোগ্য। বইটির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

সুব্রতেশ ঘোষ

রঙ ও রূপ ॥ ডাঃ সচ্চিদানন্দ কুমার ॥ রত্নসাগর গ্রন্থমালা। দুই টাকা

রঙ আছে বলেই আমরা দেখি এবং না থাকলে আমরা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতুম না,—এই বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু হয়ত সকলেরই জানা আছে; কিন্তু রঙের ব্যবহার এবং মনের ওপর তার প্রভাব নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই পুস্তিকাখানিতে জনসাধারণের গ্রহণোপযোগী করে লেখা হয়েছে তাহা সত্যই যুগোপযোগী। রঙের বৈজ্ঞানিক এবং আটপৌরে ব্যবহার ছাড়াও আধুনিক চিত্রকলায় শিল্পীরা রঙের যে মননশীল প্রলেপের ব্যবহার করেন তার স্বরূপ না বোঝবার ফলে ছবি অনেক সময়হিজিবিজি হেঁয়ালা বলে ভ্রম হয়। চিত্ররস পিপাসু জনসাধারণ এই পুস্তিকাখানি পড়ে যে এদিক থেকে উপকৃত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত হলেও লেখার গুণে বক্তব্যটি বেশ প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

নরেন মিত্র

সমকালীন

পঞ্চমবর্ষ : আষাঢ় ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪ চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও

মধুসূদন কিন্নর ও ঢপগান

দীপ্তি ত্রিপাঠী

ঢপ গানের প্রবর্ত্তন হয় উনবিংশ শতকে। অনুমান ১৮২৫—৩০ সাল থেকে সুরু হয়ে এ গান বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ রীতির প্রথম উদ্ভাবক কে বলা কঠিন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্যের মতে—"ঢপকীর্ত্তন পূর্ব্বে ছিল না, মধুসূদনই এই কীর্ত্তনের জন্মদাতা।"[১] কিন্তু "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে আছে মধুসূদন ঢপগান রাধামোহন বাউলের কাছে শিক্ষা করেন।[২] ঢপগানের আর এক প্রসারক রূপচাঁদ অধিকারী সম্বন্ধেও শোনা যায় তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষান্তে ঢপকীর্ত্তন সুরু করেন।[৩] এই সন্ন্যাসী এবং রাধামোহন বাউল এক ব্যক্তি কিনা তা জানা যায় না। রাধামোহন বাউলই বা ঢপগান কোথা থেকে শিখেছিলেন অথবা তিনিই তার প্রবর্ত্তক কিনা তাও জানা যায় না। রাধামোহন বাউল সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তাহলে তিনিও ছিলেন মধুসূদনের জেলা যশোরের লোক। তাঁর গ্রামের নাম ছিল বারখাদিয়া। রূপচাঁদ অধিকারী মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার অধিবাসী ছিলেন। ঢপগানে ইনি খুব নাম করেন। এখনো মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত আছে "বাজলো রূপ অধিকারীর খোল মেয়েরা সব চরকা তোল"। কিন্তু রূপ অধিকারীর গানের সংগ্রহ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ভূমিকা, বঙ্গভাষার লেখক পৃঃ ৩৮৫ এবং ডক্টর সুকুমার সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা পৃঃ ১০৫৩ (১ম সং) এঁর উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

মধুসূদন কিন্নর ঢপগানের প্রথম প্রবর্ত্তক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই ঢপগানকে জনসমক্ষে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিই। যশোর, কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একদা মধুসূদনের কীর্ত্তন শোনবার জন্ত লোকে লোকারণ্য হোত শোনা যায়। তৎকালীন ধনী ও শিক্ষিত পরিবারে ঢপ গানের সমাদর তাঁরই প্রচেষ্টায় বৃদ্ধি পায়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর গৃহে প্রতিবৎসর নিয়মিত মধুসূদনের গান হোত।

১ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য—মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ১৩১৭ পৃঃ ৫৪

২ বঙ্গভাষার লেখক—মধুসূদন কিন্নর। পৃঃ ৩৬২

৩ ঐ —রূপচাঁদ অধিকারী। পৃঃ ৩৮৫

অনুমান ১২১২ সালে[৪] উলসি বা উলুসিয়া গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়। এই উলসি গ্রাম যশোর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত। বঙ্গভাষার লেখকের মতে ১২২৫ সালে মধুসূদনের জন্ম হয়। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য সরকারী কাজে উলসিতে যান এবং সেখানে মধুসূদনের সাক্ষাৎ শিষ্য ও আত্মীয় হৃদয় কিন্নর বা আবদুল লতিফ, উদ্ধব কিন্নর বা উত্তমবিশ্বাসের কাছ থেকে মধুসূদনের জীবনী-সংগ্রহ করে ১৩১৭ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। উপরে বর্ণিত শিষ্যরা সকলেই মধুসূদনের সঙ্গে ঢপকীর্ত্তন গাইতেন। এঁদের মধ্যে আবদুল লতিফ মধুসূদনের মৃত্যুকালে সেবাযত্ন করেছিলেন। এ কারণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্যের সংগৃহীত জীবনীই অধিক প্রামাণ্য মনে হয়। শ্রীযুক্ত আঢ্য যখন উলসিতে কবির জন্মস্থান দেখতে যান তখনই সে স্থান প্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বর্ণনায় পাই,—

> "এই উলসি গ্রাম যশোর জেলার অধীন বনগ্রাম মহাকুমার অন্তর্গত সার্শা নামক পুলিস স্টেসনের অধীন। গ্রামটি মধ্যবঙ্গ রেলের (বি, সি, রেল) (যাদবপুর) নাভরণ স্টেশন হইতে দক্ষিণপূর্ব ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে একটি সামান্য বাজার ও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি পাকাবাড়ী আছে, কিন্তু গ্রামের ভিতর বাঁশ ও নানা প্রকার আগাছার জঙ্গল দ্বারা পরিপূর্ণ, তথাপি দেখিলেই মনে হয় কোন সময় ইহা একটি বিশিষ্ট গ্রাম ছিল। উলসির বাজার হইতে অনুমান পূর্ব্বদিকে এই কাণ বা কিন্নরদিগের বসবাস। সে স্থানটিও জঙ্গলময়, এমন কি দিবসেও অনেক সময় তথায় সূর্য দেখা দেন না। ঐ জঙ্গল মধ্যে দুই এক ঘর করিয়া কিন্নর, মুসলমান, কয়েকঘর ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতীয়ের বাস আছে। বেতনা নদী এই গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহিনী, প্রথমতঃ, তাহা উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া যে স্থানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে ঐ স্থানের দক্ষিণ প্রায় এক রশির মধ্যে এই স্বনামধন্য মধুসূদনের বসত বাটী। তথায় কিছু দেখিলাম না, কয়েকটী নারিকেল গাছ জবাদি ফুলগাছ[৫] ও কয়েকখানি কালিপড়া ইটমাত্র দেখিলাম।"

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে নট বলে একটি জাত ছিল—তারা নাচ, গান করে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। রাজা, জমিদার প্রভৃতি ধনীরা এঁদের সমাদর করতেন। এমন কি মুসলমান নবাবরাও এঁদের খাতির করতেন। নটদের সম্মানসূচক উপাধি ছিল কিন্নর। কিন্নর শব্দেরই অপভ্রংশ "কাণ"। মধুসূদন কিন্নর বা মধুসূদন কাণ এই নট জাতির লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর "যশোর খুলনার ইতিহাসে" (২য় খণ্ড, ১৩২৯ সাল) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "কিন্নরগণ নৃত্যগীত ব্যবসায়ী। উহারা চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাজত্বকালে ঝিকারগাছার নিকটবর্ত্তী লাউজানির পার্শ্বে গরিবপুরে আসিয়া বাসকরেন। পরে পাঠানদিগের অত্যাচারে সেখান হইতে উঠিয়া যাদবপুরের দক্ষিণে সামটা ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী হন ; সেখানে ৪।৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র

---

৪ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য। অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৩

৫ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য। অপর পৃষ্ঠা দ্রঃ। পৃঃ ৫৩

উলসী গ্রামে ১৪।১৫ ঘর আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ জন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হাটগাছা কালনায় কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্গে তাহাদের দুই একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। সুকবি মধুসূদন কিন্নর বা ঢপ সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক স্বনামধন্য মধুসূদন কাণ পীযূষবর্ষী সঙ্গীতে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।"[৬]

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যশোর খুলনার ইতিহাস একটি অতি সুলিখিত এবং প্রামাণ্য পুস্তক বাংলা দেশের প্রদেশ অঞ্চলের যত ইতিহাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের মতে এই গ্রন্থটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীসতীশ মিত্র মহাশয়েরও মতে মধুসূদন কিন্নরই ঢপগানের প্রবর্ত্তক। তিনি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করছি,—

"পশ্চিমবঙ্গে দাশু রায় ও গোবিন্দ অধিকারী প্রধানতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেশজয় করিয়াছিলেন, যশোহরেও উলসী-নিবাসী মধুবর্ষী মধু কাণ (কিন্নর) তেমনই নতুন ধরণে নতুন সুরে কীর্ত্তন গাহিয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। কপোতাক্ষীকূলে দত্ত মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা" বিরহের যে সুরভঙ্গী দিয়াছিলেন বেত্রবতীকূলে কিন্নর মধুসূদনও তেমনই তাঁহার "ঢপ" সঙ্গীতের বিভিন্ন পালায় নতুন পদ্ধতির পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন।"[৭]

এই কারণেই বলেছিলাম ঢপগান আর কেউ সৃষ্টি করে থাকলেও এর প্রচার ও প্রসার মধুসূদনই এমন সুষ্ঠুভাবে করেন যে ঢপগান ও মধুসূদনের নাম ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল।

মধুসূদনের জীবন সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাতে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল আনন্দ কাণ। তিনিও নটজাতির জাতীয় ব্যবসা সঙ্গীতচর্চ্চা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন—লেখাপড়া জানতেন না। তাঁর আরো দুটি পুত্র ছিল—যাদব ও তারক। বঙ্গভাষার লেখকের মতে মধুসূদনের পিতার নাম ছিল তিলকচন্দ্র কিন্নর।[৮] তিলকের চারপুত্র—মধুসূদন, যাদবচন্দ্র, শশীভূষণ এবং তারকনাথ। যাই হোক দুই জীবনী-লেখকেরই মতে মধুসূদনের পিতা অশিক্ষিত ছিলেন এবং ছেলেদেরও লেখাপড়া শেখাবার কোন ব্যবস্থা করেন নি। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভা ছিল। এই প্রতিভার বলে তিনি পরে বাঙ্গলা পড়তে শেখেন কিন্তু লিখতে পারতেন না। তিনি গান রচনা করে বলে যেতেন। একজন লেখক সেগুলি লিখে নিতেন।

"...কিছু বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে নিজের উদ্যোগ কেবলমাত্র বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, লিখিতে পারিতেন না,—ইহাই প্রসিদ্ধি।"[৯]

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর সঙ্গীতের শব্দ বিন্যাস দেখলে তা বিদ্বান লোকেরই রচনা মনে হয়। উপমা, অনুপ্রাস, যমকের প্রয়োগে, সংস্কৃত শব্দ চয়নে, ভাষার লালিত্যে তাঁর সঙ্গীতগুলি বাস্তবিকই শ্রবণ মনোহর। যেমন,—

৬,৭ সতীশচন্দ্র মিত্র। যশোহর—খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড ১৩২৯ সাল পৃঃ ৮৩৬,৮৬২

৮,৯ বঙ্গভাষার লেখক পৃঃ ৩৬১

দেখলাম আজি বৃন্দাবনে,

সেই যমুনা পুলিনে

পঙ্কে পড়ে পঙ্কজমুখী র'য়েছে পঙ্কজবনে।

লয়ে বারি পদ্ম-পত্রে কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,

তথাপি না মেলে নেত্রে বারি বহে দুনয়নে।[১০] ইত্যাদি

প্রতিভাবান মধুসূদনের প্রতিভার স্ফুরণ প্রথম থেকেই দেখা যায়। বাল্যকালেই সঙ্গীত রচনায় তিনি ক্ষমতা দেখান। ষোলবছর বয়সে সঙ্গীত ভাল করে শেখবার জন্য তাঁর আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। বঙ্গভাষার লেখকের মতে—

"মধুসূদন ঢাকা নগরীতে ছোট খাঁ বড় খাঁর নিকট রাগরাগিনী ও খেয়াল এবং রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপগান শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[১১]

কুড়িবছর বয়সেই মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। তিনি সঙ্গীত রচয়িতা বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। প্রথমে তিনি দুই একটি মার্গসঙ্গীত বা কালোয়াতী গান রচনা করেন। তাতে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারেন নি। তার পরেই তিনি এক নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করেন। এই রীতিই হোল—'ঢপ'। মধুসূদন এরপর ঢপকীর্ত্তনের দল গঠন করেন। তাঁর দলে ২৫।৩০ জন লোক ছিল। এদের প্রতি-দিনের আহার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনি যোগাইতেন। তাছাড়া তাঁর দলের প্রত্যেকই কেউ মাসিক বেতন, কেউ বা গানের লাভের অংশ পেত। মধুসূদনের গানের খ্যাতি ক্রমে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এতে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করেন। সাংসারিক অবস্থাও তাঁর স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। তাঁর পিতা এই স্বচ্ছল অবস্থা দেখে যান।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্যের বর্ণনায় কাবর জন্ম ভিটায় যে নারকেল গাছের উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় করেছি তারি কাছে একটি খড়ের বৈঠকখানায় মধুসূদন তাঁর দলবল নিয়ে গানের রেওয়াজ করতেন।

প্রবাদ আছে মধুর ভাই যাদব বৈশাখমাসের একদিনে বাগানকরবার জন্য বৈঠকখানার দক্ষিণে মাটি খুঁড়তে সুরু করে একটি স্থানে কিছু ইট বের করেন। সেদিনের মত কাজ শেষ করে রেখে গেলে রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে জায়গাটি পীরের স্থান। মাটির নীচে পীরের পাকা দরগা আছে। পীর ক্রুদ্ধ হয়ে যেন স্বপ্নে যাদবকে এজন্য তিরস্কার করে বলছেন—নিজেদের সুখের জন্য বাগান করতে গিয়ে আমার পিঠ ফেটে রক্তপাত করছিস—তোদের আর রক্ষা নেই।[১২]

এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে সকলের পরামর্শে মধুসূদন সেই স্থান থেকে উঠে গিয়ে নূতন বাস-স্থান তৈরী করেন। এ সময়ে মধুসূদনের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তার পূর্ব্বেই তাঁর বিবাহ

১০, ১১ বঙ্গভাষার লেখক—পৃঃ ৩৬২

১২ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য—পৃঃ অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হয়। মধুসূদনের দুই স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সন্তানাদি ছিল না। বঙ্গভাষার লেখকের মতে মধুসূদনের শ্বশুরের নাম ছিল নারায়ণ কিন্নর। মধুসূদনের দুই স্ত্রীই ইঁহার কন্যা ছিল কিনা জানা যায় না। মধুসূদনের এক পুত্র দুই কন্যা ছিল। তবে বঙ্গভাষার লেখক যখন লিখেছিলেন তখনি তাঁর সন্তানের সবাই গত হয়েছিলেন।

পূর্ব্ববর্তী বাসস্থানে তাঁরা বছরে একটিবার পীরের সন্তোষ বিধানের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে রন্ধন ও ভোজন করতেন। শ্রীযুক্ত আঢ্য এজন্য সেখানের ইঁটের ওপর কালীর দাগ দেখতে পান। গ্রামবাসীরা বর্ত্তমানে মধুসূদনের বাসভবন বলে যা দেখায় তা প্রকৃত পক্ষে তাঁর নূতন বাসভবন—জন্মভিটা নয়। এ বাসস্থানও অবশ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শ্রীযুক্ত আঢ্য মহাশয় লিখেছেন—"মধুসূদনের এই নূতন বাসস্থানে কতকগুলি ফুলগাছ, ভগ্ন ইঁট ও মাটির ঢিপি দেখলাম।"১৩ মধুসূদনের ভ্রাতাদেরও কোন সন্তানাদি ছিল না। তাঁর তিনটি বোন ছিল—হর, সারদা ও বাণী। শ্রীযুক্ত আঢ্য যখন প্রবন্ধ লেখেন অর্থাৎ ১৩১৭ সনে বাণী জীবিতা ছিলেন এবং কোলকাতায় কোন প্রখ্যাত কীর্ত্তনওয়ালীর দলে গান করতেন। এ ভিন্ন হরর নাতনী ভুবনেরও একটি ঢপের দল ছিল। বঙ্গভাষার লেখক প্রণেতাও লিখছেন মধুসূদনের পর—"...ইঁহার ভগিনীগণ দল চালাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকে তাঁহার রচিত ঢপগান করেন।"১৪ সম্ভবতঃ এই জন্যেই পরবর্ত্তীকালে ঢপগান অর্থেই ঢপওয়ালী বা স্ত্রীলোকের গান এমন একটি ধারণা হয়। মধুসূদনের স্বজাতির মধ্যেও আরো দু তিনটি এমন দল ছিল।

মধুসূদন জীবিতকালে যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ পেয়েছিলেন। অনেক ধনী লোকের বাড়ীতে তাঁর গান প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে হোত। কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে রাসের সময় তিনি প্রতি বছর গাইতে যেতেন। ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে মধুসূদন তাঁর দলবল নিয়ে রাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ী কাসিমবাজারে যাত্রা করেন। তখন বি, সি, আর কিংবা ই, বি, এস, আর রেলপথ হয় নি। অতএব তাঁরা পদব্রজেই যাচ্ছিলেন। মধুসূদনের তখন বেশ বয়স হয়েছে তার উপর পথশ্রমে, আহারের অনিয়মে গোয়াড়ীতে পৌছেই তিনি জ্বরে পড়েন। পরে জানা যায় পান-দোষের জন্য তাঁর প্লীহা ফেটে গেছে। পাঁচদিনের দিন অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করে তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীযুত আঢ্যের প্রবন্ধে মধুসূদনের মৃত্যুকালীন লক্ষণের বিশদ বর্ণনা আছে। কৌতূহলী পাঠক সেটি দেখতে পারেন।

বঙ্গভাষার লেখক এবং মধুসূদন কাণের ঢপকীর্ত্তনের সঙ্কলনকারী শ্রীপাঁচকড়ি দের মতে ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে ঢপগান করতে গিয়ে তাঁর যকৃত, বুকে ও পেটে ভয়ঙ্কর বেদনা হয়। এই রোগেই ৫৫ বৎসরে বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারাণ আঢ্যের লিখিত জন্ম সন ধরলে মধুসূদনের বয়স তখন ৬৩।৬৪ বৎসর হয়। শোনা যায় কৃষ্ণনগরের কোন ব্যক্তি নাকি তাঁর ফটো রেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ফটোর সন্ধান অনেক

১৩ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা ১৩১৭) পৃঃ ৫৫

১৪ বঙ্গভাষার লেখক। পৃঃ ৩৬২

চেষ্টা করেও আমি পাই নি। মধুসূদনের দেহ ভস্মীভূত বা কবরস্থ না করে খড়ি বা খোড়ে নদীর জলে নিমজ্জিত করা হয়। মধুসূদনের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হওয়ামাত্রই কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর বহু লোক তাঁকে দেখতে আসেন। অন্তে হিন্দু বা মুসলমান কোন প্রথাই অবলম্বন না করার কারণ হোল নটেরা উভয় সমাজেই যাতায়াত করতেন বলে দুই সমাজেরই কতক কতক নিয়ম মেনে চলতেন। তাঁরা যেমন মুসলমান পীর পয়গম্বরদের মানেন তেমনি মানেন গোস্বামীদেরও। এই উভয় কুল বজায় রাখবার জন্য মধুসূদনের দেহ নিমজ্জিত করা হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত আঢোর লেখা থেকে জানা যায় তিনি তখনি এই নট জাতিকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে তৎপর দেখে এসেছিলেন। ধর্ম্মান্তরের পর মধুসূদনের সঙ্গী হৃদয়ের নাম হয় আবদুল এবং উদ্ধব কাণের নাম হয় উত্তম বিশ্বাস। এর কারণ জিজ্ঞাসায় তারা বিবাহাদির অসুবিধার কথা উল্লেখ করে। শ্রীযুক্ত সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর খুলনার ইতিহাসেও দেখা যায় আপন গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বিবাহের ফলে নটজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হয়ে এসেছে। যাই হোক একটি বিষয় লক্ষণীয় উনবিংশশতকের গীতকারদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন হিন্দুসমাজের অধঃস্তন স্তর থেকে যেমন কৃষ্ণকান্ত চামার, ভোলা ময়রা, রঘুনাথ দাস তন্তুবায়, মধুসূদন কিন্নর ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁরাই সে যুগের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ তার একটি কারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম যে জাতিকুলমান নির্ব্বিশেষে সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের চিৎপ্রকর্ষের সুযোগ দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমান আমলেও যে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল ইংরেজ রাজত্বের সময়ে তা বিনষ্ট হয়ে গেল নইলে লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য ১৩১৭ সনের (ইং ১৯১০-১১) মধ্যেই কি করে দেখলেন মধুসূদনের স্বজাতিবর্গের অনেকেই ইসলামকে আলিঙ্গন করছে? অথচ সে যুগের আদিরসের স্রোতের রুচিহীনতার থেকে দূরে যে কয়জন কবি নির্ম্মল বৈষ্ণবসঙ্গীতের ধারা পুনরায় বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করেছিলেন তার মধ্যে মধুসূদন কিন্নর অন্যতম।

"ঢপ" কথাটির অর্থ জানা যায় না। শব্দটি দেশজ। সম্ভবতঃ কীর্ত্তনের মত বৈষ্ণবেরা একে স্বীকার করে নেননি বলে কীর্ত্তন থেকে পৃথক বোঝাবার জন্য "ঢপ" কথাটি বসেছে। কারণ ঢপ কীর্ত্তনের মতই ব্রজলীলা বিষয়ক সঙ্গীত। তবে ঢপকীর্ত্তনের গায়ক কীর্ত্তনের যে বাঁধা ধরা নিয়ম অর্থাৎ আগে গৌরচন্দ্রিকা পরে বিভিন্ন মহাজনদের পদাবলীর কীর্ত্তন তা মেনে চলতেন না। এ সঙ্গীতে গায়ক নিজের রচিত পদ গাইতেন কখনো বা আখরের বদলে ভাবটি প্রকাশের জন্য বক্তৃতার মত বলতেন যাকে তুক বলা হয়। মোটের উপর এ রীতি কীর্ত্তনের মত অত বাঁধাধরা ছিল না। জনপ্রিয় করবার জন্য কিছুটা হাস্যরস পরিবেশিত হোত। খেমটা ও কবিগানের সুরেরও কিছু কিছু প্রভাব এরমধ্যে পড়ে ছিল। ডক্টর সুরেশ চক্রবর্ত্তীর মতে ঢপ দুরকম ছিল—(১) ঢপ কীর্ত্তন (২) ঢপ যাত্রা। ঢপ যাত্রা ছিল মেয়েযাত্রা। এর পাত্রপাত্রী সব মেয়েরা সাজত। পোষাক পরত যাত্রাদলের মত। ঢপকীর্ত্তন অবশ্য পুরুষেরা করতো তার প্রমাণ মধুসূদন কিন্নর বা রূপচাঁদ অধিকারী। কিন্তু মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁর দল চালাতে

থাকেন তাঁর বোনেরা। সম্ভবতঃ তখন থেকেই ঢপগান স্ত্রীলোকের গানে পরিণত হয়। ডক্টর সুরেশ চক্রবর্ত্তী বলেন তিনি যে ঢপগান শুনেছিলেন তার গায়িকার নাম ছিল সম্ভবতঃ ত্রৈলোক্যময়ী।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে (মধুসূদন কাণের সঙ্কলনকারী) লিখেছেন—

> "ঢপকীর্ত্তন গায়ককে একাই সর্ব্বচরিত্রের অভিনয় করিতে হয়;......সেজন্য গায়ক, কে কি বলিতেছে, উক্তির পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিবেন। যে স্থলে ছোট ছোট উক্তি বা প্রশ্নোত্তর, তথা স্বরের ভিন্নতা এবং হস্ত ও মুখের তদনুযায়ী ভঙ্গি দ্বারা বক্তৃতা করিলে শ্রোতাদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।"১৫

মধু কাণের ঢপকীর্ত্তনগুলি পাঠ করলে মনে হয় তা কীর্ত্তন ও যাত্রার মধ্যবর্ত্তীর স্তর। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন—"কীর্ত্তন গান হইতে ঢপ (অর্থাৎ পাঁচালীর পূর্ব্বরূপ) তুক, (ভাঙা কীর্ত্তন), পাঁচালীর ও যাত্রার উদ্ভব হয়। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শীল "বাঙ্গলা সাহিত্যে নাটকের ধারা"য় বলেছেন..."কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া ঢপকীর্ত্তন ও ঢপকীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া' যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল।" তাঁর মতে পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয় নি।—কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন—"পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়।"১৬ উপরের বিসংবাদ দেখে এবং মধুকাণের ঢপকীর্ত্তন পাঠে মনে হয় নিম্নলিখিত ভাবেও যাত্রার উৎপত্তি হতে পারে।

```
            কীর্ত্তন
               |
   |           |           |
  ঢপ          তুক        পাঁচালী
   |           |           |
   -------------------------
               |
             যাত্রা
```
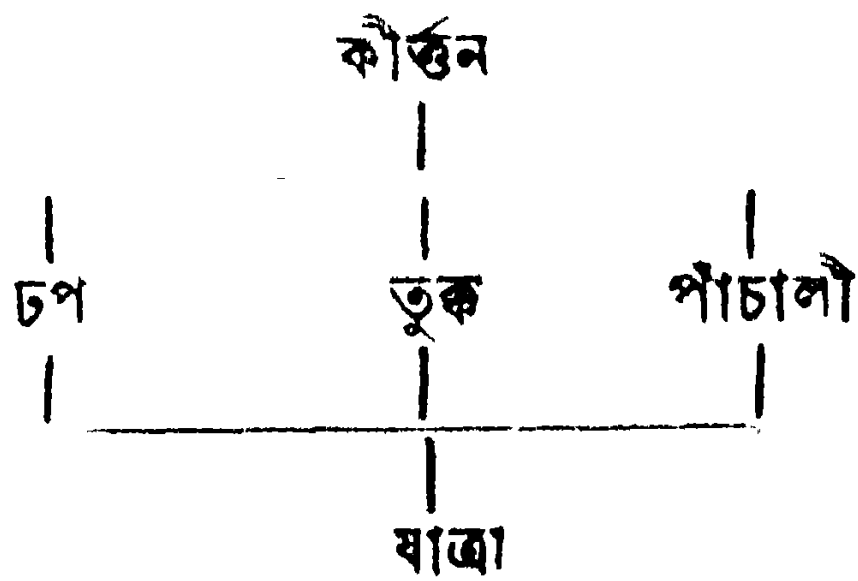
আসলে ঢপগানে সঙ্গীতের একটি Transition বা স্তরান্তরের যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই এখানে কিছুটা কীর্ত্তনের মত, কিছুটা পাঁচালীর মত আবার কিছুটা যাত্রার মত ছিল। যেমন কীর্ত্তনের মত এর বিষয় ছিল ব্রজলীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। মধুসূদন কাণের যে চারটি পালা মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় তাদের নাম যথাক্রমে কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুর সংবাদ, মাথুর, প্রভাস।১৭ কিন্তু কীর্ত্তনের বিশুদ্ধ রীতি এ গানে অনুসৃত হোত না। কীর্ত্তন গায়কদের চেয়ে

১৫ শ্রীপাঁচকড়ি দে—মধুকাণের ঢপ কীর্ত্তন। ভূমিকা পৃঃ ২

১৬ বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা পৃঃ ১০৫৪ (১ম সং)

১৭ বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থপাঠে জানা যায় মধুসূদনের উক্ত চারটি পালা প্রথম ১২০৮ সালে ৫৪।১ কলেজ ষ্ট্রীট থেকে প্রসন্নকুমার দত্ত প্রকাশ করেন। এর সম্পাদনা করেন শ্রীমহিমচন্দ্র বিশ্বাস। বর্ত্তমানে শ্রীপাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত এই চারটি পালা "মধুকাণের ঢপকীর্ত্তন" নামে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে।

ঢপের গায়ক অনেক বেশী অঙ্গভঙ্গি করতেন। কীর্ত্তনের যেমন ছিল আখর ঢপের তেমনি কথা এবং ধূয়া। কিন্তু আখর ছিল সংক্ষিপ্ত—ঢপে তা বিস্তৃত হয়ে 'কথায়' পরিণত হয়েছে।

আবার পাঁচালীর মত ঢপের পালা বাঁধা হোত কেবলি মহাজন পদাবলী গীত হোত না। পাঁচালীর মতই মূল-গায়ক থাকতো একজন। যাত্রার মত পোষাক ব্যবহার করা হোত কিন্তু যাত্রার যেমন একাধিক অভিনেতা থাকে ঢপে তা ছিল না। ঢপে বিভিন্ন রীতির মিশ্রণ দেখা যায় —এতে কীর্ত্তনের মত ব্রজলীলাবিষয়ক সঙ্গীত ছিল আবার যাত্রার মত সংলাপও ছিল। মধুসূদন কাণের ঢপ কীর্ত্তনে ভক্তিরসের প্রাধান্য দেখা যায়। রামপ্রসাদী সুরের মত তাঁরও একটি বিশেষত্ব থাকায় "মধুকাণী" সুর সাধারণের কাছে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর অধিকাংশ গানেই সূদন ভণিতা দেখা যায়। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে প্রবাদ আছে মধুসূদন বলেন মধু পাছে বিষয় হয় এজন্য মধু নামের ভণিতা তিনি দেন না।

মধুসূদনের চারটি পালার কিছু কিছু অংশ তুলে দিলেই ঢপগান যে প্রকৃতপক্ষে কীর্ত্তন পাঁচালী ও যাত্রার ত্রিবেণী সঙ্গম তা বোঝা যাবে। কলঙ্কভঞ্জন পালাটি প্রথম উদ্ধৃত করছি।

কলঙ্ক-ভঞ্জন

পালা আরম্ভ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে গৌরবিণী। তাঁহাকে গুরুজনগণ শ্যাম-কলঙ্কিনী বলে গঞ্জনা দেয়, তাইতে একদা তিনি অভিসারে গমন না করে অভিমানবশতঃ মনে মনে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ আমার এ কলঙ্ক না ঘুচাবেন, ততক্ষণ আমি শ্যাম দরশনে যাব না। তুমি—

ধূয়া

বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর।
মনের সাধ পূরাতে পার॥

কথা।

তখন শ্রীরাধিকা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নির্জ্জন কক্ষে বসলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে সঙ্গে ল'য়ে রাধা কুণ্ডের তীরে গিয়া দেখেন, তখনও শ্রীরাধার আগমন হয় নাই; অভিসারের সময় অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে। তখন সুবলকে সখেদে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, সুবল! রাধা বিনা আমার প্রাণ বাঁচেনা! এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেন ;—

ধূয়া।

এই স্থানে ব'স তুমি।
বৃন্দের কুঞ্জে যাই আমি॥

কথা।

তখন কাঙ্গালের ন্যায় বৃন্দের মদন-কুঞ্জে উপস্থিত হয়ে—

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, অদ্য অভিসারের সময় বয়ে গেছে। আমার প্রাণবল্লভ রাধিকা এখনও এলেন না কেন?

নয়নের তারা আমার রাধিকা সুন্দরী।
একতিল না হেরিলে রহিতে না পারি ॥

অতএব তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি উত্তর দেন। ইত্যাদি।

উপরের অংশেই লক্ষনীয় গীতিকবিতাকে নাটকের সংলাপ কি ভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। কীর্ত্তনের মত ঢপগানে ধূয়া, তান, সুর সবই আছে তথাপি সংলাপ এখানে অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণনাথ শীল এজন্যই বলেছেন—"ঢপে আসিয়া কীর্ত্তন নাটক হইয়া উঠিল।"১৮ তবে নাটকে বা যাত্রায় অনেক পাত্রপাত্রী থাকে ঢপে পাত্র একটি সে হইল মূল-গায়ক। ঢপের বহু বৈশিষ্ট্য পরে যাত্রায় গ্রহণ করা হয়। বাংলাসাহিত্যে নাটকের ধারায় বৈষ্ণনাথ বাবু তার একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন। তবে প্রধানতঃ ঢপের সঙ্গে কীর্ত্তনের যেটি মৌল পার্থক্য তা এই সংলাপ। যাত্রায় ক্রমশঃ এই সংলাপের প্রাধান্যই বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ঢপে সংলাপ ঠিক ততখানি প্রাধান্য লাভ করে নি। যেমন মধু কাণের "অক্রুর সংবাদ" পালায় দেখি শ্রীকৃষ্ণকে অক্রুর রথে করে যখন নিয়ে চলেছেন তখন গোপিনীদের বিলাপ পরপর নয়টি সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে সংলাপ অতি স্বল্প। অংশটি উদ্ধৃত করলেই বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে।

...ললিতা শশব্যস্তে শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রবেশ করলেন। দেখেন রাধা অবনতবদনে উপবিষ্ট, রোদন করিতেছেন। ললিতা তাই দেখিয়া বলেন ;—

গীত

রাগিনী পরজ। তাল ঢিমা কাওয়ালী।
বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণ হরি' যায়।
(হায় প্রাণ-হরি আমাদের প্রাণ হরি' যায়)
ঐ শুন রাই নন্দের ভেরী, 'যায়' ব'লে বাজায় ॥
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য' করিবে না এই ছিল ধার্য্য
সে কথা হ'ল অগ্রাহ্য, না ব'লে যে যায় ॥ ইত্যাদি

ক্ষণকাল পরে বিশাখা বলেন,—

গীত

রাগিনী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান
আয় না গো রথ দেখতে যাই প্যারী! ত্বরা করি।
সকলে সকালে গেল, আমরা কেন কেঁদে মরি ॥
আয় না শুভযাত্রা হেরি, যাত্রা পরিবর্ত্তন করি,
কি কাজ থেকে আর এ যাত্রায়, এক যাত্রায় যাত্রা করি ॥
কই কিশোরী আয় কিশোরী কাজ কি শরীরে,
হরি যদি হরে তবে আয় না লো মরি ;

১৮ বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা পৃঃ ৮০

প্রাণ তুল্য বল যারে, সে ভাঙ্গল ব্রজের বাজারে,

সুদন কয় রথের বাজারে একবার এসে দেখনা প্যারী ॥

কীর্ত্তন

তখন বেরুল রাই কমলিনী।

চারিদিকে চায় রে আলু থালু পাগলিনী ॥

ওঠে পড়ে যায় ধায়, কেঁদে বল গো আমায়

ফুরাল বল, বল গো আমায়, আমার মদনমোহন কোথায় গেল ? ইত্যাদি।

তখন— উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়,

ধায় রাধা যেন পাগলিনী।

আলু থালু কেশো যায়, আর কাঁদি কাঁদি কয়,

কোথা গেলে পাব গুণ মণি ॥

আহা! নিতম্বে চরণ ভারি, সত্বর চলিতে নারি

ব্রজনারীগণ করে ধরি।

কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বরা ক'রে,

হেরিতে পরাণ বঁধু হরি ॥

আহা !—একে ব্রজের কঠিন মাটী

তাহে—কমল কোমল পদ দুটী ।।

কমলিনীর—চরণে তৃণটি ফুটে

কৃষ্ণ উহু উহু ক'রে উঠে ॥

গীত

রাগিনী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংস গতি।

কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি ॥ ইত্যাদি।

তখন ললিতা অগ্রেতে রথের সান্নিধ্যে গিয়া কহিতেছেন,—

গীত

রাগিনী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি!

যবে নিলে নীল কান্ত মণি, ঐ এল সেই চাঁদবদনী ইত্যাদি

তথাপি রথ স্থগিত করিলেন না। তখন শ্রীবৃন্দা আসিয়া কহিতেছেন—

গীত

রাগিনী বিভাস। তাল তিওট।

দাঁড়াও হরি এল প্যারী, সকলে বদন হেরি। ইত্যাদি।

তথাপি রথ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল দেখিয়া বৃন্দা পুনর্ব্বার কহিতেছেন ;—

গীত

রাগিনী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান

রথ রাখ বংশীবদন　হেরিব বদন

রথ রাখ, কথা রাখ,　একবার মোরা দেখি দেখ,

যাই রাই বলে ডাক

শুনে যাই কথাটি মিঠে কেমন॥ ইত্যাদি

তথাপি রথের গতি নিবৃত্ত হইল না। তখন বিশাখা বলেন—

গীত

রাগিনী জয় জয়ন্তী। তাল-ঢিমা তেতাল।

রথ রাখ সারথি　দেখাও রথি,

দয়া নাহিক এক রতি।

যুগল করে করিব এই আরতি॥ ইত্যাদি

কথা

তথাপি রথবেগ স্থগিত হইল না। তখন শ্রীরাধিকা রোদন করতঃ কহিতেছেন—

রথরাখ নন্দসুত।

বদন হেরি হে জন্মের মত॥

গীত।

রাগিনী পরজ। তাল মধ্যমান।

এখন রথ রাখ, রথ রাখ, থাক,

বারেক ফিরিয়ে দেখ।

আর হবে না দেখাদেখি

দেখি দেখি দেখ দেখ॥

ত্যজ্য করি মনোরথ,　আরোহিলে মুনি রথ,

আমরা কেবল অবিরত,　কাঁদতে রত চেয়ে দেখ॥

একবার মনে করেছিলাম হ'য় গিয়ে হয় ধরি,

হেরিয়ে তুরঙ্গ রঙ্গ আতঙ্কেতে মরি ;　—ইত্যাদি।

এখানে বাহুল্য ভয়ে অনেক গানের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না। কিন্তু উপরের বর্ণনা পাঠ করলেই দেখা যাবে মাত্র একটি আধটি লাইনের সংলাপের সঙ্গে নয়টি গান কি ভাবে যোজনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ললিতার গান দুটি, বিশাখার গান দুটি, শ্রীরাধার গান একটি এবং শ্রীরাধাকে বর্ণনা করে গায়কের গান দুটি। যাত্রায় গানের এতখানি প্রাধান্য থাকে না। অথচ ঢপের উত্তর প্রত্যুত্তর যদি বিভিন্ন পাত্র পাত্রীর মুখে তুলে দেওয়া যায় তবে তা প্রায় একটি গীতিনাট্য হয়ে ওঠে।

ঢপের সংলাপ কখনো খুব স্বল্প কখনো বিস্তৃত। সংলাপের মধ্যে মধ্যে ধুয়া বা কবিতার পদ কখনো কখনো বিস্তৃত কবিতা উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। বৈচিত্র্যের জন্য কখনো সংস্কৃত কখনো বা ফার্সী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, এমন সময় বৃন্দা উপস্থিত হলেন, তখন বৃন্দাকে অবলোকন করে—

শ্রীমতী। কস্মাৎ বৃন্দে প্রিয় সখি—কোথা হতে এলে ?
বৃন্দা। হরে পাদপদ্মাৎ—হরির পাদপদ্মের নিকট হইতে।
শ্রীমতী। কুত্র সঃ—কোথায় তিনি ?
বৃন্দা। কুঞ্জারণ্যে—রাধাকুঞ্জের তীরে।
শ্রীমতী। কিমসৌ কুরুতে—কি করছেন তিনি ?
বৃন্দা। নৃত্যশিক্ষাং—নৃত্য শিক্ষা করছেন। (পৃঃ ৭ কলঙ্ক ভঞ্জন পালা।)

আবার সংলাপের মধ্যে "পয়ার"ও দেখা যায়। যথা,

বৈদ্য বলে শুন শুন মাতঃ যশোমতি।
এই কুম্ভে আনবে জল সেই হবে সতী ॥
সেই জল প'ড়ে আমি দিব শ্রীকৃষ্ণেরে।
আরোগ্য হবেন কৃষ্ণ ব্যাধি যাবে দূরে ॥ পৃঃ ৪০ ঐ

বিভিন্ন রসের অবতারণাও মধুসূদনের গানে দেখা যায় যেমন, হাস্য রসের গানে—

ও কুটিলে ভাল ত দেখালি সতীত্ব
মায়ে ঝিয়ে হলি ব্যাকুল, বারি এনে বাড়াবি কুল,
ভেসে যে গেল ও কুল, এখন কুল কুল
হাসি পায় হে—জগদীশ্বর যথার্থ ॥ পৃঃ ৪৪ কলঙ্কভঞ্জন।

বাৎসল্য রসের বর্ণনায়—

নারিব পাঠাতে রে রাম! আমার দুধের গোপাল।
এ দধি মন্থন কালে, অঙ্গন বাহিরে খেলে,
ননী দে দে ব'লে সদাই কাঁদে রে রাম ॥ পৃঃ ৯২ অক্রুর সংবাদ

প্রভাস পালায় বাৎসল্য ও করুণ রস একাকার হয়ে গেছে। যেমন—

আর কি পাব সে নীলমণি!
মা বলে আসিবে কোলে খাওয়াইব ক্ষীর ননী ॥
পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছ ও দুখিনীরে,
খেদে ভাসি আঁখিনীরে হ'য়ে মণিহারা ফণী।

শুধু যশোদা নয় নন্দের পিতৃহৃদয়ের বেদনাকেও কবি মূর্ত্ত করেছেন।—

আর কি আমায় রাজা বল
হয়েছি দুর্ব্বল।—

আর কি আছে সে ঘনশ্যাম বল
হারায়েছি সে সম্বল।

*　　　*　　　*

যশোমতীর নাইকো মতি, হারায়ে মতি ;—
সতত উন্মত্তা মতি এমনি দুর্গতি ; ইত্যাদি।

বিরহের বেদনাও সহজে রূপ পেয়েছে। যথা,—নৌকাবিহারের তরণী দেখে রাধিকার বিলাপ,

প্রিয়সখীরে সেই তরী ঐ যে পারে॥
এ পারে থাকিত যে তরণী
পার হতেন যত তরুণী
　　এখন দেখ তরুণী সেই তরণী
　　এখন থাকে পরপারে॥ পৃঃ ১৩১ মাথুর।

কিন্তু বিরহের বেদনা অপেক্ষা বাৎসল্যের বিচ্ছেদ কাতরতাই মধুসূদনের কাব্যে অধিকতর সুন্দর হয়ে ফুটেছে। মধুসূদন কিন্নরের গানে অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকতা ফুটে উঠেছে! যেমন—

　　ফল কেন দাও কানুর হাতে।
একবার ব্রজে ফল দিয়ে ওই হাতে
　　ফল পেয়েছি, সবাই হাতে হাতে॥
এক যাত্রায় পৃথক ভল
　　করমগুণে ফলাফল,
　　　গোকুলের ফল হল বিফল,
　　　　সফল হল দ্বারকাতে॥ পৃঃ ২৪৭ প্রভাস

"ফল" কথাটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ও সেই যুগের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করায়। মনে রাখা প্রয়োজন সে যুগটি ছিল কবিওয়ালাদের। তখন গানের মধ্যে অনুপ্রাস যমকের ঘটা ছটা না থাকলে দর্শকের বা শ্রোতার পরিতৃপ্তি হোত না। মধুসূদনের গানেও এই রুচির সন্ধান মেলে। যেমন,

শ্রীদুর্গা কমলপদ, পূজিয়ে কমল দলে,
সেই নীলকমল কোলে পাইয়াছি সেই ফলে ;—
আসিবে আমার নীলকমল, হেরিব চাঁদ বদন কমল,
প্রফুল্ল হবে হৃৎকমল কমলমুখে মা বোল শুনি॥

কিন্তু কখনো কখনো আতিশয্য দোষ ঘটেছে। এটিও যুগরুচির সাক্ষ্য দেয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞান হবার ভাণ করায় যশোদা শশব্যস্ত হয়ে বলছেন—

দন্তেতে লাগিল দন্ত
কি হোল পাইনে তদন্ত
হেরে আমার লাগল দন্ত
কারু মন্দ করি নাই তো আমি ॥ পৃঃ ২৬ কলঙ্কভঞ্জন।

অথবা—

সেই ভঙ্গী ত্রিভঙ্গিমা, সেই ঠাট সেই ঠঙ্গিমা, পৃঃ ৩৭, ঐ।

বলাবাহুল্য উপরের বর্ণনায় কবির শব্দ চয়নের দুর্ব্বলতাও লক্ষিত হয়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে মধুসূদনের রচনা বিস্ময়কর। কবিওয়ালাদের সেই ঝকমকি অনুপ্রাসের তরবারী খেলার যুগে মনের আবেগকে তিনি অনেক সহজেই প্রকাশ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে শিক্ষিত বলতে আমরা যা বুঝি মধুসূদনের সে রকম শিক্ষা ছিল না। এমন কি কোন শিক্ষিত পরিবেশও কবিকে তার মানসরচনায় সাহায্য করে নি। ইংরেজী শিক্ষার পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে যে এক গরিমাময় সংস্কৃতি ছিল—সে সংস্কৃতি যে সমাজের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল মধুসূদন কিন্নরের গান, তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

লক্ষ্মী

প্রকাশ পাল

বোলপুর ষ্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। একটু আগে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখে এসেছি। সেই ঘোর এখনও চোখে লেগে আছে। সেই আম্রকুঞ্জ, সেই উত্তরায়ণের পুষ্পবীথিকা, কলাভবন ও নাভবনের শিল্পময়তা আমার মন ভরে দিয়েছে। শান্তিনিকেতনের মোহময় পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের মধুর ব্যবহার…সব মিলিয়ে আমায় যেন কিছুক্ষণের মত এই পৃথিবীর অশান্তি দুঃখ ও বেদনার পরিমণ্ডল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি এখনও সেই রসেই জারিত হয়ে আছি।

ষ্টেশনে এসে শুনলুম ডাউন আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেস তিনঘণ্টার মত লেট্। অতএব নিরুপায় হয়ে ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের ওপর বেডিংটা রেখে চুপচাপ বসে বসে সিগারেট ধ্বংসে মনোযোগ দিলুম।

দু'দিন আগেও শীত ছিল না। আজ একটু শীত শীত করছে। ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে বসে শীতের রদ্দুরটুকু বেশ লাগছিল। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনে কবিগুরুর সংগঠনী শক্তির বিকাশ দেখে আসার পর এই আরামভোগ… আজ দিনটাই আমার কাছে পরম রমনীয় বলে মনে হচ্ছে।

একটা বাচ্চা জুতোপালিশওলা আমার ঝিমোনো ভাবটি কাটিয়ে দিল।

—বাবু দিন, সাদা রং করে দি—।

বললুম,—করবি…আচ্ছা কর।

জুতোর দিকে চেয়ে দেখলুম সাদা কেড্স্ জোড়া শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতনের পবিত্র লালমাটি অঙ্গে ধারণ করে সার্থক হয়ে গেছে। আসল রং চেনার উপায় নেই। জুতোর অঙ্গরাগ হচ্ছে। আমি একমনে মুচিনন্দনের ছোট ছোট দুটো নিপুণ হাতের কাজ দেখছি। এক সময় তার দেহের দিকে চেয়ে বললুম,—হ্যাঁ বাবা, পরের জুতো সাফ করিস ওই সঙ্গে নিজের দেহটাও একটু সাফ করে নিস না কেন? উত্তরে সে তার লাল ছোপধরা দন্তপাতি বিকশিত করে একটু হাসল মাত্র। কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করল না। পাশ থেকে আর একটা কচি গলার আওয়াজ হল,—এই ঠিক সাফ নেহি করা হায়। সেদিকে চেয়ে দেখলুম কোন এক সময় আমার অনতিদূরে আর একজন শতচ্ছিন্ন পোষাক পরা ছেলে আমার জুতোর অঙ্গরাগ দেখবার জন্য এসে বসেছে।

যখন জুতো রং করা শেষ করে মুচিনন্দন আমার দিকে জুতোজোড়া এগিয়ে দিচ্ছে তখনই তার এই অপূর্ব হিন্দীতে ভৎর্সনা শুনতে পেলুম।

বাচ্চা পালিশওলাকে বললুম 'ওতো ঠিক বলেছে। রং ভাল হল না তো। এরি মধ্যে হয়ে গেল?'

মুচিনন্দন আমায় কিছু বলল না কিন্তু আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুটির দিকে এমন ভাবে চেয়ে দেখল বুঝলুম আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে দুজনের মধ্যে একচোট বোঝাপড়া হবে।

নতুন বন্ধু বলল, 'হাঁ বাবু. ওরা আরো ভালো কোরে করে। দুবার রং ল্যায় ও ঠকাচ্চে'।

পালিশওলা জুতো আর বাক্স ফেলে ওর দিকে ছুটে গেল আর আমার বন্ধু চট করে আমার পেছনে এসে আশ্রয় নিল। আমি ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দিলুম। মুচিনন্দনকে বললুম, এই নে বাবা, খুব হয়েছে পয়সা নে। পালিশেও কাজ নেই আর মারামারিতেও কাজ নেই। ও চলে গেলে নতুন বন্ধুটির দিকে চেয়ে দেখলুম। পোষাক যেমনই নোংরা বা ছেঁড়া হোক কালো ছেলেটা দেখতে বেশ। হৃষ্টপুষ্ট, বছর আট নয় বয়স। বললুম 'হাঁরে ওর সঙ্গে লাগছিলি, ওর সঙ্গে পারতিস তুই ?'

সে বলল, লেগে দেখুক না ক্যানে, তুলে পট্‌কান দিতাম এম্‌নি কোরে…'

কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে ছেলেটা এমন করে দাঁড়াল যে দেখে না হেসে পারলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম,—থাকিস কোথা।

—এই ইষ্টিশনে।

—বাড়িঘর নেই তোর।

'হুঁ :। বাড়িঘর থাক্‌লে কেউ ইষ্টিশনে পড়ে থাকে ? বড় ভাল লাগল কথাটা। সরল সত্যি কথা। অতি সহজে অনায়াসে বলল ওই ছেলেটা।

বললুম,—তোর নাম কিরে।

—লক্ষী।

—লক্ষী! বা বেশ নামতো কি করিস ?

—কিছু না, কি আবার করবো ?

—কিছু করিস না তো খাস কি করে ?

—ক্যানে, ভাত নামে যে—

—ভাত নামে! কোথা থেকে ভাত নামে রে ?

—আসাম লিংক থিকে। ভাত এসে-ইখানে নামে, আমরা খাই।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না ও নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও দেখলুম না তবে এই ছেলেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটবে এই আশায় গল্প জুড়ে দিলুম।

—হ্যাঁরে আজ খেয়েছিস।

—না এখনো খাইনি, আসাম লিংক আপ ডাউন কোনোটাই এসে নি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল

—আজ দু'দিন ভাত খাই নাই…কাল দিনে রেতে একবারও ভাত নামে নাই।

ওর কণ্ঠস্বরে বিশেষত্ব ছিল।

সাধারণ ভিখিরিছেলের বাঁধাবুলিগুলোর সঙ্গে আমরা জন্মাবধি পরিচিত। তাদের বাবু দুদিন খাই-নি—বাবু, বাপ—মা অনাহার-আছে বাবু ইত্যাদি একটানা মুখস্ত কথাগুলো আমাদের

প্রাণে কোনো সাড়া জাগায় না কিন্তু লক্ষীর এই সোজা কথাটায় কোন সুর নেই। বেদনা বা করুণা জাগাবার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না ওর। চেয়ে দেখলুম ওর মুখে কোন ভাবান্তর নেই, যেমনভাবে সে অন্য কথা বলছিল তেমনিভাবে সে এই দুদিন ভাত না খাওয়ার কথাটাও বলেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি খেলি এ দু'দিন ?

—যা হয়। দু'পয়সার ত্যালেভাজা আর দুপয়সার মুড়ি খেলম কাল দিনে আর রেতে ফাসকেলাসের একবাবু আধখানা পাঁউরুটি দিল তাই...

—আচ্ছা লক্ষী, আমায় দু'টো সিগারেট এনে দিতে পারবি ?

হুঁ দেন না কেনে—বলে আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়াল। আমি দু'আনা পয়সা ওর হাতে দিয়ে বললুম,—পালিয়ে যাবি না তো ?

—বারে, পালাবো কেনে ?

কেন পালাবে এটা আর স্পষ্ট করে ওকে বললুম না। বললুম—'রেড এ্যাণ্ড হোয়াইট আনবি-কেমন ?

—বেশ।

—প্যাকেট চিনিস তো, সেই লাল আর সাদা প্যাকেট। কিন্তু তোর হাত যা ময়লা খেতে ঘেন্না করবে।

লক্ষী চলে গেল। আমিও পয়সা বা সিগারেটের আশা ছেড়ে দিয়ে 'রহস্য রোমাঞ্চ' খানায় মন দিলুম। ও দু'আনা লক্ষী যদি মেরে দেয় দিক। জেনেই দিয়েছি। কিন্তু আমার ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে একটু পরে লক্ষী ফিরে এল হাতে তার রাংতা মোড়া দুট 'রেড এ্যাণ্ড হোয়াইট' সিগারেট।

—আচ্ছা লক্ষী, এক আনা পয়সায় কি খাবি ?'

—কি আর ? মুড়ি আর দু'পয়সার ত্যালেভাজা।

—বিড়ি খাবি না তো।

—বাবুর যেমন কথা, প্যাটে ভাত জুটচে নি বিড়ি। বলে নিচের ঠোঁটটা উল্টে দিল।

ওকে চারটে পয়সা দিলুম। বললুম,—যা খেয়ে আয় আর আপ আসাম লিঙ্ক ভাত যদি না নামে তাহলে আরো পয়সা দোব আরো কিছু খাস।

আনন্দ-উজ্জল মুখে ও পয়সাকটা নিয়ে চলে গেল। একটু বাদে এক পেট জল খেয়ে জামা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আমার কাছে এসে বসল।

—কিরে পেট ভরল ?

—হুঁঃ দু'পয়সায় মুড়ি আর:দু পয়সার ত্যালেভাজার প্যাট ভরে বুঝি ? হু'হু করে জ্বলছিল, একটুক আসান হোল আর কি।

ও দিকে আপলাইনে সিগ্ন্যাল ডাউন দিয়েছে। লক্ষী বলল,—'আসাম লিঙ্ক এসচে বাবু।

—লিঙ্ক আসছে না অন্য গাড়ি আসছে তুই জানলি কি করে ?

—গাড়ি আমার সব মুখস্ত। এখন লিঙ্ক ছাড়া আপে অন্য গাড়ি কুথা?

—রেলে চেপেছিস কখনো? হ্যাঁরে লক্ষী!

—ক—ত! এই তো সিদিন গাড়সায়েবের গাড়িতে চেপে মনিহারি ঘাট ঘুরে আলাম।

বললুম— হ্যাঁরে তুই কোলকাতা যাবি?'

—উঁহু।

—কেন।

—কোলকাতার বড় গাঙে ডুবে যাবো।

—কে বললে একথা?

—কেনে, মা বলতো।

—মা আছে তোর?

—উঁহু—মাও নাই। বাবাও নেই। তাইতো দাদা বললে তুই আপনার প্যাট মেঙে খা আর আমি আমার প্যাট মেঙে খাই।

এমন সময় হু হু শব্দে আপ আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেস এসে দাঁড়াল। আর চকিতের মধ্যে লক্ষী আমার কাছ থেকে চলে গেল।

আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আমার মনেও কৌতুহল ছিল। আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেসে ওদের জন্য ভাত আসার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একটু এগিয়ে যেতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

এঁটো থালাগুলো রেষ্টুরেন্ট বয়েরা ট্রেনের কামরা থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। কোন কোন থালায় দু'একমুঠো এঁটো ভাত অবশিষ্ট রয়েছে আর সেই ভাত পাবার আশায় লক্ষীর মত দশ বারোটা ছেলে রেষ্টুরেন্ট বয়েদের ছেঁকে ধরেছে। অনেক বড় ছেলেও আছে।

এঁটো ভাত নিয়ে মানুষে মানুষে মারামারি আমি অনেক দেখেছি। আমি কোলকাতার মানুষ বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখেছি...এই সব ব্যাপার দেখে আমার কষ্ট হওয়ার কথা নয়, তবু মনটা যেন হঠাৎ টনটন করে উঠল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

লক্ষী প্রতিযোগিতায় নিতান্ত অপটু। বড় বড় ছেলেগুলোর ধাক্কায় সে এদিক ওদিকে ছিটকে পড়ছে। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একপাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। দূর দেখে দেখতে লাগলো বড় বড় ছেলেগুলো কেমন গোগ্রাসে শুকনো ভাতের ডেলাগুলো গিলছে।

আপ আসাম লিঙ্ক চলে গেল। আমি আবার বসে পড়লুম। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে প্রশান্তি ছিল এই একটা দৃশ্যে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শান্তিনিকেতনের মনোহর রূপের প্রভাব আর এককণাও মনের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। বিষন্নমুখে লক্ষী এসে আমার পাশে বসে মাথা নিচু করে পায়ের নখ খুঁটতে লাগল।

আমি জানি তবু জিজ্ঞাসা করলুম,—ভাত নামলো তোর। —ভাত তো অনেক নামলো শালারা দিলে নি। বললুম,—লক্ষী ভাত খেতে কত লাগবে রে? —কত আর? চার পাঁচ আনা।

দেন না কেনে আপনি। পকেট থেকে পাঁচআনা পয়সা বার করে ওর হাত দিয়ে বললুম,—যা ভাত খেয়ে আয়। —সবটা লেব?

—হ্যাঁ।

পয়সা নিয়ে ও প্রায় নাচতে নাচতে চলে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বলল—খুব খেলম আজ, ভাত মাচ। ভাত মাছের স্বাদ বোধহয় এখনো ওর মুখে লেগে আছে। একটা ঢোক গিললো কথা বলতে বলতে। একটু পরে বলল,—বাবু।

—কি রে।

—আপনি নিয়ে চলুন না কেনে।

—কোথায়?

—কেনে, কোলকাতা আপনার বাড়ি—আমি যাব।

—তুই বললি যে যাবি না—।

—না, আপনার সঙ্গে যাবো।

বুঝলুম স্নেহবাঞ্চিত হতভাগ্য আমার কাছ থেকে একটু স্নেহের আস্বাদ পেয়ে আমায় ওর নিতান্ত আপনজন বলে ভেবে নিয়েছে। লক্ষ্মীকে সত্যি কথাটা বলতে পারলুম না। একটা ছেলেকে বারোমাস ভরণ পোষণ করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই বললুম,—নারে তুই গিয়ে থাকতে পারবি না। অচেনা জায়গা। তার চেয়ে এখানে কোথাও গিয়ে কাজকর্ম্মো কর, ভিক্ষে করা ভাল নয়।

—কুথা কাজ করবো?

—কেন, চায়ের দোকানে, কারো বাড়িতে—

—না ওরা ভাল নয়, বড় মারে—আমি আপনার কাচে কাজ করবো—

বলে আবার পায়ের নখ খোঁটায় মন দিল। আস্তে আস্তে ডাকলুম—লক্ষ্মী।

—উঁ।

—আবার পরে এলে তোকে নিয়ে যাবো কেমন?

—কবে এসবেন আবার?

কবে যে আসব তা আমি নিজেই জানি না। গরীব ছাপোষা মানুষ, অতিকষ্টে সংসার খরচের টাকাটা বাঁচিয়ে বহুদিনের সাধ মেটাতে এসেছিলুম। হয়ত আর কোনদিনই আসব না। তবু লক্ষ্মীর বিষন্নমুখটা দেখতে ভাল লাগল না। তাই মিথ্যা বললুম,—আবার শিগগিরই আসব—দু'একমাসের মধ্যেই—।

লক্ষ্মী বোধহয় ধরে ফেলল কথাটা। উঠে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল,—আপনি মিছাকথা বোলচেন আপনি নিয়ে যাবেন নাই, আমি জানি···বলে আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের ওদিকে চলে গেল।

মনটা বিমর্ষ হয়ে পড়ল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার রহস্যের সূত্র সন্ধানে মন দিলুম।

একটা গোলমাল হতে মুখ তুলে দেখি সবাই ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমের দিকে দৌড়চ্ছে। কি

ব্যাপার বুঝলুম না। একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো ওদিকে চোর ধরা পড়েছে। আমিও কৌতুহল মেটাতে হাল্কা বেডিংটা হাতে ঝুলিয়ে ওইদিকে আস্তে আস্তে এগোলুম।

কোনমতে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে যা দেখলাম তাতে চক্ষুস্থির। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষী। আর তাকে শক্ত করে ধরে আছেন এক সুবেশ ভদ্রলোক। একজন সুবেশা মহিলা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে কি করেছে ও ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল,—কি আর হবে—চুরি মশাই চুরি। দেখতে পুঁচকে কিন্তু পাকা চোর—।

লক্ষী চুরি করেছে এ কথাটা চট করে বিশ্বাস হোল না আমার। বললুম—না না, ও চোর নয়—আপনারা ঠিক দেখেছেন ও চুরি করেছে ?

সমস্ত জনতা ব্যঙ্গ করে উঠল।

'কোথা থেকে উকিলবাবু এলোরে। ওরই দলের লোক বুঝি—তাইতো বলি হেঁ হেঁ বাবা··· স্বচক্ষে দেখলুম ওই ভদ্রমহিলার ভ্যানিটি ব্যাগনিয়ে সটকান দিচ্ছিল ছোঁড়াটা আর উনি বোলচেন···'

লক্ষীর কাছে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁরে চুরি করেছিস।

এতক্ষণ লক্ষী মাটির দিকে চেয়েছিল। এবার মুখের দিকে চেয়ে জোরগলায় উত্তর দিল —হ্যাঁ।

কথাটা শোনামাত্র আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঠাস করে ওর গালে এক চড় কসিয়ে দিলুম,—হতভাগা চোর···।

আমার আঘাতের আকস্মিকতায় উপস্থিত জনতা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

দেখলুম লক্ষীর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার হোল না।

ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম,—কেন, কেন চুরি করেছিস। এবার ও জলভরা চোখদুটো আমার দিকে তুলে গলায় যতজোর ছিল তাই দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলো—

—বেশ করিচি···খুব করিচি। আমি চুরি করিচি আমি জ্যালে যাবো তাতে তোমার কি ? বলনু কোলকাতায় লিয়ে যেতে, লিয়ে গেল নাই এখন মারতে নেগেচে। আমি চোর হবো, ডাকাত হবো তাতে কার কি—তোমার কি, তোমার কি—আমি তো ভিকিরি···।

প্রবল কান্নায় ওর শেষকথাগুলো বোঝা গেল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-পত্রিকা

অণিমা সেন

বিংশ শতাব্দীতে শিশুদের জন্য নানা সুলিখিত, সুরঞ্জিত ও সুচিত্র সামাজিকপত্র ও মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ঐ সকল সুন্দর সুন্দর রঙবেরঙের সাজপোষাক-পরা পত্রিকা দেখিয়া আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে এক সময়ে একান্তভাবে শিশুদের উপযোগী বাংলাসাহিত্যে ঐরূপ কোন পত্রাদি ছিল না। বাঙ্গলায় নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত সমাজে শিশুদিগকে বাংলা স্কুলে ও পাঠশালায় পাঠাইয়া শিক্ষা দানের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে। সুধী সমাজ ইহা বুঝিয়াছিলেন যে গল্প শুনাইয়া শিশুদের আনন্দদান করা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি দেশ-বিদেশের কথা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের রহস্য জানাইয়া শিশুদের বুদ্ধি বিকশিত করা, অনুসন্ধানী মনকে জাগরিত করা ও শক্তিশালী করিয়া তোলা তেমনি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক পত্রের ঘনিষ্ঠতম যোগ আছে। বাংলা সাময়িক পত্র (প্রথম পত্রিকা দিক্‌দর্শন, মাসিক ১৮১৮-১৮২১ সন) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সাধারণ মাসিক পত্রিকার মত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকার পরিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা দ্রুত নহে; তাহার প্রধান কারণ বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিতসমাজ মাত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুদিগের মনঃস্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মনের খোরাক যোগাইবার জন্য সুচিন্তিত গবেষণা করিয়া নানারূপ পাঠ্য পুস্তক, গল্পের বই ও মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শিশুদিগের মনঃস্তত্ব তখনও শিক্ষিতসমাজের মনোযোগের বিষয় হয় নাই। সেই শতাব্দীতে যে সকল মনীষী শত কর্ম্মের মধ্যে একটু অবসর করিয়া মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে শিশুদের মুখে শুভ্র হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্ব প্রথম। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রচারিত সাময়িক পত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা প্রবন্ধাকারে দিতে আরম্ভ করেন। তখন এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক রচনা করা হইয়াছিল, সেই সব পুস্তকের মধ্যে কোনরূপ গল্পের স্থান ছিল না; কালক্রমে সকলেই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন যে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য লঘু রচনারও একান্ত প্রয়োজন আছে। কারণ কেবল খাদ্যদ্বারা যেমন শরীর গঠিত হয় না, স্বাস্থ্য পুষ্ট হয় না, সেই সঙ্গে নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম চর্চ্চার প্রয়োজন, সেইরূপ শিশু-মন সবল, সুস্থ ও স্বাস্থ্য সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য চাই পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য লঘু ও আনন্দ-সরস রচনা। পাঠ্যপুস্তকের অপেক্ষা ঐ সকল পুস্তক পড়িতে শিশু-মন মাত্রই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশু-মন বলিষ্ঠ হইয়া উঠে।

এই উপলব্ধির পরে ক্রমে ক্রমে শিশুদিগের জন্য স্বতন্ত্র পত্র প্রচারের আগ্রহ দেখা যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' শিশুদিগের জন্য কল্পিত না হইলেও তাহা তাহাদের

কিরূপ চিত্তাকর্ষক ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন।...নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপাখ্যান পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।" বিবিধার্থ সংগ্রহ সচিত্র পত্রিকা ছিল, ইহার যে সব ছবি দেখিয়া শিশু রবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কাঠ-খোদাই ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রিকার ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করিলে শিশুপাঠ্য পত্রিকা-গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

(১) একান্তভাবে শিশুপত্রিকা

(২) সাধারণ পত্রিকার মধ্যে শিশু বিভাগ।

শিশু পত্রিকাগুলি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমে আমরা একান্ত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকাগুলির আলোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথম শিশুদের মনোরঞ্জনকারী মাসিকপত্রিকা 'জ্ঞানোদয়'। ইহা ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার যুগ্মসম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র। 'সমাচার দর্পণে, ইহার সমালোচনা হইয়াছিল। তৎকালীন শিক্ষিতসমাজ ঐরূপ একান্তভাবে শিশু পত্রিকার জন্ম দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। ইহা নিয়মিত প্রকাশ হয় নাই। পাদরী লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন—"জ্ঞানোদয়" সর্ব্বসমেত ২০ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা পাওয়া যায় না। কাজেই ইহার ভাষা বা প্রকাশভঙ্গী কিরূপ ছিল বলা কঠিন।

'জ্ঞানোদয়' প্রকাশের প্রায় উনত্রিশ বৎসর পরে খ্রীষ্টান ভার্ণাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা হইতে 'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকা ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৬৪ সাল পর্য্যন্ত ছিল। জ্ঞানোদয়ের ন্যায় ইহাও অপ্রাপ্য।

সত্যপ্রদীপ বন্ধ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে 'অবোধ বন্ধু' ১৮৬৩ সালে প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইহা কলিকাতা স্কুল বুক যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিছুদিন চলিবার পর আত্মগোপন করিয়া থাকে; তারপর ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ইহার দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ হয় ১৮৬৯ সালের বৈশাখ মাসে। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয়ভাগের নবম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে তিনি এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন। ইহার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বহু রচনা ইহাতে ছিল। ইহাতে ফরাসী ভাষায় লিখিত 'পৌলভর্জিনী' গল্পখানি সমগ্র অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদের ভাষার নমুনা—

> মরীশশ দ্বীপের রাজধানীর নাম লুই বন্দর নগর। ইহার পশ্চাদ্ভাগের যে এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহার পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে দুটী জীর্ণ ভগ্ন কুটিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের উচ্চচূড়াতে অরুণোদয়কালীন সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শ হইলে নীলবর্ণ

আকাশ এবং হরিৎ ধূমল গিরিশিখর ও উভয়ের সমাগমে এক অনির্ব্বচনীয় নয়ন লোভনীয় শোভার আবির্ভাব হয়।

এই শিশু পত্রিকাখানি শিশু রবীন্দ্রনাথকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি 'জীবন স্মৃতি'তে বলিয়াছেন, "পৌল ভজিনী" গল্পের সরল বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। (জীবন স্মৃতি পৃঃ ৭২-৭৩।) অবোধবন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে কত উচ্চধারণা ছিল তাহা নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতেই বোঝা যায়।

বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের প্রাণ সঞ্চারের ইতিহাস যাহারা পর্য্যালোচনা করিবেন তাহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত সূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধ-বন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। (সাধনা আষাঢ় ১৩০১, পৃঃ ১২৭)]

১৮৬৯ সালে জ্যোতিরিঙ্গিন মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা কলিকাতা ট্রাকট সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র পত্রিকা। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের লিখিত দুইটী কবিতা 'পুরুলিয়া' ও 'কবির ধর্ম্মপুত্র' মুদ্রিত হয়। পত্রিকাখনির মূল উদ্দেশ্য ছিল গল্পের মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। ইহার গল্পগুলি প্রায়ই বিদেশী গল্পের অনুবাদ। গল্পের নমুনা—

ঈগল পক্ষীর অত্যাচার

আমেরিকা দেশের পর্ব্বতময় প্রদেশের কোন গ্রামে এক গৃহস্থের স্ত্রী আপনার দেড় বৎসর বয়স্ক একটি শিশুকে দোলনায় শোয়াইয়া আপনি গৃহের কর্ম্মকাজ করিতেছেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ শিশুটী উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জননী অমনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া গেলেন।

'বিশ্বদর্পণ' ১৮৭২ সালে পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হয়। ইহার যুগ্মসম্পাদক মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ছিলেন। ১৮৭৩ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা হইতে 'বিশ্বদর্পণ মাসিক রূপে বাহির হয়। ইহাতে বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করাই এই কাগজের উদ্দেশ্য ছিল।

যাঁহারা স্বতন্ত্র শিশুপাঠ্য পত্রিকা প্রচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেশবচন্দ্র সেন তাহাদের অগ্রণী। তিনি শিশুদের অন্তরের তাগিদ একান্তভাবে অনুভব করিলেও সেই অভাব সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। তিনি শিশুদের জন্য দুইটী পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সেই পত্রিকা দুইটী (১) বালকবন্ধু (পাক্ষিক) ও বালক পাঠ্য—(সচিত্র পাক্ষিক পত্র।) ইহা ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার গল্পগুলি প্রায় সবই বিদেশী গল্পের অনুবাদ। গল্পছাড়া ইহাতে সংস্কৃত নীতি কবিতার অনুবাদ ও হেঁয়ালি ইত্যাদি থাকিত।

হেঁয়ালী :—সাতজন এক ঠাঁই
যদি হয় ওরে ভাই ॥
পাই সবে ছুটি।
বল কি হয় সেটি ॥

কেশব সেনের পর যিনি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে শিশু পত্রিকার অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সফলকাম হইয়াছিলেন সেই অকালমৃত প্রমদাচরণ সেনের নাম বর্ত্তমান যুগেঅনেকেই জানেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে খাঁটি শিশুপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশ বিভাগে তিনিই পথ প্রদর্শক। তাঁহার নিকট হইতে আমরা অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি। আমাদের বাংলা দেশে তিনি কেবল মাত্র শিশু-সাহিত্য শ্রেণী বিভাগে পথ প্রদর্শন করিয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; তিনি খাঁটি শিশুপাঠ্য পত্রিকার জন্মদাতাও বটেন। তিনি যখন তরুণ এবং সামান্য বেতনে শিক্ষকের কাজ করিতেন তখনই শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র পত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনি ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাঁহার সামান্য আয় হইতে সঞ্চয় করিতে থাকেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "সখা" প্রকাশিত হয়। উহা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন।

> সখা প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের সহায় বটে কিন্তু এ সখার সাহায্যে অনেক পলিতকেশ বৃদ্ধের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে। বালক বালিকার এমন সহৃদ্ধ দুর্লভ।

> শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

> ১৮৮২ খৃঃ ব্রাহ্ম সমাজের শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে কাজের নিদর্শন "সখা" মাসিক পত্র প্রকাশ। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র জগতে উহাই ঐ জাতীয় প্রথম পত্র বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

১৮৮৫ সনের ২১শে জুন প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যুর পর জুলাই মাসে প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা হইতে ৪র্থ বর্ষ (ইং ১৮৮৬) পর্য্যন্ত 'সখা' পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদনা করেন। তাঁহার পর অন্নদাচরণ সেন পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। শেষ তিন চার বর্ষের বিশেষ করিয়া ১১শ ১২শ বর্ষের (১৮৯৩-৯৪) 'সখা' নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৪' সনের এপ্রিল মাসে 'সখা' ভুবনমোহন রায় পরিচালিত 'সাথী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সখা ও সাথী' নাম ধারণ করে। প্রমদাচরণ সেনের শিশুদের জন্য লিখিত কবিতার নমুনা

আঃ ছেড়ে দাওনা

আঃ ছেড়ে দাওনা কুকুর চন্দ্র
মায়ের কাছে যাই।
এখন কি আর খেলা করবার
সময় আছে ভাই ?
দেখ্‌ছ না কি হাঁড়ি হাতে
চাল ধোওয়া রয়েছে তাতে

মা বলেছেন নিয়ে যেতে
'চাকর বাকর' নাই।
কাজটা সেরে ফিরে এলে
তখন তোমার আমায় মিলে
মনের সুখে করবো খেলা যত ভেবে পাই।
কাজ ছেড়ে না করব খেলা
ছেড়ে দাওনা হলো বেলা
আগে কাজ কি আগে খেলা
জানতে আমি চাই?

সখার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মাসিক পত্রিকা ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন জে, ই, ভোন। ইহা খৃষ্টতত্ত্বমূলক পত্র ছিল। বর্ত্তমানে ইহা অপ্রাপ্য।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী হইতে শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর সম্পাদনায় শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা 'বালক' ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে (বৈশাখ ১২৯২, এপ্রিল) এক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশুদের মনে আনন্দ দিবার কথা বহুদিন হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন। জ্ঞানদাদেবীর প্ররোচনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া 'বালক' পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে চালনা করিবার ভার তিনি লইয়াছিলেন। ঐ কাগজের তিনি যে কেবল কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন তাহা নহে পরন্তু লেখকও ছিলেন।

'বালকে'র পাঠকদিগের জন্য রবীন্দ্রনাথ সরল ভাষায় ব্যায়ামচর্চ্চা হইতে হেঁয়ালী পর্য্যন্ত অনেক বিষয় লিখিয়াছিলেন; এবং তখন হইতেই তাঁহার শিশুদিগের জন্য সুমধুর কবিতা রচনা আরম্ভ হয়। 'বালকে'র প্রথম সংখ্যাতেই **বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর** কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহার পর রবীন্দ্রনাথ অমৃতবর্ষী লেখনী দ্বারা শিশুদের জন্য বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই স্থলে রবীন্দ্রনাথের আর একটি রচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন, বালকেই তাঁহার 'রাজর্ষি' উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে লিখিয়াছিলেন। উহা কেবল শিশুদিগের পাঠ্য না হইলেও প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই বালকে তাঁহার 'মুকুট' নামে শিশুদের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় গল্প প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিতে ছবির কিছু উন্নতি হয়। ছবিগুলি পূর্ব্বের সচিত্র পত্রিকার ন্যায় কাঠখোদাই নহে—লিথোগ্রাফ।

'বালক' এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'ভারতীর' সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 'ভারতীর' পরিচালিকা ছিলেন স্বর্ণময়ী দেবী।

'সখা' পত্রিকার পর একাধিক পত্র প্রচারিত হয় বটে, কিন্তু ১৮৯৫ সালে 'মুকুল' প্রকাশের পূর্ব্বে ঐ সকল পত্রিকা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮৯৫ জুলাই মাসে (১৩০২ আষাঢ়) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উদ্যোগের মুকুল পত্রিকা বালক বালিকাদের পাঠ্য উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদনা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রের শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দ দানের জন্য তিনি নিজে ও অন্যান্য অনেকেই লিখিতেন। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথও লিখিতেন। তাঁহার লিখিত 'কাগজের নৌকা' কবিতাটী 'মুকুলে'ই প্রকাশিত হয়।

• হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিখ্যাত 'আবু হরিমের চটিজুতা' গল্পটিও এই পত্রিকাতে আমরা পাই। তিনি এই গল্পটি তুরস্ক দেশীয় গল্প হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই গল্পটি শিশুদের চিত্তহরণ করিয়াছিল। উদ্যোগীদিগের মধ্যে ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও কর্ম্মীদিগের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের যুগান্তকারী যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কয়েকদিন মৃগনয়নী বনবিহারীর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি, বনবিহারীও কথা বলেনি। প্রমদার এমন একটা অন্যায় আদেশে বনবিহারীও যেন লজ্জিত হয়েছিল। ভেবেছিল মৃগনয়নীর তরফ থেকে বহু অনুযোগ অভিযোগ আসবে, কান্নাকাটি শুনতে হবে, উত্তর দিতে হবে। প্রমদার মতের বিরুদ্ধে যাওয়াও চলবে না। বড় মুস্কিলে পড়েছিল বনবিহারী। মৃগনয়নী কিন্তু একটা কথাও বলল না। একটুও কাঁদল না, অকারণে হাসলও না।

অতি সহজভাবে ঘরের দোর বন্ধ করে বনবিহারীর পাশে শুয়ে পড়ল; বনবিহারীর দিকে পেছন ফিরে। বনবিহারী বেঁচে গেল। যাক্, কিছু বলতে গেলেই ফ্যাসাদ হোত। ভগবান বাঁচিয়েছে।

পরের দিনও তেমনি কাটল।

পর পর কয়েকদিন কেটে গেল।

বনবিহারী টু শব্দটি করে না। ঘাঁটাতে গেলে নিজেই মুস্কিলে পড়ে যাবে। যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে কিছু বলতেও সে পারবে না। অথচ মৃগনয়নীর জন্যে মনে একটু কষ্টও যে হচ্ছে না, এমন কথা নয়।

কষ্ট করতে হবে। উপায় কি। প্রমদা তাদের বড় আদরের বোন। ওর মনে কষ্ট দিতে পারবে না। মৃগনয়নীকে বনবিহারীর ভাল লেগেছে। কিন্তু বউকে খুব ভাল লাগতে নেই, এই বোধটা ওর মনে সজাগ রয়েছে। মাগের ভেড়ো সে হবে না। বউয়ের কথায় চলবে না। এই বোধটা শৈশব থেকে এক তীব্রভাবে মনে শেকড় গেড়েছে, যে এই শিকড়ের মহীরূহ মৃগনয়নীকে তার কাছ থেকে অনেকটা তফাত করে রেখেছে। কোন কারণ নেই অথচ আশৈশব সংস্কারের কি শক্তি! অকারণে একজনকে মনে প্রাণে না ভাল বাসবার কি হাস্যকর চেষ্টা। বনবিহারী কিছুতেই মনের এই ভাবকে ছাড়িয়ে উঠতে পারছে না।

মৃগনয়নী স্বামীর কাছ থেকে একটু সহানুভূতি আশা করেছিল। দুটো মিষ্টি কথা, একটু সান্ত্বনা। কিন্তু বনবিহারী একেবারে পাথর হয়ে আছে। প্রথম কয়েকটা দিন মনটা বড্ড খারাপ লাগে মৃগনয়নীর। একজন যদি আপন করে নেয়, তবে সইবার জোর আপনা থেকে বেড়ে যায়। একজনও কি আপনার নেই? সরলা? না, সরলাও নয়। সরলা মৃগনয়নীকে খাড়া করে তার ওপর একদিনের অবিচারের একটা প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছে, সমব্যথী হয়ে সমবেদনা ভিক্ষে করছে।

মৃগনয়নীর মনের দিকে তাকাবার মত চোখ তার আছে কিনা কে জানে, থাকলেও তাকাবার সময় নেই তার। তীব্র অভিমানে মৃগনয়নীর বালিশ যে ভেজেনি এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

কয়েকদিনের ভেতরই ও নিজেকে সামলে নেয়। অভিমান কার ওপর করবে সে। ভালবাসা যেখানে নেই। সেখানে মান অভিমান করা গরম বালির ওপর চোখের জল ফেলা।

মৃগনয়নী স্থির হবার চেষ্টা করে। বাবার মুখখানি স্মরণ করে মাঝে মাঝে। বাবার মুখ যেন ওর ক্ষতের আশ্চর্য প্রলেপ। মনটা ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন পরে শুয়ে শুয়ে ও প্রথম কথা বলে,—একটা কথা ছিল।

বনবিহারী জেগে শুয়েছিল। উত্তর দেয় না।

—শুনছ ?

—উত্তর নেই।

এ পাশ ফিরে বনবিহারীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী। বনবিহারী চট করে চোখ বুজে ফেলেছে।

—ঘুমুলে নাকি ?

বনবিহারী যেন গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

—একটা কথা বলবার ছিল।

বনবিহারীর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে মৃগনয়নী।

বনবিহারী বিড়বিড় করে একটা হাই তোলে। ঘুম আর ছাড়ে না।

বুকে হাত দিলে মৃগনয়নী টের পেতো যে বনবিহারীর বুক ঢিপ ঢিপ করছে। একে রোগা দুর্বল মানুষ, তার ওপর এই ফ্যাসাদ!

আবার ঠেলা মারে মৃগনয়নী।

বনবিহারী চোখদুটো কচলে পিট পিট করে তাকায়।

—একটা কথা ছিল।

বনবিহারী অস্পষ্ট স্বরে বলে,—কথা! কথা আবার কি ? আচ্ছা, কাল শুনব।

বলে ওর দিকে পিছন ফিরে চোখ বোজে আবার।

মৃগনয়নী একটা বড় নিশ্বাস ফেলে।

পরের দিনও এই ভাবেই বনবিহারী ঘুমিয়ে কাটায়।

আরও কয়েকদিন কাটে।

আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে ঘরে ঢুকে দেখে বনবিহারী বসে বিড়ি টানছে। ওকে দেখেই বনবিহারী চমকে ওঠে। এই রে! আজ আর শুয়ে পড়বার উপায় নেই। একটু আগে টের পেলে বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ত বনবিহারী।

মৃগনয়নী দোর বন্ধ করে কলসী থেকে জল গড়িয়ে নেয়। শিয়রের কাছে জলের ঘটিটা রাখে। রোজই রাখতে হয়। মাঝে মাঝে বনবিহারীর জলতেষ্টা পায় দুপুর রাতে। অবিশ্যি এ ক'দিন আর উঠছে না জল খেতে।

মৃগনয়নী এসে বিছানার ওপর বসে।

বনবিহারীর বুক ঢিপ ঢিপ করে। আর একটি বিড়ি ধরায়। যাক্‌গে দু চারটে কড়া উত্তর দিলেই স্ত্রী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করতে হলে মানে একবারে খুব ইয়ের মত কড়া হতে হবে।

বনবিহারী মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বসে থাকে।

—আজ ঘুমোলে গায়ে জল ঢেলে দোব।—হেসে ওঠে মৃগনয়নী।

হাসিটা দেখে একটু আশ্বস্ত হয় বনবিহারী। তবু মুখখানি তখনও গম্ভীর করেই রাখে। নাকের ভেতর দিয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে।

মৃগনয়নী ওর আরও কাছে এসে বসে।

বনবিহারী খুব কঠিন হয়ে বসে থাকে।

—কি হোল! কেউ কিছু বলেছে?

বনবিহারী এবার মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

মৃগনয়নী ওর কাঁধে একটা হাত রাখে। কাঁধের হাড়েতে হাত লাগে। একটু হেসে বলে, কি রোগা তুমি? শরীরের ওপর একটু যত্ন নিলে তো পারো!

বনবিহারী বিড়িটা ছুড়ে ফেলে মাটির মেজেতে।

কথা বলচ না কেন?

—কি বলব?—এতক্ষণে কথা বলে বনবিহারী।

—একটা কথা বলব?

—বনবিহারী উত্তর দেয় না।

—মামা শ্বশুর কি মাসে মাসে টাকা দেয় তোমাদের।

মৃগনয়নী শুনেছে মামা শ্বশুর এখনও মাসে মাসে ওদের সাহায্য করে তাতেই ওদের সংসার চলে। মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে, মামা বাড়ী করে দিয়েছে।

—কিছু ধানজমি দিয়েছে। কিছু কিছু টাকাও দেয় মাঝে মাঝে।

কথাটা শুনে মোটেই ভাল লাগেনি ওর। বৃদ্ধা শাশুড়ী বলেছেন মৃগনয়নীকে। বলতে বলতে বুড়ীর গলা ভিজে উঠেছে,—ছেলেরা বড় হোল। এখনও ভাইয়ের কাছে হাত পাততে হয় আমার! কি বরাত করেছিলুম মা!

বুড়ী শাশুড়ীর কথাটা ওর মনকে নাড়া দিয়েছিল। সেদিন ও চুপ করেই ছিল।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল! পরে পরে ওর মনে হয়েছে,—বনবিহারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। দুর্বল বনবিহারী দাঁড়াতে জানে না। তাকে শেখাতে হবে। এ ভার তার। এই রুগ্ন দুর্বল স্বামীর পিছনে তাকেই দাঁড়াতে হবে। ছায়ার মত তার সর্বসত্তায় শক্তি সঞ্চার করতে হবে। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে তার ভবিষ্যতে সফল হবার কোন আশাই আর থাকবে না। মৃগনয়নী মরবে, সবাই মরবে। ও জানে ওর বরাত খারাপ। ভবিষ্যতও খারাপ দেখছে। তাই বিবশা হয়ে গা এলিয়ে দিতে ও পারছে না। ওর জমিদারী-স্নায়ুর আবেগ ওকে যে শক্তি দিয়েছে আজন্ম, তাকে কাজে লাগাতে ওর মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। বনবিহারীকে শক্তিতে

সঞ্জীবিত করবার পুরো দায়িত্ব ওর। এ শিক্ষা ও শৈশব থেকে পেয়েছে ওদের সংসারে। মনে মনে—অন্তরে অন্তরে।

হাসতে হাসতে খুব সহজ হয়েই তাই জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী,—কত টাকা দেয়।

—তুমি মেয়েছেলে; তোমার তাতে কি দরকার।—বনবিহারী অকারণে কঠোর হয়।

—মৃগনয়নী মনে মনে খুব হাসে। কি হাস্যকর পৌরুষ!

—তবু শুনি না। তোমাদের টাকা তো আমি কেড়ে নিচ্ছি না।

পিঙ্গল চোখ দুটো তুলে তাকায় বনবিহারী। মৃগনয়নীর দীপ্ত চোখদুটোয় প্রসন্ন হাসি। বড় ভাল লাগে বনবিহারীর।

তবু মুখটা গম্ভীর করেই বলে,—কুড়ি টাকা করে দেয়।

—এরপরে যদি না দেয়, তোমাদের কি হবে?

বনবিহারী প্রশ্নটা শুনে একটু হকচকিয়ে যায়,—তা কখনও হয়! ও যে বাঁধা বরাদ্দ!

মৃগনয়নী বনবিহারীর ফরসা একটি লাল তিল লক্ষ্য করে। তার ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে বলে, লেখাপড়া তো কিছু নেই। দয়া করে দিচ্ছেন। দয়া না হলে না দিতেও পারেন। তোমাদের কি কিছু জোর আছে?

—দেবেনা মানে!—বনবিহারীর মুখটা শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। মৃগনয়নী কি ঠাট্টা করছে। এমন গুরুতর ঠাট্টা!

—ধরোনা সামনের মাস থেকে কিছু দিলো না। তখন তোমরা কি করবে?

—তখন? হঠাৎ জবাব দিতে পারে না বনবিহারী। কথাটা কখনও ভেবে দেখিনি ও।

তবু বললে,—তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

—তার চেয়ে একটা চাকরী বাকরীর চেষ্টা করো না?

খুব মিষ্টি করে বলে মৃগনয়নী।

—চাকরী! কোথায় চাকরী পাবো?

মৃগনয়নী একটু ভাবে, বলে,—কেন, কলকাতায় গেলে তো চাকরী পাওয়া যায়।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ। ওখানে আমার দুটি পিসতুতো দাদা আছেন। তাঁরা কাজ কচ্ছেন। মাসে মাসে টাকা পাঠান পিসিমাকে।

—কিন্তু,—বনবিহারী যেন এক একটা ঢেউএর ধাক্কা খাচ্ছে।

—কিন্তু কি?

—মানে ওখানে গেলেই তো আর চাকরী মিলবে না।

—কারো বাসায় গিয়ে উঠবে।

—কার বাসায়?

—ধরো আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়।

—না, না, কুটুম বাড়ী গিয়ে ওঠা।

একটু ভাবে বনবিহারী। আর একটা বিড়ি ধরায়। কথাগুলি মৃগনয়নী মন্দ বলেনি। মেজদাকে একবার বলে দেখলে হয়। বিড়ির লাল আগুনের আলোয় ওর পিঙ্গল চোখদুটো চিন্তান্বিত দেখায়।

—অবিশ্যি আমাদের এক জ্যাঠতুতো দাদা ওখানে আছেন।

মৃগনয়নী বলে,—তবে তো তাঁর ওখানেও উঠতে পারো।

—তা পারা যায়। মেজদাকে একবার বলি।

—বলো না। বুঝিয়ে বলবে। চাকরী না করলে তো তোমাদের চলবে না। আজ হোক কাল হোক, করতেই হবে। আগে থেকে চেষ্টা করাই ভাল।

—একটা কথা আছে। বিড়িটায় খুব জোরে একটা টান দিয়ে বলে বনবিহারী।

—কি?

—আমার জ্যাঠতুতো দাদা এনট্রান্স পাস। ভাল চাকরী তো সে পাবেই। আমরা যে পড়াশুনোয় তেমন—

মৃগনয়নী বলে,—তা হোক। সবাই যে পাস হবে এমন কিছু কথা নেই। একবার চেষ্টা করেই দেখো না।

—আমি তো তবু ফোর্থ ক্লাস অব্দি পড়েছি, মেজদা একবারে—হ'য়ে!

—তুমি ভাসুর ঠাকুরকে বলেই দেখো না?

বিড়িতে সুখটান দিতেদিতে বনবিহারী আবার জিজ্ঞেস করে—তাহলে বলেই দেখি কি বলো?

—হ্যাঁ বলো।

মৃগনয়নী ওর পিঠটা আস্তে আস্তে চুলকে দেয়।

—যদি তেড়েমেড়ে ওঠে! উঠুকগে, তাহলে কালই বলবো। কি বলো?

বনবিহারী কতখানি দুর্বল তা স্পষ্টই বুঝতে পারে মৃগনয়নী। একে নিয়ে সংসারে সকলের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান যে কত বড় কঠিন তা মনে মনে বেশ বুঝতে পারে।

মৃগনয়নী অভয় দেয়,—বলো না তুমি, তোমায় তো আর মেরে ফেলবে না?

—না, তা নয়, মানে যদি আবার ইয়ে হয়।

—কিচ্ছু ইয়ে হবে না।

—তুমি তাহলে বলছো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি কালই বলবে।

বনবিহারী বিড়ি শেষ করে একটা হাই তোলে।

—আরও ভাবছি।

—কি?

—সুন্দরী যদি রাজী না হয়।

মৃগনয়নী হাসে,—তোমরা যদি রোজগার করতে পার, সেত আনন্দের কথা। রাজী না হবার কি আছে?

—যদি বলে বউ পরামর্শ দিয়ে দুভাইকে তাড়ালে।

তা বলবে—আমায় বলবে। তোমাদের তো বলবে না?

—আবার একটা অশান্তি!

—একটু অশান্তি হলেও পরে অনেক শান্তি হবে। মাইনে পেয়ে ঠাকুরঝিকে টাকা পাঠালেই দেখবে মুখে হাসি।

বনবিহারী টাকা পাঠাবে। কথাটা ভাবতেও বনবিহারীর বেশ ভাল লাগছে। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তা বটে! মাকেও ওই বলে বোঝাতে হবে।

—মাকে বোঝাবার ভার আমার।

—তুমি পারবে?

—তা কেন পারব না!

বনবিহারী খুব খুসী হয়ে ওঠে। মৃগনয়নীর বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না। হাজার হোক, অত বড় ঘরের মেয়ে। তার ভাগ্য বলতে হবে: ও বিগলিত হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। বলে এবার নিজেই, তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে?

—কেন?

—আটকে রইলে এখানে?

মৃগনয়নীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় না। বলে,—কষ্ট আবার কি? তুমি আছো।

—তা ঠিক! আমি তো আছি। জানো আমি মাকে বলেছিলুম, মা ওর যেন কষ্ট না হয়!

মৃগনয়নী অবাক হয়,—কই মা তো বন্ধ করেনি?

—এ মা নয়। আমার মা—কালী মা। আমি তো রোজ সন্ধ্যেবেলা কালীতলায় যাই। ওখানে কেত্তন গাইতে হয়। তাই এত রাত হয়।

—তাই নাকি!—মৃগনয়নী এই সরল মানুষটার ভেতর এক নোতুন জগত আবিষ্কার করে ফেলে।

—আমি তো বিয়ের আগে মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতুম।

—কি করতে?

—কিছু না গান গাইতুম। গান গাইতে গাইতে কেমন বেভোর হয়ে যেতুম। রাত বেশী হলে মেজদা গালাগাল করতো

মৃগনয়নীর চোখদুটো বড় বড় হয়ে যায়। কি গান?

বনবিহারী বলে,—এই রামপ্রসাদী। আমার গান শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে।

তা শোনাব কি করে বলো?

—একদিন খুব আস্তে আস্তে শোনাবে।

—আস্তে? না, আস্তে গান গাইতে আমি পারি না। আচ্ছা, আমি দাওয়ায় বসে একদিন গাইবো, শুনো।

বনবিহারী মুখর হয়ে উঠছে,—মায়ের কথা কিন্তু সবাইকে বলি না। তোমাকে এই আজ বললুম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে মৃগনয়নী।—চাকরীর কথা মাকে জানিও।

—তুমি বলছ? মাকে জানাব?

—হ্যাঁ, জানাবে বই কি?

বনবিহারী হঠাৎ খুব খুশী হয়ে বলে,—ঠিক বলেচ, আগে মাকে জানাই, তারপর মেজদাকে বলব। তবে আর গোলমাল থাকবে না।

মৃগনয়নী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে ওর খুসী ভাবখানা। মায়ের কথায় আনন্দে আটখানা। অজ্ঞাতে একটা শ্রদ্ধার ভাব আসছে মনে, মানুষটা এত সরল, এত দুর্বল, অথচ এত ভাল! দুর্বল! দুর্বল হয়তো নয়। সংসারের গোলমেলে ব্যাপারগুলোকে একটু এড়িয়ে চলতে চায় অশান্তিকে ভয় পায়।

বনবিহারীকে নোতুন করে দেখছে মৃগনয়নী।

আর একটা হাই তোলে বনবিহারী! তোমার কোন কষ্ট হলে আমায় বোল।

মৃগনয়নী তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কথা বলে না। বনবিহারী আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবনায় ওর মাথাটা ভরে ওঠে। দুমাস আগে কোথায় ছিল। কোথা থেকে কোথায় এলো। জীবনে যাকে স্বপ্নেও কখনও দেখেনি তার কাছে পরম নিশ্চিন্তে একা একা বসে আছে, ভাবলে অবাক লাগে।

একে ভরসা করে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কাটাতে হবে। কে জানে তাই বা কাটান যাবে কিনা আবার হয়ত জীবনের অন্য কোন বাঁকে পড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠতে হবে, হতে পারে। কি না হতে পারে সেইটেই ভাবা যায় না।

যৌবনের উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্যের কোঠায় পৌঁছেও মৃগনয়নীর মনে হয় জীবনের আগাগোড়া এক অবধারিত কতকগুলো গিরোয় বাঁধা। বেশী টানাটানি করবার উপায় নেই তাতে গেরো থেকে সুতোটা হয়তো ছিঁড়ে যেতে পারে।

কি এক অমোঘ শক্তি এই সাজানো সুতোর জালের পিছনে বসে নির্মম হাতে জাল বুনে যায় একে অস্বীকার করবার মত যৌবনের নেশা ধরল না ওর এখনও। সবাই কি এমন সব কথা ভাবে? দিদিও কি ভাবে? পুঁটি ভাবে? কে জানে।

(ক্রমশঃ)

নাটকীয়

হিমাংশু চৌধুরী

ক্যানভাসে ছবি আঁকি,—টেম্পেরা, জলরঙা
কখনো বা পেন্সিল স্কেচ্‌
'গড়ের মাঠের কিম্বা সূর্যোদয় হয় হয়
এমন ধূসর কোনো গ্রামে'······
দুপুরের ক'লকাতা,—গংগায় অন্ধকার নামে
অথবা স্বপ্নিল মনে যাকে এঁকে বলেছি : মানসী !
বহুতর অবক্ষয়ে এখনো তোমায় ভালবাসি ।
এখনো পৌরুষ কণ্ঠে বলি বারংবার :
যুগে যুগে তুমি যে আমার !

দরজায় টোকা পড়ে। দোর খুলে অমায়িক হাসি
বহুচেনা মুখ দেখে,—বলি তাঁকে :
ল্যাণ্ডস্কেপ্‌, স্কেচ্‌,—
অনেক পছন্দসই ফটো প্রিণ্ট হুবহু আসল······
: বুঝেছি,—থামিয়ে দেন,—সজীব সিনারি তবু
আরো ভালো এমন নিটোল,
এমন আমেজ লাগা কুমারী মেয়ের ছবি
হিট্‌ দেবে বাজারে এখন······

আলগোছে তুলে দিই,—তারপরে বললেন : আসি ।
ইজেলের পাশে বসে কী করুণ তুলি হাতে হাসি ।

মধুমতী

সামস্থুল হক

সেই যে মায়াবী ভোরে নিদ্রানীল নীল পাখী এসে
আমাকে জাগিয়ে গেলো : সাঁওতালী মেয়ে যেন হেসে
হিজলের পাতা ছুঁয়ে পাহাড়ের আকাশে মিলালো :
আমার বিনম্র বুকে সেই ডাক—সেই নীল আলো।

পৃথিবী যখন ছিল জল, জল ছিল আঁধারের ঘুম,—
আমার মেরুণ পাখী বলে গেলো :
জন্ম তার সেইখানে—নিরব নিঝুম।

তারপর কতকাল : পৃথিবীর সোনামুখী মেয়ে
সোনালী যৌবন পেতে গায়ে ঢালে কিশোরীর শাড়ী
স্নিগ্ধ শাউন-জলে : ঠিক যেন নব তনু ছেয়ে
কুমারী ফোটাতে চায় ভীরুলাজ, রূপরেখা যারি
প্রতিটি তারার রঙে ভ'রে দিতে চায় তার মন :
পউষে ধানের দিনে সেই মেয়ে সোনালী তেমন।

ওই ডাক শুনে শুনে পুরাতন হ'য়ে গেছে কবে,
তবুও আমার পাখী কই এল—শিশুগাছে—ভোরে।
তবে সে কি আসবে না এইখানে ফেলে অনাদরে,
যাকে নিয়ে অপরাজিতার চেয়ে আরো নীল হবে!

কে যেন বললো ওই!—আসবে সে, আসবে সে, কাল,
মধুমতী প্রেম নিয়ে দেখা দেবে আগামী সকাল॥

আলোচনা

চরিত্রহীন

শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সরকারী-বেসরকারী, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সবাই আজ বলছেন দেশের বড় দুর্দিন, অর্থনৈতিক পেষণে মানুষের মনের ভারসাম্য নেই, মধ্যবিত্ত দিকভ্রান্ত, ছাত্রসমাজ বিশৃঙ্খল। ভারতের অন্য প্রদেশের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে যে সর্বব্যাপী হতাশার রাজত্ব চলেছে তার ভয়াবহ রূপ প্রতিদিনই তো দেখছি। বাংলার শাসনের গদীতে অধিষ্ঠিত দলের প্রতি জনসাধারণের খুব বেশী আস্থা নেই, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধারেরা দেশের সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি, দেশের সাহিত্যিক কিছু কিছু অল্পমূল্যে কেনা যায়, বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তি আদর্শহীনতার চোরাবালিতে দুর্বল, হিন্দী ফিল্মের জোয়ারে বাঙ্গালী যুবকের আদর্শবাদ ও মননশীলতা ভেসে যাচ্ছে নিঃশেষে, এ সব কথা সবাই জানি সবাই বুঝি তবু দিনের পর দিন আত্মধিক্কারের ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে যাচ্ছি, মেরুদণ্ডের সে শক্তি নেই যাতে আজ এই অধোগতির পথ রুখে দাঁড়াতে পারি।

কিন্তু এই দুরবস্থা কেন? শাসনে অধিষ্ঠিত দল বলছেন বামপন্থী সমাজবিরোধীদের কাজ এটা, বামপন্থীরা বলছেন শাসনে অধিষ্ঠিত দলের লুব্ধ স্বার্থপুষ্টির অপচেষ্টার ফল এটা। কোন্‌টা সত্য এ প্রশ্ন অবান্তর—কারণ সহজবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেই জানেন যে দুপক্ষের অভিযোগই সত্য। শিক্ষার উপরতলার কর্তা ব্যক্তিরা ছাত্র বিশৃঙ্খলার জন্য ছাত্রদের দায়ী করবেন। পারস্পরিক অভিযোগের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে স্বার্থসংশ্লিষ্টের দল মূল প্রশ্নটিকে চাপা দেবেন। দেশ, জাতি, এ সবের চিন্তা মনে ঠাঁই পাবে না। প্রস্তাবের পর প্রস্তাব উঠবে, স্তূপীকৃত প্রস্তাবের উচ্চচূড়ায় বসে তৃপ্তির হাসি হাসবে সবাই।

মূল সমস্যাটা হলো এই যে দেশব্যাপী চরিত্রহীনতা দেখা দিয়েছে। কি সাধারণ মানুষের মধ্যে, কি রাজনীতির আসরে, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সত্যবাদী স্পষ্টবক্তা নির্ভীক লোকের স্থান নেই। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে আজ এমন লোকের অভাব যাঁদের ধর্মবুদ্ধির উপর সমস্ত জাতি নির্ভর করতে পারে। সত্যকথা বলা আজ নির্বুদ্ধিতার নামান্তর, কথার মূল্য রাখা বোকা ভালোমানুষীর পরিচয় সুতরাং অবাধ আত্মীয়তোষণ আর ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণের খেলা চলছে সমাজের উপরতলায়। সংকীর্ণ চাতুরী সৎবুদ্ধিজাত কর্মপ্রেরণার জায়গা জুড়ে বসেছে। বেশী দিনের কথা নয় মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এই দেশের জীবনে এমন লোকের সংখ্যা অল্প ছিলনা, যাঁরা মুখের একটা কথার জন্যে অবহেলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতেন যাঁদের কাজে এবং কথায় অমিল ছিল না, আদর্শবাদ বক্তৃতামঞ্চের মধ্যেই অগ্নিস্ফুরিত হয়ে বাইরে স্তিমিত হয়ে যেতো না।

আজ বাংলাদেশ তার মর্যাদার আসন থেকে চ্যুত হয়েছে—তার চরিত্রের অটুট মনোবল নেই যার জোরে সারাভারতকে একদিন তার মুখাপেক্ষী করে তুলেছিল। সেই সাহস নেই যার জোরে ইংরেজ সাহেবের মুখের উপরে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী বিদ্যাসাগর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

সবাই জানেন আজকে যে দল বাংলা দেশে সরকার হাতে নিয়ে বসেছেন এঁদের মনোবল ও চরিত্রবল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেশবাসীর আস্থা অর্জন করতে পারেনি। এমন ঘটনা নিত্যই ঘটছে যেখানে ধনীর তর্জনীশাসনে এ দলের কার্যপরিচালনার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ এঁরা নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে সবাই যে সুবিধাবাদী এমন কথা অশ্রদ্ধেয়, এ দলের মধ্যে এমন লোক কয়েকজন আছেন যারা নির্ভীক সৎ দেশসেবক হিসাবে সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু তবু দেখছি দলরাখার স্বার্থে সে নির্ভীকতা, সে সততার লেশমাত্র স্পর্শও তাঁদের সত্তায় আর নেই। মানুষের প্রতি যে দরদ যে সহানুভূতি গান্ধীবাদী দর্শনের একটা গোড়ার কথা ছিল সেই দরদটুকু এঁদের স্বভাব থেকে মুছে গেছে। যে আদর্শবাদ একদিন প্রেরণা দিয়েছিল বাংলার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে সেই আদর্শবাদ আজ তাঁদের জীবনে নেই।

অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতির কি চেহারা দেখছি। সেখানেই কি কোন আদর্শের বালাই আছে! গদীচ্যুত কিছু কংগ্রেসী আজ জোর গলায় বামপন্থী হয়েছেন। কোন মতামতের প্রশ্ন অবান্তর, কোন আদর্শের প্রশ্ন নিরর্থক, কোন স্বার্থত্যাগ আজ অপ্রয়োজনীয়। তথাকথিত বড় দলগুলি আজ লোভের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলার যুবসমাজের উপরে এই বামপন্থী রাজনীতির কি প্রভাব পড়েছে? আদর্শহীনতার বেদনা অনুভব করার মত বোধশক্তি কই?

শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেই কি জীবনের কোন মহত্তর প্রেরণা কাজ করছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে আজ গোষ্ঠীস্বার্থ সেখানে দেশের স্বার্থকে ছাড়িয়ে গেছে। যাঁরা এ বিষয়ে কোন খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে কেন বি, এন মিত্র কমিটির রিপোর্ট চাপা দেওয়া আছে।

যেখানেই যাই সেখানেই দেখি সারা বাংলাদেশের জীবন জুড়ে চরিত্রহীনতার চরম বিকৃতি দেখা দিয়েছে। এই দুর্গতিকে রোধ করার জন্য নানা চেষ্টা নানাভাবে করার ভাণ দেখানো হচ্ছে। শিক্ষাপদ্ধতি বদল করার কথা উঠছে, শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতার প্রশ্ন উঠছে কিন্তু 'এহো বাহ্য।

মূল কথাটা এই—বাঙ্গালী আজ তার চরিত্র হারিয়েছে, কিন্তু কেন? সেইটেই হলো আসল প্রশ্ন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাছে বাঙ্গালী আঘাত পেয়েছে বলেই, তার সর্বভারতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে বলেই, এ প্রশ্ন তুলছি এ কথা কেউ মনে করবেন না। দুঃখের কথা যেটা মনে বেজেছে সেটা হলো এই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে আজ একটি প্রতিষ্ঠান নেই, একটি মানুষ নেই যাঁর মধ্যে বাঙ্গালীর মাত্র পঞ্চাশ বছরের পুরণো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখবো। আত্মস্খলনের দুঃখ বেজেছে বলেই এই প্রশ্ন, বাইরের সম্মান কতটা কমলো আর কতটা বাড়লো সে প্রশ্ন নিরর্থক।

উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতকের প্রথম তিরিশ বছরে যে বাংলা ও বাঙ্গালীকে আমরা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বাংলাকে দেখলে বেদনাহত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেদিনকার তুলনায় আজকের বাংলার লাভলোকসানের যদি বস্তুগত খতিয়ান করি তাহলে বোধহয় ক্ষতি বেশী ধরা পড়বে না। কিন্তু যদি মনের রাজত্বের সীমানা মেলাতে

যাই তাহলে দেখবো শিবনাথ শাস্ত্রী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ,আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের লোক আজ বাংলাদেশে নেই—রামমোহন, প্রভৃতির কথা নাই তুললাম। সমস্যাটা ঐখানেই। মানুষ নেই--যে সত্যনিষ্ঠ, উদার, সাহসী মানুষের দল আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগে সমস্ত জীবনের সুর বেঁধেছিলেন তাঁদের বংশধর নেই একটিও। যে দেশসেবক ছিল নির্লোভ, নিঃস্বার্থ তার সহকর্মীরা বেঁচে নেই কেউ। মূলতঃ জাতিগঠনের মূল উপাদানটাই পচে গেছে—মরে গেছে মানুষের মন, মরেছে বাঙ্গালীর চরিত্রবল।

এ কথা অনস্বীকার্য যে নানা কারণে এই চরিত্রবল গেছে—সে কথা শিশুতেও বোঝে—কারণ ছাড়া কার্য্য হয়না। সবচেয়ে চটকদার কারণ হিসাবে দেখানো হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-দাঙ্গা দেশবিভাগ। এই সব কারণগুলি যে একটা জাতির জীবনে বিপর্যয় আনবার পক্ষে যথেষ্ট একথাও ঠিক। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন রইলো; যাঁরা চোখের সামনে বিংশশতাব্দীর প্রথমাংশের লোকোত্তর প্রতিভাশালীদের দেখেছেন তাঁদের সঙ্গ পেয়েছেন তাঁদের জীবনে সেই আদর্শের লেশমাত্র স্পর্শও কেন নেই। আশুতোষের সঙ্গ পেয়েছিলেন এমন লোকের তো অভাব নেই কিন্তু সেই বিরাট বিস্তৃত বক্ষের দরদ কই, বাংলা ভাষার প্রতি সেই সুগভীর অনুরাগ কই। বাংলার সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের যে দু' একজন অবশিষ্ট আছেন তাঁদের দেখা যাচ্ছে রাজনীতির আসরে যে পাটোয়ারী মূর্তিতে তার মধ্যে সূর্যসেনের সহকর্মী বলে পরিচয় দেবার কি আছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া শান্তিনিকেতন আজ কি পরিণতির দিকে চলেছে—রবীন্দ্রনাথের সুর কি তার নিকট বন্ধুদের মন থেকে এরই মধ্যে মুছে গেছে। আজকের তরুণ আর আশুতোষ প্রফুল্লচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে generation রয়েছেন দেশের সর্বাঙ্গীন অবনতির তাঁরাই হলেন subjective কারণ। জাতীয় জীবনকে তাঁদের আদর্শহীনতা, লোভ, মিথ্যাচার দিয়ে তাঁরা কলুষিত করেছেন। কি রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক চরিত্রহীনতা এঁরা দেখিয়েছেন আজকের বাংলায় তারুণ্যের দায়িত্ববোধহীন জোলো জীবনদৃষ্টি তারই প্রত্যক্ষ ফল।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে দেশকে নতুন আদর্শবাদের জাগরণ। একথা অবিশ্বাস্য যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বাধীন সৎ মনোবৃত্তির প্রকাশ দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে ঘটবে না। তাঁদের এ দায়িত্ব নিতে হবে। পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্য, পাটোয়ারী রাজনীতি জাতির জীবনকে পঙ্গু করেছে, বন্ধ্যা করেছে। সংবাদপত্র যেখানে ধনীর স্বর্ণঝুলির সূত্রে বাঁধা, শিক্ষকতার পেশা যেখানে কর্তৃত্বের রক্তচক্ষুর তাড়নায় সত্যকথনের অধিকার থেকে বঞ্চিত সেখানে অবারিত তারুণ্যের প্রতি আশা ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এ অভিযোগ নিরন্তর শুনেছি যে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার জন্য রাজনীতির প্রতি তাদের আকর্ষণের প্রবলতাই দায়ী। নিজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু নেই। যে সব ছাত্রদের রাজনীতির প্রতি এতটুকু আকৃষ্ট হতে দেখেছি ভুল হোক ঠিক হোক তাদের একটা আদর্শবাদের প্রেরণা এসেছে মনে। কোন অসভ্য অশালীন ব্যবহার তাদের

কাছ থেকে পাইনি। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে স্পর্শমাত্র যোগ যাদের নেই তাদের দেখেছি সহজেই উদভ্রান্ত হতে অশালীন হতে কারণ জীবনের কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য তাদের সামনে নেই। আদর্শের অভাব জীবনে কত বড় অভাব সেটা অত্যন্ত সন্তর্পণে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সহজ গতানুগতিক গড্ডালিকার স্রোত সৃষ্টি করতে পারলে একদল লোকের অবাধ জোচ্চুরীর পথ প্রশস্ত হয়।

আজ তাই যখন দেখি মূলের এই দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বাইরে থেকে নানা চেষ্টা চলছে, নানা সম্মেলন, নানা রাজনৈতিক শক্তি জোট তখন নিজের অক্ষমতাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন একশোটি ছেলে পেলে পৃথিবীর ধারা বদলে দেব—তাঁর স্বপ্নের মূল কথাটি সত্য না হলে মুক্তির পথ নেই এই অধোগতির চোরা বালি থেকে। মানুষ চাই, সৎসাহসী আর নিঃস্বার্থ মানুষ চাই, তা যদি না পাওয়া যায় তাহলে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স, মালটিপারপাস স্কুল, পাঁচপাটি বামপন্থী ঐক্য, সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ, বঙ্গসংস্কৃতির সম্মেলন, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এও জানি যে খাঁটি মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, সে গড়ে উঠবে এই সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যেই।

সোমেন বসু

কথা সাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন

এবারের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আর অজস্র রবীন্দ্র জন্মোৎসবের দাপটে বাংলা দেশ যখন উতপ্ত, তখন হঠাৎ ঠাণ্ডা মৃদু সমীরণের ছোঁয়ার মত মনোরম লাগল কলিকাতার "সাহিত্য তীর্থের" তিনদিনব্যাপী কথা সাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীটের "মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে" সাহিত্য-তীর্থের পক্ষ হতে তাদের তিনদিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সূচনা হয় যথেষ্ট শান্ত, সুন্দর ভাবগম্ভীর পরিবেশে। এই দিনটি বিশেষ ভাবে প্রাচীন সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা দিবস নামে চিহ্নিত ছিল, এবং এক অপরূপ পরিবেশে, উপেন্দ্রবাবুকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিবারের মত এবারও এক বাংলা কবিতা পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে প্রায় দেড় শত বাংলা কবিতা পুস্তকের সমাবেশ হয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে এবারের প্রদর্শনী যথেষ্ট প্রশংসা লাভের যোগ্য ও সাফল্যজনক মনে হলেও, "তীর্থের" কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু অভিযোগ শোনা যায়। যে বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও নাকি কবি ও পুস্তক প্রকাশকদের কাছ হ'তে তেমন সাড়া বা সহযোগীতা পাওয়া যায় নি। কিছু নবীন কবিরাও প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষকে পুস্তক পাঠিয়ে সাহায্য করেন নি। যার ফলে অনুষ্ঠান সমাপ্তির দিন পর্যন্ত কেউ কেউ পুস্তক পাঠান, যা প্রদর্শনীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কবিকুল প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে আশানুরূপ সাহায্য করবেন।

তিনদিন ধরে এবার প্রদর্শনীতে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সাহিত্য অনুরাগীদের সমাবেশ হয়, এবং তারা প্রদর্শনীর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্রদর্শনীর গঠন ভঙ্গী এবার সত্যাই চমৎকার হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, কবিসম্মেলনের বিরাট সূচীপত্র নিয়ে। বাঙলা দেশ কবিতার দেশ। বাঙালী কবিতা ভালবাসে। ভাবপ্রবণ বলে বাঙালীর অখ্যাতি থাকলেও কবি-গুরুর দেশে কবিতার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অনুষ্ঠানে বাঙলা দেশের প্রখ্যাত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, তার প্রারম্ভিক ভাষণে বাঙলাদেশে কবিতার স্থান উল্লেখ করেন। এবং বর্ত্তমান বাঙলা কবিতার স্রোতে জোয়ার দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন।

এবারের অনুষ্ঠানের আগে সাহিত্যতীর্থের কর্ত্তৃপক্ষ একদিনে নবীন ও প্রবীন কবিদের সম্মেলনের জন্য যে সমস্যার কথা ভেবেছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কবি অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র তাঁদের ভাষণে সেই কথা উল্লেখ করে বলেন যে নবীন ও প্রবীনরা আজ তাঁদের পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব কাটিয়ে উঠেছে। কারণ আজকে বাঙলার কবিতা স্রোত শুধু রসের প্রবাহে এবং মননশীলতার ধারায় প্রবাহিত। যেখানে নবীন প্রবীণে বিদ্বেষ নাই।

কবিসম্মেলনের বিষয় এবার কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ এবছর কবিদের মধ্যে একটা অযথা আত্ম-অহমিকার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। অনেকজনকেই দেখা গেছে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে না আসতে। এটা কি দলগত বিদ্বেষ না নিছক উদাসীনতা? বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে "সাহিত্যতীর্থ" যে বিনা অর্থগ্রহণে সাহিত্য সম্মেলন করেন তা বিপুল প্রশংসার দাবী রাখে। হয়ত বা বাঙলা দেশে এই ভাবে সাহিত্য প্রসারের পথে তাঁরাই প্রথম পথ প্রদর্শক। তবুও দেখা যায় কবিদের, সামান্য ত্রুটি ধরে বিদ্বেষের ভাব। যেটা সহজেই সহজ করে ভেবে নেওয়া চলে। দ্বিতীয় আছে কবিদের বৃহৎ কবিতা, অনেক কবিতা পড়ার উদ্ভট সখ। বেশীর ভাগ কবিই পাঠ করেছেন একের বেশী বড় কবিতা, সময়-অল্পতা সম্বন্ধে পুর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা হঠাৎ কেন বড় বড় কবিতা পড়লেন জানি না। কবিদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কবিতা নির্ব্বাচনের কর্ত্তব্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল কবিদের সময়ের কথা না ভেবে বড় কবিতা পড়তে। এমন কি অনুষ্ঠান পত্রে অজস্র কবিদের উপস্থিতি দেখেও দীর্ঘ কবিতা পড়ার সখ ত্যাগ করেন নি। যার জন্য এবার অনেক কবিই শেষ পর্যন্ত কবিতা পড়তে পারেনি। কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলা যায় (জানিনা কবিরা আমার কথা অনুমোদন করবেন কিনা!) যে তাঁরা কবিতার এ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেও ভুল করেছেন অনেকেই। তাঁদের কবিতা ছোট সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর প্রতিনিধিমূলক হওয়া উচিত ছিল, সম্মেলনের কবিতা দীর্ঘ না হয়ে ছোট কিন্তু, কোন বিশেষ বিষয়ে স্বাতন্ত্রতা পুর্ণ হলেই ভাল হ'ত। এছাড়াও দরকার, পাঠে সুনিপুণ বাচনভঙ্গী। কবিরা আশাকরি কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

শেষ দিন বা তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় কথা সাহিত্যিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে পরপর দুবৎসরই কথাসাহিত্যিক সম্মেনের দিনটিকে বড় দুর্ব্বল লাগল। এর কারণ খুঁজলে দেখা যায় অনুষ্ঠান গঠন-ভঙ্গীর দুর্ব্বলতা, কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট উৎসাহের অভাব, আর গল্প লেখকদের গল্পের দুর্ব্বলতা। শুধুমাত্র বাচনভঙ্গী দিয়ে যে শ্রোতাদের মনে স্থান পাওয়া যায় না তা এবার গল্প লেখকরা অনুভব করেছেন। গল্প শুধুমাত্র বাচনভঙ্গী নয়, নির্ভর করে কাহিনীর জন্য। গল্প সংবেদনশীল, এবং কাহিনীমূলক হলেই শ্রোতারা পছন্দ করে। আশা করি আগামীবার এর সংশোধন দেখতে পাব। এইদিনকার অনুষ্ঠানের সূচনায় শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী তার ভাষণে বলেন গল্প হবে ছোট, কিছুটা কবিতার মত। অর্থাৎ একটা মেজাজের।

এবারের সমস্ত দিনের অনুষ্ঠানে একটা বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করা যায় তা হল মহিলাদের অনুপস্থিতি। আবেদন করার ফলেও মাত্র দু' একজন মহিলা কবি ও গল্প লেখিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ত্তমান নারী প্রগতির যুগে এটা লজ্জাকর নিশ্চয়। কারণ যখন পত্রপত্রিকায় অনেক মহিলাদের রচনাই তো দেখা যায়। নিছক সাহিত্য বলেই বোধ হয় তাদের বিরাগ।

আশুতোষ লাহা

ধর্ম

ধর্মের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "মানববৃত্তির উৎকর্ষনই ধর্ম।" তাঁর মতে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির পারস্পরিক সামঞ্জস্য-পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ এবং চরিতার্থতায় মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তাহাই ধর্ম।[১]

যে অনবদ্য বিশ্লেষণের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই, পৃথিবীর সাহিত্যেও তার তুলনা বিরল বলেই অনুমান করা চলে। (বঙ্কিমচন্দ্রের মূল প্রেরণা যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তা তিনি স্বীকার করেছেন)। বাংলাদেশের সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যদি অত যুক্তিনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন না হতেন বা তাঁর মানসিক ভারসাম্যের কিছুমাত্র অভাব ঘটত তবে তাঁর এই মতবাদকে কেন্দ্র করে একদল শিষ্যসামন্ত জুটে যে তাঁকে আর এক শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা অনুকুল ঠাকুর করে তুলতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু শিষ্য জোটানর দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ বা প্রশ্রয় ছিল বলে বোধ হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত ধর্মমত বা ধর্ম হিসেবে প্রচলিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই; কারণ, তার আলোচনা বিশ্লেষণনির্ভর, বিশ্বাসসম্বল নয়। ধর্মের ভিত্তিই হল বিশ্বাস বা অলৌকিকে বিশ্বাস।[২] কিন্তু অলৌকিকে বিশ্বাস ধর্মের শেষ কথা নয়। বিশ্বাস শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস গোষ্ঠিগত বিশ্বাসের সমার্থক না হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত শুধুমাত্র অলৌকিকে বিশ্বাস ধর্মের পর্যায়ে পড়ে না। ধর্মের সংজ্ঞায় সামাজিক দিক অপরিহার্য্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন তাতে এই দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ধর্মের ব্যক্তিগত দিক মাত্র। তা দর্শনের এক্তিয়ারভুক্ত। আমাদের আলোচনা যথাসম্ভব সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ রাখব।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিরা সকলেই ধর্ম নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং যুগের প্রভাবে ধর্মের ব্যক্তিগত দিকটাই প্রায় সকলের চোখেই প্রধান হয়ে উঠেছে। কাণ্টের মতে "Religion is morality", ফিক্তে বলেছেন "Religion is knowledge"। হেগেলের মতে আবার "Religion is or ought to be perfect freedom, for it is neither more nor less than the devine spirit becoming concious of himself through the finite spirit." এই শতাব্দির চিন্তাধারায় ব্যক্তিবাদের সর্ব্বাত্মক ব্যপ্তি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেকাংশেই আচ্ছন্ন করে ছিল, তাই এ-যুগের বিচারে ধর্মের ব্যক্তিগত দিকটাই প্রধান। একমাত্র আগস্ত কোঁতেই ধর্মের সামাজিক দিক সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে—

(১) ধর্মতত্ত্ব
(২) E. B. Tylor এর মতে ধর্মের সংজ্ঞাই হ'ল belief in spiritual being.

"Religion consists in regulating one's individual nature and forms the rallying point for all the separate individuals"[৩]

তবু, গোষ্ঠিগত অলৌকিকে বিশ্বাস বললেই ধর্ম্মের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ ধর্ম্ম ক্রিয়ামূলক। প্রত্যেক ধর্ম্মের সঙ্গেই আনুসঙ্গিক পূজা প্রকরণ বা আচার-অনুষ্ঠান অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার সূত্রপাত যে অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস বা ভয় থেকে সঞ্জাত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৪] আদিমানবের ধারণার জন্ম-মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, শস্যের ফলন, এক কথায় মানুষিক বা প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাই কোন না কোন শক্তির প্রভাবে সংঘটিত। সেই সব শক্তি আকাশ, নদী, পাহাড়, বন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পাথর এমনকি বিভিন্ন পশু পাখীর মধ্যেও কল্পনা করা হ'ত। সেকালে মানুষের চোখে সমস্ত পদার্থই সচেতন এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন (এই ধারণা এবং তজ্জনিত মতবাদকেই Animism বা সর্বপ্রাণবাদ আখ্যা দেওয়া হয়)। কাজেই সেই সমস্ত ব্যক্তিকে নৈবেদ্য সহযোগে ভজনায় তুষ্ট করে বা ভীতি প্রদর্শনে বাধ্য করা যায় বলেই সে কালের ধারণা ছিল। সেই ধারণার বশে যে সব ইন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল, পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান তারই পরিণতি মাত্র।[৫] ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থায় তা ইন্দ্রজালমূলক যৌথ অনুষ্ঠানের বেশী কিছু ছিল না। তাই James Frager এর মতে ধর্ম্মের সংজ্ঞা হল "a propitiation or conciliation of power superior to men which are believed to control the course or nature of human life"। অবশ্য এ সংজ্ঞাও যে অসম্পূর্ণ তা আমাদের আলোচনার সূত্রে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। যাই হোক প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্ম্ম একান্তই ক্রিয়ামূলক, ভাবমূলক নয়। ধর্ম্মে ভাবপ্রাধান্য একান্তই আধুনিক এবং এখনও কোন ধর্মই অনুষ্ঠানবর্জিত নয়।

ধর্ম্মের এই ক্রিয়ামূলক দিক আবার ধর্ম্মের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হ'ল অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য। ধর্ম্মের ঐন্দ্রজালিক পর্যায়ে পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত সমাজেই যে এমন কয়েকজন ব্যক্তির সন্ধান মেলে যারা কতকগুলি অস্বাভাবিক ক্ষমতা বা প্রবণতার পরিচয় দেয়। প্রচলিত অন্য কোন উপযুক্ত শব্দের অভাবে আমরা এদের ঐশীশক্তিসম্পন্ন (Charismatic) ব্যক্তি বলব। আদিম সমাজে অনেকে আবার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং ধীশক্তির বলে মানুষের এবং মনুষ্য পালিত পশুর রোগের নিরাময় করতে অনেক সময় সফল হ'ত। আদি মানব সমাজে এই দুই জাতীয় লোকেরই স্থান যে খুব উচ্চে

(৩) কাণ্ট, ফিক্তে, হেগেল এবং কোঁতের উক্তিগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

(৪) এ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীরা সকলেই একমত। ধর্ম্মের সূত্রপাত এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ Lewis Browne তার "This Believing world" গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি অবশ্যই ভয়ের দিকটাতেই জোর দিয়েছেন বেশী।

(৫) ইন্দ্রজাল এবং ধর্ম্মের সম্পর্ক বিষয়ে James Frazer-এর Golden Bough গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। বলা বাহুল্য, সমাজতত্ত্বে ইন্দ্রজাল মানে ভেল্কীবাজী নয়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রজাল বলতে আমরা মোটামুটিভাবে বশীকরণ কৌশলই বুঝব।

ছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাথমিকযুগের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার যৌথরূপ যাই থাকুক সেইসব অনুষ্ঠানাদির নেতৃত্ব যে এদেরই হাতে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরোহিত শ্রেণীর সূত্রপাত ঘটেছে এইভাবেই। আগেই বলা হয়েছে অলৌকিকশক্তি সম্বন্ধে ভয় ও ভক্তি দুইভাবেই লোকের মনে প্রবল ছিল। কাজেই অলৌকিকের সঙ্গে কারবারে সাধারণ লোকে নিজেরা হস্তক্ষেপ না করে এই গুণিন শ্রেণীবিশেষের হাতেই পূজার্চনার পবিত্র ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করত। এই গুণিন শ্রেণীও যে তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য কায়েমী করার এই বন্দোবস্তে কোনরূপ অসহোযোগিতা করেননি তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন 'পবিত্র' ক্রিয়াকলাপে ক্রমশঃ জনসাধারণের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং এভাবে পুরোহিতদের একচেটিয়া ব্যবসায় সমাজে সুদৃঢ় স্বীকৃতি পায়। আজ পৌরহিত্য ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অলৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে পুরোহিতশ্রেণীর নেতৃত্বে অলৌকিক শক্তির উপাসনার্থে গোষ্ঠীগত ক্রিয়াকলাপ যখন সাংগঠনিক রূপ পায় তখনই তাকে ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। সংগঠনও ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ।[৬] পাশ্চাত্যে ধর্ম্মীয় সংগঠনের প্রতীক চার্চ (Church) ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সমাজজীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে দেবালয়কে ধর্ম্মীয় সংগঠনের প্রতীক হিসেবে খাড়া করার প্রশ্ন ওঠে নি। সামাজিক সংগঠনই ধর্ম্মীয় সংগঠনের প্রতিভূ হয়েছে। অতএব ভারতবর্ষেও ধর্মের সাংগঠনিক দিক অস্বীকৃত বা উপেক্ষিত বলা চলে না। ধর্ম্মের এই অপরিহার্য দিকগুলি বিচার করে ধর্মের সংজ্ঞা আমরা এইভাবে নির্দ্ধারিত করব—অলৌকিকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পুরোহিত শ্রেণীর নেতৃত্বে অলৌকিক শক্তির উপাসনার জন্য কোন জনগোষ্ঠির যে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে ওঠে তাই ধর্ম্ম।

কি টোটেমিক যৌথজীবনে কি বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ধর্ম্মের আবশ্যকীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব। টোটেমিক বন্ধনে ধর্ম্ম যেমন সিমেন্টের কাজ করছে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সূত্রপাতে তেমনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে উস্কে দিয়ে প্রগতির পথ পরিষ্কার করেছে।[৭] সমস্ত যুগেই অলৌকিকের বিশ্বাস ও ভীতি, স্বর্গের প্রলোভন বা নরকের বিভিষিকা, এবং ধর্ম্মীয় অনুশাসন সামাজিক শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং ভারসাম্য বজায় রেখেছে, সামাজিক কল্যাণে যার অবদান মোটেই তুচ্ছ নয়, তাছাড়া বিশ্বাস সাধারণ মানুষের পক্ষে চিরদিনই একান্ত অবলম্বন। বর্ত্তমানে ধর্ম্মীয় বিশ্বাস হয়ত রাজনৈতিক বিশ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু মূলতঃ উভয়ের পার্থক্য খুব স্পষ্ট না। পৃথিবীর এক বিপুল জনসমষ্টি, সম্ভবতঃ অধিকাংশের পক্ষেই ধর্ম্ম যে এখনও একটি মহৎ অবলম্বন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের সাংগঠনিক দিকের কোন যোগ নেই। এই বিশ্বাস ধর্ম্মের ব্যক্তিগত দিকমাত্র।

ধর্ম্মের এই মূল্যবান অবদানের উল্টোদিকে তার অপকারিতার পাল্লাও কম ভারী নয়। অতীতে অন্ধবিশ্বাস এবং অজ্ঞানতায় ফলে যে সব ধর্ম্মীয় অনুশাসনের সৃষ্টি হয়েছে তার উপকারিতার চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপকারিতাই বেশী। নরবলি, কন্যাবিসর্জন, সতীদাহ বাল্যবিবাহ, ধর্ম্মের নামে বেশ্যাবৃত্তি, প্রয়োজনীয় খাদ্য নিষিদ্ধ (বা 'উৎসর্গ) করা' এবং অসংখ্য কুসংস্কার সমাজের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক হয়নি। এ সবই চলেছে ধর্ম্মের নামে। প্রগতিশীল ভাবধারা বা কার্য্যকলাপ

---

(৬). cf Emile Durkheim. "Elimentary forms of religious life" tr. by J. W. Swain, London 1915. P. 47.

(৭) প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিকাশের নিবিড় যোগাযোগের কথা Max waber অকাট্য যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে প্রমাণিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর "The Protestant Ethics and spirit of capitalism" (tr. by T. Parsons. New york 1930) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। J. M. yinger এর Religion and the struggle for power(Durham 1946) গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য।

চিরদিনই ধর্মের বিরোধিতায় বাধাহত হয়েছে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ধর্মের নামে চললেও ধর্ম্মকে সেজন্য দায়ী করা চলে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকলে এসবের জন্য সরাসরিভাবে না হ'লেও অন্তত: পরোক্ষভাবে ধর্ম্মকে দায়ী করা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ধর্মের প্রকৃতি স্থৈতিক (static) এবং রক্ষণশীল। প্রচলিত ধর্ম্ম ব্যবস্থার বিধি-বিধানের সঙ্গে গতিশীল (dynamic) সামাজিক প্রয়োজনীয়তার অসঙ্গতি অনেক সময়ই তীব্র হয়ে দেখা দেয়। সেই অসঙ্গতি হয়ত নূতন ধর্ম্মের সূচনা করে, কিন্তু সেই সূচনা যতদিন পর্যন্ত না সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়ে সাংগঠনিক রূপ নেয় ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পর্যায়ে পড়ে না। ততদিনে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতি হয়ত নবতর অসঙ্গতির সূত্রপাত করবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম্মকে তাই চিরদিন রক্ষণশীল ভূমিকাতেই দেখা গেছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং ন্যায়নীতির রক্ষণাবেক্ষণ করাই ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে শাসকশ্রেণীর পক্ষে ধর্ম্ম তাই চিরদিনই প্রধান সহায়।

উপকার অপকারের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় ধর্ম্মের যা মূল ভিত্তি, সেই অলৌকিকে বিশ্বাসই টলে উঠেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে এমন অনেক ঘটনা বা পরিস্থিতি মানুষের বোধগম্য হয়েছে যা আগে অলৌকিকের পর্যায়ে জ্ঞানবুদ্ধির অতীত বলে ধরা হত তার ফলে আবার যা' এখন পর্য্যন্ত বোধগম্য হয়নি তাও ক্রমশ: ক্রমশ: মানুষের জ্ঞানের আয়ত্বে আসবে বলে আস্থার সঞ্চার হয়েছে। এদিকে সামাজিক অসাম্য প্রভৃতি নানা কারণেও 'ভগবানের' উপর মানুষের বিশ্বাস বহুলাংশে সংকুচিত। তদুপরি বিজ্ঞানের কল্পনাতীত সাফল্য ঈশ্বরমুখী মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলছে। যতবড় বিশ্বাসীই হোক না কেন, রুগ্ন সন্তানকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের ভরসায় ফেলে না রেখে সকলেই আধুনিক ডাক্তারকে ডাকেন। ডাক্তার হাল ছেড়ে দিলে তবে চরণামৃতের খোঁজ পড়ে।

ধর্ম্মের মূল ভিত্তি শিথিল হবার ফলে পূজা অর্চনার বিভিন্ন ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে; যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় আবার পুরোহিত শ্রেণীর গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। আজ মোটামুটিভাবে ধর্ম্মেরই সার্থকতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে, সামাজিক প্রয়োজনীয়তার এই ঘাটতি পূরণের জন্যই আধুনিক যুগে সমস্ত ধর্মেই মানবকল্যাণ বা সমাজ সেবায় দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা মিশনারীদের সেবামূলক কার্যকলাপ সাধারণ উদাহরণ মাত্র। পাশাপাশি পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মসমন্বয়ের, অন্তত বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। (ব্যতিক্রম স্বীকৃত।)

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা যদি শেষ পর্য্যন্ত সমাজ কল্যাণেই পর্য্যবসিত হয়, তবে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে যে সব ধর্ম বা ধর্মীয় সংগঠন আছে, তার কোন সার্থকতা থাকে না। এ যুগে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, সকলেরই লক্ষ্য সমাজকল্যাণ। শুধুমাত্র ধর্মীয় বলেই কোন সংগঠন সমাজকল্যাণে বেশী কার্যকরী হবে একথা মেনে নেওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর চেতনায় তাই হিন্দু, মুসলীম, বৌদ্ধ কি খ্রীষ্টান বলে আত্মসনাক্তি অর্থহীন অন্ধতা ছাড়া কিছু না।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

গ্রন্থপরিচয়

নাবী ফসল ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক সিগনেট বুকশপ্। দুই টাকা।

সবশুদ্ধ আটচল্লিশটি কবিতা গুচ্ছ সাজিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ। জীবন সমীক্ষার বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে প্রকাশভঙ্গীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। পরিণত মন নিয়ে লেখা আলোচ্য কবিতাগুলি এরই এক সার্থক সমষ্টি বলা যেতে পারে।

বর্ত্তমানে মানব সমাজ তার শিল্প সমষ্টি নিয়ে বন্ধ্যা। কবি এই সমস্ত বাধা বিপত্তি ধুয়ে মুছে নূতন আশার আলোকপাত করেছেন কবিতার মাধ্যমে। কবির কাছে চক্ষু বা কর্ণেন্দ্রিয়ের স্থূল চর্চাই সৌন্দর্য্য উপলব্ধির একমাত্র উপায় নয় অতিন্দ্রিয় উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই তার দাম, তাই সেখানে আকাশ, রোদ এমন কি কালের চরম জয়ও গান হয়ে ধরা দেয়।

কবির এই উপলব্ধি প্রধানতঃ সঙ্গীতধর্ম্মী। নিসর্গ চিত্রের প্রতি রেখাটি তাই গান হয়ে ভেসে চলেছে। এবং প্রতি নিয়তই তাকে কথা দিয়ে বাঁধতে হয়েছে। তাই বলেছেন,—

"অপার ভাসার অবার ভাষার গান
আলোর পরতে চির সঞ্চারে বাঁধা,
স্ফুরণ চকিত ছোঁবে কি বেপথুমান
আমার যে কথা সে ভাষার সুরে সাধা!"

"নাবী ফসলের" প্রতি কবিতার মধ্যেই একটা চিন্তার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তু থেকে রূপে, রূপ থেকে গন্ধে, বা গানের উপলব্ধিতে যাবার পথ প্রতি কবিতার মধ্যে চিহ্নিত হয়ে হয়ে আছে। সেই জন্যই পাঠক সহজেই কবির চিন্তাজালে গভীরতায় পৌছতে পারে।

কাব্যগ্রন্থখানি মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর এবং গদ্য কবিতার বিভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। মিত্রাক্ষর কবিতাগুলির অনুপ্রাস যমক ও মিলগুলি বেশ সহজেই এসেছে। কতকগুলি গদ্য কবিতাও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কয়েকটিকে 'কবিতা' আখ্যা দেওয়া চলে না এবং বিশেষ করে দুটি নিবন্ধকে কবিতা বলে চালানো নিতান্তই দুঃসাহসিকতা বলতে হবে। তবুও কেবলমাত্র অপ্রচলিত ও উদ্ভট শব্দমূলক যোজনা করে চুল চেরা মনস্তাত্ত্বিক ধোঁয়াটে ভাবালুতার আশ্রয়ে যাকে কবিতা বলে চালানোর প্রচেষ্টা কিছুকাল ধরে চলেছে, "নাবী ফসল" যে তারই বিরক্তিজনক পুনরাবৃত্তি নয় সেইটাই আশার কথা। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাইএর প্রশংসা করতে হয়।

বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। দুইটাকা আটআনা

বাংলা ভাষার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক মহেন্-জো দারো, হরপ্পার লিপি নিদর্শন থেকে আরম্ভ করে বাংলা হরফের জনক ব্রাহ্মী লিপির কাল পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক লিপির লিখনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন পুস্তিকাখানির প্রারম্ভে। চর্য্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, রামায়ণ, শিবায়ণ

মহাভারত, নাথ সাহিত্য ইত্যাদি কাব্য ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যের আদিকালের সঙ্গে সাধারণ পাঠককে পরিচিত করে দেবার চেষ্টা হয়েছে এই পুস্তিকায় এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধানও করা হয়েছে। নূতনত্ব না থাকলেও সংযোজনের বৈশিষ্টে ও বর্ণনার বিন্যাস কৌশলে প্রবন্ধের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। ভাষাও যথোপযুক্ত।

শাশ্বতিক ॥ বসুধারা। হোমশিখা প্রকাশনী। কৃষ্ণনগর। সাড়ে চার টাকা

সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ইতিহাস পাঠে বিরূপ অথচ প্রাচীনতম মানবজাতির সমাজের উপর আধুনিক মানব-সমাজের বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে রয়েছে বলেই ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই লেখক একটি আধুনিক সমাজের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে কথোপকথনের ছলে ইতিহাস বর্ণনা করে গেছেন। সেই সঙ্গে সুপ্রাচীন মানবের সঙ্গে আধুনিক মানবের কাম-ক্রোধাদি আদিম ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির তুলনামূলক চিত্র এঁকে দেখাতে চেয়েছেন যে মানবতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক মানব একটুও অগ্রসর হয়নি।

লেখকের প্রচেষ্টা সত্যই সার্থক হ'ত যদি তিনি ছোটদের জন্যে এই বইখানি লিখতেন। বয়স্ক পাঠক তাঁদের রুচি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, তাই বইখানির ভূমিকা পাঠের পর ইতিহাস পাঠে অনিচ্ছুক পাঠক আর অগ্রসর হবেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এর চেয়েও যদি কেবল ইতিহাস বর্ণনার জন্যই বইখানি লেখা হতো তাহলে বইখানি সার্থক রচনা বলেই গণ্য হত। ইতিহাসকে সরস করে প্রকাশ করার ভঙ্গী লেখকের আছে।

ইতিহাসের অংশ বাদ দিলে প্রায় তিনশত পাতার বইখানি থেকে একটি দেড়শত পাতার মিষ্টি গল্প পাওয়া যাবে। ইতিহাসের কথা বলাতে গিয়ে চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে ঘটনাগুলি এক নিঃশ্বাসে শেষ করতে হয়েছে।

প্রচ্ছদপট স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ছাপা, বাঁধাই নিতান্ত মোটামুটী।

ব্যঞ্জনা ও কাব্য ॥ হরিহর মিশ্র। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। দুই টাকা

বাংলাভাষায় কাব্য সমলোচনা ও তার রীতি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়ে থাকলেও কাব্যের ওপর ব্যঞ্জনার প্রভাব এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য সমালোচনা বড় একটা চোখে পড়েনা। সংস্কৃত সাহিত্যে এর যথেষ্ট কদর আছে এবং হয়তো তার ওপর আধুনিক সাহিত্যিকদের উন্নাসিকতাই এর কারণ কিন্তু ব্যঞ্জনা যে সাহিত্যে তথা ভাষার একটি প্রধান উপাদান এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। আলোচ্য খণ্ডে লেখকের বিষয়বস্তু এই নিয়ে। বেশীর ভাগ সংস্কৃত এবং কিছুটা রবীন্দ্রকাব্য থেকে উদাহরণ তুলে ধরে লেখকের এই প্রচেষ্টা কতকটা সার্থক হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে লেখা ভাষা কিছুটা আড়ষ্ট এবং উদাহরণ চয়নকালে আধুনিক সাহিত্যের উপর

লেখকের বীতরাগ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখক ভূমিকাতে জানিয়েছেন যে গ্রন্থখানি লেখা হয়েছে প্রকাশের অনেক আগে। কত আগে জানিনা, তবে হয়ত সেইজন্যেই কাব্য জগতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীরা অবহেলিত। বইখানির পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এ সম্বন্ধে অবহিত হলেই গ্রন্থখানির কদর বাড়বে।

রবীন্দ্র কথা ॥ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রত্নাসগর গ্রন্থমালা। এক টাকা

বঙ্গসাহিত্যের উপর আলোচনার অভাব নেই কিন্তু এর শেষও বোধকরি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রপ্রতিভা রবি কিরণের মতনই সর্ব্বব্যাপী তাই রবীন্দ্রসাহিত্যকে নিত্য নৈমিত্তিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা হচ্ছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এমনি চারটি বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন,—রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবন, রবীন্দ্রকাব্যে দৃশ্যপট, জাতীয়তা ও রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ছন্দ। এই বিশ্লেষণগুলি, বিশেষতঃ প্রথম দু'টি বিষয়বস্তুর অবতারণায় ও যুক্তিসমাবেশের দিক থেকে কিছুটা অভিনবতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। বিন্যাসের বৈশিষ্টে ও আবেগহীন আন্তরিকতায় বক্তব্যগুলি বেশ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে। আশাকরি রবীন্দ্র-কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি স্থায়ী আসন লাভ করবে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

বাঘ ও অজন্তা ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। দেড় টাকা

স্বল্প পরিবেশের মধ্যে হলেও দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বাঘ ও অজন্তা' গুহার নির্ম্মাণ শৈলী ও তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের একটা সংক্ষিপ্ত সার্থক আলোচনা করেছেন। তবে আলোচনাটা বিশেষভাবে বাঘ ও অজন্তা নির্ম্মান কার্য্যের কারণ ও তার সঠিক একটা Technical দিক নিয়ে বিশদভাবে হতো তাহলে বইটি আরও উচ্চাঙ্গের হতো। এত স্বল্পভাবে আলোচিত হয়েছে যে বিভিন্ন গুহাশিল্পের মধ্যে যে পার্থক্য আছে যা বিশেষভাবে অজন্তাশিল্পে বর্ত্তমান সে বিষয়ে লেখক নীরব। আর একটা দিক, সেটা হলো ভাস্কর্য্যের দিকটা। এটাও লেখক খুব বেশী নজর দেন নি। যার ফলে চৈত্য গৃহগুলির আলোচনা যেটা অজন্তাশিল্পের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সেইটিই বাদ পড়ে গেছে। তবে আশাকরি শিল্পরসিক পাঠক এই থেকে খানিকটা ধারণা বাঘ ও অজন্তা সম্পর্কে পাবেন।

নিখিল বিশ্বাস

সমকালীন

নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি :

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক যান্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

লেখকদের প্রতি :

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশকদের প্রতি :

'সমকালীনের' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও ছোট গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

ম্যানেজার—'সমকালীন' ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য

ফোন : ২৩-৫১৫৫

সমকালীন

পঞ্চমবর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪ চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও
টেম্পল প্রেস ২ ন্যায়রত্ন লেন কলিকাতা—৪ হইতে মুদ্রিত।

পথ চলার নিয়ম ৩

সময় ও ট্রেন কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

পৌনে সাতটায় ট্রেন, আর আমাদের বন্ধুটি চারটে বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে স্টেশনে এলেন ৬-৪২ মিনিটে···মাত্র তিন মিনিট সময়—টিকিট কিনে, মাল ওজন করিয়ে ট্রেনে চাপতে হ'বে! বলা বাহুল্য, ট্রেনটি তিনি ধরতে পারলেন না, পরের ট্রেনের জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'ল। স্টেশনে আসবার পথে ভীড়ে গাড়ী আটকে যেতে পারে, টিকিটের জন্য লাইন দিতে আর গাড়ীতে জায়গা খুঁজে নিতেও তো কিছু সময় দরকার। হাতে সময় রেখেই বাড়ী থেকে বেরুবেন। সামান্য একটু সময়ানুবর্তিতা—কিন্তু তার পরিবর্তে অনেক আরাম, অনেক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবেন।

আপনাদের সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

সমকালীন ॥ শ্রাবণ, ১৩৬৪
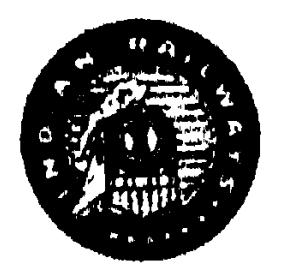
যুক্তিবাদ

পুণ্যশ্লোক রায়

আমরা বলি যুক্তিবাদ, মানে বুঝি যুক্তির ব্যবহারে বিশ্বাস রাখা, যুক্তির প্রয়োগ চর্চা করা, যুক্তির কথা লোককে শোনানো। কথাটা এসেছে হয়ত যোগ, যোগ্যতা, যোজনা থেকে। যৌক্তিক যা তা এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষের মনের যোগ ঘটায়। অযৌক্তিক যে কথা আর কাজ, অপর মানুষের কাছে তা মূল্যহীন, নেহাৎ খোদ খেয়ালি বলে ঠেকে। যা অযৌক্তিক তাকে বুঝবার ও বোঝাবার কোন দায়িত্ব নেই, তা অপরের বুদ্ধি বিবেচনাকে উপেক্ষা করেই আছে। মানুষে মানুষে মনের যোগ ঘটাতে যা পারে তাকেই বলে যুক্তি, যুক্তিনিষ্ঠা, যৌক্তিকতা।

যুক্তির সঙ্গে আরো আছে যোগ্যতার সম্পর্ক। আমার বা তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছে, আমাদের সমাজগত সুবিধে অসুবিধের প্রতি উদাসীন যে সত্য তাকে বুঝতে চাওয়া যুক্তিপ্রীতির সূত্রপাত। নিরপেক্ষ সত্যের যোগ্য যে ধারণা আর ব্যবহার তারা যুক্তিনিষ্ঠ। যুক্তি দিয়ে ও যুক্তি মেনে আমাদের মন নিরপেক্ষ সত্যের যোগ্য হয়ে ওঠে।

যোজনা করতে পারে মানুষেরই মন। প্রত্যক্ষ যা দেখছে, শুনছে, বোধ করছে তাতেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকে জন্তুরা। তারা স্বপ্ন দেখেনা, কথা বলে না, নাম দেয় না এই জিনিষটাকে ওই ব্যাপারটাকে, পরিকল্পনা করে না, এক জিনিষকে আর জিনিষের সঙ্গে চিন্তা দিয়ে কল্পনা দিয়ে যুক্ত করে বাস্তব কিংবা আদর্শ কোন সামগ্রিক বিন্যাসকে ধরতে চেষ্টা করে না। এমন পারে মানুষ, কেননা তার মন যোজনশীল, যুক্তিশীল।

ইংরেজেরা বলে র‍্যাশনালিজম, অর্থাৎ রীজনের ওপর ভরসা। কথাটা আসছে রাৎসিও থেকে। রাৎসিও মানে বিচার, মনের বিচারশক্তি। যা দেখছি, শুনছি, বোধকরছি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে বাজিয়ে নিতে হবে, যথার্থ বলে তাকে বিশ্বাস করবার আগে। ভালো লোকে বলছে অথবা অতএব যা বলছে তা সত্যি, এ হবে না। প্রমাণ চাই, অন্ততঃ চাই নিজস্ব উপলব্ধি। যেমন তেমন করে কিছু করলে চলবে না, বুঝে নিতে হবে তার স্বরূপ, তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি, তার ভালোমন্দ। কাজ চালানোর জন্যে আপাততঃ অনেক আপোষ করতে হয়, তবু শেষপর্যন্ত কিছুই বিচার না করে না বুঝে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। আপন আপন বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে, হবে, নইলে মনের মুক্তি নেই। এসব কথা র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিবাদের গভীরতম প্রত্যয়।

জার্মাণরা বলে ফের্নুন্‌ফ্‌ট্‌স্‌ফিলোজফি। ফের্নুন্‌ফ্‌ট্‌ মানে মনের ফোন'য়্‌মেন্‌ অর্থাৎ অবধারণ করার শক্তি। অবধারণ করা বলতে বোঝায় মনোযোগ দিয়ে পরিষ্কার একটা ধারণায় পৌঁছনো, হুঁস করে দেখে উপযুক্ত ধারণা গড়ে তোলা। এর মানে শুধু মনোনিবেশ নয়, আরো বরং তারই ভিত্তিতে সংঘটিত বিষয়ানুগ, আদর্শানুগ চিন্তা আর সঙ্কল্প। যুক্তিচেতনার দায় যে মানুষকে জাগিয়ে রাখার, প্রতি পদে তাকে সাবধান করে দেবার, তাকে সম্যক্‌ বোধ আর অপ্রমাদের পথে নিয়ে যাবার দায়, জার্মাণ ভাষার শব্দপ্রয়োগটি সেই কথা মনে এনে দিচ্ছে। উঠে, জেগে, যা পাবার মত চাইবার মত তাকে বুঝে নিতে হলে অবধারণ করতে হয়। যুক্তিশীল মনের একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিরও দিক্‌ আছে। সেটা মনের জাগরণের দিক।

এক সত্যের সঙ্গে অপর এক সত্যের যোগ ঘটায়, সেইভাবে অবধারণা হয় আরেক সত্যের, এইজন্যে যুক্তি। মানুষের কাছে সত্যের প্রকাশ অবশ্য একবিধ নয়, একটি তো নয়ই। একবিধ কিন্তু অনেক সত্যের সংযোগ করা যুক্তির কাজ সংকীর্ণ অর্থে। নানাবিধ অনেক সত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যুক্তির কাজ উদার অর্থে। প্রথম অর্থে যুক্তির আর এক নাম তর্ক, একবিধ অথচ অনেক সত্যকে মেলানো নিয়ে গড়ে ওঠে তর্কনীতি। বহুবিধ বহু সত্যকে মেলানো প্রজ্ঞার কাজ, সে অর্থে যুক্তির আরেক নাম প্রজ্ঞা। যুক্তি, রীজন, ফের্নুন্‌ফ্‌টের এই দুই ব্যবহার। যুক্তিবাদ বলতে তাই তর্কনীতির প্রতিষ্ঠাও বোঝায় আর প্রজ্ঞার সাধনাও।

তর্কনীতিকে ঘিরে তাকে পরম জেনে যে দর্শন গড়ে ওঠে তাকে যুক্তিবাদ না বলে বলা উচিত তর্কবাদ। এ হল যুক্তিবাদের বিকার। কেননা এমন দর্শনের ভাবুক সত্যকে বোঝেন সম্পূর্ণ একবিধ বলে। সত্য একরকমেরই, একই স্তরের একই গোত্রের। নানা সত্য আছে বটে কিন্তু তারা তো একবিধ, তাই তাদের মেলাতে তর্কনীতিই যথেষ্ট। ওই এক গোত্রের সত্য ছাড়া আর যা কিছু মানুষের মনে আছে তা হয় অসত্য নয় সত্যাসত্যবিচারশূন্য অযৌক্তিক আবেগ ও কুসংস্কার। এই জাতের ভাবুকরা কখনও কখনও এতদূর গেছেন যে এঁদের কাছে তর্কনীতি ছাড়া জ্ঞানার্জনের অন্য কোন পন্থা স্বীকৃতি পায় নি। মনে হয়েছে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা কিছুরই আর দরকার নেই। এক সত্য থেকে সমগ্র সত্যে পৌঁছতে এঁরা নীতিসম্মত তর্ককেই একমাত্র ভরসা করেছেন।

মানুষের জীবনের মূল সত্য কিন্তু এই যে সত্য এক নয়, একবিধও নয়, অথচ সেই নানাবিধ নানা সত্যকে না মেলাতে পারলে মানুষের মনে অশান্তির সীমা নেই। সত্য যে বহু একে উপেক্ষা করে যে দর্শন সে দর্শনের অস্বীকার। সত্য যে বহুবিধ একে উপেক্ষা করে অনেক সত্যকে মেলাতে চায় যে দর্শন সে আপন সংকীর্ণ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাকে পরম জানলে দর্শনের বিকার। শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদ তর্ককে স্বীকার করে তর্কের অতীত, সে বহুবিধ বহু সত্যকে অবধারণ করে, বিচার করে, তারই ভিত্তিতে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যোজনা ঘটায়, নিরপেক্ষ সত্যের উপযুক্ত মন গড়ে তোলে, মনের সঙ্গে মনের সাযুজ্য পাতায়। এর কাছে যুক্তির শ্রেষ্ঠ রূপ প্রজ্ঞা।

যুক্তি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধটা পুরনো। যুক্তিবাদী কেউ কেউ বলেছেন সত্যকে চিনবার

জন্যে যুক্তিতর্কই যথেষ্ট, স্মৃতির ওপর নির্ভর করলে সত্যমিথ্যে জ্ঞানটা অস্পষ্ট হয়েই থাকবে। স্মৃতিবাদীরা ইতিহাসের পরম্পরা, সংস্কৃতির অনবচ্ছেদ, সমাজগত ঐতিহ্য, কুলধর্ম ইত্যাদি নানান্ কথা বলে এর জবাব দিয়েছেন। তাঁদের কথা মানতে হলে যুক্তিতর্ক দিয়ে সত্যকে পুরোপুরি পাওয়া তো যায় না; এমন কি, পূর্ব্বপুরুষেরা যা করতেন যাকে ভালো বলে বুঝতেন তার স্মৃতিতে যে সত্য প্রকাশিত হয়ে মানুষের কাছে আনুগত্যের দাবী জানায় যুক্তিতর্ক দিয়ে তার বিচার করতে যাওয়াটাও ধৃষ্টতা। স্মৃতিলভ্য সত্যই মহান্। তাই-ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, যুক্তিতর্ককে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে দিলে সে সত্য তছনছ হয়ে যাবে। এ বিতর্কের কি কোন শেষ আছে? যুক্তিতর্ক ছাড়া সত্যকে জানার আর কোন পথ নেই একথা অবশ্য সত্য নয়। স্মৃতিতে নিশ্চয় কিছু, কিছু কেন অনেক, পাওয়া যায় যাকে বাদ দিলে মানুষের জীবন দরিদ্র ও সত্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ দেশে বিশেষ ইতিহাসে বিশেষ ঐতিহ্যে মানুষ শিকড় গেড়ে থাকে; শিকড়হারা মানুষ ধনবান্, বুদ্ধিমান্, রুচিবান্ হয়েও নিতান্ত শ্রীহীন ও প্রতিষ্ঠাশূন্য এতদূর স্বীকার করা যায়। তবু বলতে হবে যে স্মৃতি যুক্তির বিচারে শেষ পর্য্যন্ত টেকে না, সেও সত্যকে প্রকাশ করছে এ কখনোই হতে পারে না। যুক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতা অস্বীকার আর স্মৃতির বিশেষ সত্য স্বীকার করা যেতে পারে, যুক্তি দিয়ে সমস্ত কিছু অবাধভাবে বিচার করার অধিকারকে মেনে নেবার আগে নয়, সঙ্গে সঙ্গেই। যুক্তিশক্তির প্রয়োগ করতে হবে এ দাবীকে অস্বীকার করে যা হয় তার নাম আত্ম-ও পরপ্রবঞ্চনা, ভণ্ডামী আর ভীরুতা। তর্কনীতি সর্বস্ব যুক্তিবাদী আর যুক্তিভীরু স্মৃতিবাদী উভয়েরই ভুল, উভয়েই প্রজ্ঞাহীন।

যুক্তিবাদের সঙ্গে সৃষ্টিকাজ মেলে না একথাও শোনা যায়। যুক্তি ও যোজনা যেন পরস্পরবিরোধী, বিচার ও কল্পনা যেন একে অন্যকে এড়িয়ে চলে। রোমান্টিক ও ক্লাসিসিষ্ট দের ঝগড়া এই নিয়েই। রোমান্টিকদের মনের কথা এই যে যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ, আলোচনা এসব ভালো জিনিষ নয়; কল্পনার অবাধ গতির পক্ষে সৃষ্টিধর্মী কাজের পক্ষে এরা পিছুটান। এদের আনুগত্যে মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়, পরিকল্পনা করে ভরসা পায় না, বাস্তব বা আদর্শ কোন সামগ্রিক বিন্যাসকে মনের মধ্যে রূপ দিতে গিয়ে ভাবে এ কি সম্ভব। সে কবিৎকে আশকারা দেয় না, কল্পনাকে অবিশ্বাস করে, ইশারাকে মনে করে অস্পষ্ট, দেবার মত নাম খুঁজে পায় না। এমনি করে মানুষ হয়ে ওঠে অতিসচেতন, সৃষ্টিভীরু। অপরপক্ষের কাছে রোমান্টিক ও সৃষ্টিবাদীদের বিচারবিমুখিতা, বিশ্লেষণবিরোধিতা, ভাবতে না চাওয়া, আলোচনায় অনিচ্ছা এসব একেবারেই অসহ্য ঠেকে। তর্কনীতিসর্বস্ব যুক্তিপ্রয়োগকে একমাত্র বিচারক করলে রোমান্টিকদের কথাটাই সত্য হবে। কল্পনায়, ইশারায়, যোজনায় যে বিশেষ সত্যের প্রকাশ সে অন্যবিধ। তাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে যে যুক্তিশীলতা তার দীপ্তি মরুভূমির মত, যেমন উজ্জ্বল তেমনই রিক্ত, রূপ আছে কিন্তু প্রাণ নেই। কিন্তু যুক্তি, অবধারণা, বিচার, বিশ্লেষণ এদের এড়িয়ে চলে যা হয় তা অন্ধ, বোবা, অসংযত, পথভ্রষ্ট, সাযুজ্যহীন, সোজা কথায় বিশ্রী পাগলামি। যাঁরা নানান্ দেশের নানান্ যুগের শিল্প বা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের কাছে উভয় ধরণের বিকৃতির যথেষ্টসংখ্যক উদাহরণ মনে পড়বে। শিল্পের

বা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকীর্তিগুলি রোমান্টিক বা ক্লাসিসিষ্ট কোনটাই নয়। পাশ্চাত্যশিল্পের রেনেসাঁসের সময়, ভারতশিল্পের স্বর্ণযুগে দেখা গেছে বিশ্লেষণ ও বিচারের অসাধারণ উৎকর্ষকে সঙ্গী করে তাকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল অনন্য মহৎ শিল্প।

যুক্তিবাদের সঙ্গে এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিজ্‌মের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুয়েক কথা বলে এ প্রবন্ধ শেষ করি। আধুনিক ইউরোপের এই ব্যাপক চিন্তাধারাটিকে যুক্তিবিরোধী দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা বলে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিজমের ভাবনা এ; ও, যে, আকাশপাতাল, গাছপাথর, দেবদানবের অস্তিত্ব ঘিরে নয়, আমার আর যে তুমি আমার আপন জন সেই তোমার অস্তিত্ব ঘিরে। অস্তিত্ববাদ বা অস্তিবাদ না বলে অস্মিতাবাদ বললে আরো যথাযথ হয়। অস্মিতা কথাটার মানে অবশ্য অহংকার বা আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, আমি যে ভাবে আছি আর যা হতে পারি তাই। এই দর্শনের মূল ভাবনা হল কি ভাবে বাঁচবো কোন জীবন নিজের জন্যে বেছে নেবো সেটা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে আমাকেই ঠিক করতে হবে। এদিক থেকে দেখলে কির্কেগর্ড্‌ প্রবর্তিত চিন্তাধারাটিকে স্বয়ম্বরবাদ নাম দেওয়া যায়। মানুষের জীবন যে থেকে থেকে এমন এক জায়গায় ঠেকে যায় যেখানে মানুষকে দুটি তিনটি সমান ভালোর মধ্যে নিজের ভালোকে বেছে নিতে হয়, যেখানে হয়ত বেশী ভালোকে ছেড়ে কম ভালোকে বেছে নিতে হয় সেটা যে বিশেষ করে নিজের শুধু এই কারণেই, একথা এই অস্মিতাবাদী বা স্বয়ম্বরবাদীদের আগে কেউ অত জোর দিয়ে বলেন নি। এই বেছে নেওয়াটা কি স্বরূপতঃ যুক্তিবিরোধী নয়? বুদ্ধিবিজ্ঞানজনিত জ্ঞানকে ছাপিয়ে গিয়ে শুধু বরণ দিয়ে চেনা যায় যে সত্যকে তা তর্কের বিষয় নয় উপলব্ধির বিষয়। তর্কের সত্য, স্মৃতির সত্য, কল্পনার সত্য, বরণের সত্য এদের ভিন্ন বলে মেনেও এদের মেলানো উদার যুক্তিবাদের কাছে অসম্ভব নাও ঠেকতে পারে। তর্ক দিয়ে সত্যকে পরীক্ষা করে নেওয়া যায়, জীবনের অন্তরতম বরণের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে বাজিয়ে নেওয়া যায়, উভয়ই কি যুক্তিশক্তির প্রকাশ নয়, যে যুক্তিশক্তির শ্রেষ্ঠরূপ প্রজ্ঞা? এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিস্টরা অবশ্য এক রাস্তায় ঠিক চলেন না। মার্সেল তোমার অস্তিত্বের ওপর এত জোর দিচ্ছেন যে যে তাঁর মতকে স্বচ্ছন্দে অস্মিত্ববাদ বলা চলে। হাইডেগার গোঁড়া যুক্তিবিরোধী, তিনি অস্মিতাকে ব্যক্তিচেতনা থেকে আলাদা করে বিশ্বইতিহাসে অস্মিতারূপ পরম সত্তার অপাবরণ দেখছেন। সার্ত্র্‌ সংকীর্ণ অস্মিতাবাদের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন সংকীর্ণ যুক্তিতর্কবাদের সঙ্গে। একমাত্র ইয়াস্পর্স একই সঙ্গে উদার অস্মিতাবাদী ও উদার যুক্তিপ্রজ্ঞাবাদী বলে খ্যাতি পেয়েছেন।

যুক্তির মূলনীতি সরল। কিন্তু প্রয়োগ বিস্তৃত। কোন সত্যই একমাত্র নয়, তাকে অপর সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে আরও সত্যে পৌঁছতে হবে। সব সত্য একবিধ নয়, পৃথক পৃথক্ সত্যের প্রকাশ অবধারণা করে সত্যকে তার নিজস্ব পরিসরে যোজনা করে নানাবিধ নানা সত্যের মধ্যে যোগ ঘটাতে হবে। এরই চর্চায় শ্রেষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠার প্রকাশ, এর কথা লোককে মনে করিয়ে দেওয়াটাই যুক্তিবাদের বিশেষ দায়।

যুক্তিনিষ্ঠা আর মানবিকতা একই জিনিষ। একটি আরেকটির সংজ্ঞা। অবধারণা, বিচার, যোজনা ও সাযুজ্য এদের বাদ দিয়ে মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় কি? প্রজ্ঞায় যার পরিণতি, প্রজ্ঞা যার উদ্দেশ্য, তেমন যুক্তি শোনাতে হওয়া মানুষের প্রাথমিক দায়, তেমন যুক্তি শুনতে পাওয়া মানুষের প্রাথমিক অধিকার। চর্চাতেই মানুষ হয়ে ওঠে মানুষের মত মানুষ। এই-ই যুক্তিবাদের পরম প্রতীতি, তার শেষ কথা।

পরিশেষের ছন্দোলিপি ও তার ভূমিকা

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'আকাশ-প্রদীপ' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ একদা আধুনিক কবিদের অগ্রণীরূপে ধীন্দ্র দত্তকে লিখেছিলেন : "আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা ক'রে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।" উল্লেখিত নিরুক্তি থেকেই রবীন্দ্রমানসে এই পর্যায়ে আধুনিককালের সাযুজ্যকামনা স্পষ্ট প্রতীত। এই নবতর অনুভূতির স্পন্দনেই রবীন্দ্রকাব্যে রীতিবদল ঘটেছে।

রবীন্দ্র কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে সনাতনরীতির অনুবর্তন; এই পর্বের অন্তিম যুগে কবির উদ্ভাবিত মাত্রিকছন্দের লক্ষণীয় ক্রমবিকাশ দেখা গেছে। 'কড়ি ও কোমল' থেকে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরকে মাত্রারূপে গণনা ক'রে এবং শব্দ মধ্যস্থিত যুক্তাক্ষরকে দ্বিমাত্রার পর্যায়গত ক'রে নতুন ছন্দোরীতিকে ভাষার সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন। 'মানসী'তে সেই ছন্দ ভাবের সূক্ষ্ম সংগীতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'মানসী' কাব্যে কবির আত্মপ্রতিষ্ঠ ছন্দোলিপির যে সূচনা দেখা যায়, 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত তা উল্লেখ্য রূপান্তরবিহীন। অবশ্য মানসী-তেই তিনি পয়ারের প্রথাসিদ্ধ চতুর্দশআক্ষরিক গণ্ডী অতিক্রম করতে চেয়েছেন;—'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি প্রসংগত স্মর্তব্য। এণ্ডারসন সাহেবকে একদা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার শেষবয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার চল্‌তি ভাষা ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করেছি।" এই বক্তব্যের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হবে তাঁর শেষপর্বের কাব্যে যুক্তাক্ষরের যথেচ্ছ প্রয়োগ ও বর্জনে এবং চল্‌তি ভাষানীত 'হসন্তে'র প্রবর্তনায়। তারই অব্যবহিত পরিণামে পদ্যছন্দের ঝংকার ও সমৃদ্ধি এবং গদ্যের সতেজ গতি ও বিস্তৃতির সমন্বয়। এর প্রাথমিক উদ্বর্তন 'ক্ষণিকা'য়। সেখানে প্রথম তিনি বাংলা ছন্দকে নতুনপথে প্রবাহিত ক'রে দিলেন। ক্ষণিকা-র ভাষা কথোপকথনের; পদ্যের ভাবগভীরতার চেয়ে কথ্যভাষার সাবলীল ভংগীপ্রাধান্য। কিন্তু এই কাব্যের ভাষায় তারল্য এবং চটুল চপলতার লক্ষণ সমধিক। 'বলাকা'য় নব শিল্পরীতির পূর্ণতম অভিব্যক্তি। এখানে হসন্ত-প্রধান শব্দ, যুক্তাক্ষরের যথেচ্ছ ব্যবহার, কথ্যভাষার স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে ভাবগাম্ভীর্যের স্পর্শ। পয়ারের দ্বি-মাত্রিকতা স্মরণ রেখেও চার-ছয়-আট-দশমাত্রার স্বাধীন সমন্বয় এবং মিলবৈচিত্র্য। 'বলাকা'-র ভাবপ্রসংগ এবং তজ্জনিত মননকল্পনার মৌলিকতা এই নিরীক্ষার যুক্তি। 'পলাতকা'-য় আখ্যায়িকাবর্ণনায় ছন্দোবদ্ধ কবিতারচনা এবং ভাবযতিপ্রয়োগবিস্তৃতি লক্ষ্যণীয়। ক্ষণিকা-র ছন্দের চপল চরিত্র নবরূপে 'পলাতকা'য় গৃহীত। এর ছন্দে আভিজাত্য বা নিয়মানুরক্তি নেই, রয়েছে কথ্যভাষার সজীব স্পর্শ। পরবর্তী অধ্যায়ে পুণশ্চ-শেষসপ্তক-শ্যামলী-তে তিনি যে গদ্যরীতির উদ্ভবসাধন করলেন তার পূর্বভাষ শোনা গেল বলাকা-পলাতকায় পদ্যের সংযত ঝংকারমুখর মিল ও মাত্রানুগামী ছন্দের সংগে কথ্যভাষার স্মিত সহযোগে। ছন্দের অতিপিনদ্ধ যত্নজাত নিয়মানুগত্যের মধ্যে অন্ত্যমিল এবং বৃত্তপ্রবাহের উত্থানপতনের অনুগামী

যুক্তিপ্রবণ গদ্যেই প্রবাহসঞ্চারের প্রয়াস 'বলাকা'-'পলাতকা'-'মহুয়া'য়। এই রীতিই উত্তরপর্বে পুণশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট শ্যামলীতে চতুরংগ সার্থকতায় সিদ্ধিকামী। লিপিকা-য় অবশ্য গদ্যকবিতা রচনার প্রাথমিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তাই গদ্যে রচিত হ'লেও এর ছন্দে "বাক্যগুলিকে পদ্যের মত খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ" (পুণশ্চ, ভূমিকা)। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি এ সংকোচ উত্তীর্ণ হ'য়েছেন। বলাকা-পলাতকার ছান্দসিক নিরীক্ষা বীথিকা-পরিশেষ কাব্যে পুনর্গৃহীত।

এই গদ্যছন্দের প্রবর্ত্তনায় মধুসূদনের মত রবীন্দ্রনাথ যে দুঃসাহস ও অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন অনেকের মতে তার উৎসমূল পাশ্চাত্ত্য ছন্দ-পরীক্ষার ইতিহাসে নিহিত আবার কারো মতে এ বিষয়ে তিনি ইংরেজী কবিতা থেকে প্রেরণামাত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু এর আদর্শ রূপটি দেখেছিলেন বোধহয় সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যকাব্যে।

উনিশশতকের শেষার্ধে মার্কিন কবি হুইটমানের Leaves of Grass কাব্যে ছন্দ-পরিহৃত সহজ গদ্যের নিদর্শন। সংসার, মানুষ এবং নীতিবোধসম্পর্কে তাঁর তীব্র, তীক্ষ্ণ মতবাদের বাহনরূপে এই রূপকল্প সুসংগত হ'য়েছিল। সমকালীন রুশসাহিত্যে তুর্গেনিভের Poems in Prose গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন জীবনের সুখদুঃখের ইংগিত বা অবহেলিত, নগণ্য জীবনচিত্রণের মাধ্যম রূপে এই ছন্দ সুপ্রযুক্ত হয়। কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীযুগলের কারও মধ্যেই সুকুমার রসসৃষ্টির বা রসাত্মক লিরিক রচনার বাসনা ছিল না। বিশশতকের সুরুতেই ইংরেজীসাহিত্যের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি তৎকালীন সমাজমানসের আত্যন্তিক প্রবণতাকে গ্রহণ ক'রে গদ্যছন্দেই স্বাধর্ম্যনিষ্ঠ হলেন। তাঁদের এই নূতনত্বের ভিত্তিতে হুইটম্যানের অগ্নিময় বিক্ষোভ ছিল না, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিক আদর্শ সামাজিক জীবনাদর্শের বিরোধে বিচলিত হ'য়ে ওঠে ব'লেই ছন্দের মধ্যে সেই বন্ধনমুক্তির এষণা জয়ধ্বনি ঘোষণা করে।

উনিশ শ' একুশসালে অসবার্ট সিট্‌ওয়েল্ লিখেছিলেন, "you cannot write well in the idiom of the day before yesterday" (Who killed Cock Robin) ইংরেজী সাহিত্যে তার পূর্বেই 'Vers libre' নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা সুরু হ'য়েছে। উনিশ শ' চোদ্দ সালের পরেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 'ইমেজিষ্ট'দের রচনায় এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর দেখা যায়। এই বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন রিচার্ড আলডিংটন্, ফ্লিন্ট্ এবং এজরা পাউণ্ড। প্রথম বিশ্ব মহাসমরোত্তর য়ুরোপীয় সমাজ ও নীতিতে যে শৃংখলাহীন অবনমন দেখা গেল তার পরিণামে 'উনিশ শ' তিরিশের কবিতায় রোমান্টিক সংস্কারবিহীন 'মেটাফিসিক্যাল' দের অভ্যুদয়ের সূচনা। তাঁদের কাব্যে একাধারে নৈরাশ্য, অবক্ষয় ও নির্মুক্তির সমন্বয়। উনিশ শ' বাইশ এ এলিয়টের 'দি ওয়েষ্টল্যাণ্ড' প্রকাশিত হয়। ম্যাথায়েসন্ তাঁর কাব্যকে 'an interpretation of a whole condition of society' (-The Achievement of T.S. Eliot, 1930) রূপে অভিহিত ক'রে যাথার্থের পরিচয় দিলেন। বস্তুতঃ ইংরেজী সাহিত্য ঐতিহাসিকের বীক্ষায় 'The poetry of nineteen thirtees was saturated in the bloody sweat of that decade'.

এলিয়ট এবং পূর্বজ হপকিন্‌স্‌-এর তিরোধানোত্তর প্রকাশিত কাব্যই তখন তরুণ কবিসম্প্রদায়ের উদ্দীপনা ছিল। তিরিশের কবিতায় স্মরণ্য স্বাক্ষর রাখেন অডেন, স্পেণ্ডার, সি-ডে লুইস্‌ এবং লুই ম্যাক্‌নীস্‌। তাঁদের কাব্যে এই ক্রমোত্তীর্ণ আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়।

উল্লিখিত ইতিহাসনির্দেশের মৌল প্রসংগ এই যে রবীন্দ্রমানসেও ছন্দের নিরূপিত বন্ধন-মুক্তির রূপোল্লাস আকস্মিক এবং অসম্ভাবিত ছিল না; যুগপ্রবৃত্তির অস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বীয় মানসচেতনার অস্থিরতা এই নবনির্মিতির যুগ্মসূত্র, এবং প্রথমোক্ত সূত্রগ্রন্থনাপর্বে রবীন্দ্রমানসে পূর্বকথিত পাশ্চাত্যসাহিত্যের আধুনিক মননের প্রকৃতি ও লক্ষণটি যথাযথ প্রতিহত হ'য়েছে।

পরিশেষের রচনাকাল তেরোশ' উনচল্লিশসালের ভাদ্রে। বৎসরকাল পূর্বেই সমাজে ও রাষ্ট্রে গুরুতর আবর্তন দেখা দেয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথের রাশিয়াভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংকলিত এবং অর্থদৈন্যে পীড়িত ভারত ও উন্নততর বিশ্বরাষ্ট্রের আপেক্ষিক মান নির্ধারিত হয়। ভারত দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ, ব্যক্তিসাধনার অবলোপ, সাম্প্রদায়িক কোলাহল ও নরহত্যা, নৈসর্গিক দুর্যোগ—বিপ্লব-বন্যা-মহামারী; ষোলই আশ্বিন হিজলী জেলে দুজন বন্দী হত্যা, স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় খৃষ্টানোচিত আদর্শের দোহাই, গোল-টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, গান্ধিজীর কারাবরণ প্রভৃতি চলমান ঘটনাপ্রবাহে রবীন্দ্রমানস প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। সাময়িক ঘটনার বিশ্লেষণ এবং তদানীন্তন জনজীবনে ব্যাপক অসন্তোষের অংশীদারত্ব স্বীকার করেছিলেন ব'লেই কবিচিত্তে বন্ধনমুক্তির অসহিষ্ণুতা ভিন্নতর তাৎপর্যে প্রকাশলাভ করে। মহুয়া ও বলাকায় কবির ভাবপ্রেরণা কেন্দ্রীয় সংগতি অর্জন করেছে। কবিচিত্তে মূলভাবের পরিবর্তন সূচিত হ'য়েছে, নিবিড়তর হ'য়ে উঠেছে মানসচিন্তার প্রবালখণ্ড-গুলি। কিন্তু পরিশেষ-বীথিকা কবির স্বেচ্ছাবিহারী ভাবকল্পনার কাব্য; নিবিড়তার শৈথিল্য কাব্যদ্বয়ে লক্ষণীয়। 'একদিকে বিশ্বের ক্রিয়াশীল দৃশ্যপট, অপরদিকে কবিমানসে মৃত্যুর প্রাগ্রসর মূর্তি' এবং মৃত্যুর বর্ণালীবিরহিত স্তব্ধতায় আত্মসমীক্ষণের এষণা পরিশেষের কাব্য প্রসংগ গঠন করেছে। বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সুসংযোগে রচিত আলোচ্য কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য তাই স্বতঃসম্ভাবিত। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে দেশের অগণিত নগণ্য জনসাধারণকে স্বীকৃতিজ্ঞাপনের মনোভাবই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার রূপকল্প অবলম্বনের মধ্যে প্রতিফলিত—এ ধারণা পুরোপুরি অযৌক্তিক নয়। তাই সমকালীন যুগচেতনার প্রভাবেই লিপিকা-র জন্ম এবং 'পুনশ্চ' থেকেই মনোভাবের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি। পুনশ্চ-র 'কোপাই' নদী তাই গোত্রের গরিমাহীন; তার ভাঙাতালে সাঁওতাল ছেলে আর ছেঁড়া ছাতি মাথায় 'মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু' হেঁটে চলে। গদ্যছন্দের পক্ষসমর্থনেও কবি এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি সহজ স্বচ্ছতা আছে তার মধ্যে দিয়ে অতুচ্ছ পরে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা।" সেই কারণেই 'জরির আঁচলা দেওয়া বেনারসী শাড়ী' ছেড়ে দেহের সহজ ভংগীর প্রতি তিনি অনুরক্ত। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার তুচ্ছ কাহিনীগুলি গদ্যের সহজছন্দে সহজেই ফোটে এ সত্য তাঁর অজানা ছিল না।

বলাকা-পলাতকা-মহুয়ার যুগে যত্নবিন্যস্ত নিয়মানুগত্য এবং ছন্দের উত্থানপতনের মধ্যেই চিন্তাধারার অনুগামী বলিষ্ঠ গদ্যের শক্তিপরীক্ষাই পরিশেষ বীথিকার ছন্দে পুনরনুভূত। এটিকে বলাকা-র যুক্তিশৃংখলাময় মুক্তক ছন্দের সার্থক পরিণতি বলা হ'য়েছে। পরিশেষে অগোচর, খ্যাতি, জরতী, বোবার বাণী প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার যতি প্রায় সমমাত্রিক এবং ছন্দঃস্পন্দ সুসম; যদিও এর ছন্দ মিলহীন বিষম পয়ার। যেমন—

সেখানে তো | শব্দ নেই, | আলো নেই, ।
বাইরের | দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের | পথ নেই | কারো ॥

গদ্যকবিতায় যতি পড়ে অর্থের সংগে শ্বাসবায়ুর স্বল্পবিরামে গদ্যছন্দের মত; মাত্রাসমতা ঋজু না হ'লেও পর্বের মধ্যে তাল অনুভূত হয়। 'পুণশ্চ'-র গদ্যছন্দের সঙ্গে 'পরিশেষ'-এর সংযোগ প্রত্যক্ষ, তাই পুণশ্চ-র দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত তেরটি কবিতার মধ্যে ছ'টিই 'পরিশেষ' থেকে পুনর্গৃহীত।

কিন্তু যতিস্থাপনের বা পর্বের বিশৃংখলার মধ্যে সামঞ্জস্যের যে সুরটি গদ্যছন্দের প্রাণ (পুণশ্চ), কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্বে সেটি তখনো অনায়ত্ত। 'পরিশেষ'এর কয়েকটি কবিতায় (আগন্তুক, জরতী, সাথি) যুগ্মমাত্রার এবং বিশেষভাবে ছয় ও আট ও দশ মাত্রার পরে যতি ও ছেদ স্থাপনের প্রতিই কবির আকর্ষণ —

এসেছি সুদূর কাল থেকে ।—(১০)
তোমাদের কালে ।—(৬)
পৌঁছলেম যে সময়ে ।—(৮)
তখন আমার সংগী নেই—(১০)

পয়ার জাতীয় ছন্দে যুগ্মমাত্রার পরে ছেদবিন্যাসের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবিষ্ট। কিন্তু সাধারণ গদ্যের উচ্চারণে সম-বিষম মাত্রাভেদে যেমন যতি দেওয়া হয়, কবি সেই ভংগীই অনুসরণ ক'রেছেন।

এই পর্বে সর্বত্র গুরু অক্ষরকে এক মাত্রার অধিক মর্যাদা দেওয়া হ'য়েছে; ফলে শব্দমধ্যবর্তী হলন্ত অক্ষরগুলিতে এবং অনেকস্থলে আ-ঈ স্বরগুলিতে একমাত্রার বেশী টান দেওয়া হ'য়েছে :

'' ''
গভীর শীতল
যার স্তব্ধ অন্ধকারতল —(সান্ত্বনা)

রবীন্দ্র গদ্যছন্দের বিশিষ্ট রীতি, ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে না দিয়ে সুরুতে বা মধ্যে স্থাপন করা 'পরিশেষে' অনুসৃত :

'এল গণেশ পল্টু এল, এল নবীন পাল
এল মাখনলাল।' —(স্পাই)
'দেবার মত এনেছিলেম কিছু' —(ভীরু)

'নন্দগোপাল এনেছে তার নতুন কালের ডাক।' —(নতুন শ্রোতা)

'পরিশেষে' অধিকাংশ কবিতায় অন্ত্য অক্ষরের মিল নেই এবং প্রায়শঃই অসম পংক্তি ব্যবহৃত। বীথিকা-য় যেখানে ছন্দ বজায় রয়েছে সেখানেও কথ্য ভাষার তুচ্ছতা, স্বচ্ছতা, বিস্তৃতি ও উন্মুক্ত গতিভংগী রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের যুক্তধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দ্বিমাত্রিক ধারা হ'য়েছে—

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে।

স্বরবৃত্তের প্রীতি-পক্ষপাত ব্যতিরেকে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের পংক্তিভোজেও মৌখিক ক্রিয়া-পদ আসন পেয়েছে। মাত্রাবৃত্তেও হসন্ত-মধ্য ক্রিয়াপদ সন্নিবিষ্ট :

জগতের | উপকার | কর্‌তে
চায়না সে | প্রাণপণে | মর্‌তে

বিষমমাত্রার ছন্দে বাধার ছল ক'রে গতিকে উজ্জীবিত করা, আধুনিক কবিতায় যার অজস্র নিদর্শন, তারও পরিচয় রয়েছে :—

একটুখানি | দোষের ফাঁক | নিয়ে
হৃদয়ে আজি | নিয়ে এসেছ | প্রিয়ে | করুণ পরিচয়।

এখানে সচরাচর ৩+২ মাত্রাবিন্যাস ভেঙে ২+৩ করা হ'য়েছে।—

ছন্দ যে কেবলমাত্র কবিমানসনিঃসৃত শিল্প-আবেগ (aesthetic emotion) পাঠকমনে সঞ্চারিত করে তা নয়, বাচ্যার্থের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায় সংগে সংগে প্রমূর্ত হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার যথাযথ বিকাশসাধনে ধ্বনিতরঙ্গ বা ধ্বনিগুচ্ছের অপরিহার্য স্থান আছে। ছন্দের অভিনবত্ব বা ধ্বনিবৈচিত্র্য কেবল কাব্যসৃষ্টির নিয়াম নয়, ঐ ধ্বনিকেও ভাষার মত ভাবের যথাযথ প্রতিরূপ হওয়া চাই। তাই কাব্যরসসংবেদনায় ছন্দ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। ফরাসী প্রতীকবাদীরা ধ্বনি ও ছন্দের সুপরিণয়ে শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে ভাব ও ছন্দের তাৎপর্যে ধ্বনিঝংকার সংগীতময় হ'য়েছে। তাই যেখানে লঘু কাহিনীবর্ণনার প্রয়োজন হ'য়েছে সেখানে স্বল্পায়তন অনুপ্রাস-মিল-বাক্যসহযোগে উপযোগী ছন্দ গৃহীত হ'য়েছে; (যেমন 'নতুন শ্রোতা')। আবার আত্মসমীক্ষণ বা গভীর ভাবচেতনার প্রকাশে গুরু, মন্থর ছন্দ গৃহীত (বিচিত্রা)। বীথিকা-তেও যেখানে পূর্বস্মৃতির সুখস্বপ্নে কবি তন্ময়নিমীল হ'য়েছেন সেখানে সহজ কথ্যভাষা সহযোগে সমিল ছন্দেই কল্পনার অভিযান জয়যুক্ত হয়েছে। বীথিকার নিমন্ত্রণ কবিতাটিতে চৌদ্দমাত্রিক ছন্দ পয়ারের লক্ষণাক্রান্ত হ'লেও পয়ার নয়। প্রথম কলায় ছয় এবং দ্বিতীয়ে আট মাত্রা এবং যুক্তবর্ণের পূর্বস্বর দীর্ঘ হওয়ায় যুক্তবর্ণ উপযুক্ত মূল্য পেয়েছে।

পরিশেষ-পর্বের ছন্দোলিপির একটি উল্লেখ্য গুরুত্ব আছে, কারণ 'পুনশ্চ' থেকে পরবর্তী কাব্যগুলিতে অনুসৃত গদ্যছন্দের সূচনা 'পরিশেষে'। অবশ্য বলাকা-পর্ব থেকেই তিনি অপাঙক্তেয়' ছন্দকে ছাড়পত্র দিতে ব্যস্ত হ'য়েছেন। পদ্যের শব্দবিন্যাসগত রীতি ও অন্তঃমিলের নির্দেশ

পুরোপুরি অগ্রাহ্য না করেও প্রচলিত আংগিকের বিদ্রোহী হয়েছেন। এই ছন্দ প্রকরণ নিয়ে বিদগ্ধ সমালোচকমহল যথেষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন, বক্ষ্যমান আলোচনায় তাঁদের নিরুক্তিগুলি সমীকৃত। শুধু মৌল প্রসঙ্গ এই যে ছন্দের উৎসারণ কোনো কবির আকস্মিক মানস-উত্তেজনার অব্যবহিত পরিণাম নয়। ছন্দ যেমন ভাষার অনাত্মীয় নয়, তেমনি কবিমানস-নিঃসৃত ভাবের সংগে তার গূঢ় স্বাজাত্যবোধ আছে। তাই কবিতার ছন্দঃপ্রকরণ বিচারে বহিরংগ বৈচিত্র্যকেই গ্রহণ করলে চল্‌বে না, কারণ সে বিচার অসম্পূর্ণ। ভাষা ও ভাব এই দ্বৈতপ্রেরণার মধ্যে ছন্দ সর্বদা দৌত্য করে তাই ছন্দকে ভাষা থেকে পৃথক করলে বৃন্তচ্যুতির ভয় থাকে; আবার ছন্দ, ভাবকে অতিক্রম করলে অতিরিক্ত ভূষণের মত কেবল শ্রুতিনির্ভরতায় নিঃশেষিত হয়। ভাষা এবং ভাবের মধ্যে যে প্রসুপ্ত লাবণ্য থাকে, নিপুণ শিল্পীর ছন্দঃপ্রয়োগে সুন্দরীর নূপুরশিঞ্জিত চরণের আঘাতে প্রস্ফুটিত অশোকমঞ্জরীর মত তা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। ভাষার ঐ শব্দলাবণ্য ও ধ্বনিঝংকার রবীন্দ্রকাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কবিতার বহু নিদর্শনে এলিয়টের 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড'-এ অনুসৃত ভাব ও ছন্দের আত্মিক সংযোগের রীতিটি গৃহীত। 'পরিশেষে'র 'নতুন শ্রোতা' কবিতায় ভাবের পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে ছন্দও মোড় ফিরেছে।

আধুনিক কবিতায় রসকল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে; ছন্দের চরিত্রকে নানাভাবে পরিবর্তিত ক'রে ভাষার শক্তি পরীক্ষা সুরু হ'য়েছে। কিন্তু যে ভাবেই প্রযুক্ত হোক না কেন, ছন্দ যদি কবির মানসাশ্রিত ভাবাবেগের সুষম প্রকাশ না হয় তাহ'লে 'শুধু ভংগী দিয়ে চোখ ভোলানো'র অতিরিক্ত 'মর্যাদা'য় তার দাবী নেই। কাব্যসাধনাপর্বের প্রান্তলগ্নে প্রাজ্ঞ কবি এ সত্যে নির্দ্বিধ ছিলেন ব'লেই তাঁর নবতর 'রূপ' সাধনা সার্থকতায় সংরাগী।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

শেষ জীবনে মৃগনয়নী বহুবার আমায় বলত, এমনি সব ভাবনাগুলো কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারতুম না। আগাগোড়া জীবনটাকে এক অবাক চোখে ভাল করে দেখবার অভ্যেসটা আমার অল্প বয়েস থেকেই ছিল। এখন তো বুঝি সকলের এ ভাবনা থাকে না। সংসারে আমোদ আহ্লাদে মেতে থাকবার বয়েসটা ভেবে ভেবেই কাটিয়েছি। অনেকে তো মেতেই থাকে।

মত্ততা আমার ছিল না। সাদা চোখে দেখতে পেতুম সব মুহূর্ত্তগুলো। কারণটা কি জানো? আজ বুঝতে পারি কিছু। যে আঘাতগুলো সেগুলো এত বেশী আর এত লাগত যে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে হোত। মনটা খুব নরম ছিল কিনা, ছোট আঘাতগুলোও বড় হয়ে লাগত মনে!

চুপ করে থাকতুম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ওর বিশ্লেষণের শক্তি ছিল অসাধারণ। অথচ এক অতি সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নী। যাক্ ও কথা। এ সংসারে মৃগনয়নীকে ছটা মাস কাটাতে হোল। শেষ পর্য্যন্ত।

মাস পাঁচেক কেটে গেল। শরীরে মনে ওর মাস দুয়েক হোল কতকগুলো অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল ও। সরলা কিন্তু হেসে অস্থির—আনন্দে প্রায় নাচতে বাকী রেখেছে!

বৃদ্ধা শাশুড়ীকে গিয়ে কাণে কাণে খবর দিয়েছে,—জানেন মা। ন'বৌ পোয়াতি। বৃদ্ধার জোলো তাল শাঁসের মত চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, সত্যি, বোধহয় মাস তিনেক।

বৃদ্ধার কুঞ্চিত গাল দুটো হাসিতে টান টান হয়ে ওঠে। এত বেশী হাসি বুড়ী বহুদিন হাসেনি, —বলেছি তো লক্ষ্মী বৌ। এমন মেয়ে আমার পেটে হলে ধন্যি হতুম।

বলেই একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। প্রমদাসুন্দরী আছে কিনা। প্রমদাসুন্দরী তখন পাড়া বেড়াতে গেছে। সকালে বিকেলে ঘণ্টা কয়েক দুটো চক্কর না দিলে অসুখ হয়ে যাবে ওর।

প্রমদাকে বললে বৃদ্ধা।

খবর শুনে প্রমদার গালে হাত। চোখ বড়,—ওমা আমার কি হবে! বলো কি গো! বিয়ে না হতেই ইয়ে। এ সব কি মেয়েমানুষ না কুকুর বেড়াল।

বৃদ্ধা সরে যায় সেখান থেকে।

প্রমদা খবরের মত খবর পেয়ে পঞ্চমুখ।

—ঠিক বলে রাখলুম আমি। লিখে রেখে দাও। বছর বছর কুকুরের মত বিয়োবে ও। কি ঘেন্না! কি ঘেন্না!

—বাবার জন্মেও তো শুনিনি বাছা। এক মাস যেতে না যেতে পোয়াতি!

কথাগুলো কিছু কিছু কানে আসে মৃগনয়নীর। লজ্জায় কালো হয়ে ওঠে মুখখানা।

সরলা বলে,—বংশে পেথম হচ্ছে, তা মুখ কচ্ছে দেখো। হিংসে। হিংসেতে জ্বলে যায়।

ওর ইচ্ছে ভাইরা সব আইবুড়ো থেকে ওকে মাথায় করে রাখত। খুব ভাল হোত। প্রাণ ঠাণ্ডা হোত।

সরলা অন্তর থেকে খুসী! ননদের সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট করে আগে বলতে পারত না। আজ বলতে পারছে। আজ কি যেন এক মস্ত ভরসা পেয়ে গেছে। নিজের বন্ধ্যাত্বের বেদনাও যেন অনেকটা কমে গেছে।

মঙ্গলার মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয় বাঁড়ুয্যে বাড়ীর চাল্‌তে তলায়। চাল্‌তে এনে সরষে বাটা দিয়ে মেখে পাথর বাটি করে রেখে দেয় লুকিয়ে।

বিকেলে মৃগনয়নীর চুল বেঁধে দেয়। গা ধুয়ে আসে দুজন। হাত ধরে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

—ভারি সোন্দর দেখাচ্ছে তোকে।

সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে মৃগনয়নীকে। দুপুরে একটু না গড়িয়ে পারেনি। ঈষৎ রক্তাভ বড় বড় চোখদুটিতে এক স্নিগ্ধ মমতার আবেশ। মাজা সাদা মুখখানি। ছোট মসৃণ কপালে আধলার মত একটি সিঁদুরের টিপ।

শরীর মাজা ভারি হয়েছে একটু। মৃগনয়নী সুন্দর হয়ে উঠেছে। নিজের অন্তর দিয়ে আর একটি ছোট্ট জীবনকে পোষণ করবার আনন্দের স্বাদ বড় মিষ্টি। বুক ভরে উঠেছে।

মৃগনয়নী মা হবে!

নারীত্বের পূর্ণ আস্বাদ পাচ্ছে মনে মনে। বেশ বুঝতে পাচ্ছে ও, কাণায় কাণায় ভরা যৌবন নিয়ে পুরুষকে কামনা করেছে, কোন এক পুরুষ ওর পুষ্পিত যৌবনকে নিষ্পেষিত করুক, কেড়ে নিক ও উদার হয়ে দান করতে চেয়েছে, এ সব কিছুর পেছনেই একটি মাত্র কামনা ছিল, উজাড় করে যৌবন দান করে আমি মা হবো। তুমি ভোগ করো, গ্রহণ করো, আমাকে একটিমাত্র সম্পদ দিও, আমাকে মা করো।

নিশ্চিত জানে মৃগনয়নী, এই কামনাই প্রথম আর শেষ কামনা। এ কামনা যার নেই, সে মেয়ে নয়। যে মা নয়, সে মেয়ে নয়।

মৃগনয়নী বুঝতে পারছে এই একরত্তি জীবনকে লালন করবার অদম্য আগ্রহ ওকে রোমাঞ্চিত করছে, ওকে দিন দিন নমনীয় স্নিগ্ধরূপে ভরে দিচ্ছে। ওর সর্বশরীর গরম, ওর হাত গরম, ওর কোল গরম, ও সন্তানকে পরম স্নেহে স্পর্শ করবে বলে, সন্তানকে নরম কোলে আরামে শুইয়ে রাখবে বলে। ওর সুস্পষ্ট স্তনভার নুয়ে পড়তে চাইছে—সন্তানের ছোট্ট ঠোঁট দুটির আশায়। সব লজ্জা খুইয়ে যাকে ও পাচ্ছে, সেই সন্তানের কাছে ওর কোন লজ্জা নেই। ওর লজ্জা কাম-লোভাতুর ইতর দৃষ্টিকে। সন্তানের কাছে ও যেমন উদার উন্মুক্ত, তেমনি ভ্রূকুটি-কুটিল ও লোভীর কাছে। একহাতে বরাভয়, একহাতে খাঁড়া। মেয়েদের এই তো চিরকেলে রূপ।

মৃগনয়নী নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করছে। সব সত্যি একটুকুও ওর মিথ্যে নয়। মৃগনয়নী ভেবে আশ্চর্য হয়, এমন কি বনবিহারীকে পর্যন্ত ওর মাঝে মাঝে নিজের সন্তানের মত মনে হয়। এক অবাক মমতায় ওর মনটা ভরে ওঠে। খুব শিশু মনে হয় তখন বনবিহারীকে। তখন বনবিহারীকে ও আদর করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ঘুম পাড়ায়! জল ভরে রাখে শিয়রের কাছে। শিশু বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে থাকে মা মৃগনয়নী। এ এক অদ্ভুত অনুভব।

লোকের কাছে বললে বিশ্বাস করবে না। বলতে গেলে নিজেই লজ্জায় নুয়ে পড়বে। তবু এ সত্যি। এ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। সব চেয়ে মজা এই যে এই সময়টা ও বনবিহারীর কাছে সবচেয়ে সহজ হয়ে ওঠে। সব চেয়ে উদার হয়ে যায়। তখন বনবিহারী যা চাইবে, ও তাই দিতে পারে। কিন্তু যখন বনবিহারীকে পুরুষ মনে হয়, স্বামী মনে হয়, তখন ও নিজেরই অজ্ঞাতে কুটিল হয়ে ওঠে। অনেক সময় নিষ্ঠুরার মত কৌতুক করে বনবিহারীকে নিয়ে। তার কামার্ত মনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, খেলায়। একটুও উদার হতে পারে না তখন।

বড়ই অবাক লাগে মৃগনয়নীর। কে জানে সব মেয়েরই এমন হয় কিনা! কিন্তু নিজের জীবনে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, নিজেকে বিশ্লেষণ করেছে।

মৃগনয়নী তাই সরলার কথা শুনে মনে মনে হাসে।

—তুই খুব সোন্দর হয়েচিস।

সে সুন্দর হয়েছে, তার পেটের ওই ছোট প্রাণটুকুর জন্যে।

ওকে ঘরে ধরে আনে সরলা। চৌকীর নীচ থেকে পাথর বাটিতে চালতে মাখা বার করে।

—নে খা।

—তুমিও খাও মেজদি।

—ওলো আমি অনেক খেয়েছি। তুই খা। তোকে এখন তো এই সবই খেতে হবে। ভাত তো একটাও মুখে রোচে না।

মৃগনয়নী হাসে।—কেমন বমি বমি লাগে। মাছের বড্ড আঁসটে গন্ধ লাগে!

—আ মরণ! সরলা হেসে ফেলে,—মাছে আঁসটে গন্ধ লাগবে নাকি কি দুধের গন্ধ পাবি?

—বড্ড বেশী আঁসটে। কোনমতে গিলে ফেলি।

—তা না হয় না খাবি, তোর ভাসুরকে বলব তোর জন্যে আলু এনে রাখবে। আলু ভাতে আলু ভাজা করে দেব।

মৃগনয়নী লজ্জায় বলে,—না, না, ও সব আর তোমার ভাসুরঠাকুরকে বলতে হবে না!

—সে যা বলব, আমি বলব। তোর লজ্জা কিসের?

—না, ঠাকুরঝি আবার—,

—কলা করবে? রান্না তো আমার হাতে।

চালতে মাখা মুখে দেয় মৃগনয়নী। খুব ভাল লাগে।

—সব চেয়ে ভাল লাগে—

—কিলো ?

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে মৃগনয়নী।

কি বলনা! আমার কাছে আবার লজ্জা কি ?

মুখনীচু করে বলে ও,—উনুনের পোড়া মাটি।

—ও মা আমার কি হবে। সে কি লো। তাই বলি, রোজ উনুন লেপ্‌তে গিয়ে উনুনের এ পাশ ও পাশ ভাঙা দেখি।

—আমি তো খাই! চালতে খেতে খেতে বলে মৃগনয়নী।

—যাক বাবু, তোমার আর উনুনটা খেয়ে খেয়ে শেষ করে দরকার নেই। আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে কুমোর বাড়ী থেকে ভাঁড় আনাব। যত খুসী খেয়ো।

খুব হাসতে থাকে সরলা।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। প্রমদাসুন্দরী বেড়াতে বেরিয়েছে। শাশুড়ী বোধ হয় জপে বসেছেন।

ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টি সুরু হয়। আকাশটা ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। এ বর্ষণ সহজে থামবে না। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ের ভেতরটা শির শির করে। বাইরে গাছের ডালপালাগুলো বর্ষায় বাতাসে চঞ্চল হয়েছে। টিনের ওপর শব্দ হচ্ছে বর্ষণের। মাঝে মাঝে বড় বড় ফোটার টপ্‌ টপ্‌ শব্দ।

সরলা তাকিয়ে আছে মৃগনয়নীর দিকে। মৃগনয়নী মুখ নীচু করে চালতে খাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

সরলার মুখটা যেন ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে ওঠে। চোখদুটো আকাশের মত ঘোলাটে হয়ে ওঠে। হঠাৎ ও মৃগনয়নীর একখানা হাত ধরে ফেলে।

—একটা কথা বলব ?

—মৃগনয়নী চমকে তাকায়।

—কথা রাখবি ?—সরলার গলাটা কাঁপছে।

মৃগনয়নী সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এত গম্ভীর মুখ সরলার ও কখনও দেখেনি।

—বলো না ?

সরলা একটু সময় চুপ করে থাকে।

ঝম্‌ ঝম্‌ করে শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি বেড়েছে।

সরলা হাতখানা ধরেই বলে,—তোর ছেলে হলে আমায় দিবি ?

মুহূর্ত্তে মৃগনয়নীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

মুখের চালতে বিস্বাদ লাগে, এই জন্যেই কি চালতে খাওয়াল ? এই জন্যেই কি এত ?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সরলা কি বুঝে মুখটা নামায়।

মুখ যখন তোলে গাল দুটো ওর জলে ভেসে গেছে।

—আমায় তো ভগবান দিলে না! ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপে! গলা বন্ধ হয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

নজরুল কাব্যে—প্রেম ও সৌন্দর্যপ্রীতি

ভবানীগোপাল সান্যাল

দুইটি সমান্তরাল ধারা নজরুলের কাব্যে পরিস্ফুট। একদিকে কবি বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ কালক্রমে তাঁহার কাব্যে স্ফুটতর হইয়া বিপ্লবের সর্বাত্মক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজে ও রাষ্ট্রে যাহা কিছু অযৌক্তিক, অন্যায় ও অসত্য তাহাদের অপসারিত করিতে চাহিয়াছেন। ধ্বংসের মধ্য হইতে নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত হইবে, ইহাই তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস। 'মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে', এই নবীনকে লইয়া তাঁহার জয়যাত্রা।

'অগ্নিবীণায়' নবীন বিদ্রোহী সৃষ্টির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে তিনি আঘাত করিতে চাহিয়াছেন। ভাঙার সুর সেখানে স্থায়ী ভাব।

আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে, সব বাঁধ!

বাধাবন্ধনহীন হইয়া দুর্নিবার গতিতে ছুটিয়া চলিবার অন্ধ আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহী মনোভাবের অনুকূল। নেতিবাচক এই মনোভাব 'সর্বহারায়' বিপ্লবের স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কবির আদর্শ কোন ঐতিহাসিক চেতনা সম্ভূত নহে। মানসিক প্রীতি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সমাজে ও রাষ্ট্রে তিনি যে শোষিত জনসাধারণের মুক্তি-কামনা করিয়াছেন, তাঁহাকে এক উদার মানবতা বোধ প্রেরণা দিয়াছে। ইহাই কবিকে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষা দিয়াছে। ধনগত ও শ্রেণীগত বৈষম্যের যে অবসান কবি চাহিয়াছেন তাহার পশ্চাতে কোন শ্রেণীহীন মনের বিদ্বেষ নাই, শ্রেণী সংগ্রামের কোন অপরিহার্য ইঙ্গিতও নাই। তাঁহার বিপ্লবের আদর্শ সমন্বয়ের সাধনা। গতির সহিত তিনি স্থিতিকেও চাহিয়াছেন। ভারতীয় আদর্শের সহিত এই সাম্যবাদের কোন বিরোধ নাই।

এই বিপ্লব একদিকে সকল বিভেদ দূর করিয়া সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করিতে অন্যদিকে জগতের অন্তর্লীন সৌন্দর্যকেও উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে। সুতরাং নজরুলের কাব্যে বিদ্রোহ ও সৌন্দর্যপ্রীতি, এই দুইটি ধারার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিদ্রোহী কবিতায় এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি, বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।

বিপ্লবের ক্ষেত্র কবির ভারতবর্ষ। মানুষকে তিনি সর্বাধিক প্রীতি ও মূল্য দান করিয়াছেন।

গাহি সাম্যের গান—

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান !
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সবদেশে, সবকালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।

নজরুলের কাব্যে বিপ্লবের অপর নাম গতি। ইহা একদিকে যেমন জরাজীর্ণকে অপসারিত করিয়া জগতে পরিবর্ত্তন সূচিত করে তেমনি সৌন্দর্যকেও উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। একদিকে ইহা প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস ও বারিধির মহাকল্লোল তেমনি অন্যদিকে তাহা ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ উদ্দাম প্রেম। সমন্বয়ের সুরটি এখানে পরিস্ফুট।

তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা নজরুলের কাব্যসৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যথাক্রমে তাহারা প্রথম মহাসমর; ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সোভিয়েট বিপ্লব। এই তিনটি ঘটনা যেমন কবিসত্তাকে বিদ্রোহ হইতে বিপ্লবের অগ্নি-পথে পরিচালিত করিয়াছে। তেমনি পরোক্ষভাবে সৌন্দর্যের জগতেও তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিয়াছে।

দোলন চাঁপা, ছায়ানট, সিন্ধুহিন্দোল ও চক্রবাক প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সৌন্দর্যধ্যান কখনও নরনারীর ভালবাসা কখনও বা নিসর্গকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। 'আমার যৌবন-স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ', এই যৌবনস্বপ্নের পরিচয় আছে দোলন-চাঁপায়, ছায়ানটে আছে সুকুমার কল্পনা-লীলা। সিন্ধুহিল্লোলে জীবনের বহুবিচিত্র বিষয় ও বিস্তারের উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিবিড়তা ও চক্রবাকে প্রকৃতির সহিত আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস। কবির এই সৌন্দর্যধ্যান তাঁহার জীবনবিশ্বাসের ফলশ্রুতি। জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাসের গভীরতা কদাপি বিচলিত হয় নাই।

প্রেমের কবিতা রূপেও পূর্বোক্ত গ্রন্থ সমূহ উল্লেখযোগ্য। এক 'কড়ি ও কোমল' ছাড়া নিবিড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে নাই। 'মানসী' হইতে প্রেমের পরিচয় ভাবের সূক্ষ্ম লীলাবিলাসে। দেহের তটবন্ধন ছাড়িয়া দেহাতীত বিরহ-মিলনের ভাবস্বপ্ন কবিতা সমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। কামনার চরিতার্থতার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই, আছে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

আমার কথা শুধাও যদি—
চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাবনা কিছুই নাই

উপরন্তু

চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে—
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও,
নয় খাঁচাটার থেকে।

বিরহের মধ্যে যেমন প্রেমকে নিবিড় রূপে উপলব্ধি করা যায় তেমনি, ভোগাসক্তিহীন

আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও তাঁহার অনির্বচনীয় মাধুর্য্য পাওয়া যায়। পূরবী-মহুয়ায় প্রৌঢ় প্রেমের আন্তর স্পর্শ। আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা আত্মত্যাগ, বাসনা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা, প্রেমের স্মৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার ইচ্ছা প্রেম-মহিমাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে।

তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে,
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

যৌবন স্বপ্নের পরিচয় দোলন চাঁপায়। এখানে প্রেমের স্নিগ্ধ, শান্তরূপ নহে, তাহার লীলা-বিলাস কবির মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বয়ঃসন্ধিকালে যখন 'জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি ভোর' তখন প্রিয়তমার সহিত পরিচয়। তখন :

ছিন্নকণ্ঠে কাঁদি আমি, 'চিনি তোমা' চিনি, চিনি, চিনি,
বিজয়িনী নহ তুমি—নহ ভিখারিণী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির পূজারিণী।

কবির আহ্বানে, অচেনা, অজানা পথের পথিকের সম্বোধনে প্রিয়তমার চোখ জলে ভরিয়া আসিত। কিন্তু পথিক কবি নিজের অভিশপ্ত জীবনকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন :

বাঁধানীড় পুড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে ;
মণি ভেবে কত জনে তুলে পরে গেলে
মণি যবে ফণী হয়ে বিষ-দগ্ধ মুখে
দংশে তার বুকে
অমনি সে দলে পদতলে !
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিণী ! তারে নিয়ে একি তব অকরুণ খেলা ?

কিন্তু প্রিয়ার প্রেমগীতিতেও 'যৌবন যে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হ'য়ে তব মুখ-ছবি'। তাহার পর অনন্ত অগস্ত্য তৃষাকুল বিশ্বমাগা যৌবন কবির জাগিয়া উঠিল। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের পরে কবি দেখিলেন তাঁহার গরবিনীকে ছলনাময়ী রূপে।

লোভে আজ তব পূজা কলুষিত। প্রিয়া,
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ প্রাণ মন দিয়া।

অনুতাপ-দগ্ধ কবি পূজারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—
অকরুণা !—প্রাণ দিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা !
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার, নারী !

এ আঘাত পুরুষের,
হাসিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম মোরা শুধু
পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি দিয়া
মন-প্রাণ লভে অবসান।
ভুল, তাহা ভুল!

পূজারিণী কবিতাকে বয়ঃসন্ধিকালের উচ্ছ্বাস, কাল্পনিকতা ও ভাববিলাস ভারাক্রান্ত করিয়াছে। তবে, 'অবেলায় ডাকে' বিচ্ছেদকাতরা নারী হৃদয়ের ক্রন্দন প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাকে একদিন সমস্ত প্রাণমন দিয়া নারী ভালবাসিতে পারে নাই। আজ বিরহের ধূসর-আলোকে, অবেলায় 'তাকেই কেন পড়ছে মনে বারে বারে।' নারীর দুঃখ :

দেবতা আমার নিজে আমায় পূজ্‌ল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারিকে চিনলাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে॥

আজ বিরহ-খিন্না নারীর মর্মব্যথা আকুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে :

হে বসন্তের রাজা আমার!
নাও এসে মোর হার-মানা হার!
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্ত্তনাদে হাহাকারে
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদতে পারে!

কিন্তু মৃত্যুর অন্ধকারে যে বিলুপ্ত হইয়াছে সেখানে ক্রন্দন পৌঁছায় না। 'যে দেশে নাই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে'। আমি যারে ভালবাসি, সে কি আমা হতে দূরে যেতে পারে? এই আশায় নারী বলে;

মাগো আমি জানি জানি
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
ব'লো তখন খুঁজতে তাঁরেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে!

অকৃতার্থ প্রেমের অভিমান 'অভিশাপ' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। দয়িতের মৃত্যুর আলোকে প্রেমিকা তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে। সেদিন সমস্ত বিশ্বে তাহাকে খুঁজিয়া ফিরিয়া দয়িতা ব্যর্থ হইবে। বঁধুর আলিঙ্গনের মধ্যেও :

বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আন্‌তে মনে—
বিষিয়ে ও-বুক উঠবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

যেদিন চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রিতে দোলন চাঁপা প্রস্ফুটিত হইবে, সেদিন তারায় তারায় ধ্বনিত হইবে বিচ্ছেদের আর্ত্ত সুর।

ঋতুর পরে ফিরবে ঋতু
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু
চাইবে কেঁদে নীল নাভা গায়
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়
যে তারা, তায় খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

নূতন গৃহে যাইয়া হয়ত বধুর পুরাতন প্রেমের কথা স্মরণ হইবে না। পুরাতন দিনের কথা নূতন পরিবেশে, নূতন সঙ্গীতে ও আবাহনে সে ভুলিয়া যাইবে। 'আমিই শুধু হারিয়ে গেলেম হারিয়ে যাওয়ার বনে' এই দুঃখের সুর প্রেমিকের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের সমাধির উপরে প্রেমিকার বাসরঘর নির্মিত হইয়াছে। তাই বেলা-শেষের ক্ষণে প্রেমিক বিদায় চাহিতেছে। 'পিছুডাক' কবিতায় এই বিক্ষোভ ও হতাশা প্রেমের স্নিগ্ধ, তপস্যা-শুদ্ধ, গভীর রূপের পরিচয় দেয়না। কিন্তু এই প্রশান্তি প্রকাশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়:

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি!
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

প্রসন্ন বিদায়ের মধ্যে ক্ষণিকের প্রেম চিরন্তনের মহিমা লাভ করে!

কবির কাব্য-সাধনা, বিশ্বের সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্পর্ক; তাঁহার মনের ঐশ্বর্য্য, সকল কিছুই কবি-রাণীর দান। প্রেমের স্নিগ্ধ রূপের পরিচয় কবি-রাণী কবিতায় আছে।

তুমি আমায় ভালবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালবাসার ছবি॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো—
আকাশ বাতাস প্রভাত আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পূবের অরুণ রবি—
তুমি ভালোবাসো ব'লে ভালোবাসে সবি?

অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পার হইয়া পৌষ আবির্ভূত হয়। একদিকে পাকাধানের বিদায় ঋতুর গান শুরু হয় অন্যদিকে নূতনের আসন্ন আবির্ভাবের জন্য চাঞ্চল্য ও শঙ্কা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ও বিদায়কালীন ক্রন্দনের মধ্যে পৌষের বোধন সম্পন্ন হয়। এখানে, পউষ কবিতায়, কোন তত্ত্বের আভাষ নাই। শীত মৃত্যুম্লানে কালিমা মুছাইয়া দেয়, চিরপুরাতনের মধ্যে নূতনত্বের সঞ্চার করে। ঝরা ফুলের পাপড়ি ও শুকনো পাতার স্রোত শীতের শেষ কথা নহে। রবীন্দ্রনাথের পূরবীর শীত কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে ;

মন যে বলে, নয় কথনোই নয়—
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান।
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।

'ছায়ানটে' সুকুমার কল্পনা-লীলা প্রকৃতি ও প্রেমকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রকৃতির বর্ণনায় কবির চিত্ররীতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

উদাস দুপুর কখন গেছে এখন বিকেল যায়।
ঘুম জড়ানো ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর পরা পায় !
শঙ্খ বাজে মন্দিরে।
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায় !
মাঠের বাঁশী বন্‌-উদাসী ভীম্‌পলাশী গায় !

কবির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণনা স্বভাবতঃ কবি কীট্‌সকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নজরুলের পরিক্রমা মনোহারী রূপের জগতে কিন্তু কীট্‌স রূপ হইতে ভাবের জগতে উত্তীর্ণ হন। রবীন্দ্রকাব্যেও রূপকে অবলম্বন করিয়া ভাবসত্য প্রকাশিত হয়। নজরুল জীবনকে ভালবাসেন বলিয়া রূপের পূজারী। রূপের পূজারী বলিয়া তিনি বিপ্লবী।

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে, আয়, আয়, আয়। রৌদ্রোজ্জ্বল পুষ্প প্রাতে পুষ্পিত মহুয়ার বন হইতে আহ্বান আসিয়াছে। আমনধানের বিদায়কালীন করুণতা কবির কর্ণে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যায়। অড়হর ফুলে সংলগ্ন প্রকৃতিরাণীর হলুদ আঁচল, বাবলা ফুলের নাকছাবি, অপরাজিতার নীল শাড়ি কবির মনকে আকর্ষণ করে! অকেজোর গান কবিতার চিত্তরূপটি স্নিগ্ধ।

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হল্‌দে আচল চল্‌তে জড়ায় অড়হরের ফুলে !
ঐ বাব্‌লা ফুলে নাকছবি তার
গা'য় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে॥

প্রকৃতির মধ্যে প্রেমকে প্রসারিত করিয়া তাহার রূপ-উপলব্ধির প্রয়াস "ছায়ানটে" লক্ষ্য করা যায়।

হয়ত তোমার পাব' দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুম্‌ছে বনের সবুজ রেখা ॥

অথবা

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ শ্যাম,
অশনি আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম ॥

সন্ধ্যাতারাকে সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছেন।

কার হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে।

শায়ক বেঁধা পাখী ও চিরশিশু, এই দুইটি কবিতা বাৎসল্য রসে পূর্ণ। সৌন্দর্যের আর একটি দিক এখানে পরিস্ফুট। প্রথম কবিতায় মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য, নীড়হারা, শায়কবেঁধা এক পাখীকে অবলম্বন করিয়া উৎসারিত হইয়াছে। পৃথিবীতে কোন কিছু হারায়না, সকল কিছু আছে, এই বিশ্বাস সন্তানহীনা অথচ চিরকালের মাতার কণ্ঠে প্রকাশিত হইয়াছে।

তুই তো আমার ন'স রে অতিথ্‌ অতীতকালের কেহ,
বারে বারে নাম হারায়ে এসেছিস্‌ এই গেহ,
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য' দিন আছে বাকী;
প্রাণের আড়াল করতে পারে সৃজন দিনের মা কি ?
হারিয়ে যাওয়া ? ওরে পাগল, সে তো চোখের ফাঁকি !

মানব শিশু বারে বারে পৃথিবীতে নানা নামরূপ ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসে। 'অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে', সেই চিরযাত্রিকের আবাহনে "চিরশিশু" কবিতাটি মুখর হইয়াছে।

প্রেমের দেহারতি করিয়াছেন কবি সিন্ধুহিল্লোলে। কখন ও বা মিলনের স্বপ্নে, কখনও-বা বিরহের আকুতিতে তাঁহার কবিতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কখনও-বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাতে প্রেমের ভাবরূপ অনির্বচনীয়তা লাভ করিয়াছে।

সত্যেন্দ্র-প্রভাতে রচিত সিন্ধু কবিতায় কবির কল্পনার বিস্তার স্থানে স্থানে মনোহারী হইয়াছে। চির-বিরহীর সিন্ধুর হৃদয় বেদনায় উদ্বেল, হৃদয়ে তাহার অনন্ত ক্রন্দন। ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি সদৃশ সমুদ্রে প্রথম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল যেদিন আসিল চাঁদ। আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিল সমুদ্র। পৃথিবীতে সুরু হইল সৃষ্টির লীলা।

বুক চিরে এল তার তৃণ ফুল-ফল।
এলো আলো, এলো বায়ু, এলো তেজ, প্রাণ,
জানা ও অজানা জেগে ওঠে সে কি
অভিনব গান।

প্রিয়া-বিরহে সমুদ্র বক্ষে দেখা যায় প্রবল উচ্ছাস।

বাসনা তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,

ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, উর্দ্ধে প্রিয়া স্থির !
ঘুচিল না, অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল !

মহাদেবের মত আপন দুঃখের হলাহল পান করিয়া সমুদ্র নীলকণ্ঠ। মহাদেবের মত সমুদ্র আপনাতে আপনি বিভোল। সে মৃত্যুজয়ী দ্রষ্টা, ভূমানন্দ তাহার অন্তরে। পুনর্বার কবির বর্ণনায় সমুদ্রের অশান্ত হৃদয়ের হাহাকার বর্ণিত হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের সমুদ্র বিষয়ক কবিতাগুলির ন্যায় নজরুলের কল্পনা স্বেচ্ছাবিহারী, ভাবকেন্দ্র হইতে শিথিল বিস্তারের দিকে অধিকতর মনোযোগী। নিসর্গ সম্বন্ধে তাঁহার সৃষ্টিও বস্তুগত নহে, আত্মগত।

'রাখীবন্ধনে' শরৎকালে আকাশ আর ধরিত্রীর মধ্যে যে রাখীবন্ধন উৎসব সম্পন্ন হয় তাহার পরিচয় দিয়াছেন কবি। বর্ণনা চিত্রবহুল ও মনোরম। কিন্তু ইহাতে শরতের অন্তর রূপের কোন পরিচয় নাই। শরতে "নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণী"

হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হ'য়ে এল পুলকে,
লতা পাতা ফুলে বাঁধিয়া আকাশে ধরা কয়, 'সই ভূলোকে
বাঁধা প'লে আজ'। চেপে ধ'রে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,
চুমিল আকাশ নত হ'য়ে মুখে ধরণীরে বুকে ঝাঁপিয়া।

গোপন প্রিয়া ও অ-নামিকা, এই দুইটি প্রেমের কবিতায় শিল্পী ও কবির প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি লীলাসঙ্গিনী, স্বপ্ন সহচরীকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন। যে লীলাসঙ্গিনী রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী, কাজ ভুলাইবার জন্য যাহার চকিত আবির্ভাব! সেই লীলাসঙ্গিনীর প্রেমিকা মূর্তি নজরুল অঙ্কিত করিয়াছেন। গোপন প্রিয়া হৃদয়-অন্তঃপুরে বসিয়া কবির জীবনকে স্বপ্নে ও মাধুর্য্যে ভরিয়া রাখে। তাহার প্রতি তাঁহার প্রীতিও কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। মানস রঙ্গিনী 'নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়'।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো ও দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে ?—তল কেবা পায় অতল জলধির !
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই-সে সুখে থাক্‌ব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর
দূরের পাখী—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়।

এই কবিতার সুরটি পূরবীর একটি কবিতাব সহিত তুলনীয়।

ঝরনা ধারার মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই-বা নিলে তটের শরণ
তাই বা কিসের ক্ষতি।

উপসংহারে কবি আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :

চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে—
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও,
নয় খাঁচাটার থেকে ॥

মানসরঙ্গিনী, অনন্ত যৌবনবালা চিরন্তন বাসনাসঙ্গিনীর বন্দনা গান রচনা করিয়াছেন কবি অনামিকা কবিতায়। কবির মানসলোকে তাঁহার বাস, তাই রতিরূপে তাঁহার আবির্ভাব, সতীরূপে দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গৃহে নয়।

যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হ'লে রতি
তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!

অনাদি কালের হৃদয় উৎস হইতে যে প্রেমের ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিচয় তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মিলনের মধ্যে প্রেমের অপরিপূর্ণতা। প্রাচীন কাব্যে তাই বিরহের জয়গান ঘোষিত হইয়াছে। প্রেমাকাঙ্ক্ষার নিবিড় অনুভূতির মধ্যে প্রেমিকাকে উপলব্ধি করা যায়।

আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতিরূপে, অপরূপা, ডাকো তুমি,
চিনেছি তোমায়'
যাদের বাসিব ভালো—সে-ই তুমি
ধরা দেবে তায়।

এই অপরূপাকে কবি শুধু আপন প্রেমে নহে, নিসর্গের শোভার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রেমিকা ও প্রকৃতি এক হইয়া গিয়াছে। একাকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। 'চক্রবাকে' প্রেমের এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

চক্রবাকে বিদ্রোহীর কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়াছে। চট্টলের কর্ণফুলী, আকাশের বর্ণ সমারোহ যে শোভা রচনা করিয়াছে তাহার মধ্যে :

আমার বেদনা আজি রূপ ধরি, শতগীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে-বিরহিনী-তব তরে ঝুরে!

প্রকৃতির উদার বিস্তারের মধ্যে, যেখানে কর্ণফুলীর চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি, সেখানে কবি তাঁদের স্বপ্ন সহচরীকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। প্রকৃতিই প্রেমিকার রূপ ধরিয়া কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে।

'চক্রবাকে' চক্রবাকীর আকুল আহ্বানের মধ্য দিয়া কবির বিরহ-গীতি ধ্বনিত হইয়াছে। বিরহের আর্তিতে :

মিলনের কুল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের স্রোত-লেগে
অধরের হাসি বাসি হয়ে উঠে নিশীথ-প্রভাতে জেগে!

চক্রবাকীর মত একা নদীতীরে কবিও কাঁদিয়া ফেরেন।

আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ জীবনে শুকাবেনা,
কাটিবে নিশি, আসিবে প্রভাত,—যতেক অচেনা চেনা
আসিবে সবাই, আসিবেনা তুমি তব চির চেনা নীড়ে,
এ-পারের ডাক ও-পার ঘুরিয়া এ-পারে আসিবে ফিরে!

বালুচরে পড়িয়া থাকিবে কবির বিরহ-গীতি। কর্ণফুলীকে কেন্দ্র করিয়া কবির বিরহ-বেদনা আবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। দয়িতের সন্ধান রত দয়িতার কান হইতে একদা কানফুল খসিয়া পড়িয়াছিল। তাই কর্ণফুলি নামটি সার্থক হইয়াছে। কিন্তু কর্ণফুলি তুষার-হৃদয় অকরুণা। মানুষের দুঃখ তাহার স্রোতধারায় দাগ রাখিয়া যায় না। যে লীলাসঙ্গিনীকে কবি অনুসন্ধান করেন তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করেন নিশীথের স্বপ্নে। তাঁহার ভাষাহীন আবেদন, দেহ-ভরা কথা। শতযুগ যুগান্তের অন্তহীন কথা তাঁহার নিকটে নিবেদন করেন। নিশীথের সেই স্বপ্নকে বৃথা বাস্তবে অনুসন্ধান করেন। কিন্তু 'সাড়া নাহি মিলে কারো'। যে গোধূলির রঙে মিলনের লগ্ন রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বিরহের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মলিন হইয়া গিয়াছে। তথাপি :

সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমার পরশ লভি' হইনু সুন্দর—
—তুমি তাহা জানিলেনা!

অনুরূপ ভাব ও ভাষায় রবীন্দ্রনাথও লীলাসঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন :

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,

'এ-মোর অহঙ্কার' কবিতায় নজরুল লিখিয়াছে :

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর—সভায়!
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন।
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার
আমি তোমার গাঁথছি মালা এ মোর অহঙ্কার!

নিশীথ তমসা তীরে চক্রবাক চক্রবাকীকে খুঁজিয়া ফেরে। তাহার বিরহ ব্যথাকে অবলম্বন করিয়া

পৃথিবীতে কত কাব্য ও চিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কত কবি প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। চক্রবাক সৌন্দর্যের অলকাপুরী হইতে নির্বাসিত :

এ পারে ও পারে জনম জনম বাধা,
অকুলে চাহিয়া কাঁদিছে কুলের রাধা।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি'
কাঁদিছে বাঁশরী সুরের ছলনা করি'।

বিরহ সন্তপ্ত প্রেমিকের নিকটে চেতন ও অচেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। প্রকৃতি তাই পরম সুহৃদরূপে প্রেমিকের নিকটে প্রতীয়মান হয়। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারিকে" সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছেন : তোমার শাখার পল্লব মর্মর
মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দিঘল তাহার দেহের রেখা।

এই গুবাক তরুর সারি প্রণয়-ইতিহাসের সুহৃদ ও আশ্রয়স্থল।

তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর। হোক বা না হোক্ দেখা।

নজরুলের প্রেমের কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রেমের আবেদন তাঁহার বলিষ্ঠ, প্রবল ও ইন্দ্রিয়জ। প্রেমের ভাবরূপ অপেক্ষা তিনি দেহাশ্রয়ী প্রেমকে অধিকতর মর্যাদা দিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যে মূলতঃ প্রেমের ইন্দ্রিয়াতীত অনির্বচনীয়তা ও তপস্যার শান্ত শ্রী প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য, নজরুলের কবিতায় কামনা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট। রস সম্ভোগের ক্ষেত্র হইতে বিরহলোকে এই প্রেমের অভিসার। প্রেমের আলোকে পৃথিবী নবতর রূপ ও মহিমা লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যে প্রেমের যে মঙ্গলরূপ তাহার পরিচয় নজরুলে নাই। তিনি প্রেমের দেহারতি করিয়াছেন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে প্রেমের নির্বিশেষ, সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্যের পরিণাম যে মঙ্গল তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে নাই।

পূরবী-মহুয়ায় প্রেম তপস্যার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙ্গে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানির—তুমি আছ, আমি আছি।

এখানে প্রেমের মঙ্গলরূপ পরিস্ফুট। জগতের সহিত এই প্রেমের কোথাও বিরোধ নাই। নজরুলের কাব্যের প্রধান আকর্ষণ তাঁহার অকুণ্ঠ ঋজুতা। তেজোদৃপ্ত ভাষায়, বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তিনি মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বাস্তবকে বস্তু-গত দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার দারিদ্র্য কবিতা কবি-ধর্মের পরিচয় বহন করে।

দারিদ্র্যকে অনেক কবি স্তুতি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তপস্বীর কঠিন সন্তোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু দারিদ্র্য ব্যক্তি ও সমাজজীবনে চরম অভিশাপ।

নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যুযজ্ঞ পৈশাচিক সুখে।

নজরুলের ত্রুটি হইতেছে তাঁহার সংযমের অভাব। মনের একান্ত উদ্দামতা তাঁহার মনে ভাবাতিরেক সৃষ্টি করে। সিন্ধু কবিতায় কল্পনা করা হইয়াছে, সিন্ধুর হেরেম-বাঁদি শুক্তি-বধূ, সিন্ধু পোত তাহার পোষা কপোতী-কপোত, আশা তাহার লুব্ধ সাগর-শকুন আর সাগর বক্ষে অজ্ঞাত পাখীর দল সাগরের বিচিত্র স্বপ্ন। সমুদ্রকে কখনও কবি কল্পনা করিয়াছেন মৃত্যুঞ্জয়ী স্রষ্টা ঋষিরূপে যিনি 'জন্মমৃত্যু দুঃখ-সুখ ভূমানন্দে হেরিছে সতত' কখনও দেখিয়াছেন প্রিয়া-বিরহে তাহার আকুল ক্রন্দন; 'তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল'।

বিদ্রোহী কবিতায় ভাঙ্গনের রথে অধিরূঢ় নির্দয় যৌবনের চিত্ররূপ অঙ্কিত হইয়াছে। এখানেও সংযমের অভাব আমাদের পীড়িত করে।

নজরুলের কাব্য প্রসাধন-কলা বর্জিত। স্বভাব-কবির ন্যায় তিনি তাঁহার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, শিল্পসম্মত রূপ দিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে। এই কারণে তাঁদের কাব্যের উচ্চকণ্ঠ, যাহাকে ভাজিনিয়া উলফ বলিয়াছেন loud speakers strain, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাঝে মাঝে কবির বর্ণনার চমৎকারিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। রহস্যময়ী লীলাসঙ্গিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

এ বুঝি গো ভাস্করের পাষাণ-মানসী
সুন্দর, কঠিন, শুভ্র। ভোরের উষসী,
দিনের আলোর তাপ সহিতে না জানে।
মাঠের উদাসী সুর বাঁশরীর তানে,
বাঁশী নাই শুধু সুর, শুধু আকুলতা। (চক্রবাক)

অথবা

পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পাড়ায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥ (দোলন চাঁপা)

অথবা

সুন্দরী বসুমতী
চিরযৌবনা দেবতা ইহার শিব নয়—কামরতি (সর্বহারা)

মাঝে মাঝে চিত্ররীতির যে আয়োজন করা হইয়াছে তাহা মনোহর।

আস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি !' (চক্রবাক)

অথবা

সিক্ত পক্ষ পাখী
(তাহার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী
হয়ত তেমনি করি ডাকিছে সাথীরে (চক্রবাক)

অসার্থক প্রয়োগ স্থানে স্থানে রসাভাস সৃষ্টি করিয়াছে।

তুমি বুঝিবেনা রাণী,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে' বুদ্বুদ-বাণী ! (চক্রবাক)

অথবা

দিক-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার-নেটের কুয়াশা-মশারি ওকি বর্ডার তারি ? (সিন্ধুহিন্দোল)

অথবা

কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিটকিরি
মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা পিচ্‌কিরি। (বিষের বাঁশী)

সুষ্ঠু অলঙ্কার প্রয়োগ কাব্য-শরীরের শুধু শোভাবর্দ্ধন করেনা ভাবার্থকেও দূর-বিস্তারী করিয়া দেয়। প্রতিভাবান কবিদের কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগ এত স্বাভাবিক রূপে ঘটিয়া থাকে যে কাব্যদেহ হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু নজরুলের কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগ কাব্যাত্মার দ্যুতি প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করে নাই। কয়েকটি অলঙ্কারের পরিচয় নিম্নরূপ।

অনুপ্রাস : আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল ঊমির হিন্দোল্‌-দোল্‌ (অগ্নিবীণা)

অথবা

গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি। (ফণীমনসা)

উৎপেক্ষা ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার। (সিন্ধুহিন্দোল)

অথবা

পার হতে নারি এই তরঙ্গের বাধা
ও যেন 'এসোনা' বলি পায়ে—ধরে কাঁদা
তোমার নয়ন স্রোত। (চক্রবাক)

বিরোধাভাস মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি তোমার প্রাণ

কালোমুখ তার হলো আলোময়। শ্মশানে উঠিছে গান। (চিত্তনামা)

যমক ভাবতে নারি, গোরের মাটি ক'রতে মাটি এ মুখ কেমন করে
(অগ্নিবীণা)

প্রতিবস্তুপমা অসুর নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে।
দনুজ দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি। (চিত্তনামা)

দৃষ্টান্ত তাই সব সয়ে যাও নির্বাক নিশ্চুপ
ধূপেরে পোড়ায় অগ্নি—জাগে না তা ধূপ। (সর্বহারা)

অন্যান্য অলঙ্কারেরও প্রয়োগ আছে। তবে অতিশয়োক্তির প্রয়োগ প্রভূত। অলঙ্কার যে সৌন্দর্যের উপাদান, এই সম্পর্কে ভামহের মত অত্যন্ত স্পষ্ট। অলঙ্কারহীন কাব্য নিরাভরণ রমণী মুখের ন্যায় রমণীয় নহে। 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বণিতাননম্'।

কাব্যশরীরকে উজ্জল করিবার অভিপ্রায়ে নজরুল বহু বিদেশী ও অপরিচিত পদাবলী নির্বিচারে প্রয়োগ করিয়াছেন। অগ্নিবীণায় ও বিষের বাঁশিতে ইহাদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বহুস্থলে অপরিচিত পদাবলী ধ্বনিঝঙ্কারে আমাদের আকৃষ্ট করে।

মোরা খুন্-জোশী বীর, কঞ্জুশী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই!
মোরা দুর্মদ, ভরপুর মদ
খাই ইশকের ঘাত শম্‌শের ফের নিই বুক নাঙ্গায়! (অগ্নিবীণা)

নজরুলের একপ্রকার যৌগিক শব্দ প্রয়োগের দুর্বলতা আছে। ইহা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

চির—দূরে—থাকা ওগো চির—নাহি—আসা

অথবা

নাম—নাহি—জানা—ওগো আজো—নাহি—আসা

কিন্তু নিম্নের এই প্রয়োগটি সুন্দর :

রাত্রি—জাগা তন্দ্রা—লাগা ঘুম—পাওয়া প্রাতে।

নজরুল গীতি-কবি। গীতি কবিতার সুর ও আবেগ তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়ক কবিতাগুলিতে আছে। আর আছে তাঁহার সঙ্গীতে।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির প্রকাশ কাব্যে, কেন না কবির অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য ধরা পড়ে শুধু কবির কাব্যে, তাঁর সৃষ্টিতে। মানুষের আসল পরিচয় যখন তার অন্তরের ঐশ্বর্যের পরিচয়ে তখন কবির সৃষ্টিই কবিকে জানবার ও বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও মানুষ আরো জানতে চায়, নানা দিক থেকে নানা ভাবে জানতে চায়, তার জানার ও কাছে পাওয়ার তৃষ্ণার শেষ নাই। বিশেষ করে যাকে ভালোবাসে, যাকে মন চায় তাকে মানুষ বিশেষ করে জানতে চায়। তার সম্বন্ধে মানুষের মনে কৌতূহলের শেষ নেই। প্রেম এমনি করেই বিস্ময়ের কাজল পরিচয় দেয় মানুষের মানসনেত্রে। তাই কবির সম্বন্ধে মানুষের এতো কৌতূহল, কবিকে সবদিক থেকে জানবার জন্যে তার অন্তরের এমন রস-পিপাসা। কাব্য এমনি আনন্দ-ধারায় মনকে সিক্ত করে, যে তাতে মন সরস হয়ে সব কিছু অনুভব করবার জন্যে তৃষিত হয়ে ওঠে। এমনি আলো জ্বেলে দেয় কাব্য অন্তরের দীপে যে সে আলোতে বিশ্বের সব কিছুকে তাদের স্ব-রূপে জানবার জন্যে মন সহস্র শিখা মেলে ধেয়ে চলে। যে স্রষ্টা, যে কবি তাঁর সৃষ্টির অগ্নি-পরশে মানুষের চেতনাকে এম্নি করে পূর্ণজাগ্রত করেন তাঁর পানে ভালোবাসা যে ধেয়ে যাবে শত তরঙ্গে, তাঁকে সব দিক থেকে জান্‌তে, অনুভব করতে যে চেষ্টা করবে মানুষ, এতো স্বাভাবিক তাই কবিদের সম্বন্ধে মানুষের যতো কৌতূহল এমন কৌতূহল আর কারো সম্বন্ধে নেই। কবি হচ্ছেন মানুষের সব চেয়ে প্রিয়, ভালোবাসার ধন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মহাকবি কালিদাস। যুগের পর যুগ চলে গেছে, তাঁর কাব্যের সুধা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা পান করে চলেছি, তবুও আজো তা এতোটুকুও পান্‌সে, কিম্বা রসহীন বলে মনে হয় না। সমকালীন রোয়াকি-সাহিত্যের মৌসুমের যুগে, আজও কালিদাসের কাব্য অমৃত-নির্ঝর হয়ে রয়েছে রসিকের কাছে। মোটা সুর, বেসুরো সুর যে নেই তাঁর কাব্যে তা বল্‌ছি নে, নিশ্চয়ই আছে, যেমন তাঁর 'ঋতুসংহার' কাব্যে; কিন্তু পেলব সুর গভীর অনুভূতির অনুপম রূপ-সৃষ্টিও এতো আছে তাঁর কাব্যে যে তাঁর মতো মহাকবির এই রস-বিকৃতির ও রুচির স্থূলতার অপরাধ আমরা গভীর রসাস্বাদনের আনন্দে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ক্ষমা করতে পারি।

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর কালের সামাজিক অবস্থার ছবি আমরা পাই। তাছাড়া ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের সঙ্গে মহাকবির পরিচিতি ছিলো সেটাও আমরা জানতে পারি। কিন্তু এই পৃথিবীতে তাঁর আসা-যাওয়ার সময়ের সব প্রমাণ মহাকাল যেন ইচ্ছে করে গোপন করে নিয়েছেন। যিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি তাঁর জন্মমৃত্যুর তারিখ ও সনের হিসেব রেখে লাভ কি?—মহাকাল যেন এই কথাই আমাদের বল্‌তে চান। কিন্তু কোন শতাব্দীতে কালিদাস জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতভেদ

আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের আবির্ভাব। আবার কারো কারো মতে সপ্তম খৃষ্টাব্দে কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের আবির্ভাব এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর নজির দিয়ে বলেন যে সুংগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের ছেলে অগ্নি মিত্রের রাজদরবারের জীবনের বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। এই অগ্নিমিত্র খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগের লোক আবার যে ঐতিহাসিকেরা সপ্তম খৃষ্টাব্দে কালিদাসের জন্ম এই মত পোষণ করেন তাঁরা রবিকীর্ত্তির আইহোল শিলা-লিপির লিখনের উল্লেখ করে তাঁদের মতের যথার্থতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

দাক্ষিণাত্য বিজাপুর জেলা বর্ত্তমান 'আয়াভেল'-ই হচ্ছে প্রাচীন যুগের আইহোল রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশীর রাজত্বকালে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই মন্দিরে এই শিলা-লিপি আছে—"কালিদাস ও ভারবির তুল্য যশের অধিকারী রবিকীর্ত্তির জয় হোক।"

খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের জন্ম এই মতের বিপক্ষে যে ইতিহাসবিদ পণ্ডিতেরা তাঁরা নিম্নলিখিত, এই যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন।

প্রথমত, কালিদাস যে পাতঞ্জলির 'যোগসূত্র' ভালো করে জানতেন তার প্রমাণ তাঁর রচনা থেকে আমরা পাই। পাতঞ্জলি ছিলেন পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক।

দ্বিতীয়ত, বহু যুগ থেকে চলে-আসা জনশ্রুতি অনুসারে কালিদাস ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। সুংগ কুলের রাজারা কিন্তু বিক্রমাদিত্য উপাধি কখনো ব্যবহার করেন নি। তাছাড়া খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকে বিক্রমসম্বৎ সুরু হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকে বিক্রমাদিত্য নামে কোনো রাজা শকদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে শকারি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ও বিক্রমসম্বৎ সুরু করেছিলেন, এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই না। তা ছাড়া যে শতাব্দীতে বিক্রমসম্বতের সুরু হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে, তার প্রায় এক হাজার বছর পরে এই সম্বতের প্রথম চলন হয়।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে কালিদাস অশ্বঘোষেরও আগে। তাঁর যুক্তির সার কথা হচ্ছে এই যে কালিদাস আর অশ্বঘোষ দুজনেই তাঁদের রচনায় একধরনের শব্দবিন্যাস ব্যবহার করেছেন। অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। অতএব কালিদাস নিশ্চয়ই খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের লোক। কিন্তু শ্রী উপাধ্যায় তাঁর 'India in Kalidas' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কালিদাস ও অশ্বঘোষের কাব্যে শব্দ-বিন্যাসের যে সাদৃশ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবিষ্কার করেছেন, সেই শব্দ-বিন্যাসগুলি প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত কবিরা ব্যবহার করেছেন।

চতুর্থত, কালিদাসের রচনায় কোথাও শকদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। যদি তিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের লোক হতেন তাহোলে 'গার্গী' সংহিতা'র যুগপুরাণ অংশে শকদের অভিযান সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তা নিশ্চয়ই জানতেন। এই সংহিতা আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ৩৫ সালে রচিত হয়।

পঞ্চমত, কালিদাসের রচনায় যে ভারতবর্ষের ছবি আমরা পাই সে ভারত ঐশ্বর্যশালী ও শান্তিময়। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের অশান্তি ও অভিযানের ঝড়ের ঝাপ্টা খাওয়া ভারতবর্ষের ছবি আমরা তাঁর রচনায় পাই না।

ষষ্ঠত, পৌরাণিক সংস্কারের উল্লেখ কালিদাসের রচনায় আমরা বারবার পাই। এই পৌরাণিক সংস্কারগুলি কিন্তু গুপ্তবংশীয় রাজাদের শাসন কালে তাঁদের আনুকুল্যে সংগৃহীত হয়;

সপ্তমত, কালিদাস বহু হিন্দুদেবদেবীর উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনাগুলিতে। এগুলি কিন্তু খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের সৃষ্টি নয়। মহাযান বৌদ্ধ মতবাদের প্রবর্তনের পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তখন থেকেই এই নানা দেবদেবীর সৃষ্টি ঘট্তে থাকে। তার আগে প্রধানত যক্ষমূর্তির পুজা হোতো। এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা ভালো যে কালিদাসের রচনায় দেবদেবীর যতো উল্লেখ আছে, তার চেয়ে দেবদেবীর অনেক কম উল্লেখ আছে অশ্বঘোষের রচনায়। এর থেকে এও অনুমান করা যায় যে কালিদাস অশ্বঘোষের পরের যুগের লোক। প্রথম খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন অশ্বঘোষ।

যাঁরা কালিদাসকে সপ্তম খৃষ্টাব্দের লোক বলে প্রমাণ করতে চান তাঁদের যুক্তির বিরুদ্ধে শ্রী উপাধ্যায় বলেন যে হুনদের ভারতে প্রবেশ ও ভারতে বাস সম্বন্ধে কালিদাস যে কিছু জান্তেন তার প্রমাণ তাঁর রচনায় নেই। আর হুনেরা ৪২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বসবাস করেছিল। তাঁর সময়ের অনেক আগে হুনদের ভারতে আগমন হলে কালিদাস নিশ্চয়ই সেটা জানতেন ও তার উল্লেখও করতেন তাঁর রচনায়।

এম্নি করে ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে বিরাট কালের বুকে রেখা টান্তে টান্তে আমরা চতুর্থ খৃষ্টাব্দকে কালিদাসের আবির্ভাবের যুগ বলে নির্ণয় করি। আর একটি বিষয়ও এই কাল নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। বাৎসায়নের মত যে কালিদাস অনুসরণ করেছেন তার বহু প্রমাণ কালিদাসের কাব্যে আছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে কালিদাস বাৎসায়নের পরের যুগের লোক। আর তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বাৎসায়নের আবির্ভাব।

কালিদাস যে গুপ্তযুগের কবি এই মতের সমর্থনে শ্রী উপাধ্যায়ে যে যুক্তিগুলি দর্শিয়েছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—কালিদাস যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে ও নাটকে, তার সঙ্গে গুপ্ত নৃপতিদের শিলালিপিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার একান্ত সাদৃশ্য।

গুপ্ত নৃপতিদের শিলালিপিতে ধর্ম সম্বন্ধে সহনশীলতার যে পরিচয় পাই, কালিদাসের রচনাতেও তার প্রচুর আভাস আছে। জনশ্রুতি কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলে ঘোষণা করেছে বহু শতাব্দী ধরে। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের পরে আমরা শুধু একজন বিক্রমাদিত্যের হদিশ পাই। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। যমিত্র, ডায়মেত্রন্ প্রভৃতি গ্রীক শব্দ কালিদাস জানতেন। এই বিদেশী শব্দ গুলি ছড়িয়ে পড়তে ও প্রচলিত হতে যে অনেক দিন লেগেছে তা নিঃসন্দেহ। এর থেকেও কালিদাসকে গুপ্ত যুগের লোক বলে অনুমান করা যায়। ভরতের "জালগ্রথীতাঙ্গুলি কর"—এর বর্ণনা করেছেন কালিদাস। এই ধরণের যুক্তাঙ্গুলি সমন্বিত মূর্তি অতি বিরল। আর যে

কটি এই ধরণের মূর্তি পাওয়া গেছে সব ক'টি হচ্ছে গুপ্ত যুগের। কালিদাস গঙ্গা যমুনার মূর্তির বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের চামরধারিণী রূপে এই নদী-দেবী দুটির যে রূপ-কল্পনা তা আমরা শুধু কুশানযুগের শেষ সময়ে ও গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের প্রারম্ভকালে দেখতে পাই। প্রাক্ কুশান যুগের মূর্তিগুলিতে যে ছত্রের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে সেই ছত্রই মূর্তির মাথার পিছনের 'প্রভামণ্ডল'-এর রূপ নেয়। কুশানযুগে এই প্রভামণ্ডল সাদাসিধে গোলাকৃতি রূপে কল্পিত ছিলো। পরবর্তী গুপ্তযুগে এই প্রভামণ্ডলের ভিতরটা নানা কাল্পনিক মূর্তি ও আলোর রশ্মির রূপ-রেখা দিয়ে ভরে তোলা হয়। কালিদাস যে এটা ভালো করে জানতেন তার প্রমাণ পাই আমরা তাঁর রঘুবংশ কাব্যে যেমন তিনি 'স্ফুরৎপ্রভামণ্ডল' এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কালিদাসের আবির্ভাব এই মতের সমর্থনে শ্রী উপাধ্যায় উপরি উক্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন। শ্রীশিবদাস মূর্তি তাঁর 'Epigraphical Echoes of Kalidasa' বইটিতে কালিদাস চতুর্থ খৃষ্টাব্দের লোক এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখিয়েছেন।

কালিদাস যে 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' কাব্যদুটি ৪৭৩-৪৭৪ খৃষ্টাব্দের (৫২৯ বিক্রম সম্বৎ কিম্বা মালব্য সম্বৎ) পূর্বে রচনা করেছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ শ্রীশিবমূর্তি শিলালিপির উল্লেখ করেছেন। এই শিলালিপিটি দশপুরের তন্তুবায়দের নির্দেশে কবি বৎসভট্টি কর্তৃক রচিত। উজ্জয়িনী থেকে আশী মাইল উত্তর-পশ্চিমে দশপুর নগরী অবস্থিত। দশপুরে যে সব তন্তুবায়েরা রেশমী তৈরী করার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো, সেই তন্তুবায়দের শ্রেণী সংস্থার (Guild) নির্দেশে বৎসভট্টি নামক এক কবি দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে (৪৬৯-৪৭৬ খৃঃ) এই শিলালিপিতে যে কবিতাটি খোদিত আছে সেটি রচনা করেন; মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাট থেকে এই তন্তুবায়েরা দশপুরে আসে রাজা বন্ধুবর্মনের রাজত্বকালে। ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে এই তন্তুবায়েরা দশপুরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে তারাই এই মন্দিরটির সংস্কার করায়। এই ঘটনাদুটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে তন্তুবায়েরা কবি বৎসভট্টিকে দিয়ে একটি কবিতা রচনা করায় শিলালিপিতে খোদিত করাবার উদ্দেশ্যে। চোয়াল্লিশ স্তবকের এই কবিতাটি কাব্যরীতি অনুসারে লিখিত। কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে কালিদাসের কাব্যগুলি বৎসভট্টি যে শুধু জানতেন তা নয়, কেমন করে অন্য কবির কাব্য নিজের কাজে লাগানো যায় সে বিষয়েও তিনি কম নিপুণ ছিলেন না। এ হেন বৎসভট্টির কিন্তু আর যাই দোষ থাক বিনয়ের অভাব ছিলো না; তাঁর এই কবিতার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"ইয়ম্ প্রযত্নেন রচিতা বৎসভট্টিনা"—অর্থাৎ এই কবিতাটি তাঁকে লিখতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে।

নানা ধরণের এই সব ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করে অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গে চতুর্থ খৃষ্টাব্দকে কালিদাসের আবির্ভাবের কাল বলে ধরা যেতে পারে।

(ক্রমশঃ)

তৃতীয় পাণ্ডব

গোপাল ভৌমিক

কি নতুন লোভ দেখাবে আমাকে বল !
এই পৃথিবীর সুখ দিয়ে যদি
ভোলানোর কর ছলও
মানবে না মন,
মেপে সে দেখেছে আকাশ পৃথিবী
গভীর সাগর তলও।

বেয়োনেট হাতে পরিখার নীচে
নজর রেখেছে শত্রুর পিছে ;
বুঝেছে সে পরে
মিথ্যা দ্বন্দ্ব
আসল শত্রু থাকে অগোচরে
তোমার আমার মনের ভিতরে।

ধনের গর্ব প্রেমের স্বার্থ
কামের পঙ্কিলতা
সব কিছু তার ভোগ করা শেষ ;
তাই সে অজেয় পার্থ
গাণ্ডীব হাতে খুঁজে ফেরে পরমার্থ—
মিথ্যে করো না তাকে ভোলানোর ক্লেশ।

তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে

রণজিৎকুমার সেন

একটি মোমের আলো ঘর যদি আলো ক'রে দেয়,
তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে।
তুমি পারো একটি হৃদয়-রাজ্য আলোতে ভাসাতে,
একটি প্রেমিক মন পারো তো নাচাতে
এক কলি গান গেয়ে!
মোম, তারা, সূর্য্য, চাঁদ কতটুকু আলো দেয়?
তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে।

তুমি যে উজ্জ্বল আরও।
একটি বসন্তে যতো ফুল ধরে কাননে কান্তারে,
একটি সপ্তর্ষি যতো টিপ আঁকে আকাশ-ললাটে,
তুমি যে উজ্জ্বল আরও তার চেয়ে!
হৃদয়ের পথ বেয়ে
কখন্ নিভৃতে আসো নূপুর-নিক্কনে,
সে কথা কি জানি মনে?

দিনের ক্লান্তি শেষে
বিহঙ্গ যেমন ফেরে নীড়ের সন্ধানে,
বসন্তের পাখী যেন:
নানা ঘাটে পণ্য সেরে আমি ফিরি তোমার উদ্দেশে
তেম্‌নি নির্জ্জন ধ্যানে।
জানি তুমি শান্তি দেবে, দিতে পারো প্রেম, আলো,
দিতে পারো ঘুম গান গেয়ে:
এ পৃথিবী যত বড়, যত তারা এ আকাশে জ্বলে,
তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে।

স্মৃতিলগ্না

সরোজবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর থেকে ধূসর সন্ধ্যায়
আকাশের নীল আর শিমূলের সবুজ ছায়ায়
সব দিক খুঁজিলাম
যা কিছু আমাকে আছে ঘিরে
তোমার সে হাসিটুকু পেলাম না ফিরে।

সবুজ স্বপ্নের ছবি আঁকা
করমচা-রঙ মাখা কতো মুখ হ'য়ে গেছে দেখা,
শীতের কুয়াশা-ভোর
গোলাপের পাপড়ীর মতো
তোমার সে অধর দু'টি পেলাম না তো।

শহরের পার্ক, নাচঘরে
যেখানে নারীর রূপ পুরুষের মন রাখে ধ'রে
অনুরাগে অবনত
সেই আঁখি নীলাঞ্জন মাখা
সেখানে কারোর মুখে পেলাম না আঁকা।

মানুষের স্পর্শ আর মন
সে তার সব কিছু নিয়ে আছে একান্ত আপন,
জীবনের যাদুঘরে
তাই এই মানুষকে একা
অতীতের স্মৃতি দিয়ে আজো পাবে দেখা॥

টিকিট

অসীম গোস্বামী

তিনকাল গিয়ে তার এককালে ঠেকেছে এখন
অথচ মনের সাধ মনেই তো রয়ে গেল—তাই
চাঁদ-ঝরা মৃদু রাতে বিছানায় ঘুম তার নাই—
কোথায় বা বৃন্দাবন হরিদ্বার পুরীর মন্দির!
নবদ্বীপে রাস দেখে কবে সেই প্রথম যৌবনে
মনে আশা পুষেছিল হৃদয়ের নিভৃত গুহায়
কাশী কাঞ্চি বৃন্দাবন সব দেখে মনের জ্বালাকে
নীলাচলে সঁপে দেবে—তাঁর পদচিহ্ন ছুয়ে ছুয়ে।

মনের সকল সাধ রয়ে গেল মনেই তো তার;
টিকিটের পয়সা কোথা! কোথা তার যাবার পাথেয়,
কোথায় থাকবে সেথা! ধর্মশালায় যদি ঠাঁই
নাই পাওয়া যায় তবে—তাই এই পোঁটলাখানাতে
বৃথা চেষ্টা সঞ্চয়ের; অথচ এ জ্বরতপ্ত দেহে
মনে হয় চলে যাক্ এখুনি সে গভীর ইচ্ছায়।

রাত্রি নিঝুম হলে চাঁদখানা মাথার ওপরে
ধীরে ধীরে উঠে এলো, জানালায় কিছুটা আলোক
মেঝেতে ছড়ায়ে দিল। আর সেই সবুজ আলোয়
পরীগুলো নেমে এসে দিল হাতে সোনালি টিকিট
—এবার সে যেতে পারে সারাদিন সারারাত্রি ভরে।

সকালের অভ্রসূর্য রঙ্ ঢেলে পারেনি জাগাতে
তার সে কঠিন চোখ—কারণ সে পরীর সাথেই
টিকিটটা হাতে নিয়ে ছাড়পত্র পেয়ে চলে গেছে
নরম আকাশ ভরে কাশী আর কাঞ্চির পথে॥

আলোচনা

পাঠক প্রসঙ্গে

সাম্প্রতিককালে সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা যে লক্ষ্যণীয় ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ কারো দ্বিমত নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা এবং সাময়িক পত্রিকার সংখ্যার প্রাবল্য লক্ষ্য করলেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ প্রসারের ক্ষেত্র খুবই আশাপ্রদ। সাহিত্যের এই বহুল বিস্তৃতি দ্বারা একটা জাতির সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক মান নির্ণয় করা যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব্ব করার হয়ত আছে।

কিন্তু এই আত্মশ্লাঘা যথার্থই যুক্তিপূর্ণ কিনা এখানে তা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই বলা দরকার, সাহিত্য অর্থে আমরা সৃষ্টিধর্ম্মী-সাহিত্যকর্ম্মকেই বুঝব। কারণ, এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধেই বৃহত্তর পাঠক সমাজের স্বাভাবিক আকর্ষণ বেশী। যে কোন পাঠাগারে গল্পোপন্যাসের বহর ও তার চাহিদা লক্ষ্য করলেই এই বক্তব্য স্বীকার করা যায়।

কিন্তু 'পাঠক' বলতে আমরা আজ সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রাদায়কেই ধরে নিতে পারি না। একটু অনুসন্ধান করলেই জানা যেতে পারে যে, হালের সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল রাখেন, শিক্ষিতের মধ্যে এমন সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ। অফিস-আদালতে এবং নানা কর্ম্মসূত্রে আমরা যে সব তথাকথিত 'ইন্‌টেলেকচুয়েলদের' সংস্পর্শে আসি, তাদের বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহালতা পরিলক্ষিত হলেও হালের সাহিত্য বিষয়ের ধারণায় রীতিমত নিরাশ হতে হয়। দৈনিক পত্রিকার নৈমিত্তিক কয়েকটা পৃষ্ঠা ছাড়া সাহিত্য অনুশীলনে যত্নবান হতে কাউকে বড় একটা দেখা যায় না। এমন কি, দৈনিক কাগজের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক সাময়িক ক্রোড়পত্রটুকুর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে নাকি তাদের অবসরের অভাব। অথচ তথাকথিত রাজনীতির টুকিটাকি থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত রকমারী খবর রাখতে কোথাও শৈথিল্যের অবকাশ নেই।

এই যেখানে শিক্ষিত সাধারণের মনোভাব, সেখানে আমাদের সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক মান নিয়ে গর্ব্ব করবার অবকাশ কই? অথচ প্রতিনিয়তই আমরা শুনছি যে সাহিত্যে পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং আজকের সাহিত্যের মানও বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই সাধারণ শিক্ষিতশ্রেণীর সঙ্গে এই সাহিত্যের সম্পর্ক দিন দিন এতটা ক্ষীণতর হতে চলেছে কেন, সেটাও একবার ভেবে দেখা দরকার।

সত্য বটে, সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাহিত্যের উৎকর্ষতাও কোন কোন দিকে প্রথমশ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তবু ব্যাপকভাবে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তার প্রভাব আজও যথাযথ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, সাধারণের

আগ্রহ দিন দিন যেন ক্ষীণতর হতে চলেছে। সাধারণ শিক্ষিতশ্রেণী রাজনীতি বুঝে, আর দশটা বিষয় নিয়েও কথা কাটাকাটি করে, কিন্তু সাহিত্যের প্রসঙ্গে এলেই তারা নিরাশাজনক ভাবেই নিশ্চুপ।

সাহিত্যে এই বিমুখতার কারণস্বরূপ নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো সাধারণতঃ উল্লেখিত হয়ে থাকে।

১। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক অনটন এবং তজ্জনিত মানসিক অব্যবস্থিততা।

২। জীবিকা আহরণে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা।

৩। চটুলতার প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহ ও হুজুগপ্রিয়তা।

৪। রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং তৎপ্রতি সংবাদপত্রের প্রভাব।

৫। আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টিতে শিক্ষিত সাধারণকে আকৃষ্ট করার অক্ষমতা।

উপরোক্ত পাঁচদফার মধ্যে প্রথম চারদফার বিশদ আলোচনা সম্ভবতঃ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই চারদফা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকলেও মোটামুটি কারণ হিসেবে এখানে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু শেষ বক্তব্যটি সরাসরি আধুনিক সাহিত্যকর্ম্মের উপরেই এক মারাত্মক অভিযোগ এনে দিয়েছে, এর যথার্থতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্য যে সমগ্রভাবে শিক্ষিত সমাজের সাগ্রহ সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়নি, এটা বহুলাংশেই স্বীকৃত। আজকের সাহিত্যামোদী 'পাঠক' নামে যে এক বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে, এর আয়তনও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই বিশেষ শ্রেণী বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের এক ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। এই শ্রেণীর পঠন নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসায় আন্তরিকতার অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই। উত্তরোত্তর বিচিত্র কৌতুহলতার দাবীতে আজকের সাহিত্যকর্ম্মের মধ্যেও এক সজীবতার বেগ সঞ্চার করে দিয়েছে। সাহিত্যপাঠ আজ আর শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র নয়, কিংবা অলস চিত্তের পরিপুরক আহার্যও নয়; কি অনুসন্ধিৎসায়, কি বিশ্লেষণ পারদর্শীতায়, এই পাঠকশ্রেণী আজ অতিমাত্রায় সজাগ। তাই অবসর বিনোদনের মামুলী চুটকী দিয়ে, কিংবা পূর্ব্বসুরীদের কথিত পদানুসরণে আর সাহিত্যপাঠকদের মনঃতুষ্টি করা যায় না। তাই এই সচেতন-পাঠক মনের চাহিদা মিটাতে সাহিত্যসেবীদের আজ, বিশ্ব-সাহিত্য পরিক্রমা করে নিত্যনুতন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। এতে পাঠক মহলের প্রসাদলাভ করেছে বটে, কিন্তু আজকের সাহিত্য জটীল থেকে জটীলতর হয়ে জনসাধারনের আওতার থেকে বহুদূরে সরে গেছে। এর ভঙ্গী, রসসৃষ্টির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চিরাচরিত সহজ ধারণা থেকে এতই বিভিন্ন যে, এ যুগের সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না রাখলে এর রসাস্বাদন করা এক দুরূহ ব্যাপার। তাই আজকের সাহিত্য-আস্বাদনের জন্য প্রস্তুতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।

জনসাধারণের সহজলভ্য আওতায় এনে দিতে সাহিত্যের এই গঠন আবার ঢেলে সাজান দরকার কিনা, সেটা স্বতন্ত্র আলোচ্য। কিন্তু সাধারণের সম্পর্কহীন এই সাহিত্য তার সমুন্নত

ভিত্তি নিয়েও যে জাতির সামগ্রিক সংস্কৃতির পুরধায় এসে দাঁড়াতে পারে নি, সেটাই বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই ব্যাপারে শিক্ষিত সাধারণের নির্বিকার উদাসীনতা কতটুকু দায়ী, সেটাও বিশেষ ভাবে ভাববার বিষয়। আমাদের তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় যে, এসব অনুষ্ঠান পর্বে 'নাচ-গান-হল্লা' সবই আছে, নাই শুধু সাহিত্যানুষ্ঠান। যে 'রবীন্দ্রজয়ন্তীর' হুজুগে সহরের অলি-গলি পর্যন্ত মুখরিত, সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যালোচনা লজ্জাকরভাবেই অনুপস্থিত। শোনা যায়, দর্শক মহল নাকি এ ব্যাপারে নিদারুনভাবে বিমুখ। সাহিত্য করতে গেলে দর্শক জুটে না, আর দর্শক জুটাতে গেলে সাহিত্য চলে না। সুতরাং সামাজিক অনুষ্ঠানে এরূপ বিরূপ অনুশীলন বাদ দেওয়াই ভাল।

এই পরিপেক্ষিতে বিচার করতে গেলে বৃহৎ সমাজে সাহিত্যের ব্যর্থতা বিশেষভাবেই স্বীকার করতে হয়। এ ব্যাপারে আধুনিক সাহিত্য কতটুকু দায়ী, অথবা শিক্ষিত সাধারণ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্বই বা কতটুকু তার বিশদ আলোচনা আলাদাভাবে করা প্রয়োজন। এমন কি, এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। যাঁরা আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁরা জানেন, বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে পঠন পাঠনে কতদূর উদাসীন! আধুনিক কাব্য ও কথাশিল্পকে তাঁরা পঠনযোগ্য সাহিত্যকর্ম্ম বলে স্বীকার করে নিতেও একান্তভাবে কুণ্ঠিত। ফলে, এই পণ্ডিতম্মন্য-স্পর্শকাতরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র হাতে নিয়েও আজকের সাধারণ শিক্ষিতসমাজ আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়হীন। ফলে গোড়া থেকেই সুষ্ঠু অনুশীলনের অভাবে আজকের সৃষ্ট সাহিত্য অনেকের কাছেই অর্থহীন ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। এর জন্যই অনেকের মুখে শতাব্দীপূর্ব্বের কবি সাহিত্যিকদের রচনার যতটা খ্যাতি ও প্রশংসা শোনা যায়, হালের সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি তেমনি নির্বিকার। অথচ এই সাহিত্যেরই গৌরব ঘোষণা করতে তাঁরা বিশ্বসাহিত্যের সমকক্ষতার তুলনা অহরহই করে থাকেন। এটাই বিচিত্র!

সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা বেড়েছে, এই গতি ভবিষ্যতে হয়ত আরো ব্যাপকতর হবে; কিন্তু সর্ব্বস্তরে এর প্রসার বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে আমাদের শ্লাঘা করার মত কিছু নেই। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরো বিস্তারিত ভাবে চিন্তা করা উচিত।

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মূল ও কাণ্ড

উদ্ভিদ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তার 'মূল' থাকে নিচের দিকে—মাটির অভ্যন্তরে আর 'কাণ্ড' ওপর দিকে। সুতরাং উদ্ভিততত্ত্বে 'মূল' ও 'কাণ্ডের' অভিন্নতা সনাক্ত করতে খুব বেশি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয় না।

নিচ-ওপরের কথা তুললুম, কারণ বর্ত্তমান কালের ফ্যাসানই হল শ্রেণীচেতনার 'ওপর-নিচ' এই দুইয়ের ব্যাখ্যান করা। অবশ্য সাহিত্য আসরে এই 'মূল' ও 'কাণ্ড' কারা জানি না।

তবে লেখক ও সম্পাদক নিয়েই সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন। সে আসরে আর যাঁরা আছেন তাঁদের স্বীকার করি, কিন্তু তবুও বলি মূল দুটি চরিত্র হলেন লেখক ও সম্পাদক।

বর্তমান যুগ লেবার ও ক্যাপিটালের যুগ। এই লেবার ও ক্যাপিটাল যুগে শ্রেণী চেতনার নিরন্তর সংঘর্ষ সামাজিক ঘরকন্নার একটা কুৎসিৎ ব্যাধি। সেখানে কলহ, অধিকার নিয়ে। লেবার ভাবেন প্রিভিলেজ্‌ড্‌ ক্লাস হলেন ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ভাবেন লেবার। অথচ উৎপাদন ক্ষেত্রে উভয়েইর অবদান অচেল। এই লেবার—ক্যাপিটাল যুগে লেখক ও সম্পাদকের পরস্পর সম্পর্কও অনুরূপ ব্যাধিগ্রস্ত। 'মূল' ও 'কাণ্ডের' সহ-অবস্থান সম্বন্ধ নয়।

রাজনীতি বা সমাজনীতির এই ভয়াবহ বৈষম্য অবশ্য উদ্ভিদতত্ত্বে নেই। মূল বা শিকড় যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অধোগতি, তার আচরণ ক্ষেত্র মাটির নিচে, অতি গভীরে। প্রতীক মতে অন্ধকার পাতালপুরীর অধিবাসী, এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে 'মূল' বা শিকড়কে। সেখানে প্রাণ-চেতনা মেনে নিলেও এমন কথা কখনই শুনি নি যে মূল বা শিকড়ের এই অবনমন তার পুণ্য রাজনীতিক অধিকারের ওপর একটা বিরাট কটাক্ষ। হয়ত উদ্ভিদজগতে এমন আন্দোলন কখনও হয় নি তাই। যদিও বিশ্বাস করি উদ্ভিদজগতে আকাশচারী 'কাণ্ডের' এই এক্‌স্‌প্লইটেশন বেশিদিন স্থায়ী হবে না।

সে কথা যাক্‌। বর্তমান আলোচ্য বিষয় হল সম্পাদক ও লেখক পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি সত্তার আদানপ্রদানের একটা হিসেবনিকেষ। অবশ্য কাজটা অনেকটা ধনিক শ্রমিক বিবাদে ট্রাই-বুনালের মত; সুতরাং ভণ্ডুল অবশ্যম্ভাবী।

কিছুদিন পূর্বে আমার পরিচিত এক তরুণ লেখক বলেছিলেন সম্পাদকরা যে ঠিক কি চান বুঝি না। কবিতা লিখে নিয়ে গেলে বলেন গল্প আনতে আর গল্প নিয়ে গেলে বলেন প্রবন্ধ লিখতে পারেন না? আমাদের এখানে প্রবন্ধের বড় অভাব। গল্প পাই হাজারে হাজারে কিন্তু প্রবন্ধ দশবিশটাও জমে না এককালীন।

বন্ধু প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে স্বভাবতই আমি আতঙ্কিত হয়েছিলুম। হাজারে হাজারে গল্পলেখক যদি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে। প্রথম সমস্যা হবে বিষয়বস্তু নিয়ে। কী নিয়ে লিখি! (অবশ্য লেখকের বর্তমান আলোচনাও অনেকটা এই সমস্যাসম্ভূত)। মোট কথা লেখকের বিশেষ তরুণ লেখকের সেন্টিমেন্টই হল সম্পাদক বিরোধীতা। অর্থাৎ লেখক ভাবেন সাহিত্য বিচার আর সংস্কৃতি অনুধ্যানের একমাত্র অধিকার শুধু সম্পাদকেরই নয়। সম্পাদক যে একমাত্র কষ্টিপাথর এ বিশ্বাসটাই সাহিত্যিক অবিমৃষ্যকারিতা। সুতরাং তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য সমালোচ্য।

একথা যদি মেনে নিই তাহলে লেখকদের এই প্রশ্নগুলি সাবধানে বিচার করা দরকার. কারণ সাহিত্যপত্রের লেখকদের যুক্তির সৌকর্য অনস্বীকার্য। বীরবল তাঁর 'টীকা ও টিপ্পনিতে' বলেছেন "বই লেখে একজন, আর মাসিকপত্র অনেকে মিলে। এককথায়, মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরস্বতীর বারোয়ারী পূজো করা।" অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্রে প্রয়োজন ছোট-বড়-প্রায়

গল্প, উপন্যাসের খণ্ডাংশ, আঁকাবাঁকা প্রবন্ধ, পাতাবাহারি কবিতা, প্রসঙ্গকথা, সম্পাদকীয়, অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ইত্যাদি, এতবড় বারোয়ারী উৎসবে গল্পলেখককে প্রবন্ধের ফরমায়েস দেওয়া সাহিত্যের অনেকটা দায়সারা পৃষ্ঠপোষকতা। তাছাড়া বারোয়ারী উৎসবে সম্পাদকের প্রয়োজনও ত' নামমাত্র!

হয়ত সম্পাদকরা এ যুক্তি মানবেন না। তবে লেখকদের তরফ থেকে যদি কোন Declaration of Rights ছাপা হয় তবে সর্বপ্রথম উল্লেখ থাকবে Right to equality of opportunity অর্থাৎ লেখা ছাপার ব্যাপারে সব লেখককেই পূর্ণ সুযোগ দান। তখন কোন সম্পাদকই কোন লেখককে তাঁর এই মৌলিক অধিকার থেকে আইনত বঞ্চিত করতে পারবেন না। শুনছি লেখকরা নাকি Writers Guild তৈরি করছেন। অতএব সম্পাদক সাবধান।

অনেকে বলেন আমাদের দেশে সাহিত্যপত্রের গড়পড়তা আয়ু খুব অল্পদিনের (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে মাত্র চার বৎসর)। কিন্তু আমার মনে হয় জন্ম ও পুনর্জন্ম যেন প্রায় একই সময়ের ফল। একই সংখ্যায় পাশাপাশি পাতায় দেখেছি জন্ম-মৃত্যুর অদ্ভুত সামঞ্জস্য। উৎসাহী পাঠক এ সত্য যাচাই করে দেখতে পারেন। কনসেপ্ট্ বা আইডিয়াল বলতে বোঝায় তেমন কোন উচ্চতর আদর্শ নিয়ে সাধারণত সম্পাদকরা বিশেষ চিন্তিত নন্। অথচ লেখকদের অভিমত, লেখা বাছাইয়ের ব্যাপারে তাঁরা নাকি অকারণ কঠিনতা দেখান। কঠিনতা অকারণ কিনা জানি না, তবে জন্ম, তার সাবালকত্ব ও তার মৃত্যুর বোধন যদি একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতে দেখি তাহলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। কিন্তু দায়ী কে! সম্পাদক নন্। লেখকও নন্। বারোয়ারী তলায় কয়েক শতকের গরমিল নিয়ে কাউকে দায়ী করার জন্য কেউ কোর্ট অব ল অব্দি দৌড়ন না। বারোয়ারী-তলার ওটাই নাকি সংগত হিসেব।

কিন্তু দায়িত্ব থাক আর না থাক সোজা কথা হল জন্ম ও পুনর্জন্ম এই দুই অন্তিমতার একীকরণ। আরও একটি সত্য আছে, জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই কেউ একাগ্রমনে মৃত্যুর চর্চা করে না। সাহিত্যপত্রও করে না। বা তার সম্পাদকও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেন না। অথচ মৃত্যুরই চর্চা হয়। এবং এ চর্চা করেন লেখক ও সম্পাদক উভয়েই। আত্মপক্ষ সমর্থনের উৎসাহে দুই পক্ষই পরস্পর চুলোচুলি করছেন। যদিও একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ তাঁরা। একের বিরুদ্ধে অপরের এই যে নালিশ এ যেন আত্মহত্যারই সামিল। মনে হয় লেখকদের সংগে সম্পাদকদের মন ও মতের মিল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ উভয়েরই আদর্শ নাকি ভিন্ন।

উপসংহারে বলি, আমার ব্যক্তিগত আবিষ্কার হল লেখক ও সম্পাদক যদি পরস্পর একটু আগ্রহশীল হন, আত্মপ্রচারের উৎসাহটা কিঞ্চিৎ অবনমিত করেন এবং পরিশেষে উদ্ভিদতত্ত্বের 'মূল' ও 'কাণ্ড' অধ্যায়টি অনুশীলন করেন তাহলে জগতের আর কিছু উপকার না হো'ক পত্রিকাগুলো বাঁচে সরস্বতীর বারোয়ারীতলায় আমরাও নির্বিবাদে বাঁচি।

রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত

আধুনিক গান

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সমকালীনে "কাব্য পণ্য নয়" শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নিত্য নুতন পরীক্ষা-নীরিক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলাম। দু'একজন বিদগ্ধ পাঠক বলেছেন: এ-হেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি বাঞ্ছনীয় নয়? তবে কেন উক্ত মন্তব্য করে রক্ষণশীল মনের পরিচয় দিয়েছি আমি?

যে-কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে নিতান্ত প্রয়োজন, আর সকলের মতো আমিও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। বেঁচে থাকার প্রধান লক্ষণই ঐ। ব্যক্তির ক্ষেত্রে। জাতির ক্ষেত্রে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-কবিতায় বর্ণিত 'একটা নতুন কিছু করার' ফ্যাশন মাত্র সেখানে ফলাফল ভুয়া হতে বাধ্য। সাহিত্য বা আর সব ললিতকলার ক্ষেত্রে ত' বটেই।

দুর্ভাগ্যবশত একালের প্রধান দুর্লক্ষণই হলো উপরোক্ত ফ্যাশন। তাক্-লাগানো চোখ-ধাঁধানো নতুন একটা কিছু করার। সর্ব্বক্ষেত্রে এই ফ্যাশনের প্রকোপ ব্যপক। ব্যবহারিক শিল্পের ক্ষেত্রে এটা চলতে পারে। কারণ, এ-শিল্প দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার তোয়াক্কা রাখে না। কাল এর কষ্টিপাথর নয়। কানের দুলের নিত্য নুতন ফ্যাশন বার করে, নতুন ডিজাইনের ধুয়া তুলে ব্যবসায়ী স্বর্ণকার আমার-আপনার গৃহলক্ষ্মীদের প্রলুব্ধ করবেনই, পুরোনো দুল ভেঙে নতুন অর্ডার দিতে। হাওয়া উঠেছে হাওয়াই সার্টের—আমরা হয়তো অজান্তেই সেই ফ্যাশনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ব্যবহার করছি সে-জিনিষ। দুদিন বাদে এসব থাকবে না কোথায় ভেসে যাবে। তখন হয়তো দেখবো গৃহিণীর আধুনিকতম ডিজাইনের দুলটি দশবছর আগেকার সেই সেকেলে মূষিক। মাঝখান থেকে সোনা নষ্ট, 'বাণী' বাবদ অপচয়। আর হয়তো হওয়াই শার্ট দেখে হেসে খুন হয়ে আমার ছেলে ব্যবহার করবে কোম্পানী আমলের বাঙালীবাবুর বেনিয়ন্। এ-সবই একটা নতুন কিছু করার ফ্যাশন।

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, আধুনিক গান নিয়েও তেমনি অদ্ভুত ফ্যাশন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যুগের প্রভাবে গান হয়ে গেছে পণ্য, বাজারে যা বিক্রী হয়। কয়েকজন গীতকার মানুফ্যাকচারার-এর মত গান তৈরী করে সিনেমা আর গ্রামোফোন কোম্পানীর হাতে দেন, যুগোপযোগী হাল্কা চটুল নতুন সুর সংযোজন করিয়ে নিয়ে তাঁরা সেই গান বিক্রী করেন বাজারে। ফলে, সেই গানের কথায় আর সুরে সস্তা ফ্যাশন থাকে, সত্যিকার প্রাণ থাকেনা। নায়ক-নায়িকার বিশেষ কোনো 'সিচুয়েশন' বর্ণনার প্রয়াস থাকে উক্ত ফরমায়েসী গানে। তাই, তার আবেদন হয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ। হনুলুলুর গ্রাম্য সুর ঝুমুরের সঙ্গে 'পাঞ্চ' করে পরিবেশন করলে ঝিলিক দিয়ে ওঠে বটে কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেই অতি 'পপুলার' সুরকে সরিয়ে দিয়ে সাময়িক জনপ্রিয়তার আসন অধিকার ক'রে বসে আর একটা নতুন গান। সেও 'একদিন কা সুলতান',—টিকে থাকে না! এক আসে, এক যায়। আমার এই মন্তব্য যে কতদুর সত্যি তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আপনারা নিজেরাই দিতে পারবেন।

ধ্রুপদ ভেঙে খেয়াল হয়েছিল একদিন। রক্ষণশীলেরা ব্যঙ্গ করে নামই দিয়েছিলেন খেয়াল। কিন্তু সেদিনের রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করে সুর নিয়ে সেই যে নুতন পরীক্ষা হলো তা কালজয়ী হয়ে রইলো। সার্থক সংযোজন হয়ে সুরের জগতে বেঁচে রইলো খেয়াল। আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তেমনি যদি বেঁচে থাকে আধুনিক কালের সুর নিয়ে খেলার খেয়াল খুশীই হবো আমরা। কিন্তু, কোথাও ত' তার লক্ষণ দেখিনা! আশ্চর্য্য প্রভাব এই যুগটার। মানুষ এখন মেশিন,—'জীবনে'র কোনো বিশেষ মানেই নেই তার কাছে। বেঁচে থাকা মানে যৌবনোত্তর পনেরো-বিশটা বছর আধা-খেয়ে আধা-পরে বোঝার ভারে টেনে হিঁচড়ে কাটিয়ে দেওয়া। এতো সমস্যা যে, হাতে সময় নেই তার কোনো কিছু গভীরভাবে তলিয়ে দেখার। তীরে দাঁড়িয়ে মাথায় গায়ে জল ছিটিয়ে নিয়েই ছুটছে সে, সময় কোথায় যে অবগাহন স্নান করবে? অবকাশ বা শান্তি কই যে দুদণ্ড থিতিয়ে বসে সুরুচিকে সজাগ রেখে খতিয়ে দেখবে ভালো-মন্দ? আশার কথা, সমস্যা-জর্জর হাড়-পাঁজরার আড়ালে সুর পিয়াসী একটা সত্বা এখনও বেঁচে আছে। পথ-চলতে সে যা পায় তাইতেই খুসী। যা পাই তাই লাভ, এই তার মনের ভাব। এ অবস্থায় দায়িত্ব বেশী বর্তাচ্ছে, যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের ওপর। যাঁরা গীতকার, যাঁরা সুরকার, গুরু দায়িত্ব তাঁদের। সে—দায়িত্বের গুরুত্ব নিশ্চয় তাঁরা উপলব্ধি করবেন, যদি একবার পূর্বসূরীদের গীতাবদানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বিচার করে দেখেন। কীর্ত্তন, বাউল আর রামপ্রসাদী প্রত্যেক বাঙালীর প্রিয় গান হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। প্রাণতন্ত্রীতে অনন্ত অনুরণন তার। এ সুরে গান গেয়ে চোখের জল ফেলে বাঙালী আজও শান্তি পায়, ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ধন্য মনে করে নিজেকে। জনমানসের রুচির কথা বিচার করে ঐ কীর্ত্তন বাউল রামপ্রসাদী সুর ত' সৃষ্ট হয়নি। সমকালীন শ্রোতাদের পছন্দ অপছন্দের কথা ভেবেও না। ভাব-সায়রে ডুব দিয়ে আপনভোলা হয়ে গান রচনা করেছেন, হৃদয়-স্বর্গলোকে যে-রাগরাগিণী উঠেছে গুণগুণিয়ে তাই দিয়েই হয়েছে তাঁদের রচিত গানের অঙ্গরাগ। সে যে প্রাণঢালা গান, তাই সে-গান সর্ব-যুগের, সর্বকালের। পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য সংযোজন এলো রজনী সেনের মত গীতকার ও সুরকারের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা করে বলার দরকার নেই। রজনী সেন, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল—এঁরা প্রত্যেকে এক একটি "স্কুল"। লক্ষ্য করবার বিষয়, উপরোক্ত প্রত্যেকেই একাধারে গীতকার ও সুরকার এবং মনে হয় এঁদের সাফল্যের মূল কারণও ঐ। কাব্য ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে এ-সব গান শ্রোতার মানস-সত্তার ওপর স্বর্গের আশীর্ব্বাদের মত ঝরে পড়েছে। এ যুগের গীতকার ও সুরকারদের আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ-আলোচনা শেষ করবো। কীর্ত্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, অথবা রজনী সেন, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল-গীতি—প্রত্যেকটি "স্কুলের" গানেরই প্রাণ হলো ভক্তি। ভক্তি-বিচ্ছিন্ন গান পরিবেশন করে বাঙালী মনে আসন পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয় আমার।

সরিৎশেখর মজুমদার

গ্রন্থপরিচয়

রূপকার নন্দলাল ঃ শান্তিদেব ঘোষ। গ্রন্থজগৎ। আড়াই টাকা

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সম্পর্কে তথ্য অবলম্বিত তাঁর শিল্পী জীবনের কথা আগে লিপিবদ্ধ হয়নি বললেই হয়। এদিক থেকে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বইটিতে তিনটি অংশ : 'শিল্পাচার্য নন্দলাল' নামে একটি, 'রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চসজ্জার বিকাশে নন্দলালের দান' একটি এবং সর্বশেষ অংশটি হলো হিমালয় ভ্রমণ। প্রথম দুটি অংশে শ্রীঘোষ নন্দলালের শিল্পী মনের যে পরিচয় দিয়েছেন তা চমৎকার! ব্যবহারিকজীবনে চলতিদিনের উৎসব, আনন্দের মধ্যে শিল্পীর জীবনের সংযোগ কোথায় তা স্পষ্টই বুঝতে পারি। শান্তিনিকেতনের পরিবেশে 'শিল্পাচার্য নন্দলাল' অংশটি চমৎকার, দ্বিতীয় অংশটিতে নন্দলালের মঞ্চসজ্জায় শিল্পীজনোচিত অবদানের রূপ কিভাবে কোথায় প্রকাশ পেয়েছে তাও অত্যন্ত সুন্দরভাবেই ফুটেছে। কিন্তু এই দুটি অংশের সঙ্গে শেষের অংশ 'হিমালয় ভ্রমণ' একটু যেন মাত্রাধিকতাতার দোষে দুষ্ট। স্বীকার করি ভ্রমণ শিল্পী জীবনকে আরও উন্নত তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন করে এবং তার পরিবেশ হিসাবে ঘরোয়া পরিবেষ্টনী ছাড়িয়ে দূরে যাওয়া দরকার—কিন্তু তা বোঝাবার জন্যে 'রূপকার নন্দলালের' হিমালয় ভ্রমণের অত লম্বা ভ্রমণকাহিনী যোগ করে দেবার কি প্রয়োজন। শিল্পীর সঙ্গে প্রকৃতির, যে প্রাণের সংযোগ তা সর্বজনগ্রাহ্য। তার জন্য বড় ভ্রমণ কাহিনীর প্রয়োজন হয় না। রঙীন ও একরঙা ছবির প্রতিলিপিগুলি বইএর শোভা বর্দ্ধন করেছে।

য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি ঃ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। তিনটাকা।

আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্র ক্ষেত্রের একটি ধারাবাহিক ক্রমপরিণতি ও তাহার ভবিষ্যৎ কি, এই সম্পর্কে অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

যদিও এই নব্যযুগের চিত্রকলার ভবিষ্যৎ কিংবা এর কালপরিমাণ তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে নামমাত্র আলোচনাতেই শেষ করেছেন। এইকারণে চিত্ররীতি কি ধরণের হওয়া উচিত তা আলোচনাই করেন নি। শুধুমাত্র বিভিন্ন মতবাদগুলো শিল্পক্ষেত্রে কেমন করে, কি ভাবের অনুকরণে বেড়ে উঠলো তার আলোচনাই প্রধানতঃ করেছেন। শেষে এই চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ভাষা ভাষা মন্তব্যে শেষ করেছেন। এইজন্যে বইটি ঠিক সম্পূর্ণভাবে আধুনিক চিত্রকলার সমালোচনা হয়নি। Classical চিন্তা ও Romantic চিন্তা বেড়ে ওঠার কারণগুলোর মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনী অন্যতম কারণ। এইগুলির আলোচনা না হওয়ার জন্যে লেখকের বক্তব্য পরিপূর্ণ হয়নি।

নিখিল বিশ্বাস

মুল্যাঁ রুজ্ : পিয়ের লা ম্যুর। অনুবাদক—মনোজ ভট্টাচার্য। গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৫৬। মূল্য সাড়ে সাত টাকা

'মুল্যাঁ রুজ' হলো পিয়ের লা মুর লিখিত শিল্পী তুলুস্-লোত্রেকের জীবন-নিয়ে-লেখা উপন্যাস। সুলিখিত ছোট্ট ভূমিকায় অনুবাদক বলেছেন: "...এই উপন্যাসের সবটাই হয়তো সত্যি নয়। সত্যি শুধু লোত্রেকের বড় বংশে জন্ম। তার পঙ্গুত্ব, ভালোবাসার জন্য অন্ধ আকুতি আর ভালোবাসা না পাওয়ার জন্য তার গভীর বেদনা। আর সত্যি তার ছবিগুলো। কিন্তু তাই বলে এই উপন্যাসের লোত্রেক রক্তমাংসের মানুষ লোত্রেকের চেয়ে কিছু কম বাস্তব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে বাল্মিকীর রামায়ণের রাম, অযোধ্যার রামের চেয়ে আমাদের কাছে অনেক বেশী সত্যি। তেমনি পিয়ের লা মুরের তুলুস লোত্রেক, মুল্যাঁ রুজের তুলুস লোত্রেক, আল্বির তুলুস লোত্রেকের চেয়ে আমাদের কাছে কম সত্যি নয়।"

ছেলেবেলায় রক্তহীনতায় ও আরো নানা উপসর্গে দীর্ঘদিন ভুগেছিল তুলুস। কে জানতো নিয়তির নিষ্ঠুরতম পরিহাস ওৎ পেতে বসেছিলো ওর জন্য। ছোট্ট একটা হোঁচট খেয়েই সরু ডাল ভাঙ্গার মত একটা শুকনো মট করে শব্দ হলো। তুলুস পড়ে গেল। আরও মাস তিনেক পরের কথা। কড়াইশুঁটির দানার মত ছোট্ট একটা নুড়িতে পড়লো তুলুসের ক্রাচ। শেষ হয়ে গেল দুটো পা-ই। সেই সুরু হলো জীবনের বেদনা-বিধুর অধ্যায়গুলো। বামন তুলুসের ভালোবাসার জন্য কাঙালপনা—যেন বামনের চেষ্টা চাঁদের নাগালের। এই সঙ্গে ফ্রান্সের এমনি আর একটি নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস-হত করুণ জীবন-কথা আমাদের মনে পড়ে। লুই-ব্রেইলের কথা। কামারশালার তপ্ত শলাকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিঁধে গিয়েছিল শিশু ব্রেইলের বাম-চক্ষে। কিন্তু তবু ব্যর্থ হয়নি সে-জীবন। কত যাতনার কত বেদনার পাহাড় পেরিয়ে অন্ধ ব্রেইল হলো দৃষ্টিদাতা। অন্ধদের পিতা। তুলুস্ও তাই। পঙ্গু তুলুসের অতুলনীয় তুলির আঁচড় অমর হয়ে রইলো।

মুল্যাঁ রুজ্ নিঃসন্দেহে এক অপূর্ব সাহিত্য-কীর্তি। এ-বইয়ের বাঙলা অনুবাদককে সেজন্য আমরা সম্বর্দ্ধনা জানাই। প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের চিত্র-কর্ম ও সজ্জা পরিকল্পনা বইটির শোভা বর্দ্ধন করেছে। শেষের দিকে তুলুস্-এর কয়েকটি অমূল্য ছবির পুনর্মুদ্রন এ-বইয়ের উল্লেখ-যোগ্য আকর্ষণ।

মনে হয়, বইটি তাড়াহুড়ো করে বাজারে বার করা হয়েছে। ছাপায়, 'প্যারা' ভাগ-করায় ও অনুবাদের অনেকাংশে তার পরিচয় আছে। অনুবাদের পর মুল বইটার কথা ভুলে গিয়ে মনোজবাবু যদি রিডিং দেবার সুযোগ পেতেন, তাহলে ভালো হতো।

সরিৎশেখর মজুমদার

নতুন মিছিল ॥ কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থ-গৃহ। কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।

নতুন জীবনবোধের চেতনার, নতুন আঙ্গিক ও প্রকাশ ভঙ্গীমার প্রেরণায় যখন আধুনিক কবিতা বুদ্ধিবাদী কল্পনার মায়াচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হ'তে চলেছে, সেই সময়েই আবার আর একদল আধুনিক কবিদের মন গভীরতম অন্তরের গীতি রসোচ্ছ্বাসকেই কাব্যের আত্মা বলে গ্রহণ করলেন। জীবনবোধের সহজতম ও সুন্দরতম প্রকাশকেই কবিতায় রূপ দিতে চেষ্টা ক'রলেন। এই শেষের দলের তালিকায় 'নতুন মিছিল' কবিতা গ্রন্থের কবি কুমারেশ ঘোষের নাম নিঃসন্দেহে সংযোজিত হ'তে পারে।

দৈনন্দিন জীবনের খোলামেলা চোখে যা রেখেছেন, যা অনুভূতির গভীরে রেখাপাত ক'রেছে, তাকেই সহজ ভাষায়, সুন্দর ভাবে সরল ছন্দে রূপায়িত ক'রেছেন কাব্যলক্ষীর অলঙ্করণে! নতুন মিছিলের কবিতাগুলো তাই আমাদের বুদ্ধির আলোকবর্তিকায় বিচার ক'রতে হয়না, তাদের আবেদন হৃদয়ের কাছে—সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য। তাই কাব্য রসের বিচারে কুমারেশ ঘোষের কবিতা রসোত্তীর্ণ। কিন্তু এই রসের কোথায় যেন একটি সকরুণ সাংগীতিক সুরমূর্চ্ছনা অনুরণিত। কবির সহৃদয় মন রয়েছে, একটি সৎবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলার মহৎ প্রেরণা রয়েছে। খুব গম্ভীর কবিতার শেষেও একটু যেন ছোট্ট চিমটি কাটার ভাব আছে সমাজ চেতনার, যুগ চেতনার অনুভূতি প্রেরণায়। এইখানেই সমস্ত কবিতার ভাব একটি ব্যঙ্গ বোধে রস পরিণতি লাভ ক'রেছে। কুমারেশ ঘোষের প্রথম চুট্‌কি ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন 'কটাক্ষ' এর পর 'নতুন মিছিল' সেই হিসেবে সার্থক পরিণতিই বলা যায়। ছাপা বাঁধাই বাজার চলতি। প্রচ্ছদপট পরিচ্ছন্ন।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সমকালীন

পঞ্চমবর্ষ : ভাদ্র ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪ চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও
টেম্পল প্রেস ২ ন্যায়রত্ন লেন কলিকাতা—৪ হইতে মুদ্রিত।

'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিত বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের সঠিক স্থান নির্দেশ করতে হলে, প্রথমে তাঁর বিদ্যানুশীলনের কথা বলা প্রয়োজন। কারণ বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার ও মাতৃভাষা চর্চার একটা বিশেষ প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার কালে সকলেরই অবশ্য তাই ছিল, 'কেবলসাহিত্য' বা 'literature for literature's sake' নীতির উদ্ভব তখনও হয়নি। রাজসভার কবিরাও উদ্দেশ্য-প্রধান সাহিত্য রচনা করতেন। আদিরসাত্মক বা আধ্যাত্মিক বিষয় পরিবেশন করে, পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজড়া জমিদারদের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য॥ আধুনিক যুগে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের পর সাহিত্যের পোষকশ্রেণীর পরিবর্তন হল। সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সমঝদারগোষ্ঠীর পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে, আধুনিক সাহিত্যের ও মাতৃভাষার, বিশেষ করে গদ্যভাষার, ভিত্ নির্মাণ করেছিলেন যাঁরা তাঁরা তাঁদের পোষক বা পাঠকদের 'মনোরঞ্জন' করার জন্য উদ্‌গ্রীব হননি। সাম্প্রতিক অর্থে, 'মনোরঞ্জনের' সমস্যাও তখন তাঁদের সামনে দেখা দেয়নি। উপন্যাস বা গল্পের মতন তার উপযুক্ত 'form' বা রূপেরই বিকাশ হয়নি তখনও। উদীয়মান মধ্যবিত্তের মনে সাহিত্যের রুচিবোধ জাগিয়ে তোলা, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আস্বাদনে তাঁদের প্রলুব্ধ করা, সাহিত্যপাঠে শিক্ষা দেওয়া এবং সাহিত্যের বিপুল সৃজন-সম্ভাবনার আভাস দেওয়াই ছিল আধুনিক যুগের প্রথম সাহিত্যসাধকদের আদর্শ। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে সাহিত্যের এই আদর্শই অনুসৃত হয়েছিল এবং যাঁরা তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদেরই বলা হত "হিউম্যানিস্ট" পণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক। সেই অর্থে, বিদ্যা-সাগরকেও আমরা আমাদের দেশের একজন আদর্শ "হিউম্যানিস্ট" পণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক বলতে পারি। না বললে, বা সেই দিক দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও বিদ্যানুশীলনের বিচার না করলে, তাঁর প্রতি ও তৎকালের প্রতি অবিচার করা হয়॥

মামুলি রীতিতে তাই বিদ্যাসাগর-সাহিত্যের বিচার না করে, ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে হবে। সকলেই জানেন, বাংলার জনসমাজে বিদ্যাসাগর 'পণ্ডিত' বলে পরিচিত ছিলেন। আজও তাঁকে 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' না বললে যেন তাঁর নামটিকে খণ্ডিত করা হল বলে মনে হয়। ইংরেজ রাজপুরুষরাও 'the Great Pundit' বলে তাঁর নামোল্লেখ করতেন। 'পণ্ডিত' যে

তিনি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কি-রকমের পণ্ডিত, কোন জাতের পণ্ডিত? পণ্ডিত তাঁর পূর্বেও ছিলেন অনেকে, তাঁর সমকালেও ছিলেন, পরবর্তী কালেও হয়েছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে না হলেও, অনেকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে 'পণ্ডিত' ছাড়াও আর একটি ব্যক্তির সত্তা ছিল। সেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিচার করা যায় না। এই ব্যক্তিত্বই "হিউম্যানিস্ট" পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিত অনেকে ছিলেন, কিন্তু এই "হিউম্যানিস্ট" ব্যক্তিত্ব সকলের ছিল না। বিদ্যাসাগরের ছিল এবং এত বেশী পরিমাণে ছিল যে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। হয়েছে বলেই বিদ্যাসাগরের মতন পণ্ডিত 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়' 'উপক্রমণিকা' ইত্যাদি লিখেছেন। পাঠ্য-পুস্তক রচনাতেই তাঁর সাহিত্য জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। অনেকের কাছে এটা রহস্যই বটে! বহু দুর্বোধ্য রচনার পসরা সাজিয়ে যিনি তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করে সকলকে চমৎকৃত করতে পারতেন, তিনি লিখলেন 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়'। এ-রহস্য অনাবৃত করা সম্ভব নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য না বুঝলে। সেই বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নয়, 'হিউম্যানিস্টের' পাণ্ডিত্য। এখন প্রশ্ন হল, হিউম্যানিস্ট বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য কি? হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত কাকে বলা হয়?

এই প্রসঙ্গে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'হিউম্যানিজম' মূলতঃ রেনেসাঁসের জীবনদর্শন। তার দার্শনিক অর্থ প্রত্যক্ষভাবে মানবপ্রেম বা মানবতাবোধ নয়, যদিও পরোক্ষভাবে তাই। মানবপ্রধান বা মানবকেন্দ্রিক চিন্তাই হল তার ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থ। আধুনিক যুগের মানুষের নতুন চিন্তাধারার উৎস হল এই 'হিউম্যানিজম্'। মধ্যযুগের 'God-ism' বা ঈশ্বরপ্রধান চিন্তার বিপরীত এই চিন্তাধারাকে বোধ হয় 'Human-ism' না বলে কেবল 'Man-ism' বললে কোন বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকত না। এ যুগের চিন্তা প্রধানত 'anthropo-centric' বা মানবকেন্দ্রিক, সেকালের বা মধ্যযুগের চিন্তা প্রধানত 'theo-centric বা ঈশ্বর-ও-ধর্মকেন্দ্রিক। নবযুগের এই চিন্তা-ধারা ও জীবনদর্শনেরই নাম 'হিউম্যানিজম্', বাংলায় 'মানবমুখীনতা' বলা যায়। রেনেসাঁসের যুগের বিদ্যাচর্চার প্রেরণা ছিল এই 'হিউম্যানিজম্'। তাই 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের অধ্যাত্মবিদ্যা ও "স্কলাস্টিসিজমের" চর্চা না করে, ক্ল্যাসিকাল যুগের গ্রীক লাটিন বিদ্যার পুনরুজ্জীবনে মনোনিবেশ করেছিলেন। রেনেসাঁসের যুগকে তাই 'revival of learning'-এর যুগও বলা হয়। এই revival বা প্রাচীন বিদ্যার পুনঃচর্চার মূলে প্রেরণা ছিল 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের। তা যদি না থাকত, কেবল যদি তা revivalism হত, তাহলে ইতিহাসে তা "প্রতিক্রিয়াশীল" প্রচেষ্টা বলেই নিন্দিত হত, প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত হত না। সাধারণ পণ্ডিত, মধ্যযুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আর নবযুগের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতের এই বিদ্যাদর্শের পার্থক্যটাই প্রধান। রেনেসাঁসের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সিমণ্ডস বলেছেন: ১

১ J. A. Symonds: A Short History of the Renaissance in Italy (London 1893): P. 6

Men found that in classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, *by which they might profit in the present.*

ক্ল্যাসিকাল যুগে এমন এক জীবনাদর্শের সন্ধান পেল মানুষ তখন, যা অনুসরণ করে তারা বর্তমানে লাভবান হতে পারে। "By which they might profit in the present"—কথার তাৎপর্য গভীর। নবযুগের মানুষের অগ্রগতির পথে সহায় হতে পারে, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে, এমন সব নীতি ও আদর্শ হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। ক্ল্যাসিকাল যুগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিকথা, পুরাণকথা, শিল্পশাস্ত্র—সর্বক্ষেত্রে তাঁরা এই মানবমুখীন জীবনধর্মী আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, বিস্মৃতির সমাধি থেকে তাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, এবং সেই গৌরবময় ঐতিহ্যে মানুষকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করার জন্য তার ঐকান্তিক অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। রেনেসাঁসের এই পাণ্ডিত্যের সাধনা ও বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে সিমণ্ড্স বলেছেন : ২

It was scholarship, first and last, which revealed to men the *wealth* of their own minds, the *dignity* of human thought, the *value* of human speculation, the *importance* of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas . . . . The Renaissance opened to the whole reading public the treasure-houses of Greek and Latin literature.

এই বিদ্যানুশীলনের ফলে মানুষের মনের সম্পদ, চিন্তার ঐশ্বর্য, কল্পনার মহত্ত্ব এবং সবার উপরে মানবজীবনের শাস্ত্রাতিরিক্ত স্বতন্ত্র মূল্যায়ন সম্বন্ধে মানুষের চেতনা জাগে, গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের লুপ্ত রত্নভাণ্ডার সকলের সামনে খুলে দেওয়া হয়। বাংলার নবজাগরণের যুগে এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যানুশীলনের ফলে, এদেশের মানুষের মনে যাঁরা এই নতুন বিচারবোধ ও জীবনবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম তো বটেই, আমার মনে হয় 'সর্বশ্রেষ্ঠ' ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বাংলার রেনেসাঁসের দুজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মী—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার পরিবেশে মানুষ হন নি। পরবর্তীকালে সে-বিদ্যা তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় আয়ত্ত করলেও, তাঁদের জ্ঞানবিদ্যার ভিত্ রচিত হয়েছিল এদেশের ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যা দিয়ে। ইংরেজী শিক্ষার অনেক আগে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও এদেশের ক্ল্যাসিকাল বিদ্যায় পণ্ডিত হয়েছিলেন, ইংরেজী বা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা-শিক্ষার আগে। এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির এই পাকাপোক্ত ক্ল্যাসিকাল বনিয়াদের জন্যই, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কেউই, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাদর্শের প্রভাবে তাঁদের উদার সমদৃষ্টি হারান নি, এবং ভারতীয় ও

২ Symonds : op. cit, pp. 7—8

পাশ্চাত্যবিদ্যার সমীকরণে ব্যর্থ হননি। নবজাগরণের পথপ্রদর্শনে বরং তাঁরাই সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য হয়েছিলেন। ইতিহাসের এই শিক্ষার গুরুত্ব আছে। কেবল ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে এদেশে নবজীবনের বা নবজাগরণের জোয়ার এসেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আংশিক সত্য মাত্র। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতন যুগনায়করা যদি প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্মৃত সত্তার পুনরনুসন্ধান ও পুনরাবিষ্কার করে, লোকসমাজে তুলে না ধরতেন, প্রকাশ ও প্রচার না করতেন, যদি তার ভিতর থেকে নবযুগের প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রেরণা তাঁরা খুঁজে না পেতেন, তাহলে কেবল পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদের বাণীর জাদুস্পর্শে, বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে নবজাগরণের এরকম আলোড়ন হত না। হলেও তা ক্ষণস্থায়ী হত এবং সমাজের উচ্চস্তরের সংকীর্ণতম গণ্ডীর মধ্যের তা সীমাবদ্ধ থাকত। প্রাচীন বেদ উপনিষদ পুরাণ ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যান ও প্রচার আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যতখানি সাহায্য করেছে, পাশ্চাত্য মনীষী বেকন, লক্, হিউম্, টম্ পেইন, ভল্‌টেয়ার, ভল্‌নি, রুশো, কোমতের বাণী তার চেয়ে বেশী কিছু করেনি। এই সব পাশ্চাত্য মনীষীদের বাণী ঘোষণা অরণ্যে-রোদনের মতন ব্যর্থ হত, যদি এদেশের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে তার পরিপোষক নীতি বা আদর্শগুলি অনুসন্ধান করে পুনরাবিষ্কার না করতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই কাজ কঠোর অনুশীলন ও অধ্যবসায় সহকারে করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা নবজাগরণের আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল। সিমণ্ডস বলেছেন: ৩

Not only did scholarship restore classics and encourage literary criticism; it also encouraged theological criticism. In the wake of theological freedom followed a free philosophy.

রামমোহন তাঁর ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা এই 'theological criticism' বা আধ্যাত্মিক সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক বা ধর্মবিষয়ের এই স্বাধীন আলোচনা থেকেই এযুগের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার ও জীবনদর্শনের বিকাশ হয়েছিল। বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় অনুবাদ ও টীকাও করেছেন রামমোহন। বঙ্গানুবাদ ও তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রতিপালন করেছেন সদ্যোজাত বাংলা গদ্যভাষাকে, কারণ গদ্যভাষা মূলতঃ—"a language of discourse"—যুক্তিতর্কই তার প্রাণ। পূর্বের সমাজে এই যুক্তিতর্কের পরিবেশই সৃষ্টি হয়নি, তার সুযোগও ছিলনা তখন। নতুন সামাজিক পরিবেশে যখন যুক্তিতর্কের, বুদ্ধিবিবেচনার অবকাশ হল, তখন কাব্যিক ছন্দোবন্ধন ছিন্ন করে, দ্রুতগতিতে বিকাশ হতে থাকল নবযুগের বন্ধনমুক্ত বলিষ্ঠ ও বেগবান বাংলা গদ্যভাষার। বাংলা গদ্যভাষায় প্রথম বেগ বলিষ্ঠতা ও যুক্তিবদ্ধতা দান করলেন রামমোহন। তারপর আরও জটিল সামাজিক আবর্তের মধ্যে বিদ্যাসাগর তার ঋজু মেরুদণ্ড ও পরিচ্ছন্ন যুক্তিবিন্যস্ত কাঠামটি গড়ে তুললেন।

---

৩ Symonds: op. cit, pp. 10—11

হিউম্যানিস্ট পাণ্ডিত্যের স্বরূপ কি, এবং কেন বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বলা যেতে পারে, সে-কথা আশা করি বলতে পেরেছি। আজকের সমাজে শুধু 'হিউম্যানিস্ট' কথার বাইরের খোলসটুকু রয়েছে, তার সারটুকু চলে গেছে। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন "হিউম্যানিটিজ' বলতে কেবল গ্রীক-লাটিন ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা বোঝায়। সেই বিদ্যানুশীলনের মূলে যে 'হিউম্যান' বা মানবিক আদর্শের প্রেরণা ছিল, তা আর নেই। এখন শুধু ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার পণ্ডিত আছেন, 'এক্সপার্ট' বা বিশেষজ্ঞ আছেন। কোন আদর্শবাদী হিউম্যানিস্ট নেই। পেত্রার্ক বোকাচ্চো, এরেজমুজ, চসার, কোলেট, টমাস মোরের যুগে তা ছিল না। আমাদের রেনেসাসের যুগেও 'পণ্ডিত' বলতে বিদ্যাসাগরের মতন হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বোঝাত। তাঁদের বিদ্যাসাধনার উদ্দেশ্য ছিল মানবমুক্তি। এরকম দু'একজন পণ্ডিত নন, বহু পণ্ডিতের কঠোর সাধনায় মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধ-বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মানবমনের ও মানববুদ্ধির মুক্তি সম্ভব হয়েছে। সিমণ্ডসের ভাষায় বলা যায়: ৪

. . . . scores of scholars, *men of supreme devotion* and of *mighty brain*, whose work it was to ascertain the right reading of sentences, to accentuate, to punctuate, to commit to the press, and to place beyond the reach of monkish hatred or of envious time that everlasting solace of humanity which exists in the classics . . . .

নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় নবযুগের ঊষাকালে explorer-রা যেমন দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন, হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরাও তেমনি হারিয়ে-যাওয়া পুঁথিপত্রের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যকে অবিকৃত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা, তার বিকৃত টীকা-টিপ্পনি ও অপব্যাখ্যাকে বাতিল করে আসল বস্তুর পাঠোদ্ধার কর সঠিক ব্যাখ্যা ও টীকা করা—এই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনাও প্রধানত এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পুনরুদ্ধার, টীকা-ব্যাখ্যা ছাড়াও তিনি মাতৃভাষায় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ করেছিলেন এবং তারই সার সংগ্রহ করে নবযুগের শিক্ষার উপযোগী সব পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। কেবল তাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। রামমোহনের মতন বিদ্যাসাগরও আরও দ্বিগুণ উৎসাহে, অর্জিত শাস্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সামাজিক আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছিলেন। তার প্রচারের জন্য নিজে ছাপাখানা স্থাপন ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। পণ্ডিত পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রবিদ্যা তিনি নির্ভয়ে জনসমাজে প্রচার করেছিলেন। এটা তাঁর সাহিত্যকীর্তির বড় দিক।

বিদ্যাসাগরের এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যাদর্শের কথা মনে না রাখলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। তাঁর পুঁথি-সন্ধান ও সম্পাদনা, অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সামাজিক আলোচনা মিলিয়ে তাঁর যে বিচিত্র সাহিত্য-সাধনা, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য-বিচার ও যথার্থ মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হব, তাঁর সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে। এই সাধনার ও আদর্শের সামান্য আভাস দিচ্ছি এখানে।

৪ **Symonds : op. cit. pp. 9—10**

তাঁর সম্পাদিত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

. . . . manuscripts of the work are very rare . . . . the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence . . . . by good fortune I procured three manuscripts from Benares . . . . after carefully collating them with the texts in Calcutta . . . . I have been able to edit the work.

'মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: "কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মুমম্বীনগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীটীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই তিনখানি ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারিপুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল।"

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়, তখন স্থির হয় যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই নাটকের যে পাঠ প্রচলিত আছে তাই ছাত্রদের পাঠ্য হবে। বিদ্যাসাগরের উপর এই পাঠ রচনার ভার দেওয়া হয়। পূর্বে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই নাটকের যে দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, তা গৌড়দেশীয় সংস্করণ। ভূমিকায় বিদ্যাসাগর এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: "এদেশে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রচলিত পুস্তকের প্রচার নাই।...আমি কার্যবশতঃ গত ফাল্গুন মাসে বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরী নিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্রের সহিত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয় দয়া করিয়া, স্বীয় পুস্তকালয় হইতে আমায় তিনখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকৃতি দিয়াছিলেন। অনন্তর, কলিকাতা সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর উদ্যোগে, বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতেও দুইখানি মূল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকৃতি অবলম্বন-পূর্ব্বক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্করণকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।"

মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত 'হর্ষচরিতম্' গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরমবন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে একখানি পুস্তক দেখাইয়া কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রীনামে এক পণ্ডিত, পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায় আমার নিকট এই পুস্তকখানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্ট প্রণীত......। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইলাম।...কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।"

ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্ককে 'the first of the humanists' বলে অভিনন্দিত করা হয়, কারণ সিমণ্ড্স বলেছেন:

In the susceptibility to the *melodies of rhetorical prose,* . . . . in the passion for collecting manuscripts, and in the intuition that the future of scholarship depended upon the resuscitation of Greek studies, Petrarch initiated the . . . . most important momenta of the Classical renaissance.

যে কয়েকটি কারণে পেত্রার্ককে নবযুগের প্রথম হিউম্যানিস্ট বলা হয়েছে ঠিক সেই সব কারণেই বিদ্যাসাগরকে বাংলাদেশের 'প্রথম' না হলেও, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বলা যায়। বিদ্যাসাগরের "melodies of rhetorical prose" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়: "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"
পেত্রার্ক, বোকাচ্চো, এরেজমুজ, এদের পুথিপত্র পুনরনুসন্ধানের কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কারণ কাহিনীর গভীর তাৎপর্য জন্ অ্যাডলিংটন সিমণ্ডস, জেকব বুর্খার্ট, হুইজিঙ্গার মতন রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকরা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের রেনেসাঁসের যুগের ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়নি আজও, তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতন হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের দানের তাৎপর্য আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। 'হর্ষচরিতে'র পুথি পেয়ে বিদ্যাসাগর যখন বলেন: "কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম"—তখন আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনা, তাঁর এত আহ্লাদ ও আগ্রহের কারণ কি, তার প্রেরণাই বা কোথায়? আরও অবাক লাগে এইকথা ভেবে যখন মনে হয়, তিনি তো কেবল বিদ্যার সাধনায় ধ্যানস্থ হতে অথবা প্রাচীন পুথির সন্ধানে মত্ত হয়ে যেতে পারেন নি, ইয়োরোপের হিউম্যানিস্টদের মতন? এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ও সামাজিকপ্রথার ব্যাপক সংস্কারের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার রূপ দিয়েছেন। তার মধ্যে ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৌধনির্মাণের পরিকল্পনা ও উপকরণ-সংগ্রহ করেছেন। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগের কোন হিউম্যানিস্টের পক্ষে একাধারে এতগুলি কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়নি। হয়ত চারশ বছর আগে, তাঁদের কালে, তা পালন করা সম্ভবও ছিল না। তা না থাকলেও, বিদ্যাসাগরের পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিল, এদেশের এত সঙ্কীর্ণ সামাজিক পরিবেশে জন্মে, সেইটাই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়।

সাহিত্য কি তা না জানলে এবং সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ না দিলে, সাহিত্যিক রুচিবোধ জাগিয়ে না তুললে, সাহিত্য-রচনার বা সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা কল্পনা করা বৃথা। মধ্যযুগের অত্যধিক আধ্যাত্মিকতার ও নীতিকথার প্রভাবে সাহিত্যের এই রসাস্বাদন ব্যাহত হত। সাহিত্য, শিল্পকলা, সবকিছুর সৌন্দর্য ছিল আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তাদের নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল গৌণ। আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ তখন 'পাপ' বলে গণ্য হত। এই অবস্থায় সাহিত্যের নতুন ভিত-রচনা করতে হলে, সাহিত্যের আদর্শকে প্রথমে সকলের সামনে

তুলে ধরা দরকার। বিদ্যাসাগর কয়েকটি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-দর্শন এদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত করে, সেই প্রাথমিক কর্তব্য পালন করেছিলেন। "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে" সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করে, তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্ভারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রাদেশিক মাতৃভাষার সমৃদ্ধি এবং সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্যই যে বিশেষ করে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ও প্রাচীন সাহিত্যের সমুদ্র-মন্থনের প্রয়োজন, 'প্রস্তাবের' মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করতেও তিনি ভোলেন নি। কেবল ইঙ্গিত করে বা নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। ব্যাকরণের বিভীষিকা থেকে সংস্কৃত ভাষাকে তিনি মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ছাত্রজীবনে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে তাঁর নিজেরই যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তিনি ভোলেন নি। বাংলা মাতৃভাষায় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' রচনা করে তিনি দেবভাষার গোপন চাবিকাঠিটি সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এদেশের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এত গভীরভাবে চিন্তা করেও বিদ্যাসাগর নতুন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা বিস্মৃত হন নি। অসীম আগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাই থেকে নানাবিধ রত্ন আহরণ করে 'কথামালা' 'বোধোদয়' 'জীবনচরিত' 'চরিতাবলী' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। রচনাকালে নতুন বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দও তাঁকে সন্ধান ও সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সংস্কৃত শব্দও তিনি যথেষ্ট সংগ্রহ করেছিলেন বাংলাভাষার পরিপুষ্টির জন্য। কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্তে 'তদ্ভব' ও 'দেশজ' শব্দের প্রয়োগের দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর 'শব্দমঞ্জরী' ও 'শব্দসংগ্রহ' নামে দুটি অভিধানের পরিকল্পনা তার সাক্ষী। দুঃখের বিষয় দুটি অভিধানের একটিও তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ-পটুতা ও যুক্তিবিন্যাস-দক্ষতার বিস্ময়কর প্রকাশ হয়েছে। গভীর হৃদয়াবেগ ও মানবিক প্রেরণার স্পর্শে তাঁর সামাজিক আলোচনা ও সমালোচনাও অনেকক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত তাঁর পরিহাস-পটুতা, প্রখর বিদ্রূপ ও শ্লেষবোধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' জনসনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্যপ্রসঙ্গে বলেছেন: "জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জন্সনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন।" তারপর তিনি দুঃখ করে বলেছেন: "আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে বিদ্যাসাগরের বস্ওয়েল কেহ ছিল না।" বিদ্যাসাগরের সামাজিক রচনা, বাদ-প্রতিবাদ, উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি পড়তে পড়তে সত্যি মনে হয়, যিনি লেখনীতে এই বিদ্রূপ শ্লেষ ও পরিহাস ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, না-জানি মৌখিক ও বৈঠকী

আলাপ-আলোচনায় কি অজস্র ধারায় তার প্রকাশ হত। এই বিদ্রূপ ও শ্লেষের বিকাশ "ব্যক্তিত্বপ্রধান" সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। অর্থাৎ প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই সমাজে ও সাহিত্যে শ্লেষ পরিহাস ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিকাশ হয়েছে। জেকব বুর্খার্ট তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস-গ্রন্থে 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ' প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে মধ্যযুগেও হাসিতামাসা, বিদ্রূপ, শ্লেষ-রসিকতা সবই ছিল—'. . . but wit could not be an independent element in life till its appropriate victim, the *developed individual with personal pretensions,* had appeared.' মধ্যযুগেও শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কাব্য ছিল, কিন্তু সেই শ্লেষ বা বিদ্রূপের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বিশেষ হত না, কুলগত বৃত্তিগত বা জাতিগত অভিব্যক্তি হত। বুর্খার্ট বলেছেন : ৬

The middle ages are also rich in so-called satirical poems; the satire, however, is not personal, but is aimed at classes, professions, and whole populations, and it easily assumes the didactic tone.

নবযুগের সমাজে অহম্‌সর্বস্ব ব্যক্তির আবির্ভাব হল যখন, তখন তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপেরও পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। সাহিত্যেও তার প্রকাশ হল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত তার একটানা স্রোত বয়ে গেছে। এই বিদ্রূপের জোয়ারের মধ্যেই প্রথম বাংলা গল্প ও উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। প্রহসনের ভিতর দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যেরও বিকাশ হয়েছে। বাংলা আলোচনা-সাহিত্যেও যে তার তীব্র দ্যুতি কি ভাবে বিকীর্ণ হয়েছে, 'বিধবাবিবাহ' 'বহুবিবাহ' ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লক্ষনীয় হল, 'বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তকের' গোড়াতেই বিদ্যাসাগর এই নতুন ভঙ্গি ও লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন : "এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র-বিচারে এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।" কিন্তু অবগত হবার পর তিনি নিজে তাঁর পরবর্তী রচনাবলীতে, বিশেষ করে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি ছদ্মনামে রচিত গ্রন্থে, তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তিতে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা তাঁর সমকালীন গদ্য-রচনায় দুর্লভ। এই বাদ-প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে স্বভাবতঃই বাংলা গদ্যভাষা প্রচুর জীবনীশক্তি আহরণ করে, তাঁর হাতে সতেজ সচল ও সবল হয়ে উঠেছে এবং তার অসংযত ও অবিন্যস্ত রূপকে তিনি সংযত ও সুবিন্যস্ত করতে পেরেছেন। ‡

৬ J. Burckhardt. The Civlisation of the Renaissance in Italy : pp. 93—100

‡ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্‌যাপিত বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা। দ্বারভাঙ্গা হলঘরে ৩০ জুলাই, ১৯৫৭, মঙ্গলবার প্রদত্ত।

ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা

সোমেন বসু

ত্রিপুরার রাজবংশ স্মরণাতীত কাল থেকে রাজত্ব করে আসছেন। রাজত্বের আয়তন চিরকাল সমান ছিলোনা। কিন্তু অন্যান্য রাজ্য ও শক্তিগুলির সঙ্গে কখনো মৈত্রীভাব কখনো বৈরীভাব পোষণ করে ত্রিপুরার অধিপতিরা নিজেদের একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন পূর্বভারতের রাজনৈতিক তরঙ্গপ্রবাহের মধ্যে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পূর্বভারতের অন্যান্য শক্তি ও সভ্যতাগুলির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো। ত্রিপুরার পার্বত্য রাজদরবারে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি মধ্যযুগে ছিল কিনা বা থাকলে কতটা ছিল তা আজ সঠিক জানবার উপায় নেই। মহারাজ ধন্যমানিক্যের আমল থেকে 'রাজমালা' লেখানো হচ্ছে, মহারাজ রত্নমানিক্য বাংলা থেকে 'স্বকর্ণ'-পুঁথিলেখক নিয়ে গিয়েছিলেন একথা রাজমালাতেই আছে। রাজমালার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই এবং তা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় তা রাজমালা আলোচনা করলে দেখবো। তবু মহারাজ ধন্যমানিক্যের আমল থেকে যে সব মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে তার সবগুলিই বাংলা অক্ষরে লেখা, প্রাচীন শিলালিপিগুলিও সংস্কৃতে রচিত কিন্তু বাংলা হরফে লেখা।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, মহারাজ জগৎমানিক্যের আদেশে রচিত গ্রন্থ পাওয়া গেছে। সেই গ্রন্থগুলিতে কবি ও লেখকেরা স্পষ্টই বলেছেন যে রাজ অনুরোধে তাঁরা সাধারণ লোকের বোঝবার জন্য কাব্য লিখেছেন বাংলা ভাষায়। গোবিন্দমানিক্যের একটি তাম্রলিপি বাংলাতেই লেখা।

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখি এই প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করেছেন ত্রিপুরার নরপতিরা। সমস্তই বাংলায় লেখা, এবং যাবতীয় রাজকার্য বাংলা ভাষাতেই চলেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি পত্রে লিখেছেন। "Tripura has been a state which has been using Bengali as the language of administration for quite a long number of years. In fact the Tripura ruling house switched on to Bengali at least from the middle of 14th century. They have developed a very vigorous and beautiful style on Bengali for transacting state business.

শুধু মুদ্রা নয়, শুধু শিলালিপি নয়, শুধু আদেশ পত্র নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে রেভিনিউ ষ্টাম্প পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ছাপা হয়েছে। মহারাজ রাধাকিশোর এক সময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে ইংরাজীর প্রতি একটা বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি ঐ ইংরাজীয়ানার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি এক বিশেষ আদেশ জারী করে বাংলা ভাষাকে রাজকার্যের ব্যবহারের জন্য অত্যাবশ্যক করে তুললেন। তাঁর মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে যা বলেছিলেন তা মনে রাখবার মতো—"এখানে আবহমানকাল রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত

ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় এবং তৎপক্ষে বেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরঘোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

অবশ্য রাজ্যে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে রাধাকিশোর প্রথম নন। বীরচন্দ্র আইন করে বাংলা ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলেন। পার্বত্যজাতিসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচারের চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছিল।

মহারাজ রাজধরমাণিক্যের আমলের মুদ্রা বাংলা হরফে লেখা—"শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্যদেব শ্রীসত্যবতী মহাদেব্যৌ।"—এ মুদ্রার সময় ১৫০৮ শকাব্দ। বাংলা হরফে বাংলা ভাষায় অন্য কোন মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে তো জানি না। এ ছাড়া রাজাদের অনেক দানপত্র বাংলায় লেখা—১৬৭৩ খৃঃএ গোবিন্দমানিক্যের বাংলায় লেখা একটি দানপত্রের প্রতিলিপি নিম্নরূপ—

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষমসমরবিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামা...রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মৌজে পাঁচথুপি॥...ভূমি ব্রহ্মোত্তর কামদেব পণ্ডিত পাইছিল অথনে সেই ভূমি বেটা শ্রীজা...পণ্ডিতেরে দিলাম। প্রিতে ব্রহ্মোত্তর এইভূমি নিজ হাতে হালে চাষ করিঅ, সুখভোগ করৌক।...

কর্ণেল মহিম ঠাকুর তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা অক্ষরে লেখা গোবিন্দমাণিক্যের মোহর দেখলেন সেইদিনই আনন্দে অধীর হয়ে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে বাংলা ভাষা প্রচার সমিতির পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র থেকে সুরু করে মহারাজ বিক্রমচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত অসংখ্য রোবকারী বাংলা ভাষায় জারী করা হয়েছিল। সেই সবগুলি একত্র মুদ্রিত করতে পারলে দেখা যাবে যে বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে সরে থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যে এক অতি বলিষ্ঠ বাংলা গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা বাংলাভাষার প্রকাশ ক্ষমতা সম্বন্ধে আজও কোন সন্দেহ পোষণ করেন তাঁরা এই আদেশনামাগুলি ভাল করে অনুধাবন করলে উপকৃত হবেন। আরও লক্ষ্যণীয় এই যে এই বাংলা গদ্য ভঙ্গী যাঁরা সৃষ্ট করেছিলেন তাঁরা ছুৎমার্গবাদী ছিলেন না। তৎসম শব্দছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা চলবে না এই সংকীর্ণতা তাঁদের ছিলনা। তাঁরা স্বচ্ছন্দে খানদানী, দরমাহা, রোবকারী, ইস্তমেজাজ প্রভৃতি ফারসী শব্দ আর ট্রেজুরী রিপোর্ট, বজেট, কমিটি প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করেছেন।

আধুনিককালে ভারতবর্ষ হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করেছে। সে ভাষা নতুন করে রাজকার্যের উপযোগী করে গড়ে তুলতে গিয়ে উদ্যোক্তারা যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছেন তা অল্প নয়। প্রকাশের দিক থেকে, হিন্দী যে বাংলার চেয়ে দুর্বলতর এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামের দ্বারা বাংলাকে রাজভাষা বলে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু সেখানেও রাজকার্যের উপযোগী বাংলা ভাষা নতুন করে সৃষ্টি করতে হচ্ছে। সুনীতিবাবু তাঁর ঐচিঠিতে বলেছেন We are trying to establish a

kind of administrative or official Bengali and we are blundering onwards. So it is also being attempted for Hindi and other Indian Languages and East Pakistan will ere long be trying to do the same thing for Bengali. I think if the Tripura State could publish a comprehensive volume of the State documents showing how Bengali has actually been in administration, it will be of in estimable value for the entire Bengali people, whether of Pakistan or of India and for two administrations—that of West Bengal and that of East Bengal as in Pakistan.

ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাস স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে, কোন দিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুৎ না হন। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।'

রাজতন্ত্রের দিন অবসিত হবার পর যাঁদের হাতে ত্রিপুরার শাসনভার পড়েছে তাঁরা এই অমূল্য সম্পদের মূল্য বোঝেন নি। তাই সুনীতিকুমারের এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে কোন উৎসাহ দেখা দেয়নি। ত্রিপুরার স্বাধীনতার দিনে যাঁরা ত্রিপুরা শাসন করতেন তাঁরা যে সবাই সাধুপুরুষ ছিলেন তা নয় কিন্তু অনেকেরই দেশের জন্য সত্যকার আকর্ষণ ছিল। আর এখন যাঁরা ত্রিপুরার শাসকবর্গ তাঁরা হিন্দী প্রচারের জন্য যতটা উঠে পড়ে লেগেছেন তার কণামাত্র উৎসাহও ত্রিপুরার রাজভাষার নিদর্শনগুলি রক্ষা করার জন্য দেখান নি। বর্ত্তমান ত্রিপুরার সরকার এই সব রাজাদেশ-গুলি সংকলিত করে প্রকাশ করবেন সে আশা সুদূরপরাহত! বাংলা ভাষাকে যাঁরা ভালবাসেন, যাঁরা বাংলা ভাষার বিচিত্রতর প্রকাশভঙ্গী দেখে গর্ববোধ করেন তাঁদের জন্য কয়েকটা রোবকারী আমরা তুলে নিচ্ছি।

এই রোবকারীগুলি বিভিন্ন সময়ের। ১৮৬২ খৃঃএ মহারাজা ঈশান মাণিক্যের রোবকারী থেকে সুরু করে ১৯৪১ এ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পর্য্যন্ত আশী বছরের রাজাদেশ এইগুলি। বিভিন্ন ধরণের আদেশ আমরা উদ্ধৃত করছি যার ফলে পাঠক বুঝতে পারবেন রাজভাষা হিসাবে বাংলার প্রসার কত বিস্তৃত ছিল।

॥ ১ ॥ রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা

হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজস্ব ও জমিদারী শাসন বিষয়

কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ, ৺ইচ্ছাধীন কোন সময়ে প্রাণ-বিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই। এ মতেই এ পক্ষের খানদানের চিররীতি মতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সে মতে হুকুম হইল যে—

যুবরাজী পদে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্রঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথমপুত্র শ্রীল-শ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তাপদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্রঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিত্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীল শ্রীযুক্ত জজ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।

মোকাবিলা—শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন পেস্কার　শ্রীশ্রীসহী　মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত মোহরের

কারো কারো অভিমত এই রোবকারী আসল নয় জাল। সে তর্কে আপাততঃ আমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে জাল হলেও ঐ তারিখেই বা তার দুচার-দিনের মধ্যেই হয়েছে। সুতরাং এ রোবকারী যে আজ থেকে প্রায় পঁচানব্বুই বছর আগেকার বাংলাকে বহন করছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। ঈশানমাণিক্যের গুরু ঐ সময় রাজ্যপরিচালনা করতেন। তিনি নাম সই করতেন না "শ্রীশ্রীসহী" লিখতেন। তাঁরই স্বাক্ষর "শ্রীশ্রীসহী"।

॥ ২ ॥　　(Sd) B. C. Deb

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্বতীয় প্রদেশের কোন কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সে মতে—

হুকুম হইল যে,—

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘণক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।　(স্বাক্ষর) প্যারীমোহন রায় মুন্সী

॥ ৩ ॥　নং ১　(sd)　R. K. Deb Barman.

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ
যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ২৮শে অগ্রহায়ণ।

স্বাঃ গোপীকৃষ্ণ দেব

যেহেতু গতকল্য অপরাহ্ণ ৩ তিন ঘটিকার সময় পিতৃদেব ৺মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর

কলিকাতা মোকামে পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যাজ্য জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও রাজসী ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার হইয়াছি। এখন হইতে রাজসী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে এ পক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ইতি মং (স্বাঃ) শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী কেরাণী।

॥ ৪ ॥ মেমো নং ৩০ (sd) R. R. Deb Barman.

শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের ২২শে চৈত্রের প্রস্তাবানুসারে বোর্ডিং খোলা সাপক্ষে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত ঠাকুর বংশীয় বালকগণকে শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩৲ তিনটাকা হইতে ৬৲ ছয়টাকা পর্য্যন্ত ২৫টি বৃত্তির বাবত মং ১০০৲ একশত টাকা এ পক্ষের ২৪শে চৈত্রের আদেশ দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি ছাত্রগণের প্রত্যেক মাসে শিক্ষার উন্নতি, উপস্থিতির সংখ্যা এবং সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে। উপযুক্ততানুসারে বৃত্তি বণ্টন ও রহিত করিতে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অধিকার থাকিবে। অতএব আদেশ অবগতি ও আচরণার্থে ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি, হিসাব বিভাগ জেনারেল ট্রেজুরী ও শিক্ষা বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ২৭শে চৈত্র। মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। ক্লার্ক

॥ ৫ ॥ মেমো নং ৩২ (sd) R. K. Deb Barman

সংসার বিভাগের হিসাবাদি কাগজাত পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইতেছে যে রাজ্যের আয়ের তুলনায় সংসার বিভাগের ব্যয় নিতান্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখার এবং রাজ্যের ও রাজধানীর আবশ্যকীয় উন্নতিকার্য্যের জন্য সংসার বিভাগে যে সমস্ত অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকীয় ব্যয় আছে, তাহা রহিত করিয়া ১৩০৭ ত্রিং সনের বজেট প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারে এক্ষণ বার্ষিক যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হইতেছে, তন্মধ্যে অনাবশ্যকীয় ও অতিরিক্ত যে সকল ব্যয় আছে তাহা রহিত করিলে কোনরূপ অসুবিধা হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয়না। গৃহাদি প্রস্তুত ও ব্রতাদির ব্যয় ব্যতীত সঙ্গীয় ফর্দ্দের লিখিত মতে শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারী বার্ষিক ব্যয় মং ২১২৩।০ আনা হইলেই নির্ব্বাহ হইতে পারে; তত্রাচ শ্রীশ্রীমতীর বিশেষ সুবিধার জন্য উক্ত মঃ ২১২৩।০ আনার অতিরিক্ত আরও মং ৩৭৬৸০ আনা দিয়া বার্ষিক মং ২৫০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইল।

রাজপরিবারস্থ অপর সকলের বন্দান এ পক্ষের স্বাক্ষরিত সঙ্গীয় লিষ্ট অনুসারে করা হইল।

হুকুম হইল যে

অবগতি ও কার্য্যপরিচালনের জন্য এই মেমো ও দস্তখতি ফর্দ্দ সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের নিকট পাঠান যায় এবং এই নিয়মে বজেট প্রস্তুত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তাং ২রা বৈশাখ মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। ক্লার্ক।

॥ ৬ ॥ মেমো নং ৫২ (sd) R. K. Deb Barman

এতৎরাজ্যে জোলাই শ্রেণীর অনেক প্রজা থাকা জানা যায়। তাহাদের সংখ্যা, জাতি, নিবাস কাহার জোলাই এবং তাহাকে কত কর দিয়া থাকে, কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য হইলে কি কার্য্যের জোলাই, সরকারে কোনরূপ কর দেয় কিনা এবং তাহাদের সমশ্রেণীর অপর প্রজার করের হার কি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যক অতএব—আদেশ হইল যে

সত্বর উল্লিখিত বিবরণ সমূহ সংগ্রহক্রমে রিপোর্ট করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ।

মং (স্বাঃ) শ্রীরামকমল চক্রবর্ত্তী।

॥ ৭ ॥ মেমো নং ৫৮ (sd) R. K. Deb Barman

জানা যায় অত্র রাজধানী, সহরতলী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের কিয়তকাল যাবত জ্বর রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যাহাতে সর্বসাধারণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে সত্বর তাহার বিশেষ উপায় অবলম্বিত হওয়া এ পক্ষ বোধ করেন অতএব—আদেশ

সর্ব্বসাধারণের চিকিৎসার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা এবং তদুপলক্ষে কোন বিশেষ বন্দোবস্তের আবশ্যকতা হইলে তৎসম্বন্ধে ষ্টেইট ফিজিসিয়ানের মত গ্রহণান্তে প্রস্তাব উপস্থিত করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট পাঠানো যায় ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২২শে জ্যৈষ্ঠ

মং (স্বাঃ) শ্রীরামকমল চক্রবর্ত্তী।

॥ ৮ ॥ মেমো নং ৭ (sb) R. K. Deb Barman

সংবাদপত্র পাঠে এবং জনশ্রুতিতে জানা যায় কলিকাতা নগরে 'বিউবণিক প্রেগ' নামক মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা এবং উদ্যম, সত্বেও যখন এই ব্যাধি বোম্বাই অঞ্চল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত পহুঁচিয়াছে তখন ইহা অচিরে বঙ্গদেশর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া এ রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে। ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই এতৎ সম্বন্ধে যথোচিত উপায় এবং সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া একান্ত সঙ্গত বোধ হইতেছে। অতএব

আদেশ

যাহাতে উক্ত মহামারী এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে একান্ত প্রবেশ করিলেও যাহাতে উহা বিস্তৃত এবং সংক্রামক হইতে না পারে তাহার উপায় স্থিরীকরণ এবং এ পক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে তাহা কার্য্যে পরিণতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণদ্বারা একটি প্রেগ কমিটি গঠিত করা যায়। কমিটির সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি এবং আর একজনকে সম্পাদক মনোনীত করিতে পারিবে। আগামী ২৮শে বৈশাখ কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে। কমিটির প্রত্যেক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীর নকল এ পক্ষ সাক্ষাৎ প্রেরণ করিতে হইবে। অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি কমিটির সভ্যগণ নিকট এবং অবগতির কারণ সংস্থষ্ট অফিসহায়ে প্রেরিত হয় ইতি।

সন ১৩০৮ ত্রিং ২৫শে বৈশাখ মং (স্বাঃ) শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, কেরাণী।

কমিটির সভ্যগণের নাম

১। শ্রীরাজা মুকুন্দরাম রায় ২। শ্রীগোপীকৃষ্ণ ঠাকুর ৩। শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুর ৪। বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ৬। শ্রীবিপ্রচরণ নন্দী ৭। শ্রীকৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস ৮। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র ৯। শ্রীবঙ্কুবিহারী মিত্র ১০। শ্রীপরেশ নাথ মুখার্জ্জী ১১। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী ১২। শ্রীরামসুন্দর দে ব্যাপারী।

রোবকারী নং ৬ (sd) R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,
স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং ৫ই ভাদ্র

যেহেতু সদর জেইলের কয়েদী শ্রীরমনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীছৈনদ্দি জেইলে আগত হওয়ার অল্পকাল পর হইতে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং এইক্ষণ ষ্টেট ফিজিসিয়ানের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে তাহাদের জীবন সন্দিগ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত কয়েদীদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত সেমতে। হুকুম হইল যে

উল্লিখিত রমনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীছৈনদ্দি কয়েদীদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া যায়। এই আদেশ অগোণে কার্য্যে পরিণত হয়। মং (স্বাঃ) শ্রীমহেশচন্দ্র ভৌমিক।

॥ ১০ ॥ ৭নং (sd) R, K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং তারিখ ৫ই ভাদ্র

যেহেতু রাজপরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অথবা শ্রীপাটের কেহ কাহারও নিকট হইতে কর্জ্জ করিলে টাকা উশুলের কার্য্যে নানারূপ অসুবিধার বিষয় ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ এ পক্ষের বিনানুমতিতে রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহ টাকা ধার কর্জ্জ লওয়া এ পক্ষের একেবারেই অভিপ্রেত নহে, অতএব— আদেশ হইল যে

এ পক্ষের অনুমতি ভিন্ন রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহই টাকা কর্জ করিতে পারিবেন না এবং কাহারও পক্ষে তাঁহাদিগকে কর্জ্জ এবং জিনিষাদি ধার দেওয়াও সঙ্গত হইবে না এবং তদ্রূপ করিলে তাহার নালিশ এ পক্ষের গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ উজীর নিকট পাঠানো যায়। ইতি মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। হেডক্লার্ক

॥ ১১ ॥ মেমো নং ১৪ (sd) R. K. Deb

যেহেতু শ্রীমান যুবরাজের শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে বার্ষিক বন্ধন নির্দ্দিষ্ট থাকা সঙ্গত অতএব আদেশ হইল যে শ্রীমান যুবরাজের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যয় বাবত বার্ষিক ২৫০০০৲ হাজার টাকা মঞ্জুর করা গেল। এই হারে বর্ত্তমান বৎসরের পৌষ মাস হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্যয় চলিবে। কোন মতেই মঞ্জুরীকৃত

টাকার অতিক্রম করা সঙ্গত হইবে না। কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই কাগজ মন্ত্রী অফিসে পাঠান যায়। ইতি ১৩১১ ত্রিং ২রা ফাগুন মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। হেডক্লার্ক

॥ ১২ ॥ মেমো নং ৭ (sd) R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,

রাজধানী আগরতলা ইতি সন ১৩১২ ত্রিং তাং ২১শে আশ্বিন

যেহেতু পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমার বিচারে সেসন আদালত কর্ত্তৃক ১নং বিবাদীর প্রাণদণ্ডের এবং ২নং বিবাদীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হওয়ায় বিবাদীদ্বয় খাস আপীল দায়ের করিয়াছে এবং বর্ত্তমান শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে প্রোক্ত খাস আপীল আদালতের জনৈক বিচারপতি শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় পীড়া প্রযুক্ত কার্য করিতে অক্ষম বিধায় এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্য সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করার জন্য খাস আপীল আদালত হইতে ইস্তমেজাজ আগত হইয়াছে, অতএব আদেশ

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে মদন মোহন লস্কর হেড কং বাদী-১নং ছেয়াদালী ২তং গামরদী বিবাদী মোং জ্ঞানকৃত বধ

শ্রীযুত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর স্থায়ী বিচারপতি শ্রীযুক্ত দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, র সহিত নথী আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবে। অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি সংস্পৃষ্ট আদালত ও ব্যক্তিগণ নিকটে পাঠান যায়; মং (স্বাঃ) শ্রীমনোমোহন চৌধুরী ক্লার্ক।

॥ ১৩ ॥ মেমো নং ১৫ (sd) B. Manikya

এ পক্ষের ১৩১৯ ত্রিং ২৩শে কাত্তিকের রোবকারির অনুস্থিতিতে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ মন্ত্রীর তন্‌খা ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করা গেল উক্ত তনখা গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে তিনি পাইবেন। ইতি ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ২৮শে পৌষ।

॥ ১৪ ॥ মেমো নং ৯ (sd) B. K. Manikya 7. 1. 22.

ঠাকুর লোকের মাধ্যে যাহারা কারবার কিংবা অন্য কোন ব্যবসায়ক্ষম এবং যাহারা কারবার করে তাহাদিগকে সংসার আফিস হইতে দরমাহা দেওয়া সঙ্গত নহে, ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব আদেশ হইল যে

ঐ প্রকার লোকের দরমাহা বন্ধ করা যায়, ইতি ১৩২২ ত্রিং তারিখ ৭ই বৈশাখ। মং (স্বাঃ) শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, পার্সনেল ক্লার্ক।

॥ ১৫ ॥ রোবকারী নং ৮ (sd) B. K. Manikya 22. 11. 28

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩২৮ ত্রিং ২২শ ফাল্গুন

যেহেতু শ্রীল শ্রীমান যুবরাজের শুভ উপনয়নোপলক্ষে নিম্নলিখিত ৫ পাঁচজন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর যাবজ্জীবন (২০ বৎসর) কারাদণ্ড ভোগের স্থলে তদর্দ্ধেক (১০ দশ বৎসর) কমাইয়া দেওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। অতএব—আদেশ হইল যে

নিম্নলিখিত পাঁচজন কয়েদীকে অত্র মুক্তি দেওয়া যায় এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর কারাদণ্ড ভোগের ২০ বৎসর ভোগের মধ্যে দশ বৎসর মাপ দেওয়া যায়, অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই রোবকারীর প্রতিলিপি চীফ দেওয়ান সমীপে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩২৮ ত্রিং ২২শে ফাল্গুন মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী পেস্কার

১। সোনারাম মালী ২। হরিরায় ত্রিপুরা ৩। আবদুল রহিম কাজি ৪। এতিম আলি ৫। গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

। ১৬ ॥ মেমো নং ৮

দরবারে একই প্রকারের নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহৃত হওয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের অভিপ্রেত; অতএব সকল দরবারীদেরই কাল আচকান, সাদা চুড়িদার পায়জামা, সাদা পাগড়ী ও মোজা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হইবে। এবম্প্রকারের পোষাক গার্ডেন পার্টি' এবং অন্যান্য ষ্টেট সংক্রান্ত সমারোহের কার্যস্থলেও ব্যবহৃত হইবে; কেবল মিলিটেরী এবং পুলিশ কর্মচারী প্রভৃতির স্ব স্ব ইউনিফর্ম ব্যবহার্য্য। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমো শ্রীযুক্ত চিফ দেওয়ান মহোদয় বরাবরে পাঠান যায়। ইতি

by order

22, 2. 18 (sd) Rana Bodhjung

Private Secretary

॥ ১৭ ॥ (sd) B. K. Manikya 2. 9. 29

যেহেতু মহামান্বিত ভারত সরকারে প্রতিকূলে আফগানিস্থানের আমীর কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া এ পক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে; অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ করা যায় যে এ রাজ্যে কোন আফগান প্রজা বা আফগানিস্থানের অধিবাসী সাময়িকরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে দৃষ্টাধীনে রাখিতে হইবে অতঃপর এরূপ ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ তৎপরতার সহিত রেজেষ্টরী করতঃ তদীয় গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ত্রিং ২৯শে বৈশাখ মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী পেস্কার।

॥ ১৮ ॥ মেমো নং ৬ (sd) B. K. Manikya 7. 8. 29.

বিগত পরশ্ব দিবস দেওয়ান শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরী কাছারীর সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে মারিয়াছে। অন্য যে কোন পন্থাবলম্বনে শাস্তি করার প্রয়াসী না হইয়া ব্রাহ্মণকে রাগান্ধ হইয়া এরূপভাবে উর্দ্ধতন কার্যকারকের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত কার্য করা হইয়াছে। অতএব আদেশ হইল যে,

দেওয়ান শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরীকে উল্লিখিত গর্হিত কার্যের দরুণ একমাসের জন্য সসপেণ্ড. করা যায়। কার্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ত্রিং তারিখ ২ই অগ্রহায়ণ মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী পেস্কার।

॥ ১৯ ॥ মেমো নং ১ (sd) B. K. Maniky 29. 2. 33

শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী শশীমোহন দেববর্ম্মার পক্ষে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন :—

ললিতলতিকা দেবীর আবেদন ও চীফ সেক্রেটারীর মন্তব্য আলোচিত হইল।

দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহার পিতার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সরকারী কার্যোপলক্ষে শোচনীয় মৃত্যুর বিষয়ে স্মরণ করিয়া আমি তাহাকে মার্জনা করিলাম। অতঃপর শশীমোহন দেববর্ম্মা সদর ম্যাজিষ্ট্রে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া কারামুক্ত হইবে। ইহার বিরুদ্ধে আর ফৌজদারী মোকদ্দমা স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। মোট তছরূপি টাকার পরিমাণ, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন কর্মচারীর দায়িত্ব ও আদায়ের উপায় সম্বন্ধে, রাজমন্ত্রী মন্তব্য উপস্থিত করিবেন। ইতি সন ১৩৪৩ ত্রিং তারিখ ১৯ জ্যৈষ্ঠ মং (স্বাঃ) দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, পার্সনেল ক্লার্ক।

॥ ২০ ॥ নং ২৫২ পদ্মমোহর স্বাঃ শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

দরবার-বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্তু বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী। ইতি

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত ;—

যেহেতু মর্ত্যদেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ মর্ত্যোঽহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম' ঋষিরা কাব্যে ভিতর দিয়া ভগবদসত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃপ্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায় তিনিই তরুণ রবিকে রাজ অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এপক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্যে রত হইবার গৌরবলাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর রাজের কর্ত্তব্য "জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্‌হৃদয়ান্ধকারম।"— অতএব

এই উৎসব চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত
কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে
"ভারত-ভাস্কর"
আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—
এবং
শ্রীভগবান তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে
শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

ভারতে জাতীয়তাবোধ উন্মেষণায়—ভগিনী নিবেদিতা

চিত্তরঞ্জন পাল

রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছেন লোকমাতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে তাঁর দানের সম্যক আলোচনা হয়নি আজও। যে বিদেশিনী মহিলা ভারত বাসীর সেবা ও কল্যাণকামনায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিলুপ্ত থেকে অত্যধিক পরিশ্রমে অকালে তনুত্যাগ করলেন ভারতেরই মাটিতে, তাঁর স্মৃতির প্রতি ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরি-শোধনীয়। পঞ্চাশ বছর চলে গেল। ভগিনীর উপযুক্ত মর্যাদা কতটুকু দিতে পেরেছি আমরা? বাগবাজারের নিবেদিতা লেন, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, দার্জিলিংয়ের অতি-সাধারণ স্মৃতি-সৌধ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক আধখানা কেতাবে তাঁর জীবনের তথ্যবিবৃতি। ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষণায় তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রেরণার মূল্য পর্যালোচিত হলনা উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে। শ্রীঅরবিন্দের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজনৈতিক জীবনের যিনি নেপথ্য প্রেরণা, তাঁর কোন পরিচয় মেলেনা পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে প্রকাশিত Sri Aravindo on Himself বইয়ে। শ্রীমনি বাগচীর "ভগিনী নিবেদিতা" কিছুটা ঋণশোধ। "যেমনি হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত কথা আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে; মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।" রবীন্দ্রনাথের মত মহামানব এমন অনুপম ভাষায় যাঁর মহিমা প্রকাশ করেছেন তাঁর জীবন-সাধনার আলোচনা জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আলোচনার প্রাক্কালে স্মরণ করি নিবেদিতার অকাল মৃত্যুতে টাউন হলের শোকসভায় সভাপতি রাসবিহারী ঘোষের আবেগ কম্পিত ভাষণ—"নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলিতে আমার বাধে। আমার তো মনে হয় তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেবায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম।......যদি কোন ফুলের সহিত নিবেদিতার অন্তরের সৌন্দর্যের তুলনা দিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে যে ফুলটির নাম আমার মনে আসে তাহা হইল শ্বেত-পদ্ম। শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র ও পবিত্র ছিল তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি। তিনি পবিত্রতার মতই পবিত্র—যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। আমাদের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্মীয়ারূপে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ভারতের পুনরুত্থানের ইতিহাসে নিবেদিতা নামটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"—সেই ইতিহাস জানবার আগে নিবেদিতার জন্ম, পরিবেশ, আদর্শ ও ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য জানা দরকার।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আলস্টার সহরে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে মার্গারেটের জন্ম ১৮৬১ সালের ২৮শে অক্টোবর। আইরিশ মুক্তি সংগ্রামের একাধিক বিপ্লবী মহানায়কের জন্মদাতা এই সহর। মার্গারেটের পিতামহ রেভারণ্ড নোবলও এমনি একজন জাতীয়তাবাদী বীর। বৈপ্লবিক মনোভাব ও সুগভীর দেশাত্মবোধ তাই মার্গারেটের গৌরবময় উত্তরাধিকার। মাতার

প্রথম সন্তান তিনি, জন্মের আগে দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন জননী ইসাবেল "প্রভু, আমার সন্তান যদি নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয়, দেবতার পায়ে নিবেদন করব তাকে।" সে প্রার্থনা সার্থক হয়েছে নিবেদিতার জীবনে। পিতার সংগে তিনিও যোগ দিলেন আইরিশ মুক্তি সংগ্রামে। নেতা পার্নেল ও মাইকেল ডেভিড। হোমরুল দাবির সেই বহ্নিগর্ভ আন্দোলনের মধ্যাহ্নে ছাত্রীজীবন শেষ করে মার্গারেট লণ্ডনে এলেন শিক্ষকতার ব্রত নিয়ে। সিসেম ক্লাব নামক প্রগতিশীল সংস্থা কর্তৃক সগ্ন-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের তিনি হলেন অধ্যক্ষ। দেশসেবাও চলল একই তালে। পরিচয় হল জার-রাশিয়ার নামকরা সন্ত্রাসবাদী নেতা ক্রোপোটকিনের সংগে: সশস্ত্র বিপ্লবের পথে তিনি দেখলেন দেশের মুক্তির ইংগিত। মনে পড়ল পার্নেলের বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা—"আমরা এমন একটি সরকারের সংগে লড়াই করছি যে কেবল একটি মাত্র যুক্তি বোঝে—ক্ষমতার যুক্তি।" সশস্ত্র বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে উঠল সারা আয়ার্ল্যাণ্ডে। মার্গারেট ডুবে গেলেন দেশের কাজে। এমন সময় বিরাট পরিবর্তনের ডাক এল তাঁর কানে।

বিবেকানন্দ বলেছেন "Nivedita is the fairest flower of my work in England" বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সংগে জাত-বিপ্লবীর এই মিলন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আধ্যাত্মিকতা এ মিলনের গৌণ কারণ। বিবেকানন্দের সেবাধর্ম ও মানবপ্রেমের আদর্শই মোড় ঘুরিয়ে দেয় মার্গারেটের চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শের। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র সার্থকতার সন্ধান পায় বিশ্বমানবতাবাদে।

রামকৃষ্ণের মত—যত্র জীব, তত্র শিব। যত পথ, তত মত। সব পথের শেষে একই সিদ্ধি। সমন্বয়ের সাধক তিনি। বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য। বিবেকানন্দ বীর্যবান সন্ন্যাসী। দেশের মুক্তি ও মানুষের দুঃখ মোচনই তাঁর সন্ন্যাসধর্মের আদর্শ। নব্য বাংলাকে সমাজবাদে দীক্ষাদান এই বীর ধর্মপ্রচারকের প্রধানতম কীর্তি। ভারতের মুক্তি তাঁর জপের মন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম যেমন বাংলা দেশে দুকুলভাসানো ভাবের বন্যা এনেছিল, বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও তেমনি তন্দ্রাতুর জাতিকে উদ্বুদ্ধ করল বিপ্লবের বহ্নিমান চেতনায়। রোমাঁ রলাঁ কথাটি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—

The Indian Nationalist movement smouldered for a long time until Vivekananda's breath blew the ashes into flame and erupted violently three years after his death in 1905. It is an undoubted fact that the Neo-Vedanticism of Vivekananda materially contributed to this evolution.

[Prophets of New India, P-497]

বাংলার বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী দেশবাসীর সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ছিল এই সব অকুতোভয় বীরের সঞ্জীবনী মন্ত্র। তাঁর লেখা ছিল মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকদের অবশ্য পাঠ্য। বাংলার বিপ্লববাদের মুখপাত্র হিসাবে হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি লিখেছিলেন—

"Man-making is my mission of life, Hemchandra. You try with your comrades to transtate this mission of mine into action and reality. Read Bankimchandra and emulate his Desha-Bhaki and Sanatana Dharma. Your duty should be service to the motherland. India should be freed politically first.

(Vivekananda : Patriot-prophet, P-304, By Dr. B. N. Datta).

দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত-আত্মা সুপ্ত আছে দরিদ্রের কুটীরে—The only hope of India from the masses. The upper classes are physically and morally dead. জনসেবা ও জনজাগরণ তাঁর জীবনের ব্রত। বিদেশী শাসন ও শোষণে দেশবাসীর একমাত্র অবলম্বন ছিল ধর্ম। বিবেকানন্দ তাদের চেতনার রাজ্যে মোহমুক্তির জোয়ার আনতে চাইলেন আধ্যাত্মিকতার পথে। তাঁর মানবপ্রেম-মূলক ধর্ম যুগধর্মেরই প্রতিফলন। বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবনের পতাকাবাহী নিবেদিতা।

লণ্ডনে স্বামীজির বক্তৃতা ও আলোচনা শুনে মুগ্ধ হন মার্গারেট। বোধিসত্ত্বের মত জগতের শেষ ধূলিকণাটির মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করার আকূতি জাগল তাঁর মনে। জগতের হিতে সেবাধর্মে দীক্ষিত হলেন তিনি। বিবেকানন্দ লিখলেন—"আমার আদর্শ দুকথায় বলা যায়। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে সমাজে তা প্রকাশ করা এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই দেবত্ব কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা।...বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন, অসার। জগতে এখন চরিত্র বলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব মানুষ চায় যাদের জীবন জ্বলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ সেই প্রেমের শক্তিতে উচ্চারিত বাক্য বজ্রের মত কাজ করবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে তোমার মন সব সংস্কার-মুক্ত। তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে যা পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে। এমনি আরও অনেক মানুষ আসবে। আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় পুড়ে মরছে। তোমার ঘুমানোর অবসর কোথায়। গুরুর বাণী নাড়া দিল মার্গারেটকে—মানুষের হিতব্রতই হল তাঁর বাকী জীবনের ধ্রুবনক্ষত্র।

ভারতে এলেন তিনি। স্যামুয়েল রিচমণ্ডের মেয়ে মার্গারেট বিবেকানন্দের সৃষ্টিতে রূপান্তরিতা হলেন ভগিনী নিবেদিতায়। তারিখ ২৫শে মার্চ, ১৮৯৮। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু স্বয়ং বিবেকানন্দ। গুরুর মন্ত্রে তিনি হলেন তাপসী অপর্ণা—"আমার জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ তোমাকে নিয়ে একথা মনে রেখে কায়মনোবাক্যে ভারতের সেবায় নিজেকে সার্থক ও সুন্দর করে সম্পূর্ণ করে তোলো। তোমার জপের মন্ত্র অন্য কিছু নয়, শুধু "ভারত" "ভারত"। নিবেদিতার মনে পড়ে গুরুদেবের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা—"আমার কথা ধরিতে গেলে আমি স্বদেশবাসিগণের উন্নতিকল্পে যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে দুইশত বার জন্ম-পরিগ্রহ করিব।" গুরুর ঘোষণা বার বার মনে পড়ে নিবেদিতার—"যে ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরা রুটি দিতে পারেন না, তিনি পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা।" গুরুর নির্দ্দেশে সর্বতোভাবে ভারতীয় হবার সাধনা চলল নিবেদিতার। বিবেকানন্দের সঙ্গে সারা ভারত ঘুরলেন তিনি। তাঁর সেই আত্মদানমূলক তপস্যা সম্পর্কে সমালোচক-প্রবর মোহিতলালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"নিবেদিতার আত্ম-বিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন

এবং বয়োধর্ম্মে এমনই দৃঢ় এবং দুশ্চেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হবার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে! ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর গ্রহণকে কে কোথায় দেখিয়াছে?" এই অসম্ভবকে সম্ভব করাই নিবেদিতা চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই রহস্যসূত্রে নিবেদিতার গৌরবোজ্জল ভারত-সেবার ইতিহাস বিধৃত। এ কথা স্পষ্টভাবে জানা না থাকলে বোঝা যায় না নিবেদিতাকে।

১৮৯৮ সালে কোলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় জনসেবায় নিবেদিতার প্রথম হাতেখড়ি। নিজের হাতে বাগবাজারের নোংরা গলির ময়লা সাফ করা, চাঁদা আদায় করা, অন্যদের দুর্গতদের সেবায় উদ্বুদ্ধ করা, দেশব্যাপী প্রেরণা সৃষ্টি করা তাঁর ভারত সেবার প্রথম অধ্যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার স্বীকার করেছেন—"ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে আমি একটি জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি; তাহা হইল আত্মমর্যাদাবোধ। আমাকে ইতিহাস গবেষণার কার্যে প্রেরণা দেবার কালে তিনি আমাকে বলিয়াছেন—Never lower your flag to a foreigner. তাঁহার এই উপদেশ আমি জীবনে ভুলি নাই।" শুধু আচার্য যদুনাথ নন, তৎকালীন বাংলার বহু যুগন্ধর পুরুষকেই তিনি আত্মমর্যাদাবোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট মেয়েকে ইংরাজী শিখাবার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে গেলে নিবেদিতা প্রশ্ন করেন—"সে কী, ঠাকুর বাড়ীর মেয়েকে বিলিতি মেম বানাবেন?" "ইংরাজী ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফৎ যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষা।" "কিন্তু বাইরে থেকে কোন একটা জিনিষ মিলিয়ে দিয়ে লাভ কী? বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করিনা।" সেদিন নিবেদিতার উক্তির কোন প্রতিবাদ করেননি পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীয়ানা তারপর ক্ষুরধার সমালোচনা করেছে ভারতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার। নিবেদিতার সুমধুর চরিত্রের দীপ্ত-সমুন্নত মহিমা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনুপম ভারত-প্রেম কবিকে এতখানি মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল যে তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'র মূলচরিত্রের পরিকল্পনায় ছায়াপাত হয়েছে নিবেদিতা-চরিত্রের। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রণেতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা স্পন্দিত হইয়াছিল। গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাওয়া যায়। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশ-ম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন।" ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নিবেদিতার ভারতীয়ত্ব নিখাদ। ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসায় তাঁর হৃদয় কাণায় কাণায় ভরা। রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে ভ্রমণকালে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল দেশের সাধারণ মানুষ ও তাদের অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা। তাদের রান্নাঘর, ঢেঁকিশালা, গোয়াল ঘর সব কিছুতেই তাঁর সমান আনন্দ। সেকেলে কাঁথা দোলাই, কুলো-ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ ইত্যাদি পল্লী ও কুটীরশিল্পের অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি বিমুগ্ধ। বাংলার মন্দিরে মন্দিরে কাসর ঘণ্টার ধ্বনি, শান্ত অংগনে তুলসীতলার সন্ধ্যাদীপের আলো, নোতুন ধানের স্বর্ণ মঞ্জরীতে কৃষাণীর আন্দোলিত কামনা—সবই তাঁর চোখে সুন্দর। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঙালী দেশের জিনিষে যে সৌন্দর্য

দেখতে ভুলে গিয়েছিল, নিবেদিতার রসজ্ঞান আবার তা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিল।" ভারত-শিল্পের-যুগান্তর-সাধনে নিবেদিতার দান তাই সসম্মানে উল্লেখযোগ্য।

ভারত-প্রেমিক ম্যাকস্‌মূলার ছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম অনুরাগী। এতবড় জার্মাণ মনীষীও একবার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, ভারতবাসী never excelled either sculpture or in painting. উক্তিটি ঐতিহাসিক সত্য না হলেও সাময়িক সত্য বটে। এবং সেই কারণের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্ট স্মিথ Imperial Gazetter এ সদর্পে লিখেছিলেন After 300 A. D. Indian sculpture properly so-called hardly deverses to reckoned as art. অজন্তা, ইলোরা, তাজমহল, কুতুবমিনার ইত্যাদিতে ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার কালজয়ী স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান থাকা সত্বেও বিদেশীর মুখে এই কুৎসাবাদ কেন? কারণটি দুর্বোধ্য নয়। ভারত-শিল্পের প্রাচীন ধারা স্তব্ধ-প্রায় হয়ে আসে ১৯শ শতকের মধ্যভাগে। প্রাক্ ইংরাজ যুগের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ইংরাজ আমলের পরবশতায় দেশীয় শিল্পের চর্চা এক রকম বন্ধ হয়ে আসে উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে। বিলাতী নীরেস শিল্পের মোহ পরিধান ও রাজানুগ্রহকামী মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন, আক্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত করে তোলে যে দেশীয় ললিতকলার গৌরবময় ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে বিদেশে তৃতীয়শ্রেণীর শিল্পের অন্ধস্তাবক ও অনুরাগীভক্ত হয়ে পড়েন তথাকথিত রসিকদল। চিত্তবৃত্তির দীনতা ও সৃষ্টির অকিঞ্চিৎকরতা এমন স্তরে পৌঁছায় যেখানে স্বদেশীয়ানা অপরাধ। ভারত-শিল্পকে এই বন্ধ্যাত্বের কবল থেকে মুক্ত করে মহত্তর মহিমায় মণ্ডিত করেন অবনীন্দ্রনাথ। ভারত-শিল্পের এই নব জাগরণের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। হ্যাভেল উড্‌রফ্, টমসন ইত্যাদির তুলনায় নিবেদিতার কাছে ভারতবাসীর ঋণ বেশী।

অনুকরণের মায়াজাল থেকে ছাড়িয়ে এনে শিল্পীর রসদৃষ্টিকে তিনি নিবদ্ধ করালেন দেশের দিকে। শিখিয়ে দিলেন জাতির অগ্রগতির অভিযানে শিল্পের সহায়তা কত দরকার, শিল্পীর দায়িত্ব কত বিরাট। লেখনী তুলে নিলেন ভারত-শিল্পের প্রচারে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রাবলী। নিবেদিতার লেখা চিত্র-পরিচিতির বাংলা অনুবাদ করতেন রামানন্দবাবু স্বয়ং। নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে তিনিই পাঠালেন অজন্তায়। জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে এবং বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে স্বদেশী ধারার ছবি আঁকলেন নন্দলাল। অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতা" চিত্রের প্রেরণা যে স্বদেশী আন্দোলন তার অগ্রনায়িকা নিবেদিতা। তাঁরই উৎসাহ-দানের ফলে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা নবযুগ আনলেন ভারত-শিল্পে। তাঁরই প্রেরণায় আনন্দ কুমারস্বামী এগিয়ে এলেন সেই শিল্পের মহিমা-প্রচারে। নিবেদিতা না থাকলে সেদিন যেমন অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা ব্যর্থ হবার আশঙ্কা ছিল তেমনি হয়তো শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতেন না কুমারস্বামীর মত রসজ্ঞ ব্যক্তি। ডাঃ কুমারস্বামী লিখেছেন—"নানা প্রবন্ধ-পুস্তকাদির ভিতর দিয়া নিবেদিতা শুধু পাশ্চাত্য জগতের নিকটে ভারতের মুখপাত্রী হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এক অভিনব ছাত্রগোষ্ঠিকে যাহারা ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয় আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল।"

অসিতবাবু লিখেছেন—"আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাধবান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্‌সে যোগ না দিই। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নব জাগরণ নির্ভর করছে, সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে বড় কাজ—সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।" ভারত-শিল্পের এই যুগান্তর একটি মামুলী শিল্প-আন্দোলন নয়। প্যারিসের শিল্প মেলায় অবনীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি একটি পরাধীন জাতির নবতর আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-প্রত্যয়ের সোচ্চার স্বীকৃতি। আর কোন কারণ না হোক, এই একটি মাত্র কারণে নিবেদিতার কাছে ভারতবাসী চিরঋণী।

২৩শে অক্টোবর, ১৯০০ সাল। প্যারিসে বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের মেলা। প্রতিভার বিজলী-ছটায় দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন দেশের প্রতিটি বিজ্ঞান-সাধক। বিবেকানন্দের পাশে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা দেখলেন জগদীশচন্দ্র বসুকে। বাঙালী বিজ্ঞানীর কৃতিত্বে বিবেকানন্দ উল্লাসে আত্মহারা—নিবেদিতা বিস্ময়-বিমুগ্ধ! "এক যুবা বাঙালী বৈজ্ঞানিক আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্যকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় জগদীশ বসু ভারতবাসী, বঙ্গবাসী।" স্বল্পভাষী, নিঃসঙ্গ, খ্যাতি লোভহীন এই বৈজ্ঞানিকের সারা জীবনের শুভার্থিনী ও প্রেরণা-দাত্রী ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতার ভারতানুরাগে জগদীশচন্দ্রের পরম আনন্দ। পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠল একটি অতি-মধুর সম্পর্ক। জগদীশচন্দ্রের আবাসে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলরতন সরকার, রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত ইত্যাদি দিকপালদের। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় নিবেদিতার অবিচল আস্থা। প্রেসিডেন্সী কলেজে কালা চামড়ার অপরাধে কম-বেতন-পাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁর বেতন-না নেওয়া সংগ্রামে নিবেদিতার সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি প্রেরণা দিয়ে সঞ্জীবিত করেছে তাঁকে। বিজ্ঞানীর সমস্ত আবিষ্কারের পাণ্ডুলিপি সযত্নে স্বহস্তে প্রস্তুত করতেন তিনি। আচার্য বসুর 'উদ্ভিদের সাড়া' বইয়ে তার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে সেকথা জানাতে গিয়ে আচার্য লিখেছেন' "শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় লইতাম।" জড়ের জীবনে চৈতন্যকে আবিষ্কার করাই ছিল জগদীশচন্দ্রের সাধনা। বিদেশীর অনাদর ও দেশবাসীর অজ্ঞানতা-প্রসূত বিরোধিতা মন ভেঙে দিত তাঁর। সংবাদ-পত্রে প্রচারের ব্যবস্থা করে, জনসভায় অভিনন্দিত করে বিজ্ঞানীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন নিবেদিতা এবং সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই সাধনাকে পৌঁছে দেন সিদ্ধিতে। নিবেদিতার মৃত্যুর পর বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন বক্তৃতায় সেই মহিয়সী মহিলার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র "আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহিয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি। এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে কত উৎসাহ ছিল তাহা একমাত্র আমিই জানি।" বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষে খোদিত নিবেদিতার পরম প্রিয় বজ্রচিহ্ন এবং দ্বারদেশে পূজারিনী মূর্তি তাঁর স্মৃতি পূজায় বিজ্ঞানীর নীরব প্রণতি।

নিবেদিতা বিবেকানন্দের রাজনৈতিক জীবন। স্বামীজির মানব-প্রেম ও দেশমুক্তির আদর্শের তিনিই উত্তর-সাধিকা। নিবেদিতা বলতেন—"আমার ব্রত এই জাতিকে জাগ্রত করা।" গুরুদেবের তিরোধানের পর তিনি ঝাঁপ দিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে। তাঁরই প্রেরণায় গড়ে উঠল বিপ্লবী দল, প্রকাশিত হল যুগান্তর পত্রিকা। ভারতের যুব সমাজ জেগে উঠল তাঁর বক্তৃতার আগুনে। ১৭ বোসপাড়া লেন হল সারা ভারতের বিপ্লবীদের মহাতীর্থ। বরোদার অধ্যাপক অরবিন্দকে তিনি আহ্বান জানালেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে। জানালেন তিনি অরবিন্দের পাশেই থাকবেন—"বিপ্লব জন্ম নিতে চলেছে। বাংলা দেশে এর সূচনা দেখে এসেছি। এখন দরকার নেতার। গুরুজীর নামে শপথ করছি আমি আপনার পাশেই দাঁড়াব। আপনি যা চান আমিও তাই চাই। গৈরিকবাস আমার ছদ্মবেশ।" রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ পুলিশের উপদ্রবে এবং বিপ্লবী মতবাদের জন্যে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলেন নিবেদিতার সংগে! নিবেদিতাকে তাঁরা ক্ষমা করেননি কোনদিন। হোলি মাদারের সেন্টিনারীতে তুমুল হৈচৈ হলেও নিবেদিতার একখানা ভাল ছবি বাজারে বিক্রী করার গরজ বোধ করেন না তাঁরা।

দাবানলের মত বিপ্লবের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়। আন্দোলন এগিয়ে যাবার পথ নিল পিঃ মিত্র, অরবিন্দ, নিবেদিতা ইত্যাদির নেতৃত্বে। কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশন-বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে বললেন "মিথ্যাবাদী ও অত্যুক্তিপরায়ণ।" অপমান ও ঘৃণায় লাল হয়ে উঠল দেশের মুখ। নিবেদিতার প্ররোচনায় স্যার গুরুদাসের লেখা প্রতিবাদ ছাপা হল অমৃতবাজার পত্রিকায়। ঐ একই দিনে নিজে একটি প্রবন্ধ লিখে নিবেদিতা প্রমাণ করে দিলেন যে কোরিয়ায় চাকুরীর অজুহাতে বয়স ভাড়িয়ে ৩৩ থেকে ৪০ বছর করেছিলেন স্বয়ং বড়লাট। Problems of the East বইয়ের ১৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখলেন, "Problems of the East বইয়ের এই উদ্ধৃতিটি এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ থেকে বেমালুম বাদ দেওয়া হয়েছে—লেখক অবশ্য সেই একই আছেন, জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন অর্থাৎ লর্ড কার্জন। এখন পাঠক বিচার করুন প্রকৃত মিথ্যাবাদী কে এবং কে অতিরঞ্জন প্রিয়।" বড়লাট কার্জনের দু গালে চুণ মেখে দিলেন নিবেদিতা, কোন কথা বলার সাধ্য হলনা বড়লাটের। ভারতীয় সংবাদিকতাকে তিনি দেখালেন কিভাবে অন্যায় ও মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিতে হয়, কিভাবে রক্ষা করতে হয় জাতির আত্ম-সম্মান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও নবজাগরণের কথা তিনি প্রকাশ করলেন নিউ ইণ্ডিয়া, প্রবাসী, স্টেটসম্যান, ডন, নিউ ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। দেশের তারুণ্যকে তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর গুরুদেবের বজ্র-বাণীতে—"তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য-দেবতা তোমার জননী জন্মভূমি।" স্বদেশী শিল্প-প্রচেষ্টার নেপথ্যে তাই তাঁর সক্রিয় সমর্থন। একদল ছেলেকে তিনি বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন জার্মানী, আমেরিকার

মত শিল্পোন্নত দেশ থেকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় পারদর্শী হবার জন্যে। বাংলার অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির মূলে আছে তাঁরই প্রেরণা ও আর্থিক সাহায্য। বড়লাট কার্জন কিন্তু ভোলেননি দুর্বিনীত বাংলাকে। বাঙালীকে ধ্বংস করবার জন্যে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ড করার আদেশ জারী করলেন তিনি। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নবজাগ্রত বাংলা প্রতিজ্ঞা নিল সেই Settled factকে unsettled করার। দার্জিলিং থেকে ছুটে এসে বংগভংগ-বিরোধী আন্দোলনের সামিল হলেন নিবেদিতা। দুর্যোগের কালোমেঘের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন দেশের সংকল্প-বাণী—"যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ইংরেজকে এই বঙ্গ-ভঙ্গ আইন উঠাইয়া লইতে বাধ্য না করে ততদিন আমরা সংগ্রাম করিয়া যাইব।"

১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় যুগান্তর। প্রথম সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিপ্লবের কেন্দ্র ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। বরিশালে ফুলারী দমননীতি খুলে দিল বিপ্লবের রক্তরাঙা পথ। ফুলার-বধের আদেশ দিলেন অরবিন্দ ও নিবেদিতা। শিবাজী-উৎসবে সেতু বন্ধন হল বাংলা ও মহারাষ্ট্রের। নিবেদিতার ললাট-নেত্রে জ্বলে উঠল প্রলয়ের বহ্নিশিখা। শ্রীঅরবিন্দ নিজমুখে বলেছেন—"বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টায় আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা মহিয়সী নিবেদিতা!" জনৈক জাতীয়তাবাদী নেতা নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে বোমা-পিস্তলের সত্যিই কোন দরকার আছে কিনা। নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন—"নিশ্চয়ই আছে। বোমা না ফাটালে ইংরাজ এককণাও ছাড়বে না। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।" এইতো নিবেদিতার সত্যিকার স্বরূপ।

ব্রিটিশ শাসকদের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন নিবেদিতা। গোয়েন্দা লাগল তাঁর পিছনে। ফাঁসির দড়ি থেকে তাঁকে বাঁচাল তাঁর চামড়ার রঙ্। মারতে না পেরে তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার ষড়যন্ত্র করল শাসক-গোষ্ঠি। আত্মরক্ষার্থে তাঁকে যেতে হল লণ্ডনে। ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার আগে বিপ্লবীদের ডাক দিয়ে বললেন—"তোমাদের একহাতে অরবিন্দ তুলে দিয়েছেন গীতা আর অন্য হাতে আমি দিয়েছি বোমা। আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্রদাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছ। ওয়া গুরুকী ফতে।" এই হল বিপ্লবী নায়িকা নিবেদিতার স্বরূপ, জ্যোতির্ময় রূপ।

ভারতের সংকটের ডাকে আবার তাঁকে ফিরতে হল ছদ্মবেশে। দমননীতির ষ্টিমরোলারে বিপ্লবীরা স্তব্ধ। অরবিন্দ রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তাঁকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চন্দননগর পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন নিবেদিতা। এবার তিনি একা। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে স্বদেশী-আন্দোলনের ছবি। শত শত শহীদের রক্তদানে যে বাংলার মাটি উর্বর হল একদিন তাতে সোনার ফসল ফলবেই। বাঙালীর নবজীবনের উদ্বোধন সার্থক হবে স্বাধীনতার আশীর্বাদে এই বিশ্বাসে রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন তিনি।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন তাঁর বিদায়-বাণী—"আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড ও অবিনশ্বর। এক আবাস, এক আকুতি আর এক সম্প্রীতি হইতেই জাতীয় ঐক্যের উদ্ভব হয়। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাহার খেলা, বিদ্বানের বিদ্যা ও ঋষির ধ্যানে যাহার প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি, সেই শক্তিই আজ আমাদের বক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহার নাম আজ জাতীয়তা। আমি বিশ্বাস করি বর্তমান ভারতের মূল রহিয়াছে প্রাচীন ভারতের গভীরে, সম্মুখে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভাবীকাল। হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে মূর্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও। আমাকে তোমার করিয়া লও।—নিবেদিতা"। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের আদর্শের সংগে নিবেদিতার আদর্শের মিলনে এ যেন নবভারতের ভাবনালোকের বিচিত্র ত্রিবেণী সংগম।

বিবেকানন্দের বিশেষ বাসনা ছিল ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার। নিবেদিতা গ্রহণ করেন সেই দায়িত্ব। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমস্ত গৌরব তাঁরই। কারও করুণার প্রত্যাশী না হয়ে, অনাহারে অর্ধাহারে লেখনী-চালনা করে বিদ্যালয়ের খরচ জোগাড় করেছেন তিনি। ছাত্রীদের চরিত্রগঠন ও দেশভক্তির উজ্জীবনই ছিল তাঁর নিরলস প্রয়াস। শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর উক্তি বর্তমানকালেও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"শিক্ষা! হায়, ইহাই তো ভারতের প্রধান সমস্যা। কেমন করিয়া প্রকৃত শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেমন করিয়া ভারতের সন্তান হিসাবে তোমাদের গড়িয়া উঠিতে হইবে, য়ুরোপের অক্ষম অনুকরণে নয়, ইহাই তো সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হইবে হৃদয়ের বিস্তার সাধন আর আত্মচেতনার উন্মেষ সাধন এবং মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন। জগৎ আর জীবনের মধ্যে একটা জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করাই হইবে তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য।" দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রেক্ষণীতে এ যেন অরণ্যে রোদন।

নিবেদিতার সাহিত্য-সৃষ্টিও অপূর্ব। ভারত-আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও সেই সত্য ও সুন্দরকে দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করাই তাঁর সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ভারতের প্রতি তাঁর অতুলনীয় ভালবাসারই অনুরণন। The Master as I saw Him, The Web of Indian Life, Cradle Tales of Hinduism, the Footfalls of Indian History ইত্যাদি বই বার বার পড়বার মত।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে একটি জাতির নবজাগরণ যখন সূচিত হয় তখন সেই জাগরণের প্রেরণা সঞ্চারিত ও পল্লবিত হয় সমাজজীবনের প্রতি অণুপরমাণুতে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতে নবজীবনের জোয়ার আসে হতাশার মরা গাঙে। ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও প্রভাব সেই যুগান্তরের মূলে।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আর তিনি বিক্রমাদিত্য এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ সময়ে ও তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীর কবি কালিদাস ভারতবর্ষের কাব্য-জগৎ আলো করেছিলেন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দের প্রথম অর্দ্ধাংশ—এই স্বল্প কালটুকুই মহাকবি কালিদাসের জন্ম-মৃত্যুর'রেখাঙ্কিত।

কৌতূহল জাগে মনে—উজ্জয়িনীর কবি আমাদের এই ভারতবর্ষের কতোখানি বা কতো-টুকু জানতেন! বিরাট, বিশাল এই ভারতবর্ষ তখন ছোটোবড়ো অগুনতি রাজ্যের দ্বারা খণ্ডিত ও বিভক্ত। রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো লেগেই ছিলো, তাছাড়া দেশভ্রমণ সেকালে সহজ ছিলো বলে তো মনে হয় না। পথ তখন হাতছানি দিয়ে ইসারা করতো না পথিককে দিগন্তের পানে। অবিশ্যি পথ না চলেও অতীতের মঞ্জুষা থেকে বহু দুঃসাহসিক পথিকদের, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের ও ভিক্ষুদের অভিজ্ঞতা নিজের করে নেবার সুযোগ তখন ঘটে গেছে। পৌরাণিক যুগ ও বৌদ্ধযুগ এই দুই বিরাট যুগের, বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের জ্ঞান ও মুক্তির স্রোত তখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত তো হয়েছেই, ভারতের সীমা অতিক্রম করে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বন্ধ্যা মানস-ভূমিকে সরস করে আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রায় ন'শ বছর পরে কালি-দাসের জন্ম। তাই পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে ভারতের ভৌগলিক রূপের ধারণা করা কালি-দাসের পক্ষে আদপেই দুঃসাধ্য ছিলো না।

কালিদাসের কাব্য ও নাটক পাঠ করে সে কালের ভারতবর্ষের যে ছবি আমরা পাই সেটি হচ্ছে এই: দেবতাত্মা পর্বতরাজ হিমালয় রয়েছেন উত্তরে। কালিদাসের কাব্যে এই পর্বতকে কোথাও হিমালয়, কোথাও বা হিমাদ্রি বলা হয়েছে। মানস সরোবরের খবর মহাকবি জানেন। মানস-সরোবর থেকে আনুমানিক পঁচিশ মাইল দূরে যে কৈলাস পর্বত রয়েছে তাও কবির অজানা নয়। হেমকূট ও কুবেরশৈল কৈলাসেরই অন্য দুটি নাম। মন্দার পর্বত কৈলাসেরি কাছাকছি তারও উল্লেখ পাই কালিদাসের কাব্যে। সুমেরু পর্বতের উল্লেখ আছে কালিদাসের রচনায়। একালের কেদারনাথ পর্বতই হচ্ছে সেকালের মেরু অথবা সুমেরু। বিন্ধ্য-পর্বত, রেবানদীর উৎপত্তিস্থল অমরকূট পর্বত, একালের অমরকণ্টক, চিত্রকূট পর্বত, বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ডের কান্তনাথগিরি, রামগিরি (বর্ত্তমান রামটক পাহাড়, নাগপুর থেকে চব্বিশ মাইল উত্তরে) ও মহেন্দ্র পর্বত (উড়িষ্যা থেকে মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী)—এই সব পর্বতেরা স্থান পেয়েছে মহাকবির কাব্যে। নদীরাও কাব্যে উপেক্ষিতা নয়। মালিনী, (বর্ত্তমান নাম চুকা।

সাহারাণপুর ও অযোধ্যা জেলা দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত) তমসা (সরযূর শাখা, বর্ত্তমান নাম তন্‌স্), কপিশা (মেদিনীপুর কাসাই নদী), রেবা (বর্ত্তমান কালের নর্মদা) ও বরদা (মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা নদী)—এই নদীগুলি বাস্তবলোক থেকে রূপের অমৃতলোকে চিরন্তনী হয়েছে মহাকবির কৃপায়।

পশ্চিমে সিন্ধু নদী ধেয়ে চলেছে আরব্য সাগরের দিকে। পূর্বে চলেছে গঙ্গা পূর্বসাগরের (বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগর) পানে। মাঝপথে যে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে তাও কবির অজানা নয়। তাল ইক্ষু ও ধান অপর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলা দেশে হয়, জাফরান ও আঙ্গুর হয় পাঞ্জাবে, মাদ্রাজ অঞ্চলে সুপুরি ও নারকেল গাছ সমুদ্রের তীর ছেয়ে জন্মায়, রেবানদীর তীর পুন্নগে ও কেতকীতে ছয়লাপ—এসব বর্ণনা রয়েছে কালিদাসের কাব্যে।§

শিপ্রার তীরে উজ্জয়িনী নগরী, সেখানে মহাকালের মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় পূজা হয়। বেত্রবতী নদীর তীরে বিদিশানগরী (বর্ত্তমানকালের ভিল্‌সা। ভোপাল থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর পশ্চিমে) কেয়া ফুল, জম্বু বৃক্ষ ও মানস-যাত্রী মরাল—এই এয়ী শোভার আকর। মেঘদূত-এ মেঘের আকাশ-পাড়ি দেবার ছবি কবি এঁকেছেন—বিদিশার নিকটেই নীচে পাহাড় কদম ফুলে আলো হয়ে আছে। তার কিছু দূরে নির্বিন্ধ্যা (বর্ত্তমানের নেওয়াজনদী) নদী যা পার হয়ে উজ্জয়িনীতে যাবার জন্যে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করেছেন। উজ্জয়িনীতে কিছুকাল বিশ্রাম করে পথ-শ্রান্তি দূর করে চমন্বতা নদী (বর্ত্তমানের চম্বলনদী) পার হয়ে দশপুর হয়ে মেঘ যাবে 'ব্রহ্মবর্ত্ত'-এ। ব্রহ্মবর্ত্ত হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব। 'ব্রহ্মবর্ত্ত' থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে কন্‌খল্ পর্বতের দিকে মেঘকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন যক্ষ। সেখান থেকে মানস-সরোবর হয়ে মেঘ যাবে কৈলাস—সেখানে অলকা।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্বপশ্চিম সব অংশের খবরই কালিদাস মোটামুটি জানতেন, যদিও তাঁর কাব্যে হিমালয় ও মালব্যের বর্ণনাই সব চেয়ে বেশী করে আছে। কবির প্রিয় উজ্জয়িনী এই মালব্য প্রদেশে। তাই মালব্য প্রদেশের ফুল, গাছ, নদী, পাহাড় ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'ঋতু সংহার' কাব্যে কালিদাস যে ছয় ঋতুর বর্ণনা করেছেন সে ঋতুগুলি মালব্য প্রদেশেই আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোনখানে নেই। তা ছাড়া যে সব গাছ, ফুল, ফল ও জন্তুদের বর্ণনা করেছেন কালিদাস 'ঋতু-সংহার'-এ সেগুলি শুধু মালব্য প্রদেশেই দেখা যায়। তাই স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কালিদাস ছিলেন মধ্যভারতের মালব প্রদেশবাসী।

যে সব গাছের কথা কালিদাসের রচনায় পাই, যেমন দেবদারু, সরল, ভূর্জ, চৈত্য, উড়ুম্বর, নমেরু, সর্জ, আম্র, জম্বুক, মধুক, সপ্তভেদ, করঞ্জ, অর্জ্জুন, মল্লকী, সিন্ধুবার, বন্ধুক, কর্ণিকার,

§ হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের বাসভূমি, দেবদারু, ভূর্জ সরল ও নমেরু গাছের ঘন অরণ্য, সেখানে মৃগেরা বনের বাতাসকে মন্থর করে কস্তুরী গন্ধে, আসামের অরণ্যে বিশালকায় হাতীদের বাস—এ সব কালিদাস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

কোবিদার, কল্পদ্রুম, পারিজাত, মন্দার, কুসুম্ভ; কন্দলী, চন্দন, জবা, স্থলকমলিনী, নিচুল, বেতস, ভদ্রমুস্ত, পুগ ও তমাল ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের গাছ।

এদের মধ্যে দেবদারু ও সরল হচ্ছে হিমালয়ের দুজাতের পাইন গাছ। নমেরু গাছটিকেও কালিদাস হিমালয়ের বাসিন্দে করেছেন। সর্জ হচ্ছে শাল গাছ। অযোধ্যা থেকে হিমালয়ে বশিষ্ঠ আশ্রমে যাবার পথে দুধারে শালগাছের বন। মধুক হচ্ছে এ কালের মহুয়া। নর্মদার তীরে বহু দূর পর্যন্ত অসংখ্য করঞ্জগাছ। খান্দেশের গাছ হোলো সল্লকী। পারিজাত, কল্পদ্রুম ও মন্দার, এই তিনটি হচ্ছে কবির কল্পনার গাছ—স্বর্গের গাছ। নিচুল, বেতস ও বাণীর এগুলি নানা জাতের বেত গাছ, রাজগিরি পর্ব্বতের আশে পাশে এদের জন্ম। ভদ্রমুস্ত হচ্ছে কাশ। পুন্ন, তমাল ও চন্দন এগুলি হচ্ছে মলয়স্থলীর গাছ। মালব্যের গাছ জম্বু হচ্ছে আমাদের জাম গাছ, নর্মদা নদী এই জম্বু গাছের ঘনসারির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। উদুম্বর হচ্ছে এক ধরণের ডুমুর গাছ। উজ্জয়িনী ও চর্ম্মন্বতী নদীর মাঝখানে যে দেবগিরি পাহাড়, সেই পাহাড় ছেয়ে আছে এই গাছে। আম্রকূট পাহাড়ে আম গাছের কুঞ্জ; আমের ঝোপের গন্ধে বাতাস বিহ্বল।

ভারতবর্ষের গাছ, নদী, পাহাড় এমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে কবির কল্পনার কাছে, নিজেদের স্থান করে নিয়েছে তাঁর কাব্যে। এবারে আমরা চলবো ফুলের সন্ধানে। যে অসংখ্য ফুল ফুটেছিল পথের ধারে, কাননে, নদীর তীরে, পর্বতের সানুদেশে, অরণ্যে সেই অতীতের ভারতবর্ষে, তাদের সকলের খোঁজে আমরা যাচ্ছি না। কি লাভ তাদের থেকে যদি তারা কবির হৃদয় জয় করতে না পারলো! তারা সেদিন থেকেও, ছিলো না, কেন না তারা মহাকবির মনহরণ করতে পারে নি। যে ফুলগুলি কবির কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে, তাঁর ভাবরসের শিশিরে সিক্ত হয়ে অপরূপ রূপ দিয়েছে তাঁর কাব্যে, সেই গরবী ফুলগুলির খবর নেবার জন্যে আমাদের মন উৎসুক। তাদেরই সন্ধান এবার নেওয়া যাক। মহাকবি কালিদাস পঁয়ত্রিশটির বেশী ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দেন নি। আশ্চর্য লাগে মনে করতে যে পথের দুধারের ফুলের ঝরণা-ধারা, মেঠো ফুলের দল, অগুন্তি নাম না জানা সব ফুল কবির মনে স্থান পায় নি। তিনি যেমন বাঁধাধরা কয়েকটি ফুলের চৌহদ্দীর মধ্যে তাঁর কল্পনাকে ও ভাবকে বিচরণ করতে দিয়েছেন। রাজ-সভার কবি তিনি, যেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন মেঠো ফুলকে, অখ্যাত ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দিতে। রাজ-সভা কবির পক্ষে এমনিই কাব্য-ঘাতিনী! আর এক মহাকবির কথা মনে পড়ে যায়। দেশবিদেশের কোনো ফুল বাদ পড়ে নি, রবীন্দ্রনাথের মনে ও কাব্যে তারা সবাই স্থান পেয়েছে। শুধু পদ্ম নয়, বকুল নয়, কেতকী নয়, আকন্দ ফুল, ঘাসের ফুল, কতোশতো অনাদৃত উপেক্ষিত ফুল অমর হয়ে রইলো তাঁর কাব্যে। অতীতের কাব্য-নির্দিষ্ট ফুলগুলি তাঁর সৌন্দর্য-বোধকে বন্দী করে রাখতে পারে নি। তাদের রূপের সীমানার মধ্যে। শাস্ত্রের কিম্বা রাজ-দরবারের নির্দ্দেশ মেনে ফুলের জাত-বিচার রবীন্দ্রনাথ করেন নি। অ-শাস্ত্রীয় ফুলের দল তাঁর কাব্যে রসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কালিদাস এখানে হার মেনেছেন তাঁর সমগোত্রীয় এই মহাকবির কাছে। রাজ-সভা যেমন কাব্য-ঘাতিনী, শাস্ত্রবিধিও তেমনি কবির কল্পনা-নাশিনী।

কালিদাসের আদরের ফুলগুলির দিকে এখন নজর দেওয়া যাক। দেখা যাচ্ছে পদ্ম, কুমুদ, অশোক, শিরীষ আর চূতমঞ্জরী—এই কটি ফুলের উপর কালিদাসের অনুরাগ ছিলো সব চেয়ে বেশী। এই ফুলগুলিই তাঁর নানা কাব্যে দেখা দিয়েছে বারে বারে। তারপরে বকুল, কাশ, পলাশ, নবমল্লিকা, কুন্দ, কেতকী ও কর্ণিকার-এর সমাদর। শেফালিকা অনাদৃতা ও উপেক্ষিতা। মহাকবি মাত্র একবার তাকে স্মরণ করেছেন। শেফালীর কথায় মনে পড়ে যায় আর এক মহাকবির কথা। তিনি শুধু শিউলির বহিরূপটুকুই ধরে দেন নি, শেফালি বনের মনের কামনা'র রস তিনি আমাদের পান করিয়েছেন, আমাদের হৃদয়ের দুটি আঁখি ভরে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ শিউলির কামনার রূপ। এই অন্তর্লীনতার কাছ দিয়েও কালিদাস আসতে পারেন নি। রূপের বার-মহলে ঘোরা ফেরা করে তিনি নিজে ক্লান্ত, আমাদের ক্লান্ত করে ছেড়েছেন।

এবারে একটি একটি করে ফুল ধরে তার গন্ধ অনুসরণ করে কালিদাসের কাব্য-লোকে প্রবেশ করা যাক।

এক—যূথিকা

যূথিকা কবির মনকে তেমন বেশী নাড়া দিতে পারে নি। মহাকবির কাব্যে যূথিকার দেখা পাই মাত্র তিনবার—'মেঘদূতম্'এর চতুর্থ অঙ্কে পূর্বমেঘে, ঋতু সংহারম্-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় আর 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে।

'ঋতু সংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষাবর্ণনায় এই বর্ণনা আছে—

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাম্
বিকসিতনবপুষ্পৈর্যূথিকাকুঙ্কলৈশ্চ
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাম্
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥

যূথিকার কুঁড়ি—মালতী কুসুম নব ফুলদলে গাঁথা
বকুলের মালা, প্রিয়জনসম সোহাগেতে ভরি মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষাঋতু,
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নব কদম্ব-আভরণ।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘের কবিতাটি হচ্ছে

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চন্
উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৬ ॥

ঘুচিলে ক্লান্তি, নদীতীরজাত যূথীর কলিকাগুলি
সিঞ্চিত করি নববারিধারে করো সৌরভময়,

কপোলের স্বেদ মুছিতে যাদের কানের-কমল ম্লান
ছায়াদানে লভ চয়ন-ক্লান্তা নারীদের পরিচয় ॥

'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে পাই—"মদকল! যুবতি শশিকলা গজযূথম! যূথিকাশবলকেশী! স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে সুখালোকা।"

হে মদমত্ত গজরাজ, যূঁই ফুল কেশে দিয়ে যে নারী বিচিত্ররূপে সেজেছে সেই স্থিরযৌবনা প্রিয়া তোমার কি দূরদেশে অবস্থান করিতেছে?

দুই—জপা

উজ্জয়িনীর রাজদরবারে জপার আদর বিশেষ ছিলো বলে মনে হয় না। কালিদাস শুধু একটিবার জপা-কে স্মরণ করেছেন মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘে। শঙ্করের নৃত্য-বর্ণনায় কুরবক, শিরীষে কেশর-- এরা যে সব বেমানান্ ও অশোভন মনে হবে, তাই শঙ্করের নৃত্যের ছবিকে সম্পূর্ণ করতে জপার ডাক পড়েছে। মেঘদূতের কবিতাটি হচ্ছে—

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজপাপুষ্পরক্তং দধানঃ
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরাদ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টি ভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৬ ॥

দুইভুজ তরু ঊর্দ্ধ উঠায়ে তাণ্ডব নাচে মাতিবেন শিব যবে,
করিও ব্যাপ্ত ভুজ তরুবন জপাফুল সম রাঙা রঙে সন্ধ্যার,
ঘুচিবে ইচ্ছা শিবের তখন নৃত্যের কালে নাগাজিন পরিবার,
স্নেহভরে উমা স্তিমিত নয়না হেরিবে তোমারে তবে ॥

তিন—সিন্ধুবার

উমার দেহ সাজাতে অশোক কর্ণিকার ফুলের সঙ্গে সিন্ধুবার ফুলের তলব পড়েছে—যদিও বারেকের তরে। ফুলটিকে একালের কোনো ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছি নে। ফুলটি অজানা রয়ে গেলো, যদিও মুক্তর সঙ্গে তুলনা থেকে তার শুভ্র বরণ অতীতের অন্ধকার ভেদ করে আমাদের কাছে এসে পৌচেছে। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে উমার এই বর্ণনা আছে—

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগেমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩ ॥

অশোকফুলে পদ্মরাগ মানিক হোলো লাঞ্ছিত কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার বাজিল যেথা মুকুতা হতো বাঞ্ছিত, ফাগুনের ফুল দিল দেহে অবদান ॥

চার—মধুক

একালে মধুকের আদর নেই শিক্ষিত সমাজে। থাকবেই বা কি করে? মালার আদর তো কমে গেছে একালের বরবনিনীদের কাছে। অতো সময় কোথায় এ যুগের মালবিকা চতুরিকা-দের যে তারা ধীরে সুস্থে প্রসাধন করবেন, লোধ্রফুলের রেণু মাখবেন মুখে, নয়নে কাজল দেবেন, হাতে লীলাকমল নেবেন, গলায় মধুকের মালা পরবেন? এখন এই যন্ত্রযুগের চলার ছন্দের সঙ্গে তাল মান রেখে তাঁদের প্রসাধনকে তাঁরা যুগোপযুগী করে নিয়েছেন। ছোট্ট কৌট থেকে হরেক রকমের রঙ বের হয় কলের ধোঁয়ায় ধুসর তাঁদের বিবর্ণ কপোল রঙীন করবার জন্যে। অধরের জন্যে shell-আকৃতি টিনের চোঙা থেকে বের হয় কটকটে লাল রঙ। মুহূর্তে প্রসাধন সারা হয়, নেপথ্যবিধান আর নেই, সবার সামনেই প্রসাধন। হায়রে! এতোটুকু মোহ উপভোগ করবার সুযোগ পুরুষদের দিতে এরা নারাজ। এরা আবার এমনি ঘোর বাস্তবপন্থী। জীবন্ত সব মোহমুদ্গর এরা। হাতে এদের লীলাকমলের স্থান নিয়েছে বৃহদাকার ব্যাগগুলি—চোঙা, কৌটও এযুগের লোধ-রেণু পাওডারের আশ্রয়স্থল। মধুক কিন্তু আজও বেঁচে আছে সাওতাল পল্লীবাসীদের মধ্যে। মহুয়ার কদর তারা জানে। পান করে তারা মহুয়া ফলের রস, মাথায়ও গোঁজে মহুয়ার হলদে ফুল সাওতাল রমণীরা।

মধূকের বর্ণনা আমরা পাই 'কুমার-সম্ভবম্'-এর সপ্তম সর্গে আর 'রঘুবংশম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে। সেকালের নারীদের চুল শুকোনোর লীলা বর্ণনা করে কালিদাস 'কুমার-সম্ভবম্'-এ লিখেছেন :—

"ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না॥ ১৪॥

ধূপের ধোঁওয়ায় শুষ্ক করিয়া কেশ, কুসুম সাজায়ে ঘন চিকুরের মাঝ,
শ্যামলদূর্বা পাণ্ডু মধুক ফুলে মালা গাঁথি নারী বাঁধিল অলক আজ।

'রঘুবংশম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুতীর বর্ণনা করে কবি বলেছেন—
"এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা॥ ২৫॥

বাক্য অন্তে হেরি তারে যবে নির্বাক হয়ে করিলো নীরস প্রণতি।
এলোমেলো হোলো দূর্বা-শোভিত মধুকমালিকাখানি, চলিলা ইন্দুমতী॥

(ক্রমশঃ)

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

মৃগনয়নী হঠাৎ উঠে। কি ভেবে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বৃষ্টিতে ভিজে চলে যায় নিচের ঘরে। ঘরে গিয়ে দোর ভিজিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘরে কেমন ওর ভয় ভয় করে। ঘরের ভেতর চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। বাইরের বর্ষার মতই সরলার চোখে বর্ষা নেমেছে। সরলার কথাটা সইতে একটু সময় নেয় মৃগনয়নী। নিজেকে ধীরে শান্ত করার চেষ্টা করে। সময় কাটে।

বৃষ্টি ধরে আসছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে তখনও। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মৃগনয়নী আবার ঘর থেকে না বেরিয়ে পারে না। ধীর পায়ে খুব আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সরলার ঘরের সামনে যায়। ঘর বন্ধ। বাইরে থেকে শিকল তোলা। সরলা ঘরে নেই। কোথায় গেল। বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে ওঠে। সরলার চোখের জলে ভেজা মুখখানি মনের ওপর ভেসে ওঠে ওর। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিতে মায়ের ঘরের কাছে যায় মৃগনয়নী। বৃদ্ধা চুপ করে বসে আছে। প্রদীপের আলোয় দেখাও যায় সরলা নেই। রান্নাঘরের কাছে আসে। ল্যাম্পো জ্বলছে রান্নাঘরে। উনুনের কাঠ যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে সরলা। পিছনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ায় মৃগনয়নী।

বারে বারে চোখ মুছচে সরলা।

—মেজদি।

মৃগনয়নীর ডাকে সরলা মুখ ফেরায়। চোখদুটো ওর টুকটুকে রাঙা। কালো গালদুটো তখনও ভিজে।

তুমিই মানুষ করো মেজদি। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তুমি ছাড়া কে মানুষ করবে বলো?

মৃগনয়নী সরলার পাশে গিয়ে বসে।

সরলা কথা বলতে পারে না। নাকের পাতা দুটো ফুলে উঠছে, ঠোঁট কাঁপছে।

মৃগনয়নী ওর হাত ধরে,—চলো চালতে মাথা খানিকটা রয়েছে, ওটা শেষ করে দুজন রান্নাঘরে আসব।

সরলা ওর সঙ্গে সঙ্গে ওঠে। কিন্তু একটা কথাও বলে না।

সন্ধ্যাটা নীরবে নিঃশব্দে কেটে যায়। রাত্রে আজও বনবিহারীকে ঠেলতে হয় মৃগনয়নীর—কই, শুনছ?

চোখদুটো বুজেই বলে বনবিহারী,—বলো, শুনছি।

—বলেছিলে?

—কি?

—বাঃ! ভুলে গেলে এর ভেতরেই ?

—উঁ ?

—এমনি শুয়ে বসেই কি চলবে ?

—হুঁ।

মৃগনয়নী আবার বিরক্ত হয়, ঠেলা দেয়,—উ আর হু, কথার উত্তরটাও দেবে না! বনবিহারী এতক্ষণে চোখ কচলে উঠে বসে,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে!

—আমার যে ঘুম যাবার দশা!

—কেন? কেউ কিছু বলেছে ?

—বলবে আবার কি ?

—তবে?

—কতদিন ধরে তো বলবো বলবো কোচ্ছ, বলেছ ?

—অ! সেই কথা! মনে পড়ে বনবিহারীর,—না, ঠিক জুত মত সময় পাচ্ছি না। মানে একটু ইয়ে করে বলতে হবে তো!

—আর ইয়ে করেছ!—হতাশ হয় মৃগনয়নী।

একটু থেমে বলে,—তোমাকে তো কত করে বললাম। কলকাতার যাবার খরচা আমি দোব। আমার গয়নাগুলো বেচে টাকা নিয়ে কলকাতায় যাও। কিছু টাকা হাতেও থাকবে। চাকরীর চেষ্টা করতে পারবে।

বনবিহারী কানের পাশটা চুলকে নেয়।—মেজদা তোমার গয়নার টাকা নিতে যদি রাজী না হয়!

—গয়নার টাকা বলবার তো দরকার নেই। তুমি বলবে, আমার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ। আমার বাপের বাড়ী তো বড়লোক, ধরে নেবে তারাই না হয় টাকা দিয়েছে!

—ধরলাম না হয়।

আবার বিরক্ত হয় মৃগনয়নী,—তোমাকে ধরতে বলেছে কে? তুমি তোমার মেজদাকে বলো।

—বেশ মেজদাকে তাই বলব।

—বলবে তো আজ বিশদিন ধরে বলছ।

—কালই বলব।

মৃগনয়নী একটু আশ্চর্য হয়। বনবিহারীর ফরসা পিঠের ওপর লাল তিলটার কাছে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—গয়না কি হবে। তোমরা যদি চাকরী পাও। টাকা রোজগার করো। গয়না আবার গড়িয়ে দেবে!

বনবিহারী চুপ করে থাকে।

—আর একটা কথা ছিল কি।

—কি ?

—ওরা তো একখানা চিঠিও দিল না।

—ওরা কারা ?

—বাবা, কর্ত্তাবাবু ওরা।

তাই তো দেখছি। ভাবছি তোমার গয়না নিলে তাঁরা আবার রাগ করবেন নাতো ?

—সে আমি যা হয় বলে ঠিক করে নোব। তুমি একটা কাজ করবে ?

কি ?

একখানা খাম এনে দেবে ? কর্ত্তামাকে একখানা চিঠি লিখব। অনেকদিন রইলাম ওখানে একবার যেতে ইচ্ছে হয়।

বলতে বলতে গলাটা একটু ভারী হয় মৃগনয়নীর।

বনবিহারী কথা বলে না।

—এখান থেকে যেতে দেয়নি বলে ওরাও বোধহয় রাগ করেছে ?

বনবিহারী একটা নিঃশ্বাস ফেলে,—করতে পারে।

ভাবছিলুম কি, আমি না হয় একখানা চিঠি লিখি লুকিয়ে।

—এতে তোমাদের মান খোয়া যাবে না। আমি কর্ত্তামাকে লিখব নেবার জন্যে লোক পাঠাতে।

—তোমার ছেলে হবার কথাও কি লিখবে ?

মৃগনয়নী লজ্জায় একটু সঙ্কুচিত হয়,—ধ্যেৎ তা কখনও লেখা যায় !

—বনবিহারী হাসে,—একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না হয় লিখো। তাছাড়া তুমি কি লিখতে জানো ?

—দ্বিতীয়ভাগ অব্দি পড়েছি তো ! একটু একটু পারি। না হয় আমার জবানীতে তুমি লিখে দেবে ?

—তা হয় না। ওরা বুঝতে পারবে।

—তবে না হয় আমিই লিখব।

—বেশ, খাম একখানা এনে দোব। আমার কাছে আবার এখন পয়সা নেই।

—আমার কাছে আছে। বিয়ের আশীর্ব্বাদীর টাকার একটা এখনও আছে। কয়েকটা টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

বনবিহারী খুসী হয়,—বেশ হবে। বেশ হবে। টাকটা দিও। আমার বিড়ির দোকানেও ধার হয়েছে এগারো পয়সা। শোধ করে দেওয়া যাবে।

মৃগনয়নীও খুসী হয়। ঝুপ্ করে শুয়ে পড়ে। বলে,—আলোটা নিভিয়ে দাও।

বনবিহারী উঠতে উঠতে বলে,—বারে বা ! আমায় ঘুম থেকে তুলে নিজে শুয়ে পড়ছ। আলোটা নিভিয়ে দেয় বনবিহারী।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। মনটা ওর চলে গেছে বাবার কাছে। বাবা নিশ্চয়ই জপে বসেছেন এখন। হৃদয়দার কাছ থেকে সবাই সব কথা নিশ্চয়ই শুনেছে। বাবা কিছু বলেন নি হয়তো। চুপ করে জপে মগ্ন হয়ে আছেন।

কর্ত্তাবাবু নিশ্চয়ই রেগে গেছেন। কর্ত্তামা হয়তো বলেছেন,—মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়েছি। মা হয়তো বলছে,—ভাবব মেয়েটা মরে গেছে। সবাই বলবে। ওটা হতভাগী! মৃগনয়নীর চোখ দুটো ভিজে ভিজে লাগে। চোয়াল দুটো আট হয়ে আসে। বনবিহারীর একটা হাত এসে পড়েছে ওর গায়ের ওপর। ভাল লাগে না। হাতটা সরিয়ে দেয়।

দিদি নিশ্চয়ই এর ভেতর দুতিনবার ঘুরে গেছে। মনে মনে হাসছে মৃগনয়নীর খবর শুনে। আর পুঁটি? আয়না মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে আছে সামনের প্রান্তরে। সামনে আমবাগান ছাড়িয়ে অনেক পরে সড়ক, তারপর সরু খালের ক্ষীণ স্রোত সাদা একটানা সুতোর মত তারপর ক্ষেত, ধু ধু ক্ষেত। অনেক অনেক দূরে বিন্দুর মত সীমানার বটগাছ। তারপর ছড়ান আকাশ। নীলে নীল। নিঃসীম।

মৃগনয়নী মগ্ন হয়ে আছে চোখ বুজে।

দু চার বার ঠেলে সাড়া না পেয়ে বনবিহারী ঘুমিয়ে পড়ে।

মেজদাকে অগত্যা বনবিহারিকে বলতেই হোল। টাকা মজুত আছে শুনে রাজী হোল মেজদাদা। পৌষ নয়। মাঘ মাসে ভাল দিন দেখে কলকাতায় যেতে কোন আপত্তি তার নেই। সেখানে যদি চাকরী মেলে, তবে ন'বৌমার টাকাটা ফেরত দিলেই চলবে। ধার হিসেবেই নেওয়া যাক এখন। তাইতো ধার ছাড়া আবার কি! বনবিহারী আরও খুসী। যাই বলুক না কেন সবাই। নবৌমা লক্ষ্মী! তা নিজের ইয়ের কথা আর নিজে কি করে বলে বনবিহারী। ওর মায়ের কৃপা।

ওখানে গিয়ে প্রথম জ্যাঠতুতো ভাই যামিনীর ওখানেই ওঠা যাবে। যামিনীদা নিশ্চয়ই খুসী হবেন? খুসী না হলেও থাকতে হবে। দায়টা এখন ওদেরই। সব তাহলে ঠিকঠাক। পাকাপাকি কথা হয়ে যায়। কথাটা প্রমদাসুন্দরীর কানে যায়। প্রায় লাফাতে লাফাতে মৃগনয়নীর সামনে হাজির।

মৃগনয়নী রান্নাঘরের কাছে ছিল।

—বলি, হ্যাঁগা এততেও মন ভরল না, এখন ভাই দুটোকে সহরে তাড়িয়ে দিয়ে মারবার ফিকির!

চমকে ওঠে মৃগনয়নী। ঘরে বসে বনবিহারী আর ওর মেজদা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন-সঞ্চারিণী

আবীর ঘোষ

আলাপে সচেষ্ট যতি টেনে
অগত্যা—এখন আসি, নমস্কার—
বিদায় নেওয়ার সুরে বলা,
চোখ থেকে চোখ তুলে নিয়ে
অনিচ্ছায় বাড়ী মুখো চলা।

দিন যায়, মনের সংস্কার
প্রত্যাহান্তে মহার্ঘ খানিক
সময়ের স্মৃতি-ছায়া আনমনে
মাখে আর নিরাকার
সুখ-স্বপ্নে জ্বালায় মানিক।

কখনো কাঁপুনি দিয়ে শীতরাত
দীর্ঘ ঘুমে হ্রস্ব যতি টানে,
কুয়াশায় ঘেরা এক মহাদেশে
উড়ে বলে আলোর জোনাকী,—
আলেয়ার মায়ার প্রপাত।

মানে খুঁজে বেড়াই সেথাও।
রাত্রির হৃৎপিণ্ড নাচে দ্রুততাল
ছুঁতে পেয়ে মৌন জিজ্ঞাসার
এক বিবাগী আবেগ। অন্তরাল
লুপ্ত হয়ে জাগে সুপ্ত স্বপ্ন-মুখ

দ্বিগুণ সৌরভ ভরা। পূর্ণ-ছবি
সঞ্চারিণী সদ্য-ফোটা পদ্ম যেন।
কোমল আশ্লেষ দেয় অস্তিত্বের
হুবহু মুদ্রণে। সচেতন ক্ষণ
ব্যর্থ সাধে খোঁজে তারি জের।

আলো আলো

সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

মেঘের পাষাণ ভেঙ্গে আলোর অলকানন্দা এলো
শ্রান্তিহীন শ্রাবণের বিরহিয়া দিনরাত রাত
নিঃশব্দ পাখায় ভেসে দূরদেশে উড়ে চলে গেলো
রক্তে রক্তে মত্ত দোলা কী আনন্দে জাগালো প্রভাত !

যৌবনা নদীর গান কান পেতে মগ্ন হয়ে শোনে
শ্যামলে গৈরিক ঢাকা দুপারের মুগ্ধ বনভূমি
স্তব্ধ হয়ে সূর্য শুধু ঢেউয়ে ঢেউয়ে আপনাকে গোণে
নদীর সরোদে সুর : তুমি-আমি তুমি !

কার্ণিশের সিঁড়ি বেয়ে রোদের সমুদ্রে দেহ ধুয়ে
বাসন্তী রঙের শাড়ী দোল্ খায় বাতাসে মাতাল
ও-বাড়ীর মেয়েরাও আকাশের মুখে পিঠ থুয়ে
চুলের অরণ্যে যেন পেতে চায় সূর্যের সকাল !

মেঘদূত শেষ হলো, আলো আলো কী বাউল হাওয়া !
কান্না মোছ, পান্না হোক অশ্রুমাখা যতো গান গাওয়া ॥

আলোচনা

শিশুশিক্ষা সমস্যা

আমার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের শিক্ষা ব্যাপারে বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। এমন সমস্যায় হয়তো আমার পিতৃদেবও পড়িয়াছিলেন আমার শিক্ষার ব্যাপারে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। অনন্যোপায় হইয়া পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ঘানিতে আমায় জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘুরপাক খাইয়া একদিন থামিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রশংসা কুড়াইয়া আনিয়াছিল, এবং যথা সময়ে একটি চাকুরী সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলও বটে। কিন্তু শেখা হয় নাই কিছুই। স্বীকার করিতে লজ্জা নেই, চোখের ঠুলি খুলিয়া দেখিলাম 'পাদমেকম্' অগ্রসর হই নাই। দোষ কাহাকে দিব? এতোগুলি পরীক্ষায় কৃতকার্যাতা স্বত্বেও এই যে "চক্ষুরুন্মীলনে" ত্রুটি, এর জন্য আমি বা আমার পিতৃদেব হয়তো কিয়দংশ দায়ী কিন্তু পর্বত প্রমাণ দায়িত্ব যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এ-বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সমস্যা বহুমুখী; কিন্তু উপস্থিত আমি পাঠ্যতালিকা ও ছাত্রের বোধক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতেছি।

বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল, হিন্দী—এই কয়টি বিষয়ভার লইয়া আমার পুত্র চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ আরম্ভ করিল। বাংলা, ইংরাজীর টেক্সট্ বুক, ব্যাকরণ, ওয়ার্ডবুক ইত্যাদি আছে। সেগুলির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সাহিত্যপাঠের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উহার ব্যাকরণ পাঠ। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কখন? একটি আট নয় বৎসর বয়স্ক শিশুকে কর্ত্তা, কর্ম, কারক বা বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দেওয়া কি সহজ কথা? শতকরা নিরানব্বইটি শিশু বাধ্য হইয়া বিষয়টি পাশ কাটাইয়া যায় অথবা মরিয়া হইয়া মুখস্থ করিয়া রাখে। অনেকে বলিবেন, কেন মহাশয়, আগেকারকালে ঐ বয়সের শিশু গুরুগৃহে বসিয়া বহু শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত, বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিত, প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিত। আপনার শিশু কেন পারিবেন না? কেন সে ব্যাকরণ বুঝিবে না?

মানিয়া লইলাম, সে-এক যুগ ছিল যখন ভূমিষ্ট হইবামাত্র শিশু শ্লোক আওড়াইত, ভুল ধরিয়া গুরুজনের বিরাগভাজন হইতেও দুঃখবোধ করিত না এবং অভিশাপে অষ্ট-অঙ্গ-বক্র অবস্থায় অষ্টাবক্রমুনী নামে অমর হইত। কিন্তু হায়, সে যুগ কি আর ফিরিবে? এখন আমার আপনার শিশুরা জন্মগ্রহণই করিতেছে অষ্টাবক্ররূপে। অর্থাৎ তাহাদের সে মেধা বুদ্ধি নাই, দীপ্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই—কিছু নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেকালের সে গুরুগৃহ, সেই দুগ্ধঘৃত কদলীর যুগ আর ফিরিয়া আসিবে না। অতএব এখনকার অবস্থানুযায়ী বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে হইবেই।

ধরুন, ইতিহাস ভূগোলের কথা। এই দুটি বিষয় খুব মনযোগ সহকারে আমার পুত্রকে পড়াইয়াছিলাম। পাঠ্য তালিকায় ছিল: প্রস্তর যুগের কথা, মাহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পার কথা, বৈদিক যুগ (সে-যুগে সমাজ ব্যবস্থা, নারীর স্থান), রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। বুদ্ধ, অশোক,

শক হুণ কিছুই বাদ ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীতে যাহা কিছু পাঠ্য ছিল সেগুলি সবই। তদুপরি আরও কিছু। গোটা হিন্দুযুগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি। আলেকজাণ্ডার, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, কনিষ্ক, অশোক, গুপ্ত সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধন (পাঠক আমায় ক্ষমা করিবেন, ইতিহাসের পুস্তক কাছে উপস্থিত না থাকায় উপরোক্ত তালিকাটি কালানুক্রমিকতার দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সম্ভব!) প্রভৃতি প্রত্যেকটির প্রশ্নোত্তর পৃথকভাবে লিখিয়া দিয়াছিলাম এবং আমার নিপীড়িত পুত্র বাধ্য হইয়া সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। ফলে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তাহার কষ্ট হয় নাই। এরপর একদিন কথায় কথায় পুত্র-আমার প্রশ্ন করিল: বাবা! বুদ্ধ বুঝি অনেকদিন আগে জন্মেছিলেন? উত্তর দিলাম: হ্যাঁ বাবা, খৃঃ পূর্ব ৫৬ সালে বোধহয়। তোমার ইতিহাসের বইটা খুলে একবার মিলিয়ে দেখে নাও। এই সূত্রে 'খৃষ্টপূর্ব' কথাটি আরও একবার বুঝাইবার দরকার হইল। আগের মতন এবারও সে খুব মন দিয়া শুনিল। তারপর প্রশ্ন করিল: আমার 'চুলদাদুর' তখন বয়স কত? (পাঠককে বলিয়া রাখি, আমার বাবার মাথায় এক সময় কাঁধ পর্যন্ত চুল ছিল বলিয়া আমার পুত্র তাঁহাকে 'চুলদাদু' বলিত) প্রশ্ন শুনিয়া আমি থ হইয়া গেলাম। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে, অর্থাৎ দুটি বৎসর ধরিয়া সে কেমন ইতিহাস শিখিল, আপনারাই বলুন। এখন পঞ্চম শ্রেণীতে সে বাবর হইতে আরম্ভ করিয়াছে শেষ করিবে বোধহয় আওরঙ্গজেবে। আশা করি ভালো নম্বরই পাইবে। কিন্তু? সেই 'কিন্তু'ই থাকিয়া গেল না কি?

ভূগোলেও সেই একই কথা। 'গ্রাম কাহাকে বলে' এই অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ইউনিয়ন বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, বাংলা দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলার বড় বড় নদী, শহর, শিল্পদ্রব্য সে মুখস্থ করিয়াছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে। এই বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে সে পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি; জলবায়ু, কৃষিদ্রব্য, অরণ্য সম্পদ, খনিজদ্রব্য, সেচব্যবস্থা সবই পাঠ করিবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাহার সন্দেহ ঘুচে নাই—কলকাতা বড় না বাংলাদেশ বড়। এখন আপনারাই বলুন, এই বয়সে এই সব ক্লাসে ইতিহাস ভুগোল পড়াইবার সার্থকতা কোথায়? আমার পুত্রকে বোকা হাঁদা বলিয়া বিষয়টি উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ঘরে ঘরে অকারণে অবোধ শিশুরা পাঠ্যপুস্তকের নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, অমূল্য সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে বাধ্য হইতেছে। আর আমরা অসহায় অবস্থায় ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতেছি।

আমাদের মনে হয় দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের কেবলমাত্র সাহিত্য পড়ানো উচিত। তাহারা ঐ বয়স পর্য্যন্ত ভালো করিয়া বাংলা, ইংরাজী ও অঙ্ক শিখুক বাংলা পাঠ্যপুস্তকে গ্রাম জনপদের কথা থাকুক। ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকেও তাই। ছেলেরা ভালো করিয়া বানান, মানে ও রিডিং পড়িতে শিখুক। অনেক শব্দের সহিত পরিচয় ঘটিবে, সাহিত্যের পাঠ তাহাদের বোধোদয়ের সহায়ক হইবে; মাষ্টারমহাশয়দের ভাষায়, আগে তাহাদের 'কান' তৈয়ারী হোক, তারপর ব্যাকরণ। আগে তাহাদের বুদ্ধি পরিণত হউক, কাল ও স্থানের জ্ঞান স্বচ্ছ হউক—তাহার পর ইতিহাস ভূগোল পাঠ।

সরিৎশেখর মজুমদার

আত্মীয়তার বালাই

আত্মীয়তার সম্পর্ক অতি মধুর বলেই ধরে নেওয়া হয়। আত্মীয় বা বন্ধু এক কথায় আমরা যাদের স্বজন বলে মনে করি, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে একটা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আজ বাংলার সমাজে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে আত্মীয়তার এই প্রচলিত অর্থ বিলুপ্ত বললে অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশে আত্মীয়তা আজ আদায়ের উপায়মাত্র;

ধরুন আমাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অলিখিত নিয়মে ধরে নেওয়া হবে যে এই ডাক্তারের অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য হ'ল যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে বিনাপারিশ্রমিকে তাদের সকলকে চিকিৎসা করা। একথা কারোর মনে ওঠে না যে যথার্থ আত্মীয়তার পরিচয় হল এই নবীন চিকিৎসককে প্রতিষ্ঠিত হ'তে সাহায্য করায়—তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থাৎ 'ফি' থেকে বঞ্চিত করলে যে তাকে সাহায্য করা হয় না এ'ত সাধারণ বুদ্ধির কথা, কিন্তু পরমাত্মীয়রা তা বোঝে কি? না, আমাদের দেশে আত্মীয় ডাক্তারকে ফি দিলে তাকে অনাত্মীয়জ্ঞান করা হয়!

উকিল হলেও একই ব্যাপার। তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা লেখকের। আপনি যদি কোন বই লিখে থাকেন তবে আপনার পবিত্র দায়িত্ব হ'ল দূর-নিকট সেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব আছেন খোঁজ করে তাদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের শ্রীহস্তে আপনার আত্মীয়তার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হ'বে। সেই বই পড়া হবে বলে যদি কল্পনা করে থাকেন তবে উচ্চাশার তারিফ করতে হয় (অবশ্য ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়) যদি কোন ফ্যাশনেবল্ ঘরের শো-কেসে (বইয়ের শেল্ফ বলব না) আপনার বই স্থানলাভ করে ত ভাগ্য ভাল; কিন্তু সাধারণত অন্যান্য ছেঁড়া বা বাজে কাগজের সঙ্গে আপনার সাহিত্যপ্রচেষ্টাও যে সের-দরে বিক্রি হবে এটা ধরে নেওয়াই সমীচিন। যদি চিত্রশিল্পী হন তা কারোর বাড়ী গেলেই একটা ছবি এঁকে দেবার ফরমায়েস হবে; হয়ত পরের দিন গিয়ে দেখবেন আপনার অনেক সময়-লাগান সেই ছবি উনান ধরান'র কাজে লেগেছে অথবা আরও আপত্তিকর কোনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দোকানী হ'লে কিছুটা সুবিধে এই যে মাগ্‌না জিনিষ দিতে হয় না, কিন্তু একদিক দিয়ে তা ও বুঝি ভাল। কারণ এক্ষেত্রে চলে ধার যা কোনদিন শোধ হবার নয়। যদি বা কোন সজ্জন ধার শোধ দেবার সদিচ্ছা করেন ত দেখা যাবে, ইতিমধ্যে ধারে ধারে জর্জ্জরিত হয়ে বেচারী দোকান গুটিয়ে ফেলেছে। কত আর উদাহরণ দেব।

তবে এই আদায়পর্ব একতরফা নয়। অপর তরফে ডাক্তার উকিল ইত্যাদিও কম যান না। আপনি হয়ত কোন সরকারী কর্ম্মচারী, আপনার ডাক্তার আত্মীয়টি তার আত্মীয়তার

সুবাদে কোন বিশেষ সুবিধা (যেমন কোন পারমিট) আপনার মারফৎ ঠিকই আদায় করে নেবেন। আপনি যদি স্কুলমাস্টার হন, আপনার উকিল বন্ধুটি আপনার মাধ্যমে তার ফেল করা পুত্রের প্রমোশনের ব্যবস্থা ঠিকই করে নেবেন। হয়ত বা আপনি অফিসার, লেখক বন্ধুটি তার শ্যালকের চাকরীর উমেদারীতে আপনাকে উত্যক্ত করে তুলবে! অন্য যা-ই হোন আপনার আটিষ্ট কুটুম্বটি হয়ত আপনার অন্দরমহলে অন্তরঙ্গতার ক্রমোন্নতিতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ফেলেছে যে কন্যাদায়ের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আরও গুরুতর) দুশ্চিন্তায় আপনার আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবার দাখিল।

তাই একালের আত্মীয়তার মধ্যে দেওয়া আর নেওয়া দুই-ই আছে, একথা খুবই সত্যি। কিন্তু কি তার চেহারা?

দেওয়া নেওয়ার আর এক দায় উপহার-রীতি। বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করেন এমন লোকের সংখ্যা বিরল নয় কি? অন্তত মধ্যবিত্তদের মধ্যে এধরণের লোক প্রায় নেই বল্লেই চলে, দরিদ্রের কথা না হয় ছেড়েই ছিলাম। কারণ সকলেই জানেন। শুধু বিয়ে নয়, বাচ্চার অন্নপ্রাশন, খোকা খুকুর জন্মদিন (খুকুদের জন্মদিন বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত চলে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপহারের ঠেলাও বাড়ে) ত আছেই তার উপর আজকাল খুকুদের মায়েদেরও জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকী, বুড়ো বুড়ীর বিবাহের রজতজয়ন্তী—দিনকে দিন যে হারে উপহারের উপদ্রব বেড়ে চলেছে তাতে এক একবার কি মনে হয়না যে এই আত্মীয় সংকুল সংসার ছেড়ে নির্জন বনে গিয়ে বসবাস করি?

উপহার যারা দেন শুধু কি তাদেরই ভাবনা? যারা আয়োজন করেন তাঁদের অবস্থাও কোন অংশে শ্রেয় নয়। নিমন্ত্রণকারীরা কেউই সম্ভবত উপহারের কথা মনে রেখে নিমন্ত্রণ করেন না। (উপহারও ত জানা, বিয়ের বেলা অসংখ্য অকেজো সিঁদুরের কৌটো, খোকার জন্মদিনে একই ধরনের খেলনা তা ছাড়া কার কাছ থেকে কী উপহার পাওয়া যাবে তার স্থিরতা কি আর সে বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তাদের ভাববার অবসর থাকে কমই)। নিমন্ত্রণের সবচেয়ে বড় ভাবনা, কেউ যেন বাদ না পড়ে, তবেই সর্বনাশ! সারাবছর মুখদেখা নেই হয়ত, তাতে কি? ক্রিয়াকর্মে বাদ দিন, অনাত্মীয়-জ্ঞান করা হবে! নিমন্ত্রণ পেলেও অশান্তি, না পেলেও অশান্তি।

আত্মীয়তার এই দায় বাংলার সমাজকে যে অক্টোপাসের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে তার বজ্র আটুনি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কে না ব্যাকুল? অথচ মজা এই যে, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা যতই বাড়ছে পাকে চক্রে সেই অক্টোপাসকেই আমরা আকড়ে ধরছি। কে জানে এই পরিস্থিতির শেষ কোথায়?

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীর বিজয় অভিযানের যে কী মস্ত ইতিহাস আছে তা পাঠক জানেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" যখন সর্বপ্রথম পড়ি তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি পেয়েছিলুম। অনুভূতি কেন; রণোন্মাদনাও বলা যেতে পারে। মনে হয়েছিল বাঙালী বলতে শুধু "অর্দ্ধশিক্ষিত কেরাণী ও অশিক্ষিত বেণিয়ান" বোঝায় না। অন্তত ইতিহাসের সত্য নয়, সুতরাং 'বোতাম আটা জামার নিচে' শান্তিপ্রিয় বুকটাকে চিতিয়ে বলতে সাধ হয়েছিল যুদ্ধং দেহি। কিন্তু রণক্ষেত্র কোথায়! উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ; বিহার না বাঙলা!

শুধু ইংরেজ অভ্যুদয়ের যুগ কেন, কখনও বাঙালীর অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস ছিল না, যেমন আজ আছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বেলাতেই হোক আর বাঙালী বণিকের শিল্পজাত দ্রব্যের বেচাকেনা ব্যাপারেই হ'ক, একটা নির্ভিক এ্যাডভেঞ্চারের নেশাই যেন গৌড়ের ঐশ্বর্য ও তার শক্তিবৃদ্ধির প্রধান সহায় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দেখি সেই অপূর্ব যুগটাই বাঙালীর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের বিশাল স্বীকৃতি বুকে ধরে রেখেছে। এরপর ইংরেজ যুগ; এবং সৌভাগ্যক্রমে সে যুগেও এই এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা ছোট ছোট কত যে উপনিবেশ গড়ল তার ইয়ত্বা নেই। তার মৌলিক চিন্তাধারা, তার সংস্কৃতি, যুগোপযোগী নব্য ভাবনা সমগ্র ভারতে যেন বাঙালীর পৌরুষ পতাকা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত করে এল। ঘরে ঘরে গৌড়জনের প্রশংসা, আর সাগরে সাগরে বাণিজ্যের বিস্তার।

সে বাণিজ্য স্বতন্ত্র সংস্কৃতির এবং নির্ভিক সচেতন আত্মঘোষণার। কিন্তু সে যুগ চলে গেছে, এবং এই উৎসাহ, এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশার পরেও যেন চরম বিস্মৃতির পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। আজ বাঙালী নিজভূমে পরবাসী।

অনেকের মতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এই অবক্ষয়ের কারণ স্বাধীনোত্তর যুগের অসুস্থ রাষ্ট্রনীতির হট্টগোল। আবার অনেক স্যোশ্যালিষ্ট মনে করেন এই সমাজবাদের যুগে মহাজাতি চিন্তার ক্ষেত্রে এমন খণ্ড খণ্ড উপনিবেশ সৃষ্টির নেশা নিকৃষ্ট সংস্কৃতি। এদের দ্বদলের আপোস মীমাংসার দায়িত্ব লেখকেরও নয়—পাঠকেরও নয়। হয়ত এদেরও নয়। রাষ্ট্রিক আর সাংস্কৃতিক হাটের এ গোলযোগ চিরকালের; কারণ এতে কোন তরফের লাভ লোকসানের বালাই নেই। শুধু যথার্থ হল এমন দেউলিয়ার হাটে আরও আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে যদি এই ধারার পরিক্রমণ চলে তবে এককালের বাঙালীর বল, বুদ্ধি সাহসের সযত্ন ইতিহাসটি অনেকের কাছেই আষাঢ়ে গল্পের অবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে মাত্র।

অবশ্য প্রসঙ্গত দুটি যুক্তিরই অকাট্যতা অনেকে স্বীকার করবেন। বাঙালীমনে যে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা ইংরেজ আমলের অভ্যুদয়ের অনেক অনেক আগে থেকে ইংরেজ শাসনের শেষ

অধ্যায় অব্দি প্রবহমান ছিল অকস্মাৎ তা থেমে গেল কেন। কারণ একটা আছে বৈকি! অবক্ষয় এসেছে আমরা তা অনুমান করি। কারণ তা যুগোপযোগী। আর এ কথাও সত্যি ঔপনিবেশিক চিন্তাধারাও ঠিক এ যুগীয় নয়। বিবর্ত্তনবাদের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত জরুরী অধ্যায় হল মানুষ জাতির অসমান উন্নতি। পৃথিবীতে সব জাতিই অন্তত চিন্তার সাম্রাজ্যে সমান উন্নত নয়। কিন্তু সেইহেতু একটা জাতির ওপর আর এক জাতির প্রভুত্ব তা সে সাংস্কৃতিক হক আর রাষ্ট্রীকই হক এক রকমের স্বার্থপরতা। তাছাড়া সাংস্কৃতিক আত্মকেন্দ্রিকতার কথাও ভাবা দরকার যে কারণে আজ এই অবক্ষয় একটা ভয়াবহ উন্নাসিক গণ্ডিবদ্ধতা যেন বাঙালীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা ভুললে চলবেনা, এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবধারা যার অপর নাম সাংস্কৃতিক প্রাদেশিকতা থেকেই রাজনীতিক প্রাদেশিকতার জন্ম হয়েছে; এবং ১৯৪৭ সালের পর সে প্রাদেশিকতার রূপ এত উগ্র যে পরভূমে ও নিজভূমে বঙ্গসংস্কৃতি বিপন্ন।

সুতরাং আজকের দিনে যা সত্য তা আত্মরক্ষা। মানুষের একটা অতি আদিম বিশ্বাস হল মৃত্যুর জীবনের আশ্বাস। সেই পুরোনো পাথরের যুগের অধ্যায় থেকে বর্ত্তমান এ্যাটম যুগ অব্দি চিন্তাভাবনার প্রশ্রয় দেখতে পাই। অতএব আত্মরক্ষার আড়ালে নতুন করে জীবনস্বপ্নবিলাস মোটেই অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা হবে না। আসল কথা হল কোনরকমে সমাধিরচনার কালটা কিছু পিছিয়ে দেওয়া—সাময়িক ভাবে কিংবদন্তীর আশ্রয়ে থাকলেও ইতিহাস রচনার উপাদান গড়ে নেওয়া।

রবীন্দ্র সেনগুপ্ত

সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ ঃ আশ্বিন ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

স
ম
কা
লী
ন

পঞ্চম বর্ষ আশ্বিন ১৩৬৪

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ও হিউম্যানিস্টের আদর্শ। তিনি নিজে ছিলেন 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যার সাধক, তাই তাঁর শিক্ষার আদর্শেরও ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম্। সেই জন্যই দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও, নবযুগের হিউম্যানিষ্ট আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী করে তোলেনি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনঃচর্চার আবশ্যকতা তিনি অস্বীকার করেন নি কখনও, কিন্তু চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং নিজে তা পরিবর্তন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক এবং সেখানে অতীতের সঙ্গে কোন আপস-রফা তিনি করেন নি। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় বিদ্যার সমন্বয় তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু বিদ্যার্জনের ও বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতির কোনরকম মিশ্রণ কোনকালেই তাঁর কাম্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই দিক দিয়ে মনেপ্রাণে একজন "ইয়োরোপীয়" শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কোন ভাবে গোঁজামিল বা মনের সংশয় ছিল না। 'হিউম্যানিজম' অবশ্যই তার মূল উৎস ছিল। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে তিনি যতদূর সম্ভব এদেশের শিক্ষাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণাকেন্দ্র। শাস্ত্রকার নয়, পুরোহিত নয়, গুরু নয়, পণ্ডিত নয়, সবার উপরে 'মানুষ' গড়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুখীন শিক্ষানীতির প্রবর্তকরূপে বিদ্যাসাগর আজও শিক্ষাকেন্দ্রে 'একক' স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষায়তনকে তিনি মানবধর্মের 'নার্সারী' করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকালের চতুষ্পাঠী, আশ্রম বা সাম্প্রতিক-কালের ডিগ্রী-উৎপাদনের কারখানা করতে চাননি। তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ সত্য হয়নি, তাঁর পরিকল্পনাও অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তা সব দেশেই হয়েছে, কেবল এদেশে হয়নি। কোন দেশে কোন কালে, কোন আদর্শবাদীর স্বপ্নই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। উনিশ শতকের অনেক আদর্শ ও স্বপ্ন যেমন আজ ধূলোয় লুণ্ঠিত, অবহেলিত ও বিকৃত, শিক্ষাব্রতীদের আদর্শও তেমনি অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত। কিন্তু তাই বলে তাঁদের শিক্ষা-

দর্শের বা শিক্ষা-পদ্ধতির কোন সামাজিক সুফল ফলেনি, এমন কথা বলা সংগত নয়। গত একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে, সামাজিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তা শিক্ষার প্রসার ভিন্ন হত না। উনিশ শতকের অনেক শিক্ষাব্রতী শিক্ষার এই প্রসারের কলাকৌশলের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁদের অনেকে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ছিলেন। বাংলাদেশে থেকেও বিদ্যাসাগর তাঁদের শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁদের চিন্তায় ও আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তার মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য, তা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সংঘাতই শিক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে তো বটেই, বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গেও। তার মধ্যেও তিনি যতটুকু শিক্ষাসংস্কার করতে পেরেছিলেন, তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্ও গড়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাব্রতীদের আদর্শ ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, কোথাও তা লেখা নেই। তার প্রমাণও কোন দলিলপত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কারের ধারা, রীতি ও পদ্ধতি বিচার করলেই বোঝা যায়, একশ বছর আগে হঠাৎ একদিন এসব তিনি চিন্তা করে ফেলেননি। বিশ্বের, বিশেষ করে ইয়োরোপের, সমকালীন শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথাও ছিল নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে? সন্ধান পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে। 'বিখ্যাত গ্রন্থাগার' বলছি, কারণ তখনকার দিনে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের আগ্রহ এবং গ্রন্থপ্রীতির আতিশয্য সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের আজও যে অবশেষ রয়েছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে', তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এই যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌতূহলী হয়ে এই গ্রন্থসংগ্রহ আমি নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম। দেখে, অনেক সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নানাদিক ছাড়াও, তাঁর কর্মজীবনের অনেক বিচ্ছিন্ন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর সংগৃহীত পুঁথিপত্র পুস্তকের মধ্যে। তাঁর জীবনের এই সবচেয়ে প্রিয় নিত্যসঙ্গীদের দিয়ে তাঁকে যেমন চেনা যায়, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই যায় না।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারে শিক্ষাবিষয়ে অনেক বই এখনও রয়েছে। অনেক বই নানা-বিপর্যয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে, নষ্টও হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যা রয়েছে, সূত্রসন্ধানের পক্ষে তাই যথেষ্ট। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সমকালে, ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের শিক্ষাব্রতীরা যেসব শিক্ষাসমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যে পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছিলেন, বিদ্যাসাগরের সংগৃহীত পুঁথিপত্র দেখে বোঝা যায়, তার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল অন্তরের, এবং তার প্রতি তাঁর কৌতূহলও ছিল অসীম। ইংলণ্ডে এই সময় জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, মডেল স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ ও আন্দোলন চলছিল। বিদ্যাসাগর যে এই শিক্ষাসংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে খুবই ওয়াকেবহাল ছিলেন, তা তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তকসংগ্রহ থেকে বোঝা যায়। ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মডেল স্কুল, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক

সমসাময়িক কালের বই তাঁর সংগ্রহে আছে। অকারণে অর্থব্যয় করে তিনি নিশ্চয় সেগুলি সংগ্রহ করেননি। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে গেলেও, আজও এইসব বইয়ের 'মার্জিনে' তাঁর হাতে-লেখা 'নোট' ও চিহ্নাদি দেখে বোঝা যায়, কত আগ্রহ নিয়ে এগুলি তিনি পড়তেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কারের ধারার সঙ্গে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবল পুথিপত্রের ভিতর দিয়েই এই পরিচয় ঘটেনি। এই সময় রাজকার্যে যে সব ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই নূতন শিক্ষাদর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁদের সংস্পর্শে এসেও বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাসংস্কারের কাজে অনেকটা উৎসাহিত হয়েছিলেন।

অনেকের ধারণা, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বেশী নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছিলেন। তা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রেও, তাঁর কালে, তিনি যে নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজকের দিনেও ভাবলে অনেকে অবাক হবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এবং 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবের' আদি রচয়িতা হয়েও, প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার যে কোন বিভাগের যাকিছু ভ্রান্ত সারশূন্য ও অপ্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছে, তা তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছেন সেই 'সংস্কৃত কলেজ' থেকেই তাঁর শিক্ষাসংস্কার শুরু হয়েছে। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে, সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে, তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে দাখিল করেন, এবং কলেজের অধ্যক্ষতাকালে, ১৮৫৩ সালে, বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন-রিপোর্টের উত্তরে যে সমালোচনা সংসদে পাঠান—তা বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে দুটি যুগান্তকারী দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য। দুঃখের বিষয় শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে বা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, বা করেছেন, তাঁরা এই দুটির আসল প্রতিপাদ্য নানা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান দেখা গেছে। তার কারণ তাঁদের ধারণা, বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিষয়ে যে-সব নির্ভীক মতামত এই দুটি রিপোর্টে ব্যক্ত করেছেন, তা আজও আমাদের বিদ্বৎসমাজের কাছে হয়ত 'চরম' বলে মনে হবে এবং তার প্রচার হলে তাঁর লোকপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এ-ধারণা, আমাদের মনে হয়, ভুল। বিদ্যাসাগর চরিত্রের উপলব্ধির দিন, বা তাঁর প্রকৃত লোকপ্রিয়তার দিন, আমাদের দেশে ও সমাজে এখনও আসেনি। তাঁর চরিতকার ও তথাকথিত ভক্তবৃন্দের বিকৃত ব্যাখ্যান ও ফিসফিসানির তলায় তাঁর প্রকৃত চরিত্র, সমাজ ও শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর আসল মতামত, আজও চাপা রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ভবিষ্যতের সমাজে, সত্যকার শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মানুষ, তাঁর চরিত্রের ও মতামতের ন্যায্য মূল্যায়নে সমর্থ হবে। তার আগে, আজকের মতন, তিনি অর্ধবিস্মৃত হয়েই থাকবেন।

দলিল দুটির কথা বলি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হবার একমাস আগে, শিক্ষাসংসদের কাছে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে পাঠ্যবস্তুর সংস্কার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করেন। যেমন ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে 'মুগ্ধবোধ' পাঠ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তা ছাড়া, 'Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries..is an imperfect grammar', বাঙালী ছাত্ররা বাংলা-

ভাষায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়বে এবং তার সঙ্গে সুনির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য পাঠ করিয়ে সাহিত্যবোধ তাদের জাগাতে হবে। পরে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' পড়বে, কারণ "of all the Sanskrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject." এরকম **সাহিত্য অলঙ্কার জ্যোতিষ** ইত্যাদি বিষয়ের প্রচলিত বহু পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তিনি সমালোচনা করেছেন। **সাহিত্যের পাঠ্য** শ্রীহর্ষের 'নৈষাধচরিত' সম্বন্ধে বলেছেন—'Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste; there are occasional bursts, however, of fine passages.' সুতরাং তার নির্বাচিত অংশ পড়লেই যথেষ্ট। **অলঙ্কারের পাঠ্য** 'সাহিত্যদর্পণ' ও 'কাব্যপ্রকাশ' সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of Rhetoric." সুতরাং সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যদর্শন ও রসগঙ্গাধরের বদলে কেবল কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক পাঠ্য হওয়া উচিত। **জ্যোতিষ** সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ছাত্ররা এখন ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও বীজগণিত' পড়ে, কিন্তু বই দুটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথেষ্ট নয় এবং তাদের পদ্ধতিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া, অকারণে বিষয়বস্তুকে জটিলও করা হয়েছে, নিয়মকানুন প্রশ্ন সব কাব্যে লেখা হয়েছে। চার বছরে ছাত্ররা বই দু'খানি পড়ে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু শেখে না। সুতরাং জ্যোতিষশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের আগাগোড়া পরিবর্তন করতে হবে। ভাল ভাল ইংরেজী পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক থেকে অবিলম্বে তিনখানি পাঠ্যবই সংকলনের প্রয়োজন। এগুলি পড়বার পর ছাত্ররা লীলাবতী ও বীজগণিত পড়তে পারে। Higher Mathematics-এর বই পরে অনুবাদ করে পাঠ্যপুস্তক করতে হবে। Astronomy সম্বন্ধে, আমার মনে হয়, হার্শেলের বই অবলম্বন করে বাংলাভাষায় একখানি পাঠ্যপুস্তক লেখা উচিত। ইংরেজী বই পড়লেও চলত, কিন্তু বাংলাভাষায় লিখতে পারলে অন্যান্য অনেক বাংলা স্কুলেও এ-বই পাঠ্য হতে পারে।" **স্মৃতিশাস্ত্র** সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "মনুসংহিতা" হিন্দু বিধিবিধানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কারণ "It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a mannar an index of Hindu Society in ancient times." সুতরাং মনু অবশ্যপাঠ্য। বিজ্ঞানেশ্বরের **'মিতাক্ষরা'** Civil ও Criminal Law—সম্বন্ধে 'is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Provinces.' তাই মিতাক্ষরাও পড়তে হবে। বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামনি' বিহার প্রদেশে প্রচলিত। তাও পড়া উচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' তো পড়তেই হবে। 'দত্তক মীমাংসা' ও 'দত্তক চন্দ্রিকা' দত্তক গ্রহণ ও দত্তকের অধিকারাদি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মীমাংসা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য, 'চন্দ্রিকা' বাংলাদেশের জন্য। 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' রঘুনন্দন বিরচিত, কিন্তু এর মধ্যে কেবল 'দায়' ও ব্যবহার এই দুটি তত্ত্ব ছাড়া বাকি ২৬টি তত্ত্ব ধর্মানুষ্ঠানের তত্ত্বকথা। সুতরাং 'the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued.' কারণ 'Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course.' **ন্যায়শাস্ত্র** প্রসঙ্গেও তিনি পাঠ্যবিষয় ও পণ্ডিতদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।

'অনুমানচিন্তামণির' লেখক গঙ্গেশোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলেছেন : 'His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle-ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a 'cobweb of learning.' শ্রীহর্ষের বিখ্যাত 'খণ্ডন' সম্বন্ধে বলেছেন—'The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call 'muddy metaphysics'." অবশেষে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে 'ন্যায়ের' বদলে এই শ্রেণীর নাম 'দর্শনশ্রেণী' রাখা হোক। দর্শনবিদ্যার অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই বলে তিনি শেষ করেছেন : "True it is that the most part of the Hindu System of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanskrit Scholar their knowledge is absolutely required." এই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে, "ছাত্ররা যখন দর্শন-শ্রেণীতে পড়বে তখন ইংরেজীও এতটা অন্তত শিখতে পারবে যাতে আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের বই পড়তে তাদের কষ্ট হবে না। তাহলে আমাদের ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা করা বা পার্থক্য বিচার করাও তাদের পক্ষে সহজ হবে। এই সব সুশিক্ষিত ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন হিন্দু দর্শনের ভুলভ্রান্তি বা অযুক্তি প্রমাণ করা যত সহজ হবে, কেবল ইয়োরোপীয় দর্শন পাঠ করে তা সম্ভব হবে না। সবরকমের দর্শন আমি ছাত্রদের পড়াতে চাই, কারণ তা না পড়লে বিভিন্ন মতের দার্শনিকেরা কি ভাবে পরস্পরের মতামত ও যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন, তা তারা জানতে পারবে না। তা না জানলে, কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য, আর কোন্‌টা বর্জনীয়, তাও তারা বুঝতে পারবে না। তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় দর্শনে জ্ঞান থাকলে এই বিচারবুদ্ধি তাদের আরও সজাগ হবে।"

এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে এই রিপোর্টেই বিদ্যাসাগর তাঁর সুচিন্তিত মতামত নির্ভয়ে ব্যক্ত করেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনান্তে যে রিপোর্ট দেন, তার উত্তরের মধ্যেও বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম রিপোর্ট আর দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে তাঁর বক্তব্য স্বভাবতঃই আরও সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। ব্যালান্টাইন বিশপ বার্কলের 'Inquiry' গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে অনুমোদন করেন। বিদ্যাসাগর তা বাতিল করেন। বাতিলের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি কি তা জানবার আগে, বার্কলে সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলা দরকার, কারণ বার্কলে প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশপ বার্কলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক। তাঁর মতে, বাইরের বস্তুজগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, মানসলোকে তার প্রতিফলিত রূপই 'সত্য'। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, চেতনাই সত্য। এই চেতনায় ঈশ্বর। এই ভাববাদী দর্শন শিক্ষার জন্য কোন ভারতীয়ের প্রয়োজন নেই বার্কলের কাছে দীক্ষা নেবার। ছাত্রদের তা গেলানোরও আবশ্যকতা নেই। আর তাতে কোন্ উদ্দেশ্যই বা সফল হবে? বিদ্যাসাগর তাই ব্যালান্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে লিখলেন : "বার্কলের Inquiry পাঠ্য হলে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই বেশি। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। এখানে সে-সব কারণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, সে-সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নেই। মিথ্যা

হলেও অবশ্য হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতেই হবে, তখন ছাত্ররা যাতে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য ইংরেজীতে যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলে পড়িয়ে লাভ কি? বার্কলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মতন একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। ইয়োরোপেও এখন আর তা খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই বার্কলে পড়িয়ে কোন সুফল লাভের আশা নেই।"—এই হল বিদ্যাসাগরের যুক্তি। যেমন স্পষ্ট, তেমনি নির্ভীক। কোন ধোঁয়া নেই, বাক্‌চাতুর্যও নেই। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ যে কতখানি মানবমুখীন তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়।

ব্যালাণ্টাইন তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেনঃ "এখন এমন এক শ্রেণীর লোক গড়ে তোলার দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে, উভয় দেশের পণ্ডিতদের মতের ঐক্য খুঁজে বার করবেন, এবং ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করবেন।" ব্যালাণ্টাইনের এ-যুক্তি যে কতখানি হাস্যকর, একটু চিন্তা করলেই তা বোঝা যায়। আসলে শিক্ষার স্বার্থে নয়, বৃটিশ শাসনের স্বার্থেই তিনি এই 'সামঞ্জস্য' স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বার্কলের দর্শন পাঠ্য করতে চাওয়ারও সেই উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজরা তখনও এদেশে প্রগতিশীল দর্শন বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে ভয় পেতেন। এ দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় খুব বেশি হস্তক্ষেপ করতেও তাঁরা চাইতেন না। সেকালের পণ্ডিত-গোষ্ঠীরও বিরাগভাজন হওয়া তাঁদের কাম্য ছিল না। তাই ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের হাস্যকর সামঞ্জস্যের কথাও তাঁরা কল্পনা করেছেন। কিন্তু দূরদর্শী বিদ্যাসাগরের কাছে এই ফাঁকা বুলির অযৌক্তিকতা ধরা পড়েছে। তিনি ব্যালাণ্টাইনের 'সামঞ্জস্য'-সাধন প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছেন এই বলে ঃ 'আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাতে পারব।..সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে, পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিচিত্র মনোভাব দেখা দিচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে যার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখানো বা চিন্তা করা দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের অন্ধবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। 'সবই শাস্ত্রে আছে' এই কথা ভেবে তাঁরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অতএব এই পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক তৈরী করবার কল্পনা করে লাভ নেই। তাঁদের তোষণ করার নীতিতেও কোন ফল হবে না। তাঁদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই। আজ তাঁদের মর্যাদাও লুপ্তপ্রায়, তাঁদের তম্বিগম্বিতে বা আস্ফালনে ভীত হবারও কারণ নেই। ক্রমেই তাঁদের কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। পূর্বের সামাজিক আধিপত্য তাঁরা চেষ্টা করলেও আর ফিরে পাবেন না। বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেখানেই এই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের লোকের শিক্ষার আগ্রহও আছে যথেষ্ট। সুতরাং প্রাচীনপন্থী দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা না করে, দেশের নানা স্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে অনেক বেশী কাজ হবে বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের কথা না ভেবে, এখন দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করার দরকার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন একদল মানুষ গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা মাতৃভাষায়

পারদর্শী হবেন, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানী ও অনুরাগী হবেন এবং সবরকমের কুসংস্কার থেকে যাঁদের মন মুক্ত হবে। এই হবে শিক্ষকের গুণ। এই ধরনের মানুষ গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য, আমার সংকল্প। তার জন্য সংস্কৃত কলেজে আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা নিয়োগ করব। কলেজের পাঠ শেষ করে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা এই ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে। এ আশা মিথ্যা নয়।"

অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই আশার কথাটা হয়ত একটু বেশী করেই বলেছিলেন। কিন্তু যে মানবিক শিক্ষাদর্শের প্রবর্তক ছিলেন তিনি, তার রূপ-কল্পনায় তখন নৈরাশ্যের স্থান ছিল না।

বাংলা শিক্ষার প্রচলন, মডেল স্কুল স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন। তার বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই এখানে। তাঁর কীর্তির এই সুদীর্ঘ ক্যাটালগ রচনা করে তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের আদর্শ বোঝানো ততটা সহজ হবে না, যতটা পূর্বোক্ত দলিল দুটির প্রতিপাদ্য প্রকাশ করলে সম্ভব হবে। জানি না, আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই দুটি বিবরণীর মতন আর কোন 'দলিল' আছে কি না—যা চিন্তায় ও পরিকল্পনায় এত গভীর ও ব্যাপক, এত বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী, এত বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত। সমাজ-সংস্কারে যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি, তিনি সমান সৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের পণ্ডিতসমাজের ভ্রূকুটির কথা ভেবে তিনি তাঁর শিক্ষাসংস্কারের সংকল্প থেকে এতটুকু বিচলিত হননি। প্রয়োজনবোধে তাঁদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতেও বাধ্য হয়েছেন। এমনকি সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের 'ভ্রান্তি' সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাও যে তিনি কতখানি বিচার করে, যাচাই করে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন, বার্কলের গ্রন্থ বাতিল করার যুক্তি থেকেই তা বোঝা হয়। ইংরেজরা সেকালের পণ্ডিতসমাজকে তোষণ করে চলতে চেয়েছিলেন, এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যা প্রগতিশীল চিন্তাধারার পোষক, তা এদেশে সহজে আমদানি করতে চাননি। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, সেকালের পণ্ডিতদের মন যুগিয়ে চলতে, বিদ্যাসাগর তা চাননি—এবং তাঁরা যা চাননি, বিদ্যাসাগর তাই চেয়েছিলেন, কেবল প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি এদেশের শিক্ষণীয় বিষয় করতে। তাও যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্যে। ব্যালাণ্টাইন প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতদের মতন তাই তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন বা ঐক্যের সন্ধান থেকে বিরত ছিলেন এবং তার 'বিপদ' সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। সেই বিপদ হল, 'সবই শাস্ত্রে আছে' মনে করার বিপদ, 'সবই বেদে আছে' এই মহানন্দময় চৈতন্যের সংকট। বিদ্যাসাগর বলেছেন, তখনই পণ্ডিতদের মধ্যে এই চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছিল, কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে। আজও, একশ বছরের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অগ্রগতির পর, এই চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাই না কি আমরা এদেশের বিদ্বৎ-সমাজে? বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-দর্শের এখনও সম্পূর্ণ জয় হয়নি, ব্যালাণ্টাইনদের আদর্শের প্রভাব এখনও যথেষ্ট রয়েছে। নব-যুগের ইয়োরোপের 'হিউম্যানিষ্ট' আদর্শের প্রবাহের পথ যাঁরা আমাদের দেশে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সেই ইংরেজরাই সেই আদর্শকে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের স্বার্থে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিকৃত করতে কুণ্ঠিত হননি। বিদ্যাসাগর সেই 'হিউম্যানিজ্‌মের' আদর্শের বীজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বপন

করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য সর্বপ্রথম দেশীয় বিদ্যার ঐতিহ্য থেকে এই আদর্শের পুষ্টির উপযোগী সার সংগ্রহ করার আবশ্যকতা তিনি যেমন বোধ করেছিলেন, তাঁর সমকালে আর কেউ তা করেননি। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের চারিদিকে যুগ-যুগ ধরে গজিয়ে-ওঠা বিষাক্ত আগাছা ও আবর্জনার প্রতি, কেবল ঐতিহ্যের মোহে, তিনি আকৃষ্ট হননি। নির্মমভাবে তা ছাঁটাই করেছেন, নির্মূল করারও চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের স্বর্ণকান্তিতে তিনি মুগ্ধ হননি, হিউ-ম্যানিজমের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করে, এদেশের মাটীতে 'transplant' করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের ভাষায় এই হিউম্যানিজমের মূলমন্ত্র হল—'Man is the measure of all things.' বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের একমাত্র মানদণ্ড ছিল 'মানুষ'। ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্টের উত্তরের উপসংহারে এই মানুষ গড়ে তোলার সংকল্পই তিনি গভীর আবেগের ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

এই শিক্ষাদর্শকে বিদ্যাসাগর কিভাবে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন, সে-সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। ছাত্রদের যে তিনি ভালবাসতেন বা দরিদ্র ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন, সেটা খুব বড় কথা নয়। ছাত্রদের তিনি 'মানুষ' বলে মনে করতেন, সেইটাই বড় কথা। সেইজন্য শিক্ষকদের সব সময় তিনি নির্দেশ দিতেন, ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করতে। তাঁর পাঠশালা-জীবন থেকে তিনি দেখেছেন, সেকালের গরুমশায়রা ছাত্রদের প্রতি কিরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাঁর সমবয়সী বন্ধু দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা) সেকালের এই গুরুমশায়-ছাত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনচরিতে লিখেছেন ঃ "তহানীন্তন গুরুমশায়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্টি গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত।...কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্য গুরুমহাশয় কোমল ভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষা বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।...ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যম স্বরূপ জ্ঞান করিত।" বিদ্যাসাগরের কালে এই ছিল শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক। বিদ্যাসাগর এই সম্পর্ককে মানবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকদের যম না ভাবে এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রদের অসহায় জীব না ভাবেন, মানুষ বলে মনে করেন, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ছাত্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, এরকম কোন শাস্তি বা নিষ্ঠুর আচরণের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাস শিক্ষকরা সহজে ছাড়তে পারবেন না জেনে, তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয় Metropolitan Institution-এর (শ্যামপুকুর শাখার) শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন ছাত্রদের প্রতি কোন অপমানকর ব্যবহার না করা হয়, অথবা তাদের কোনরকম দৈহিক দণ্ড না দেওয়া হয়। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে একবার ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একটি ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। সেই খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ হেঁটে বিদ্যালয়ে চলে যান এবং সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান

করে, প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করেন। প্রতিবেশীরা ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁকে সামান্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত না হতে অনুরোধ করেন। কয়েকজন শিক্ষক প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর বিচলিত না হয়ে তাঁদেরও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

ঘটনাটি এমনিতে 'লঘু ব্যাপারে গুরু সিদ্ধান্ত' বলে মনে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে ঘটনাটির যতখানি গুরুত্ব ছিল, ঠিক ততখানি গুরুত্বই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের দিয়েছিলেন। বিখ্যাত সুইস শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শের ফলাফল সম্বন্ধে বলা হয় : 'Perhaps a more lasting effect of Pestalozzi's teaching was the elimination of repressive discipline and cruel and degrading forms of punishment from the common schools.' বিদ্যাসাগর পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শের কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে এ-সম্বন্ধে বইও আছে। পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তখন এদেশের শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে যে আলোচনা হত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থাগারে। কিন্তু পেস্তালৎসির কথা না জানলেও বা না শুনলেও, একথা নিশ্চয় বলা যায় যে বিদ্যাসাগরের মানবমুখীন শিক্ষাদর্শের পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় মানুষেরই মর্যাদা পেত, কলের পুতুল বলে গণ্য হত না॥

---

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্‌যাপিত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার তৃতীয় বক্তৃতা। দ্বারভাঙ্গা হলঘরে ৩১ জুলাই, ১৯৫৭, বুধবার প্রদত্ত। দ্বিতীয় বক্তৃতা 'সমকালীন' ভাদ্র সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রকাশিত হয়েছে।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

আমার লন্ডনের ষ্টুডিয়োর দেওয়ালে লাগান ছিল অনেক বছর ধ'রে একটি পোর্‌সেলিনের পুরনো চীনা-প্লেট্‌। একদিন সেটার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে অসাবধানে ঘা লেগে পেরেক খুলে প্লেট্‌টা পড়ল মাটিতে, আর ভেঙে হল শত খন্ড। সেটা তো গেল কিন্তু রইল দেওয়ালে, যেখানে সেটা লাগান ছিল; একটা আবছা গোল দাগ। আমার অবর্তমানে তা আর বোধহয় নেই। নতুন মালিকের দেওয়া ডিস্টেম্‌পারে গিয়েছে হয়ত ঢাকা পড়ে—মুছে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। যতদিন দেওয়ালের গায়ে সে দাগটিকে দেখা যেত, মনে করিয়ে দিত হারানো জিনিসটির স্মৃতি। কেবল ফ্যাকাশে একখানা গোল ছাপ, যার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পেতাম, চলে-যাওয়া সেই নক্‌শাদার পুরনো চীনা প্লেট—গোলাবী, নীল, সবুজ আর হাল্‌কা হল্‌দে ফুলপাতা, ঝক্‌ঝকে সাদা গোলের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। ঐ ছোট স্থানটুকুর মধ্যে সে করে নিয়েছিল, দেওয়ালের সঙ্গে পরম সান্নিধ্য। তারা ছিল পাশাপাশি—গায়ে গায়ে অথচ হারিয়ে যায়নি একে অন্যতে। তাদের মধ্যে মিল ছিল, কিন্তু তারা মিশে যায়নি, আর সেই সান্নিধ্যের স্মারক হচ্ছে ঐ ছাপটুকু—দেওয়ালের সব জায়গার রঙের চেয়ে একটু ফিকে সে—জল থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আলোর মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

জীবনের দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে নিলে, এমনি কত ছাপ—কেউবা স্পষ্ট, কেউবা আব্‌ছা—মূর্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে কত চ'লে-যাওয়া স্মৃতি, কিছুটা রঙে, কিছুটা নক্‌শায়—কতগুলি হাইলাইটে ও কতগুলি স্যাডোয়।

আতলিয়ে

ব'জুর ব'জুর। সকাল ন'টা থেকে সওয়া ন'টা পর্যন্ত আতলিয়ে [১] ঐ শব্দে সর্‌গরম। ম্যাসিয়ের [২] ষ্টোভে লাগিয়েছে গন্‌গনে আগুন। সারা রাত্তিরের জমা ঠান্ডা, তাপের ঠ্যালা খেয়ে কোণে কোণে থেমে যাবে কি-না যাবে ইতঃস্ততত করছে। কোট খুলে ওভালঅল পরবার সময় মুহূর্তের সুযোগে আগন্তুকের স্বল্প উন্মুক্ত শরীরে প্রস্থানোন্মুখ ঠান্ডা লাগায় দু'একটা আচম্‌কা খোঁচা।

থ্রোনের ওপর নগ্না মডেল, ষ্টোভের কাছে দাঁড়ানো থাকলেও তার গায়ে হংসচর্মবৎ গুটির বিস্তার দেখে বোঝা যায়, সেও এই প্রায়-বিতাড়িত ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পায়নি। বাইরের ইয়ার্ডেতে চৌবাচ্চায় রাখা ভিজে মাটি জ'মে কালো বরফ হ'য়ে গেছে। হাত-কোদাল দিয়ে তারই কয়েক তাল প্রত্যেকে নিয়ে আসছে। খানিক পরে আতলিয়েটা হয়েছে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সেই নীরবতা ভাঙে, মডেল-থ্রোন ঘুরিয়ে দেবার শব্দে। একঘণ্টা পরে ম্যাসিয়ের বলে "রোপ্যো"। [৩] স্পন্দনহীনা মডেল, যে এতক্ষণ যেন যাদুতে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ

১। আর্টিষ্টের কর্মশালা। ২। যেখানে ছাত্ররা কাজ করে তাদের তদারককারী। ৩। বিরাম।

ম্যাসিয়েরের ঐ মন্ত্রবাক্যে মায়াজাল ভাঙায় সে যেন ফিরে পেল তার নড়বার শক্তি। উ'চু করলো সে হাতদু'খানা। হাত না হয়ে পাখা হ'লে, মনে হ'ত সে যেন ডানা মেলে উড়ে যাবার প্রয়াসী। ঘাড়ের একদিকে মাথাটা হেলিয়ে, দিল একটা হাই। হাতের আড়াল দিয়ে হাই ঢাকবার ভান পর্যন্ত করল না। তারপর ধীরে তুল্‌ল একটি পা, নামলো অতি সন্তর্পণে থ্রোন থেকে। পাশে চেয়ারে রাখা একটি ঝোলা গাত্রাবাস উঠিয়ে ঢেকে নিল নগ্ন শরীরের খানিকটা। একটু আগে সে ছিল রূপরাজ্যের সিংহাসন-আসীনা দেবী, যার আদল নিয়ে এতগুলি পিগ্‌মেলিয়ন গড়ছিল তাদের গ্যালাতিয়া। ম্যাসিয়েরের ঐ "রোপ্যো" শব্দেই সে পরিণত হল সাধারণ নগ্না নারীতে—তার এল লজ্জা, সে হ'য়ে গেল ঈভ্‌ আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকল তার উন্মুক্ত বক্ষ ও জঘন। চেয়ারের উপরে রাখা কাপড় স্তূপে হাত ডুবিয়ে বার করল একটি শাসালো এ্যাপেল এক ক্ষণমুহূর্তে চল্‌ল লোলাসক্ত জিহ্বা, দন্ত ও এ্যাপেলের কসাকসি। যে সব নরনারীর দল এতক্ষণ নিবিষ্টমনে নীরবে গড়ছিল মূর্তি তারা হয়ে উঠল মুখর। আওয়াজে ভরে গেল সমস্ত আতলিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে জমিয়ে দিল কুয়াশা। চল্‌ল পরস্পরের মূর্তি নিরীক্ষণ, বিচার ও মীমাংসা। শোনা গেল শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও ভাস্কররথীদের নাম—আরকেয়েক গ্রীক, এতুস্কান, বেনিন্‌; দোনাতেল্লা, ঘিবার্তী, রোক্যাঁ, বুর্দেশ, ব্রাঙ্কুসী এবং আরো কত কি। পনেরো মিনিট যেতেই ম্যাসিয়ের বল্‌ল "রোকমাসে মিল্‌ ভ্যূ প্লে" আবার এসে গেল সেই নিস্তব্ধতা, প্রত্যেকে রত হ'ল তাদের গ্যালাতিয়ার গঠনে। ঈভ্‌ ফেলে দিল তার লজ্জাবসন—নগ্নারূপদেবী আরোহণ করলেন তাঁর বেদীতে।

একই মানুষ, একই চোখ, একই নগ্না নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্যাখে বিভিন্নভাবে। থ্রোনের ওপর দণ্ডায়মানা উলঙ্গ দেহের ওপর ওঠা-নামা ক'রে চলেছে তাদের দৃষ্টি কিন্তু সে দৃষ্টি থেকে যায় না কোন স্থানে কামনার ভিড় দেখে। নিস্পৃহ নিষ্কাম রূপ-তাপসের দৃষ্টি সে, কেবল দেখছে আর গড়ছে।

বারটা বাজল। ম্যাসিয়ের আবার বল্‌ল, "রোপ্যো—ইল এ মিদি।" দেবী পুনরায় হলেন ঈভ্‌ এবং ঈভ্‌ হল সাধারণ নারী। ঢিলে গাউনের আব্রু করে সে একে একে পরল ব্রাজিয়ের, শিলপ প্যান্ট, ব্লাউজ, সাসপেণ্ডার, ষ্টকিং, স্কার্ট ও জুতো। প্রত্যেকটি পরিধেয় তার সম্পর্কিত অঙ্গ ও তার ক্রিয়ার ইশারা যেন ব্যাখা হতে লাগল তার গায়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। চিরুণী পড়ে চুল হল সুবিন্যস্ত, গালে চড়ল রঙ, ঠোঁটে পড়ল কৃত্রিম রক্তিমা ও চোখে টেনে দিল সুর্মা। কে এল তার এক ছেলে বন্ধু। পরস্পরের বাহুতে বাহুবদ্ধ করে তারা চলে গেল। যাবার আগে সবাই বলে গেল "অরভোয়ার, আদেম্যা"। [৪] দ্বার প্রান্তে অপেক্ষামান বা অপেক্ষামানা বন্ধু বা বান্ধবী যে যার সঙ্গী নিয়ে উধাও হল কাফেতে, নয় রোস্তরাঁয়। কারা বা গেল লুক্সাঁবুর্গ উদ্যানে এবং বেঞ্চে বসে খেতে লাগল স্যাণ্ডুইচ্‌। দুটোর পর থেকে ফের শুরু হবে কাজ, আসবে আর এক মডেল। সকালে যারা কাজ করেছে তাদের কেউ না কেউ হয়ত থাকবে কিন্তু আতলিয়ে চলবে সকালের মতই সেই একভাবে।

দারিদ্রেরও কৌলিন্য আছে। যে সবচেয়ে গরীব, তার স্থান স্যাণ্ডুইচ্‌-খাওয়া-শ্রেণীরও নীচে। সেখানে শুক্‌নো রুটি আর তাকে গলাধঃকরণ ক'রতে যে রসনা রসের প্রয়োজন তার

৪। বিদায়, কাল দেখা হবে।

উপায়ের চেষ্টা করে মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো চীজে কামড় দিয়ে। এই ধরণের লাঞ্চ বা ডিনারের পরেও এক কাপ কফি খেতেও তাকে করতে হয় হিসেব, কারণ এও মাঝে মাঝে হ'য়ে যায় শৌখিন খরচ।

বাগানের এক নিভৃত কোণে বসে সে ভাবে, অতুল ঐশ্বর্যে শোনা যায় অনেকে থাকে অসুখী, সেইজন্যে এই অসীম গরিবানায় তার হওয়া উচিত পরম আনন্দ। আতলিয়েতে কেউ যদি আসে পরিচিত হতে, সে তখনি তাকে করে নিরস্ত। ভয় হয় যদি এই পরিচয়ের সংগে হয় কাফেতে নিমন্ত্রণ। ভদ্রতার খাতিরে, সে নিমন্ত্রণের প্রতি নিমন্ত্রণ দেবার ক্ষমতা তার নেই। চায় না সে পরিচয়—চায় না সংগী—বন্ধু বা বান্ধবী। একলা সে—স্বেচ্ছায়, নয় ঘটনাচক্রে। গ্যগাঁ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণ ভাবে লোকের ধারণা যে, অন্তিম দারিদ্র দেয় শিল্পীকে মহাশিল্পের সন্ধান ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু তারা ক'জন জানে যে দারিদ্রের অন্তিম পারে পা দিলে মানুষের মস্তিষ্ক হ'য়ে যায় ঘোলা; আত্মাটাও ডুবে যায় অতল কালিমায়।

আতলিয়েতে সকলের পরিচিত আসল নামকে বিকৃত করে, ব্যংগ নামকরণ করার একটা বাতিক ছিল অনেকের। একজন হোয়াইট্ রাশিয়ান ইহুদী, যার নাম ছিল পিটকীন্, সে ইংরেজী-বলা লোকেদের মহলে হয়ে গেল পিগ্স্কিন্। ইংরেজ মহিলা মাদাম মিউভিল, হ'লেন 'মাদাম্ মুভেদ্'। যাদের নাম উচ্চারণে জিভের আড় ভাঙতে কষ্ট হ'ত, তারা তাদের দেশের নামেই খ্যাত হল। আমাদের ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ্ পোলাণ্ডের লোক বলে অভিহিত হ'ল 'পোলনে' এবং সুইডিস ভাগারম্যান হয়ে গেল মঁসিয়ে সুইদোয়া। আমি পেলাম খেতাবী নাম বুসা-সিলাঁসিউ —নির্বাক-বুদ্ধ। আমি ছাড়া আতলিয়েতে ছিল আরো একজন নির্বাক, যে চাইত না কারোর পরিচয় বা বন্ধুত্ব। আড়ালে সকলে তাকে বলতো মুখ-বোজা-মার্থ।

২

আতলিয়েতে প্রায় সব ছেলেরা চেষ্টা করেছে, মার্থের সংগে মাখামাখির কিন্তু তার তর্জন ও তাচ্ছিল্যে হার মেনে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে যে সত্যি কেউ ভালবাসতে চেয়েছে, তা নয়। তাদের সকলের প্রয়াস ছিল তাকে জয় করবার। তারা তার পিছু নিয়ে দেখেছে, তার কোন ছেলে বন্ধু আছে কি না। সে লেস্বিয়ান্ কি না, তাও আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। কারণ তাদের ধারণায়, মেয়েরা যদি ছেলেদের সাথে প্রেম না করে, তাহলে তাদের প্রণয় হবে মেয়েদের সংগে। এ'দুয়ের একটি হওয়া চাই। কিন্তু যখন তারা জানল যে মার্থ তাদের জানা কোন শ্রেণীতেই পড়ছে না তখন তাদের চেষ্টা চলল জানবার, মার্থ মেয়ে হিসাবে শারীরিক পরিপূর্ণ কি না। তাদের কৌতূহলী মন সব ভাবে তলিয়ে মার্থকে জানবার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে এখন হয়েছে নিরুৎসুক ও নিস্পৃহ।

মনে পড়ে ছোটবেলায় পুকুর ধারে দেখতাম জীবন্ত শামুক শুঁড় বার করে চলেছে। দিতুম একটা কাটির ঘা অমনি শুঁড়-বার-করা-মুখ উধাও হয়ে গেল, নিমেষে শামুকটা হল অজীব ও অচল। পা দিয়ে ঠেলা দিলাম, গেল সেটা গড়িয়ে। প্রাণের আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিস্তব্ধে লক্ষ্য করলাম, আবার বেরিয়ে এল শামুক থেকে খয়ের রঙের একটা জিভ, যার ডগায় রয়েছে উঁচিয়ে দু'টো শিং। আবার ধীরে মাটির গায়ে লেপ্টে চলল সে।

মার্থকে দেখে আমার মনে হত, সে যেন সেই শামুকের মতো হঠাৎ ঘা খেয়ে একটা খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। তাকে নাড়া দিলে আরও খোলের গভীরে নিজেকে সে তলিয়ে দেয়। আমার পাশেই ছিল তার মডেলিং ষ্ট্যান্ড। একবার তাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই আর সকলেই আমায় দিল তাড়া—"ওর সঙ্গে কথা ব'লো না হে, কামড়ে দেবে। খ্যাপা কুকুর দেখেছ? ও তার চেয়েও বেশী খ্যাপা। কাজেই ওর ধার সামলে চ'লো।" মার্থ এই কটূক্তিতে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। তার চোখের ঘোর নীল তারা দুটি একবার যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার সে দুটি পাথরের নকল চোখের মত নিরেট ও স্থির হয়ে গেল। সে ক'রে চলল আপন কাজ।

ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ্-এর আর্থিক সঙ্গতি ছিল প্রায় আমার, পিটকীন ভাগারম্যানের মত কিন্তু উদারতায় সে ছিল সবচেয়ে ধনী। সে থাকত গত শতাব্দীর কোন ধনীর পাঁচমহালী বাড়ীর প্রাঙ্গণ প্রান্তে জুড়িগাড়ীর আস্তাবলের একটি কামরায়, যেখানে থাকত আগে ঘোড়ার ঘাস। সে পাঁচমহালী বাড়ী এখন হোটেলে পরিণত আর আস্তাবলের প্রায় সবটাই ধোপার কাপড়-কাচাই-খানা। সেই আধ-অন্ধকার স্যাঁৎসেতে, সিদ্ধকাপড়ের ও সাবানজলের ভ্যাপ্সা গন্ধে ভরা ঘর-খানিই ছিল সিত্রিনোভিচের বসবার দালান, শয়ন কক্ষ ও কাজের ষ্টুডিয়ো এবং সেইখানেই ব'সে ছুটির দিনে চলতো আমাদের চারজনের শিল্পালাপ ও খোসগল্প। পোলান্ডের ইহুদী সিত্রি-নোভিচ্ ছিল বেঁটে খাট মানুষটি, যার ছোট চোখ দুটোয় সর্বদা দেখা যেত যেন সদ্যঘুমভাঙা আঁখির জলেভরা চাউনী। তার প্রায় টাকপড়া মাথার পিছনে ছিল শোণের মত জৌলুষহীন এক ঝুঁটি চুল, যা কয়েক বছর আগে হয়ত ছিল লাল্চে রঙের।

প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন থাকে কিছুটা অসাধারণের সম্ভাবনা যা যোগা-যোগে হঠাৎ উছ্‌লে বেরিয়ে আসে, আবার পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রে তার অভিব্যক্তি অঙ্কুরেই লুপ্ত হ'য়ে যায়। সিত্রিনোভিচের ভাস্কর্যে অসাধারণ ক্ষমতার ব্যঞ্জনা ছিল। কিন্তু কোথায় যেন ধাক্কা খেয়ে তার ভাস্কর্যের উচ্চ শির অযথা মাথা নামিয়ে জানাতে চাইত না তার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও মহত্ত্বের পরিমাপ। সে ছিল উৎকট কম্যুনিষ্ট্। ভাগারম্যান তাকে ঠাট্টা ক'রে বল্‌তো "তোমার কম্যুনিষ্ট হওয়া অত্যন্ত অশোভন, কারণ তাদের উগ্রতা অন্ধ-বিশ্বাস ও হিংস্রকঠিন স্বভাব তোমার মধ্যে একটুও নেই।" সে একটুও না রেগে বল্‌তো "ওটা রিত্রিক্‌শ্যানারিদের কম্যুনিষ্ট্ সম্বন্ধে একটি মিথ্যা ধারণা। বন্ধু আমরা উগ্র নই, কেবল আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতা তোমাদের চোখে লাগায় ধাঁধাঁ, আমাদের একনিষ্ঠতা জাগায় তোমাদের মনে ও হৃদয়ে আশংকা। একবার আমাদের নীতি নিয়ে দেখ না, তোমার শতাব্দীর জমা পচনশীল ও প্রস্তরীভূত অচল ধারণা একটু তাজা ও সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠ্‌বে।" একদিন সে তর্কে আমাকে বলেছিল "আরে এই যে পাথর কেটে মূর্তি গড়া সেটা কি কেবল ধ্বংস? এ কেবল অপ্রয়োজনীয়কে বাতিল করে আসল বক্তব্যকে সকলের সামনে পরিস্ফুট করবার একটি অবশ্য উপায় মাত্র। অনেকদিনের অবহেলিত ও নিবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রে ধ'রে যায় মর্‌চে, তাকে একটু ঘসে মেজে না নিলে ক্ষয় অগ্রসর হ'তে থাকে তার প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে।" আমরা যখন হেসে তাকে খেপাবার ছলে বলতাম "বকে যাও গো কার্লমাক্‌সের তোতাপাখী, ষ্টালিনের পাঁচালী গাও তো তোমাকে দেব আরও দানা।" সেও তেমনি হেসে বলত "ডেকাডেন্সের ডেলা সব তোমাদের প্রগেসিভ্ রোলারের চাপে দেব গুঁড়ো করে।" তারপরই

হাত ধরে টান্‌ত ক্যাফে দোমেতে যাবার জন্যে এবং তার শেষ কপর্দক খরচ করে আমাদের এক পেয়ালা কফি খাওয়াতো। মাঝে মাঝে চলত আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সম্বলের বিনিময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার অক্ষম চেষ্টা। সিত্রিনোভিচের জুতো জোড়া মেরাতম হ'তে হ'তে শেষে তালির তালিতে আর যোগাযোগ রাখবার স্থান ছিল না। ফাটা চামড়ার পর্দা উঁচিয়ে প্রায়ই উঁকি মারত তার পায়ের বুড়ো আঙুল আর গোড়ালির কড়া। ভাগারম্যান একদিন, পুরোন হলেও সেলাই খোলেনি এমন একজোড়া জুতো এনে তাকে উপহার দিল। বল্‌ল যে তার এক বন্ধু ভুলে তার হোটেলে জুতো জোড়া ফেলে গিয়েছে এবং তাকে লিখে জানিয়েছে যে তার ওটার আর প্রয়োজন নেই, তাই সে দিয়েছে সিত্রিনোভিচ্‌কে। আমরা সবাই মেনে নিলাম তার কাহিনী, কেবল জানতাম যে জুতো জোড়া ওর নিজেরই।

আতেলিয়েতে একদিন সিত্রিনোভিচ্ এল অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে। সুসংবাদ যে তার ভাগ্যে একটি ভাস্কর্য রচনার কমিশন মিলেছে। সে আমাদের তিনজনকে বল্‌লে যে আমরা তাকে এ কাজে সাহায্য না ক'রলে সে প্রতিশ্রুত সময়ে মূর্তিটি শেষ করতে পারবে না, অতএব আমাদের তার সংগে হাত লাগান চাই। ভাবলাম বুঝি কোন এক বিরাট মূর্তি তৈরী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল আড়াই ফুট উঁচু একটি বছর দশেক মেয়ের প্রতিমা, যা সিত্রিনোভিচ্ নির্দিষ্ট সময়ে একাই অনায়াসে শেষ করতে পারত। আমাদের তাকে সাহায্য করা ভান মাত্র দেখাল কারণ আসলে সে একাই করল সবকিছু। কয়েকদিন পরে সে এল আতেলিয়েতে হাতে একতাড়া একশো ফ্রাংকের নোট নিয়ে—ভাবটা যেন ন্যাশন্যাল লটারী জিতেছে। নোটগুলিকে ব্যাংকের কোষাধ্যক্ষের মত পারদর্শিতা দেখিয়ে গুণে, সে করল চারটি সমান ভাগ এবং আমাদের তিনজনের হাতে গুঁজে দিল তারই এক একটি। বল্‌ল, তাকে সাহায্য করার পারিশ্রমিক। সিত্রিনোভিচ্‌কে আমরা চিন্‌তাম ভাল করেই। এ অর্থ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ হ'ত না। সে পেয়েছিল তো মোটে পাঁচশো টাকার মত ফ্রাংক, তার আবার ভাগাভাগি! কিন্তু কে তাকে বোঝাবে একথা। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম ঐ ওর পন্থাতেই দেব তাকে ফিরিয়ে, তার কষ্ট-লব্ধ পারিশ্রমিক। পিট্‌কিন ভান করল একটি মূর্তি নির্মাণের কমিশন পেয়েছে এবং সে আমাদের ডাকল তাকে সাহায্য করতে। যখন তার মনগড়া একটি মূর্তি আমরা হাত লাগিয়ে শেষ করলাম, সিত্রিনোভিচ্‌কে আমাদের তিনজনকে দেওয়া ফ্রাংকগুলি তার পারিশ্রমিক বলে পিট্‌কিন্ তার হাতে দিল। সজলচোখে সিত্রিনোভিচ্ বল্‌ল, "তোমরা আমার অপমান করছ। চালাকি করে তোমাদের পারিশ্রমিক আমাকে ফেরৎ দিচ্ছ আর মনে কর—আমি এতই মূর্খ, যে এটা বুঝতে পারব না। আমি গরীব, সহানুভূতি দেখিও কিন্তু দয়া দেখাবার চেষ্টা ক'রো না।" ভাগারম্যান তার বিরাট দুই হাত সিত্রিনোভিচের প্রায়-দুমড়ে-পড়া-কাঁধের উপর সস্নেহে রেখে বল্‌লে "বন্ধু, তুমি টাকাটাকে এত প্রাধান্য কেন দিচ্ছ? কয়েকটা ফ্রাংককে উপলক্ষ করে তুমি আমাদের জানিয়েছিলে তোমার অপরিসীম বন্ধুপ্রীতি, দিয়েছিলে আমাদের তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা উজাড় করে। আজ যদি আমরা সে দানকে কত আদরে গ্রহণ করেছি তার একটা ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি দেখাবার চেষ্টা করি, নির্দয় না হলে তুমি তা প্রকাশ করতে বাধা দেবে না।" ভাগারম্যানের বলবার ধরণে ছিল যেন এক কলাকুশলী সেক্‌স্‌পীয়েরিয়ান্ অভিনেতার সম্মোহনের ভংগিমা। সে বাধ্য করল অভিভূত সিত্রিনোভিচ্‌কে ফ্রাংকগুলি নিতে। সে নোট্‌গুলি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বল্‌ল "চল শয়তানের

দল আমার সঙ্গে এখুনি কাফে দোমে। এই ছল পারিশ্রমিকের কিছুটা খরচ করে আমার সঙ্গে একপাত্র মদিরা পান করলে তোমাদের বন্ধুপ্রীতি আশা করি শুক্নো হ'য়ে উঠবে না।

এরপর চলে গেল কয়েকটা বছর ধ্বংস ও মৃত্যুর লীলাতাণ্ডবে ভরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। পারী ছাড়ার আগে আমার সামান্য সংগ্রহ ও সম্বলের পুঁজি রেখে এলাম সিত্রিনোভিচের আতালিয়েতে। বিদায় নেবার সময় সে বল্‌ল "জান আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে যে, প্রত্যেক বন্ধুকে বিদায় কালে আমরা দিয়ে দিই একখানা করে বুকের হাড়।" বল্‌লাম "বন্ধু আমি যেখানেই যাই না কেন, তোমার ঐ হাড়খানা অনুসরণ ক'রে সর্বদা পেঁছবে তোমার সবটাই আমার মনে।"

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রলয়বিধ্বস্ত ইয়োরোপের ঘটনা পুরোন কথায় দাঁড়িয়েছে। ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তন ক'রে ভয়সঙ্কুল মনে খুঁজে বেড়িয়েছি হারান বন্ধুত্বের স্রোতগুলি। কিন্তু সেগুলি কতক গেছে লুপ্ত হয়ে যুদ্ধাগ্নির শিখায় এবং কতকগুলি হারিয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত, অজানা, সংখ্যাহীন বিতাড়িতের গড্ডালিকায়। গেলাম সিত্রিনোভিচের আতালিয়ের ঠিকানায় কিন্তু পেঁছে দেখি সেখানে সে বাড়ীর কোন চিহ্নই নেই। পড়ে আছে একফালি ফাঁকা জমি, যার বুকের উপর কয়েকটা পুড়ে যাওয়া ভাঙা ইটের গাঁথুনি জানাচ্ছে এককালে সেইখানে হয়ত ছিল ঘর। হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় সামনের হোটেলের দরজা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল এক বৃদ্ধা কাঁশিয়ার্জ। কাছে গেলে বল্‌ল। 'কি খুঁজছ ওখানে?' জিজ্ঞাসা করলাম সিত্রিনোভিচ্ ও তার ঘরের খবর। বৃদ্ধা জানাল যে সিত্রিনোভিচ্ আর নেই এ জগতে। হীন বস্‌রা তাকে হত্যা করেছে। এই পাড়ায় একটি জার্মাণ সৈন্যের কে গুপ্তভাবে প্রাণ নেয়, তার প্রতিশোধ নিতে নাৎসী শাসক গ্রেপ্তার করে একশো নিরপরাধী অসহায় নাগরিকদের। তার মধ্যে ছিল বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে। সিত্রিনোভিচ্ ছিল তাদের একজন। তারা সকলেই হারিয়েছিল প্রাণ, কেবল সিত্রিনোভিচের মৃত্যু হয়েছিল একটু স্বতন্ত্রভাবে। বন্দীদের মধ্যে একটি যুবতীকে এক জার্মাণ সৈন্য ধর্ষণ শুরু করায় সিত্রিনোভিচ্ যায় এগিয়ে, তাকে রুখ্‌তে। কিন্তু সে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি, সেই সৈন্যের আগ্নেয় অস্ত্রে মুহূর্তের মধ্যে শত শত গুলিতে তার দেহখানা করে দিয়েছিল ঝাঁঝরা। শুধু তাই নয়, গেষ্টাপেরা এসে ভাঙল তার আতালিয়ে আর সেই ভগ্নস্তূপে লাগিয়ে দিলে আগুন, তার অস্তিত্বকে ধরার বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে। ভাগারম্যান ও পীট্‌কীন আজ কোথায় তা জানি না। সিত্রিনোভিচের সংক্ষিপ্ত জীবনী ক'জনেই বা জানে, বা জানবার তাদের প্রয়োজন কি! আমার কাছে র'য়ে গেছে তার স্মৃতির একটা ছাপ, যা মুছে দিতে চাইলেও যাবে না মুছে। আজও যেন শুন্‌তে পাই তার স্বর, দেখ্‌তেও পাই যেন তার স্বরূপটা—একটি সাধারণ মানুষ, যাকে আরও দশজনে জানবার সুযোগ পেলে সে হ'তো অসাধারণ।

সিত্রিনোভিচ্‌কে কে বল্‌বে না বীর? নিজের সামনে অসহায়া একটি যুবতীর পাশব ধর্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখা তার পৌরুষে সহ্য হয়নি বলেই জেনে শুনেই সে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদের তীব্রতায় মৃত্যুকেও সে মনে করেছিল তুচ্ছ। এই পুরুষকার হয়তো সাময়িক কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলের মধ্যে থেকেই এটা ফুটে বেরোয় না। তার কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় আর এক কাহিনী।

দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন পুরোদমে চলেছে। দলে দলে শিক্ষিত যুবক স্বার্থত্যাগ ক'রে খদ্দরের সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে নেমেছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠায়। তাদের অনেকেই দু' একবার কারাবাস ক'রে ফিরে এসেছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন হরিপদদা। তাঁকে কোন্ কারণে মাষ্টার মশাই বা পদবী দিয়ে অভিহিত না ক'রে কেন যে হরিপদদা বলা হত তা জানি না।

তিনি ছিলেন আমাদের দাদা স্থানীয় বন্ধুদের শিক্ষক। একহারা কাঁচা সোনার রঙের চেহারা ছিল তাঁর। কদম ছাঁটাই কালো চুল আর কালো এক জোড়া ভুরু ও কালো জ্বল্‌জ্বলে চোখের বাহার মিলিয়ে তাঁকে সুপুরুষ বলা গেলেও, বীরোচিত কিছু ছিল না তাঁর চেহারায়। বরং ক্ষীণ বপু সামর্থহীনদের দলে তাঁকে পংক্তিভুক্ত করলে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তাঁর মুখে সর্বদাই হাসি লেগে থাকত কিন্তু মাঝে মাঝে সে হাসির পিছনে উঁকি ঝুঁকি মারত দারুণ রাগের ছায়া, যা কোন সময়ে ফেটে বেরুলেই ঝাঁঝিয়ে দিত রুদ্র তাণ্ডবের ডঙ্কা। হরিপদদা আমাদের ছোটদের সঙ্গে কানামাছি খেলতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং আমাদের উপর কোন-দিনই তাঁর রাগের উত্তাপ এসে পৌঁছয়নি। সেটা বরাদ্দ ছিল কেবল প্রাপ্ত বয়সীদের জন্যে।

একবার তিনি দুটি ছাত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন জু-গার্ডেনে। গার্ডেন থেকে তিনি স-ছাত্র শেয়ালদা ষ্টেশনে চলেছেন বালিগঞ্জের গাড়ী ধরতে। দু'একদিন আগে বর্ষা আসব জানিয়ে দু'এক পশ্‌লা বৃষ্টি ফেলে গেছে। পথে সস্তায় সওদা করেছেন একজোড়া মরশুমী ইলিশ মাছ। ষ্টেশনে তিনি উপস্থিত হলেন এক হাতে ছাতি অপর হাতে মৎস্যদ্বয়, আর তাঁর ঝোলা খদ্দরের পাঞ্জাবীর দুই খেই ধরে তাঁর নাবালক সঙ্গী দুটি। টিকিট চেকারদের অন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল দুটি গোরা পল্‌টন্। তাদের কোমরে রিভলবার, হাতে ছোট ছড়ি। গেট পেরিয়ে যেমন বাড়ী মুখো কেরাণীকুল প্লাট্‌ফর্মে ঢুক্‌ছে, অমনি তারা তাদের পিঠে সপাং করে এক ঘা বেত লাগিয়ে খিল্ খিল্ হাসছিল। যেন কত মজার ব্যাপার। হরিপদদা একবার ভাল করে এদিক ওদিক তাকিয়ে ছাত্রদের বল্‌লেন, 'তোরা ঠিক আমার পিছনে থাকিস্—বলে বুকটাকে যতদূর সম্ভব সামনে চিতিয়ে তিনি গেট্ পেরুতে সুরু করলেন। সপাং করে পড়ল চাবুক তাঁর পিঠে। যেমন সহস্র আরও লোকের উপর তা পড়েছিল। কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁর বাঁ হাতের ইলিশ জোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে বাঁ দিকের গোরার মুখমণ্ডলে আছাড় খেতে লাগল আর সেই তালে তাঁর ডান হাতের ছাতির শেষাগ্র ডানদিকের পল্‌টন্ সাহেবের উদরে বিশেষ উত্তেজনা সহকারে নৃত্য সুরু করল। হরিপদদা সে সব্যসাচীর মত এক সঙ্গে এমন দু'হাত চালাতে পারেন, এ দেখ্‌লে তাঁর পরিচিত অনেকেই হতভম্ব হয়ে যেত। ছাত্ররা তো ভয়ে আড়ষ্ট। এই বোধহয় হরিপদদার শেষ আস্ফালন। পল্‌টন্‌রা এখুনি রিভলবার বের করে তাঁকে গুলি করে, দেবে দফারফা করে। কিন্তু এই ভাবনা তাদের মাথায় ভালভাবে কায়েমি হবার আগেই যে নিঃসহায়ক কাপুরুষ কেরাণীকুল বেত খেয়ে নীরবে চ'লে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন কার মায়া আহ্বানে জেগে উঠে মার্ মার্ শব্দে পল্‌টন্ দু'টিকে ঘিরে ফেল্‌ল। কেউ তাদের হাতদুটি ধরলো মুচড়ে পিছনে। একটু আগে এরা বীরত্বের দম্ভে হেসে মারছিল বেত, এখন ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গলার সুর মিহি করে চ্যাঁচাতে লাগল 'হেল্‌প হেল্‌প'। রেলওয়ে পুলিশ কয়েকজন সত্বর এসে পড়ায় তারা কোনমতে উদ্ধার পেল মারমুখী জনতার পীড়ন থেকে। হরিপদদা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ছোট সঙ্গী দুটির সঙ্গে। তিনি পুলিশদের বল্‌লেন 'ও দুটোকেও গ্রেপ্তার কর, ওরাই প্রথম মেরেছে।

ইতস্ততঃ ক'রে পুলিশরা খুব অমায়িকভাবে পল্টন্ দু'জনকে তাদের সঙ্গে যেতে বল্‌ল। তারা বাধ্য শিশুর মত চল্‌লো তাদের নির্দেশ অনুযায়ী। ষ্টেশনেই একটি ছোট কোর্টের মত আদালত বসলো। যিনি জজিয়তি করছিলেন তিনি খুব আম্‌তা আম্‌তা ক'রে টমি দুটিকে বল্‌লেন যে বাবুটির এই অভদ্র আচরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, তার মারফৎ এই আদালতের সবাই তোমাদের এবং সরকারের মাপ প্রার্থনা করছি। এইবার হরিপদদার রাগের বম্ ফেটে পড়ল। তিনি যে জজিয়তি করছিল তার দিকে না তাকিয়েই বলতে আরম্ভ করলেন, টমি দুটিকে উদ্দেশ্য ক'রে "বীরের সন্তানদের কি উচিত আচরণ, নিরস্ত্র জনতা যারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের বেত মেরে বেইজ্জৎ করা? কোমরে রিভলবার আর পল্টনের ইউনিফর্‌ম প'রে বড় দম্ভ তোমাদের —মনে করছ নিজেদের শাসক আর আমরা তোমাদের গোলাম। আমি লিখব তোমাদের কমানড্যাণ্ট-এর কাছে, তোমাদের এই নির্লজ্জ তামাশার কথা আর তাতে সই থাকবে এই জনতার প্রত্যেকটি লোকের।" জজ্ সাহেব তখন বলছেন "মশাই চুপ করুন, এরকম বেয়াদপি করলে জেলে যাবেন।" তাকে ধমক দিয়ে তিনি বল্‌লেন "চুপ কর্ মোসাহেব—ইংরাজের কেনা দাস। নিজের মান সম্ভ্রম ওদের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছ এখন চাও আমরাও তোমার মত ওদের নিষ্টিবন ভক্ষণ করি।" ইতিমধ্যে পল্টন্ দুটি এগিয়ে হরিপদদার দুটি হাত ধ'রে বলতে শুরু করেছে "বাবু আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা তোমার এবং সকলের কাছে মাপ চাচ্ছি আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা এরকম অভদ্র আচরণ আর কোনদিন করব না।" জনতা তাদের এত নরম হতে দেখে চ্যাঁচাতে লাগল "মার্ বেটাদের, খুন কর" ইত্যাদি। কিন্তু হরিপদদা হঠাৎ শান্ত হয়ে বল্‌লেন "ছেড়ে দাও ওদের, আমরা ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি কিন্তু আমরা ভদ্র জাত। কুকুরে কামড়ালে তাকে কামড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আশা করি এই শিক্ষা যেন ওরা মনে রাখে। তারপর জজ্ আর পুলিশের হুকুমের অপেক্ষা না করেই তিনি ছাত্র দুটিকে বল্‌লেন "চল্ এখন বাড়ি। কিছুটা যুদ্ধাহত অবস্থায় মাছদুটি তখনও তাঁর হাতে। সদর্পে ছাতি বগলে বুক চিতিয়ে চলেছেন একটি ক্ষুদ্রবপু বাঙালী, যার মনে প্রাণে জীবনীশক্তি টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে।

জানি না আজ হরিপদদাই বা কোথায় আর কোথায়ই বা সেই পরাধীন ভারতের শাসক পল্টন্ দুটি। তিনি হয়ত এই ঘটনাকে ভুলে গেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রম কারাবাসে ও জীবনের বৃহত্তর কর্মে। পল্টন্ দুটি যদি এত লড়াইয়ের ধুমধাক্‌কা কাটিয়ে বেঁচে থাকে আজও, হয়ত মনে করে তাদের রিভলবারের সামনে চিতিয়ে দেওয়া শীর্ণ একটি বক্ষ, যার মধ্যে সাহস ও বীরত্বের অভাব ছিল না।

আত্মজীবনী

সোমেন বসু

আত্মকথা বা আত্মজীবনী সম্পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য কিনা এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বর্তমানে সুরু হয়েছে। এতদিন এইবস্তু নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামান নি। কারণ বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ভাল ভাল আত্মজীবনী সৃষ্টি হলেও তা বেশীদিনের পুরোনো নয়। তাছাড়া অনেকের মনেই একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে যে আত্মকথা আত্মপ্রচারের মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয়। ব্যক্তিবিশেষের কথায় নিশ্চয়ই একটা আত্মবোধ প্রবল হবে—সুতরাং ওটাকে সাহিত্য বলে মনে করতে ঔৎসুক্য ছিল না অনেকেরই। জীবনী সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা—ভাল ভাল জীবনী যে বাংলাভাষায় লেখা হয়নি তা নয় কিন্তু তাকে সাহিত্য বলে মনে করেন ক'জন? ঘটনা সন্ধানের প্রয়োজনে মোটা মোটা জীবনীর পাতা উল্টে তাকে প্রায় একটি 'রেফারেন্স বুকে'র সমপর্যায়ে ফেলে দিই আমরা।

আত্মজীবনীর সঠিক সীমানা আমাদের জানা নেই বলে অনেক সময় পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ভুল করে বসেন। নানাজাতের অতীত স্মৃতির রোমন্থন, ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষের স্মরণ-কথাকে আত্ম-জীবনীর পর্যায়ে ফেলে বিচার করার চেষ্টা, অধুনাতন কালে আমরা কিছু কিছু দেখেছি। তার ফলে আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্যটুকু সঠিক ধরতে না পেরে অন্যান্য জাতের রচনার সঙ্গে অনেকেই তাকে মিলিয়ে গন্ডগোল পাকিয়েছেন। ইংরাজীতে Diary, Memoirs, প্রভৃতি নানা নামের রচনা চলে আসছে বহুকাল ধরে। ইউরোপবাসীর ডায়েরী লেখার ঝোঁক আমাদের চেয়ে প্রচুর পরিমাণে বেশী; কোন অভিযান, কোন যুদ্ধ, কোন নতুন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলেই memoirs, বা reminicense-এর ছড়াছড়ি পড়ে যায়। সেই জাতীয় লেখা বাংলাতেও কিছু কিছু হয়েছে। বহু-লোকের ডায়েরী, বহু লোকের স্মরণে-লেখা রচনা, বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ, জেল-জীবনের স্মৃতিকথা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেই জাতীয় রচনাগুলিকে আত্মজীবনী বা আত্মকথা মনে করে সুবিস্তৃত আলোচনা করছেন কেউ কেউ। তার ফলে আত্মজীবনীর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা ক্রমশই অবহেলিত হচ্ছে এবং জটিলতর হচ্ছে।

নিজের মনের কথা যে কোন ভাবেই বলবার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু নিজের কথা বললেই যে তা আত্মকথা হবে না তা বলাই বাহুল্য। তা যদি হতো তাহলে নিজের কোন একটি সুখদুঃখের প্রকাশক কোন একটি ছোট গীতিকবিতাকেও আত্মকথা বলতে হতো। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—এই কবিতায় কবির মনের একটি গভীর সত্যের রসসিক্ত প্রকাশ আমরা দেখেছি। এই ধরণের হাজার হাজার আত্মউদ্ঘাটনের প্রয়াস পৃথিবীর সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। অথচ এগুলি একান্তভাবে কবির মনের কথা হলেও তারা আত্মকথা নয়।

নিজের জীবন কথা বলার চেষ্টাতেই আত্মজীবনীর সৃষ্টি। সেটার মধ্যে একটা পূর্ণতার আভাস থাকা চাই। জীবনের যে কোন দু'চারটি ঘটনা তুলে দিলুম, ছোট ছোট চমকপ্রদ গল্পের মতো পাঠকের মন তাতেই খুসী হতে পারে কিন্তু সে রচনা আত্মজীবনী নয়। নিজের জীবন-কাহিনী বলা এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের মানসবিবর্তনের ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলার নামই আত্ম-

জীবনী। সব আত্মজীবনীতেই যে এই দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা নয়। কোথাও হয়তো জীবন বৃত্তান্তের বৃত্তান্ত অংশটা প্রবল হয়ে ওঠে, কোথাও জীবন-ফল্গুর অন্তর্নিহিত বোধের প্রবাহটিকে প্রকাশ করার চেষ্টাই প্রধান হয়। এই দুই সুরের প্রাধান্য অনুযায়ী আত্মজীবনী কখনো মূলতঃ ঘটনাবাহী হয়ে ওঠে কখনও বা দার্শনিকতার সুনিশ্চিত স্পর্শ এসে লাগে। নিজের মনোভাব প্রকাশকেই সাহিত্যের প্রেরণা বলে আমরা মেনে নিয়েছি। তার উদ্দেশ্য, তার ভঙ্গী এবং তার গাম্ভীর্যের উপরেই সৃষ্টির গুরুত্ব নির্ভর করে। একথা সবাই জানেন যে আটপৌরে কথায় না বলে যেখানে কিছু কৌশল এবং আভাষে কথা বলি সেখানেই সেই বলা চিরাচরিত প্রকাশভঙ্গীর থেকে কিছু পার্থক্য, বৈচিত্র্য দাবী করে। সুতরাং অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মতো আত্মজীবনীরও একটা ভঙ্গীগত বিশিষ্টতা আছে। সেটাকে মানতে হবে। আত্মজীবনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় সব লেখকই সচেতন—সেই উদ্দেশ্য তার সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ের যথেষ্ট সাহায্য করে। আত্মপ্রচার যেখানে প্রবল, আত্মউপলব্ধির চিহ্ন যেখানে দুর্বল সেখানেই সেই গ্রন্থের রসজীর্ণতা সপ্রমাণ। তাছাড়া রচনার ভাব ও প্রকাশের সম্মিলিত গাম্ভীর্যের প্রশ্নও অল্প নয়। বেনভেনুটো চেলিনির 'আত্মজীবনী' য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সেণ্ট অগাষ্টিনের রচনার পর এই গ্রন্থই প্রাচীনত্বের মূল্য দাবী করে। চেলিনির প্রকাশভঙ্গী সবল, ভাবও অল্প নয়—কিন্তু দুয়ে মিলে গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব। তৎকালীন য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জীবন গোয়েন্দা-উপন্যাসের নায়কের মত নানা বিচিত্র দুঃসাহসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ-জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেও পাঠকের মনে কোন সাড়া তুলতে পারেন নি তিনি। কেবলমাত্র যথোচিত মাত্রাবোধের অভাবে চেলিনির-আত্মকথা সার্থক হলো না।

আত্মজীবনী ভাল সাহিত্য হতে হলে যে জিনিষটি বিশেষ প্রয়োজন তা হলো এই যে, লেখকের জীবনের কোন না কোন তাৎপর্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠা চাই। গতিশীল জীবনের গতির ধারাটিকে ভিতরের সাক্ষ্যসমেত ফুটিয়ে তোলার কাজই হলো আত্মজীবনীর কাজ। সে বই পড়ার পরে একটি সম্পূর্ণতার ভাব মনে আসা চাই। যেখানে সেটি নেই সেখানে সাহিত্য হিসাবে সে আত্মজীবনী গণ্য হবে কিনা এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' এই দিক থেকে কখনই ভাল আত্মজীবনীর মর্যাদা পেতে পারে না। সেখানে টুকরো টুকরো ঘটনার সমষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ তাঁর গ্রন্থের অনেকটা জায়গা জুড়েছে। সুতরাং জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি গড়ে তোলাই আত্মজীবনীর কাছ থেকে আমাদের স্বল্পতম দাবী। সেই স্বল্পতম দাবীটুকু মেটার পর বিচার করা যেতে পারে যে তা সৎ-সাহিত্য হলো কিনা। বহু স্মৃতিকথা আছে যেখানে লেখক বা লেখিকা তাঁদের জীবনের বিশেষ বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ করে কিছু লিখেছেন—যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যাঁদের দেখেছি", অমিয়নাথ সান্ন্যালের "স্মৃতির অতলে", প্রতিমা ঠাকুরের "নির্বাণ", মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"। এগুলিকে কোনমতেই কোন দূরতম কল্পনাতেও 'আত্মজীবনী' বলা চলবে না। লেখক বা লেখিকা এখানে অন্য ব্যক্তি বা ঘটনার সাক্ষ্যবহন করছেন মাত্র। তাঁর নিজের জীবনের ঐটুকু ছাড়া আর কোন কথা এর মধ্যে নেই। সুতরাং আত্মবিলীন স্মৃতি-রোমন্থন কখনোই আত্মজীবনীর সমার্থক নয় একথা বুঝতে হবে। লেখকের নিজেকে নিয়েই আত্মজীবনী—সেখানে অকারণ বিনয়ের অবকাশ কম।

আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক কর্মীরা জেলখানার দিনগুলিকে নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোন আধুনিক সমালোচক আত্মজীবনীর আলোচনার মধ্যে সেগুলিকে পাংক্তেয় করে দিয়েছেন। আত্মজীবনীর স্বরূপ ভুলে, তার অত্যুৎসাহী ভক্ত হয়ে নানাধরণের রচনাকে তার গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে নিয়ে, আলোচ্য বস্তুর গৌরব বাড়ানোর চেষ্টা নিছকই ছেলেমানুষী। এই রচনাগুলির মধ্যে সেই পূর্ণতার অভাব যার মধ্যে দিয়ে একটি জীবনধারার বিবর্তন বা স্রোতের একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। খাপছাড়া একটা অংশ যতই কৌতুকপ্রদ হোক, বাচনভঙ্গী যতই ভাল হোক, তা আত্মজীবনীর মর্যাদা লাভ করবেনা।

আগেই বলেছি আত্মজীবনী একটি জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হওয়া চাই। এবং জীবনের সেই পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি একটি গতির পটভূমিকায় না হলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনার সূত্র যোজনা করে জীবনের আভ্যন্তরীণ ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধতা করে থাকি আমরা। ডায়েরীর সঙ্গে আত্মজীবনীর একটা মূলগত পার্থক্য আছে। ডায়েরীতে প্রতিদিনকার ঘটনা আমাদের জীবনের এক একটি দিনকে চিরকালের মত স্থির করে বেঁধে রাখে। তারা প্রত্যেকেই দিনে দিনে পূর্ণ, জীবনব্যাপী সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত তাদের মধ্যে অল্প। সাময়িক উত্তেজনায় একটি দিনের ঘটনা ডায়েরীর পাতায় বিরাট অংশ জুড়ে বসতে পারে—কিন্তু জীবনের সম্পূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তোলার মধ্যে তার স্থান হয়তো কিছু মাত্র না থাকতে পারে। যে ঘটনা আজ ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে সে ঘটনার প্রতি কিছুকাল পরেই ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষমাসুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট—"আমি যদি বোকামী করে প্রতিদিনের ডায়েরী লিখে যেতুম, তাহলে তাতে করে হোত আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তাহোলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিতো।" কতকগুলি ঘটনা জীবনরচনার সহায়ক হতে পারে না—কারণ ঘটনা মাত্রেই অচল, তা একবার ঘটে গেলে তার উপর নতুন করে রং চড়াবার সুযোগ নেই। সুতরাং এই অচল ঘটনাবলীর স্তূপ বেড়ে উঠে জীবনের প্রবহমানতায় বাধা সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং ডায়েরীজাতীয় রচনা কখনোই আত্মজীবনীর সমগোত্রীয় হতে পারে না। ইসাডোরা ডানকান তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন—

Incidents which seemed to me to last a life time have taken only a few pages; intervals that seemed thousand of years of suffering and pain and through which in sheer self-defence, in order to go on living, I emerged an entirely different person, do not appear at all long here."

কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা হলেই আত্মজীবনী সৎসাহিত্য হবে এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। কারণ পূর্ণাঙ্গ জীবন যদি শুধু ঘটনাবাহী হয় তাহলে তার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পথ খোলাই রইলো। এ ত্রুটি শুধু আত্মজীবনীতেই ঘটতে পারে তা নয় যে কোন ধরণের ইতিবৃত্তমূলক রচনা এর কবলে পড়ে ব্যর্থ হতে পারে। কোন দেশের ইতিহাস, কোন ব্যক্তির জীবনী কখনও সত্য হয়ে উঠতে পারে না যদি লেখক সাংবাদিকের মত কেবল প্রতিদিনান্তের ঘটনাবলীর হিসাবই রেখে যেতে থাকেন। এ সম্পর্কেও ইসাডোরা ডানকান বলছেন—

No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of the most famous women are a series of accounts of the outward existence, of

petty details and anacdotes which gave no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent.

শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে এ কথা বল্লেও অধিকাংশ আত্মকথা, জীবনী, ইতিহাস সম্বন্ধে এ কথা খাটে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সংসারে কোন সাহিত্যই যেমন বাস্তব ঘটনার ফটোগ্রাফ নয় তেমনি আত্মজীবনী বা জীবনীও যা সত্যি সত্যি ঘটে তার যথাযথ অনুলেখন নয়। জীবনকেও সৃষ্টি করতে হয়—রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয়ের প্রথম প্রবন্ধে কোন্ কাব্যগ্রন্থ কবে প্রকাশ হলো তার তালিকা দেননি, যে বৃহত্তর সত্তা তাঁর অগোচরে তাঁর সুবিস্তৃত কাব্যসৃষ্টির জগতে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন তাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন।—অর্থাৎ তাঁর 'বড় আমি'কে উপলব্ধি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন করে। কোন স্রষ্টার জীবনের সচেতন গতিবিধির সঙ্গে তার স্রষ্টাসত্তার গভীর বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে—যেমন ইসাডোরা বলছেন—

"If I were a writer and had written of my life twenty novels or so, it would be nearer the truth. And then after I had written these novels. I should have to write the story of the artiste, which would be a story apart from all the others. For my artist life and thought of art have grown quite aloof and grow still like a seperate organism, seemigly quite independant of what I call my will."

টলষ্টয়ের জীবন সম্বন্ধে গোর্কী যে জীবনকাহিনী লিখেছিলেন তাতে নির্বিচারে টলষ্টয়ের জীবনটিকে লোকচক্ষে যেমন দেখাতো তেমনি করেই দেখাবার চেষ্টা ছিল। ঘটনাগত এবং চরিত্রের আপাতঃ বৈশিষ্ট্যগত সত্যতা হয়তো ছিল কিন্তু যে সত্যগুলিকে বাদ দিলে টলষ্টয়ের অসাধারণত্ব আরও প্রকাশ পেতো সেগুলিকে বাদ না দিয়ে ঘটনাগত বাস্তবিকতাকে বড় করে তুললেন গোর্কী এবং তার দ্বারা টলষ্টয়ের যথার্থ পরিচয় ক্ষুণ্ণ হলো। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত আলোচনা মনে রাখবার মতো—'ম্যাক্সিম গোর্কী টলষ্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখর-বুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলষ্টয় দোষগুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ন রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয় টলষ্টয় যে সর্ব-সাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয় এমন কি অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলষ্টয়ের কিছুই মন্দ ছিলনা এ কথা বলাই চলেনা, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলষ্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের তাঁর ক্ষণিক-মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী।'

তাই আত্মজীবনীর স্বরূপের ধারণা স্পষ্ট না হলে, আত্মজীবনী যে নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করা একথা না বুঝলে স্মৃতিকথা, ডায়েরী, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতিকে আত্মজীবনী বলে কেবলই ভুল করতে থাকবো। সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের ইতিকথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় সংগীতে 'রাগ' বস্তুটি ললিতকলার জগতে এক অপূর্ব অবদান। রাগকে আমরা বলি আন্তর-বাহ্যাবগাহী পদার্থ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষে থাকে বাইরের ইন্দ্রিয় ও মন। মানসপ্রত্যক্ষের অপর নাম সংবেদন বা অনুভূতি। সুতরাং মনের প্রত্যক্ষ বা অনুভূতিসিদ্ধ যে তরংগায়িত বস্তুকে আমরা স্বরের মাধ্যম কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করি তাই 'রাগ'। রাগে থাকে শব্দতরঙ্গ, শ্রুতিমাধুর্য, লাবণ্য, ভাব ও রস। স্বরের বন্ধনে দেখি ও ব্যবহার করি এবং মন দিয়ে তার ভাব-রূপ অনুভব করি ব'লেই মনোবৈজ্ঞানিকের ভাষায় তাকে বলা হয় আন্তর-বাহ্যাবগাহী (psycho-physical) পদার্থ। রাগকে পদার্থ বলার কারণ ব্যবহারিক জগতে তাকে আমরা কাজে লাগাই ও তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আসল কথা এই যে, 'রাগ'-বস্তুটির রূপ ও ব্যঞ্জনা প্রথমে সৃষ্টি হয় মনে, মনের জগতেই তার প্রথম বিকাশ, তারপর স্বরের আভরণ দিয়ে প্রকাশ করি বাইরে।

ভারতীয় রাগের বিকাশে প্রাধানতঃ তিনটি স্তর আমরা স্বীকার করি ঃ প্রথমটি জাতি বা জাতিরাগের আকারে, দ্বিতীয়টি গ্রামরাগ ও তৃতীয়টি অভিজাত দেশী রাগের আকারে। আঞ্চলিক বা গ্রাম্য প্রাচীন সাংগীতিক রূপের কথা আমরা না হয় ছেড়েই দিলাম, কেননা নাগরিক সভ্যতার মূল-উপাদান যেমন গ্রামীণ সভ্যতা, তেমনি রাগগীতি ও ক্ল্যাসিক্যাল গীতিরূপের আধার হিসাবে অনুন্নত সরল স্বচ্ছন্দবিহারী সুর বা গ্রাম্যগীতির অস্তিত্ব তো অবিসংবাদিত সত্য। বর্তমানসমাজে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল রূপের ছদ্মবেশে যে সকল রাগের লীলায়ণ আমরা দেখি তাদের আদিরূপ তো আঞ্চলিক ও জাতীয় সুর বা গীতিকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছিল। আজ হয়তো সেই ইতিহাস আমাদের কাছে পরিস্ফুট না থাকতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতের প্রমাণযোগ্য ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন তার কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে সেই ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

খৃষ্টপূর্ব চার হাজার কিংবা সাড়ে তিন হাজার থেকে খৃষ্টপূর্ব ছ'শো বছরের কাল-ব্যবধানকে আমরা সাধারণভাবে 'বৈদিক যুগ' বলি। অবশ্য এরই ভেতর আবার প্রাক্‌বৈদিক যুগের অন্তর্নিবেশ আছে। এই প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক যুগের কাল-পরিসর নিয়ে বর্তমান অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদও কম নেই। কেননা ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সংগে সংগে স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে যে সব চিন্তাশীল মনীষী আজ নূতনভাবে গবেষণার কাজে ব্যস্ত আছেন তাঁদের মধ্যে সন্দেহের সঞ্চারও বড় কম হয়নি—ঐ প্রাগ্‌বৈদিক যুগই সত্যকারের বৈদিক সভ্যতার অধিকারী ছিল কিনা। যাই হোক, এই সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান-নির্ণয় ব্যাপারে ঐতিহাসিক আলোচনার কথা ছেড়ে দিলে অন্ততঃ প্রচলিত মতবাদাশ্রয়ী বৈদিক যুগের সমাজে আমরা পাই সামগানের নিদর্শন। সেই সামগান কি ধরণের ছিল, কিভাবে তাদের গাওয়া হ'ত, তাদের সহগামী বাদ্যযন্ত্রাদি কি কি ছিল ও কি রকম ছিল তাদের গঠন ও বাদনপ্রণালী—এ'সব তথ্য বৈদিক সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি থেকে আমরা পেয়ে থাকি।

বৈদিক যুগে সামগানে রাগের ব্যবহার ছিল কিনা এ'নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরা রাগের অস্তিত্ব সে যুগের গানে স্বীকার করেন না, অথচ গান ছিল, গানে চার থেকে সাত স্বরের ব্যবহার ছিল, গানের একটা প্রকাশভঙ্গি অবশ্যই ছিল, গানে স্থান (মন্দ্রাদি) ছন্দ, গতি ও রসের বিকাশও ছিল—একথা প্রমাণযোগ্য বৈদিক সাহিত্যগুলি থেকেই জানতে পারি।

এখন কথা হ'ল 'রাগ'—শব্দটির আসল সার্থকতা কি? যে স্বরসজ্জার বিচিত্র গতি মানুষের মনে আনন্দ ও রক্তিভাবের মন্দাকিনীধারা সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলি 'রাগ'। কথা এই যে, বৈদিক যুগে সামগ-ব্রাহ্মণেরা যে সামগান করতেন তাতে তাদের ও সর্বসাধারণের মন আনন্দরস-সিক্ত হ'ত কিনা, না মনোরঞ্জনের পরিবর্তে বৃথাই সুর দিয়ে কথার আবৃত্তি তাঁরা করতেন। তবে একথা কখনই আমরা বিশ্বাস করতে পারব না যে, মানুষে সে গানের (সামগান) সুরে আকৃষ্ট হ'ত না। কেননা বৈদিক সাহিত্যে আছে যে, দেবতারা, যক্ষ কিন্নর ও গন্ধর্বরা সেই গানে চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হত। সুতরাং সামগানের যুগে 'রাগ' এই নির্দিষ্ট আভিধানিক শব্দটির অস্তিত্ব না থাকলেও গানে সুরমাধুর্যের সঙ্গে লাবণ্যগুণযুক্ত রক্তিভাবের প্রকাশ ছিল, আর তারি জন্য মানুষ শুধু কেন, পশুপক্ষীরাও ছন্দায়িত সুরসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হ'ত। সুতরাং 'রাগ'-শব্দটির নিদর্শন না পাওয়া গেলেও ভিন্ন আকারে তার বিকাশ ও প্রভাব ছিল—যেমন ছিল রামায়ণ মহাভারতের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০—৩০০) বা নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের যুগে (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ)।

রামায়ণে সাতটি শুদ্ধজাতিরাগের উল্লেখ পাই তার চতুর্থ অধ্যায়ে কুশী-লব যখন তিনটি স্থানে লীলায়িত ক'রে রসে ও ভাবের সংমিশ্রণে রামায়ণগান করছে শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায়। বিকৃত জাতিরাগের তখন সৃষ্টি হয়নি দেখা যায়। শুদ্ধজাতিরাগের রূপ ও বিকাশভঙ্গি কি ধরণের ছিল তার খুঁটিনাটির পরিচয় দিয়েছেন মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ও শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন খৃষ্টীয় তেরশো অব্দের গোড়ার দিকে তাঁর আভিধানিক গ্রন্থ সঙ্গীতরত্নাকরে। এখনকার রাগে যেমন একটি বাদীস্বরের প্রয়োগ হয়, তখনকার রাগে তেমনটি ছিল না, একের অধিক বাদীস্বরেরও প্রয়োগ ছিল। বাদীস্বরকে বলা হ'ত অংশ বা অংশস্বর। অংশ বা বাদীস্বরের সার্থকতা হ'ল রাগের রূপকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করা। যে স্বরের বেশী প্রয়োগ, সে' স্বরই কিন্তু অংশ বা বাদীস্বর নয়, মোটকথা রাগের রক্তিভাব যে স্বরের ব্যবহারে প্রকাশ পায় সেই বাদীস্বর। অংশ বা বাদী প্রকাশ পেত তার অনুসঙ্গী সংবাদীস্বরকে নিয়ে। সংবাদীস্বর অংশ বা বাদীস্বরের সুষ্ঠু প্রকাশে সাহায্য করে। বাদী ও সংবাদীস্বর দুটির মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সংগতি বা স্বরসাম্যেরও বিকাশ দেখা যায়। প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ অন্ততঃ খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্বরসংবাদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল মুনি নারদের কাছে। তিনি তাই স্বরসংবাদ তথা বাদী-সংবাদী স্বর-দুটির মাধ্যমে রাগরূপের লক্ষণ ও বিকাশবৈশিষ্ট্যেরও আবিষ্কার করেছিলেন। এই সংগতির জন্য রাগে শ্রুতিসামধুর্যও প্রকাশ পায়। এখন মুনি ভরত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন সে' আবিষ্কার সত্যই নূতন ছিল—কি তাঁর পূর্ব আচার্য খৃষ্ট-পূর্ব যুগের ব্রহ্মভরতের কাছ থেকে সন্ধান পেয়েছিলেন এর সঠিক ইতিহাস এখনো আমাদের জানা নেই। আর জানা নেই বলে বেমালুম স্বীকার করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি যে খৃষ্টপূর্ব যুগে রাগও ছিল না আর তার অনুসঙ্গী বা নির্দেশক স্বর-সংবাদও ছিল না। অবশ্য আমাদের কথা

এই যে, প্রমাণযোগ্য ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ভবিষ্যতে রচিত হ'লে ছিল বা ছিল না মন্তব্যের আসল প্রামাণিকতা পাওয়া যাবে, ঠিক তার আগে নয়।

নাট্যশাস্ত্রের যুগে (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের ধারা বজায় থাকলেও নূতন পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছিল। গ্রামরাগের প্রচলন ভরতের আগেকার যুগে তথা নারদীশিক্ষার সময়েই (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) পাওয়া যায়। নারদ (১ম) ষাড়ব, ষড়্‌জ-গ্রামাদি সাতটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। ভরতও "মুখে তু মধ্যমগ্রাম" প্রভৃতি ব'লে গ্রামরাগদের নামোল্লেখ করেছেন। মোটকথা জাতিরাগ, গ্রামরাগ তখন নাট্যপ্রয়োগে নাট্যগীতির আকারে প্রচলিত ছিল। গ্রামরাগকে অবলম্বন ক'রে অভিজাত দেশীরাগের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর তৃতীয় থেকে পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দী ভারতীয় সংগীতের জগতে একটি স্মরণীয় যুগ। কোহল, যাষ্ঠিক, মতঙ্গ এঁরা মুনি ভরতের মতানুবর্তী হলেও নূতন সংগীতে নূতন পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। রাগশুদ্ধিযজ্ঞের আরম্ভ হয় তো ঠিক এই সময়ের ব্যবধানেই। কোহল, মতঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীরা দশলক্ষণের মহামন্ত্র দিয়ে দেশীয় ও জাতীয় বিচিত্র সুর-গুলিকে কৌলিন্যের মর্যাদা দিলেন ও বল্লেন তারাও রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট রাগ। বিদেশী সুরও বাদ গেল না। মালব, গুর্জর, ভোটদেশ, অন্ধ্র, কম্বোজ প্রভৃতি দেশ ছাড়া শক তথা সিথীয়ান, তুর্কী প্রভৃতি জাতিদের সুরগুলিকে শুদ্ধিযজ্ঞের মারফতে জাতে তুলে নেওয়া হয়েছিল। মূলরাগ, তার অঙ্গ বা ভাষা, তারও অঙ্গ বা ভাষা তথা বিভাষা প্রভৃতি রাগের বিকাশে সংগীতের জগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং মানব-সমাজের মতো রাগের জগতে ক্রমবিস্তারের জন্য তার মধ্যে সুব্যবস্থার চাহিদা দেখা দিল।

অবশ্য এখনকার রাগ থেকে তখনকার রাগগুলির আকার ও প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট আলাদা ছিল। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, এখনকার মতো তখনকার (খৃষ্টীয় ৩য়—৫ম-৭ম শতাব্দী) রাগগুলিও মার্গশ্রেণীভুক্ত ছিল না। অথচ আজও ভুলবশত সংস্কার যুগের অভিজাত দেশীরাগগুলিকে আমরা বলি মার্গসংগীতের রাগ। এরা মোটেই মার্গসংগীতের রাগ নয়। কেননা মার্গসংগীত ও মার্গসংগীতের রাগের গঠন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী কিম্বা তারও কিছু পরেকার সমাজে। তবে মার্গসংগীতের প্রকৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছিল দেশী-সংগীতের রূপ। তাই আজকালকার ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতকে বড়জোর বলা যায় মার্গধর্ম বা মার্গ-প্রকৃতিসম্পন্ন সঙ্গীত বা রাগ। অবশ্য একথাও প্রয়োগ করা উচিত বিশেষ সাবধান সহকারে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে খৃষ্টীয় তেরশো শতাব্দীর সংগীতের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি এ' সময়ের গীতিধারা ছিল রাগাশ্রয়ী ও তাদের বলা হ'ত 'রাগগীতি'। বৃহদ্দেশীতে মতঙ্গ রাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিচয় দিয়ে ভরত, কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, সার্দুল প্রভৃতি প্রাচীন পূর্বাচার্যদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিমতানুযায়ী রাগগীতিদের সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের মতে শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা এই সাত রকম গীতি তথা রাগাশ্রয়ী গীতি। তখন গীতি ও রাগ এতই পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিল যে, একটির নামোল্লেখ থেকে অপরটিকে বেছে নিতে কষ্ট পেতে হ'ত না। সংগীতসময়সারে পার্শ্বদেব বিভিন্ন দেশী রাগের পরিচয় দিয়েছেন। শাঙ্গর্দেব সংগীতরত্নাকরে বিপুল বিচিত্র ভাবে সাঙ্গীতিক উপাদান নিয়ে বিভিন্ন দেশীরাগের পরিচয় দিয়েছেন। শাঙ্গর্দেবের গ্রন্থ সংগীতের

একটি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া তথা বৃহৎ অভিধান বল্লেও চলে। তিনি রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গভেদে দু'শো চৌষট্টিটি অভিজাত দেশীরাগের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

সর্বেষামপি রাগাণাং মিলিতানাং শতদ্বয়ম্।
চতুঃষষ্ট্যধিকং ব্রূতে শাঙ্গী শ্রীকরণাগ্রণীঃ॥

অবশ্য তিনি জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলিরও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরই গ্রন্থ থেকে বরং রাগ-বিকাশের মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ধারণা আমরা পেতে পারি। নিবদ্ধ প্রবন্ধ-গানগুলি তখন রাগকে নিয়ে বিকশিত ছিল। এককথায় তখনকার যুগে রাগাশ্রয়ী ছিল গান ও গান ছিল অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধভেদে দু'রকম। অনিবদ্ধ আলাপ বা আলপ্তিশ্রেণীর অন্তর্গত, আর নিবদ্ধগান ছিল তালযুক্ত। মোটকথা অনিবদ্ধ বন্ধনবিহীন বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণ করত রাগের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি রচনা ক'রে, আর নিবদ্ধ বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও সীমার মাঝে অসীম মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে রাগমহিমা বিকাশ করত। রাগাশ্রয়ী গান কিংবা রাগগীতিগুলির আবার প্রকার ও শ্রেণীভেদ ছিল। তখনকার কালে রাগের বিচিত্র ও বিপুল বিকাশ ও প্রকৃতি দেখলে মনে হয়—ভারতের স্বাধীন ও পরাধীন দেশগুলির ভেতর শাস্ত্রীয় রাগ-সঙ্গীতের চর্চা কত বিস্তৃত ও সমাদৃত ছিল! অবশ্য অভিজাত শ্রেণীর পাশে গ্রাম্য সরল সাধারণ গানের পরিবেশন তো ছিলই।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের বিকাশ, বিস্তার ও অনুশীলনের ইতিহাস চমকপ্রদ। ভারতের রাগরূপ তার চৌহদ্দীর সীমানায় শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, গৌড় ও মগধরাজ্যকে কেন্দ্র ক'রে কাশ্মীর ও তিব্বতের ভেতর দিয়ে সমরকন্দ, ইয়ারকন্দ, কচ্ছ, খোটান, সুগ্ধ ছাড়াও চীন, জাপান, কোরিয়া, বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে, মধ্যএশিয়া ও এমন কি পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ব্যাপার ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নারদের (২য়) সঙ্গীতমকরন্দকে বেশীরভাগ গুণী খৃষ্টীয় সপ্তম—একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে যে রাগ-রাগিণী-পুত্র (উপরাগ ও উপরাগিণী) বর্গীকরণের শৈলী আছে তা কখনই ঐ সময়ের বিভাগ, পদ্ধতি বা রীতি নয়, তা খৃষ্টীয় তেরশো শতাব্দীর তথা শার্ঙ্গদেবেরও অনেক পরেকার। সুতরাং নানান্ কারণে আমরা সঙ্গীতমকরন্দকে শার্ঙ্গদেবেরও অনেক পরবর্তী গ্রন্থ বলে অনুমান করি। রাগের আলোচনা নিয়ে হঠাৎ সঙ্গীতমকরন্দের রচনাকালের বিবরণ দেওয়ার কারণ, সঙ্গীতমকরন্দে রাগের আলোচনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মকরন্দকার দু'রকমভাবে রাগের বংশাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীতমকরন্দ ও সঙ্গীতরত্নাকরের পূর্ববর্তী মম্মটাচার্যের 'সঙ্গীতরত্নমালা', রাজা নান্যদেবের 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' সোমেশ্বরদেবের 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে ও রত্নাকরোত্তর গ্রন্থ নারদের (৩য়) 'পঞ্চমসারসংহিতা', রামামত্যের 'স্বরমেলকলানিধি', পুণ্ডরীকের 'রাগমালা', 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়' ও 'রাগমঞ্জরী', অহোবলের 'সঙ্গীতপারিজাত', সোমনাথের 'রাগবিবোধ', লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে জন্য—জনক-বর্গীকরণের শৈলী অনুযায়ী অসংখ্য রাগের বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে তাদের অনেকগুলির অনুশীলন আর নাই, কিংবা তাদের বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টাও শিল্পী সমাজের নাই, অথচ নূতন নূতন রাগেরও সৃষ্টি চলেছে। অবশ্য প্রতিভার দানকে কোনদিনই আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বিগত প্রতিভার দানকে অবহেলাই বা কেন করি তার অর্থও বোঝা যায় না। তাই মনে হয়

সঙ্গীতের যথার্থ সাংস্কৃতিক আলোচনার দ্বার এখনো উন্মুক্ত হয়নি, গতানুগতিকেরই আমরা অনুবর্তী। তবে যেভাবে জাগরণের পালা শুরু হয়েছে—তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সঙ্গীতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল।

উত্তর-ভারতীয় ছাড়া দক্ষিণভারতীয় পদ্ধতিতে রাগের সংখ্যা অসংখ্য। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দু'টি বিভাগীয় পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল খৃষ্টীয় তেরশো-চৌদ্দশো শতাব্দীরও পরে, তার আগে সমগ্র ভারতে একটি পদ্ধতিরই বিকাশ ছিল, তবে গায়কীভঙ্গি ও দেশভেদে রাগ-বিকাশের ভেদ ছিলই। গোবিন্দ-দীক্ষিতের সুযোগ্য সন্তান বেঙ্কমখী তাঁর পূর্বাচার্য মাধব-বিদ্যারণ্য প্রভৃতির মেলপদ্ধতিকে গ্রহণ করলেও তাঁদের থেকে নূতনভাবে বাহাত্তর মেল তথা মেলকর্তার প্রচলন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সময়েই সকলগুলি মেলের ঠিক ঠিক অনুশীলন হ'ত না, হ'ত মাত্র ঊনিশটি মেলকর্তার।

রাগের জগতে রুচি ও সম্প্রদায়ভেদে মতবাদের মাধ্যমে মতভেদ দেখা দিল ও তা'থেকে ভাল ও মন্দ দু'রকম পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। রাগের অনুশীলন মুসলমান রাজত্বের সময়ে বেশী হয়েছিল বই কমে নি। তবে আলমগীর অওরঙজেবের পর থেকে ইংরাজ রাজত্বের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাগের অনুশীলনে দৈন্য দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে সমগ্র ভারতে আবার রাগ-সঙ্গীতের অনুশীলন বেড়ে চলেছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র প্রেরণা ও প্রচার এ' বিস্তৃতিকে অনেকটা সাহায্য করেছে।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা ভারতের রাগকে রক্ত-মাংসের শরীর দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, প্রাণ-স্পন্দনও জাগিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুনি ভরতই জাতিরাগগুলিকে আট রস ও ভাবে লীলায়িত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভরতকে অনুসরণ ক'রে পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রীরাও রাগের অধ্যাত্মিক রূপের মহিমাকে খর্ব করেন নি, বরং বাড়িয়েই তুলেছিলেন। রাগের অনুশীলনের পেছনে দর্শনশাস্ত্রের কাঠামো গড়ে উঠেছিল মানে সঙ্গীত যে সাধনার সামগ্রী ও সঙ্গীত সাধনার ভেতর দিয়ে কল্যাণসুন্দর ভগবানকেও যে প্রত্যক্ষ বা দর্শন করা যায় একথারই মর্মকাহিনী প্রকাশ করছে। রাগের ইতিকথা ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তরে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। ভারতের রাগরাগিণী শুধু জড়ধর্মবিশিষ্ট স্বরের কাঠামো নয়, পরন্তু প্রাণবান ও তারা দীপ্ত প্রেরণাই মানুষকে দান করে।

শঙ্করের বিবর্তবাদ বা সৎকারণবাদ

রমা চৌধুরী

শংকরের অদ্বৈতবাদ মতে কারণ ও কার্য সর্বকালে, সর্বাবস্থায় অনন্য বা অভিন্ন। তাই যদি হয়, তাহলে তার প্রকৃত অর্থ এই যে, হয় কারণই কার্য এবং কেবল কারণই সত্য; নয় কার্যই কারণ এবং কেবল কার্যই সত্য; অর্থাৎ, কেবল একটী মাত্র সত্তাই আছে, যেহেতু অভিন্নতা স্থলে দুটী সত্তা থাকতে পারে না। যেমন, যদি বলা হয় যে, 'ঘট ও পট অভিন্ন' তাহলে হয়, ঘটই পট এবং পটই একমাত্র সত্তা, অথবা পটই ঘট এবং ঘটই একমাত্র সত্তা। এস্থলে শংকরের মতে, প্রথম পক্ষই যুক্তিসংগত, দ্বিতীয় নয়; অর্থাৎ, কারণই কার্য, এবং কেবল কারণই সত্য। সেজন্য তিনি বলছেন—

"অনন্যত্বেঽপি কার্য-কারণয়োঃ কার্যস্য কারণাত্মত্বং, ন তু কারণস্য কার্যাত্মত্বম্।" ব্রহ্মসূত্র ২।১।৯, শঙ্করভাষ্য)। অর্থাৎ, কার্য ও কারণ অনন্য হলেও, কার্যই কারণাত্মক, কারণ কার্যাত্মক নয়।

বস্তুতঃ, শংকরের মতে, একমাত্র কারণই সত্য, কার্য মিথ্যাই মাত্র। শংকরের এই মতবাদের নাম 'বিবর্তবাদ' বা 'সৎকারণবাদ'। এরূপে 'সৎকার্যবাদ' থেকে 'কার্যকারণোর্নন্যত্ববাদ' এবং 'কার্যকারণোর্নন্যত্ববাদ' থেকে 'বিবর্তবাদ', বা 'সৎকারণবাদ' সিদ্ধ হয়। 'সৎকার্যবাদ' মতে, সৃষ্টির পূর্বে এবং লয়ের পরেও কার্য কারণেই নিহিত হয়ে থাকে। সেজন্য কার্য কারণ থেকে অনন্য; সেজন্য কারণই একমাত্র সত্য; সেজন্য কার্য মিথ্যা। এরূপে, যুক্তিসংগত ভাবে, শংকর একটী মতবাদ থেকে অপরটীতে উপনীত হয়েছেন।

সৎকার্যবাদ দ্বিবিধ—পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ পরিণামবাদ মতে, সৎকারণ থেকে সৎ বা সত্য কার্যের সত্যই সৃষ্টি হয়। যেমন, মৃত্তিকা থেকে ঘট ও দুগ্ধ থেকে দধির সৃষ্টি হয়। এস্থলে, মৃত্তিকা সত্যই ঘটে, এবং দুগ্ধ সত্যই দধিতে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়। সেজন্য, ঘট মৃত্তিকার এবং দধি দুগ্ধের 'পরিণাম'। সুতরাং কারণ ও কার্য, মৃত্তিকা ও ঘট বা দুগ্ধ ও দধি সমভাবে সত্য ও বাস্তব। পরিণামবাদ হল সাংখ্য-যোগ ও রামানুজপ্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণের মত।

বিবর্তবাদ মতে, সৎকারণ থেকে সত্যই কোনো সত্য কার্যের উৎপত্তি হয় না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কারণে মিথ্যা কার্য প্রতীতি হয়। যেমন, রজ্জুকে সর্পরূপে, বা শুক্তিকে মুক্তা-রূপে ভ্রম করলে, রজ্জু সত্যই সর্পে বা শুক্তি সত্যই মুক্তায় পরিণত হয় না। রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্প মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র, বাস্তব সত্য নয়। সেজন্য, সর্প রজ্জুর ও মুক্তা শুক্তির 'বিবর্তই' মাত্র 'পরিণাম' নয়। এস্থলে, কারণ বা রজ্জুই একমাত্র সত্য, কার্য বা সর্প নয়। বস্তুত, কারণ থেকে কার্যোৎপত্তিই হয় না বিবর্তবাদ শংকরপ্রমুখ একাত্মবাদী বা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মত।

এরূপে, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের প্রভেদ সংক্ষেপে এই ঃ—

"সতত্ত্বোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিত।"

অর্থাৎ, সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হলে, তাকে বলা হয় "বিকার" বা "পরিণাম।" কিন্তু

সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার না হলেও যদি সেরূপ মিথ্যা প্রতীতি হয়, তাহলে তাকে বলা হয় "বিবর্ত"।

বিবর্তের সংজ্ঞা দান করে আচার্য সারণ মাধব তাঁর সুবিখ্যাত "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" বলছেন—

"স্বরূপাপরিত্যাগেন রূপান্তরাপত্তি বিবর্ত ইতি সত্যমিথ্যাখ্যাবভাস ইতি। অবভাসো-ধ্যাস ইতি পর্যায়ঃ।" (শঙ্কর-দর্শনম্)

অর্থাৎ, স্বরূপ পরিত্যাগ না করেও, অন্যরূপ প্রাপ্তির নাম "বিবর্ত"। এক্ষেত্রে সত্য 'রজ্জু' ও মিথ্যার 'সর্পের' মধ্যে অভিন্ন প্রতীতি হয়—এবং এরূপ প্রতীতিই "অধ্যাস"।

শঙ্করের মতে, পরিণামবাদমূলক সৎকার্যবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই মতে, প্রথমতঃ সৎকারণটী একটী তুল্যসত্য কার্যে তুল্যসত্যভাবে পরিণত, রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সৎকার্যটী একটী নূতনরূপ বা আকার ধারণ করে, সৎকারণটী থেকে অভিব্যক্ত হয়। এ দুটীই অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

প্রথমতঃ, যা সৎ বা সত্য তার ত পরিণাম, পরিবর্তন বা বিকার অসম্ভব, তা' সম্পূর্ণ নির্বিকার।

দ্বিতীয়তঃ, যদি স্বীকার করা হয় যে, কার্য একটী নূতন, সত্য; বা বাস্তব রূপ বা আকার ধারণ করে, কারণ থেকে আবির্ভূত হয়, তাহলে সৎকার্যবাদ ভঙ্গ হয়—যেহেতু সেই আকারটী ত কারণে পূর্বে নিহিত হয়ে ছিল না।

তৃতীয়তঃ, দৃশ্যতঃ কার্য কারণ থেকে আকারতঃ বিভিন্ন হলেও, বস্তুত, আকারগত ভেদের জন্য বস্তুগত ভেদ হয় না, সেজন্য, কার্যকে কারণ থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা' নয়।

চতুর্থতঃ, আকার যদি বস্তুসত্তা থেকে বিভিন্নই হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কোনোরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন করাও অসম্ভব।

এরূপে, কোনোদিক থেকেই, পরিণামবাদ বা কারণের সত্য কার্যে পরিণতির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সেজন্য, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কার্য একটী সত্য বস্তু, প্রকৃতপক্ষে কার্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর তথাকথিত 'কার্য', 'পরিণাম' বা 'বিকারের' দুটী প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করে বলছেন—

"দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ এবমস্য ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪, শঙ্কর-ভাষ্য)

অর্থাৎ, তথাকথিত 'কার্য', 'পরিণাম' বা 'বিকারে'র দুটী প্রধান লক্ষণ হল ঃ "দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপত্ব" এবং "স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্ব।" এরূপে, প্রথমতঃ কার্যের বাস্তব সত্তা নেই, তা' কেবল ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষই মাত্র, মানসিক চিন্তাই মাত্র, সেজন্য যতক্ষণ তা' দৃষ্ট হয়, ততক্ষণই তার তথাকথিত অস্তিত্ব—তার পূর্বে বা পরে নয়। যেমন, রজ্জু-সর্প-ভ্রমকালে, যতক্ষণ ভ্রমটা থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের সর্প প্রত্যক্ষ হয়, ততক্ষণই সর্পটীর অস্তিত্ব থাকে—অবশ্য বাহিরের জগতে নয়, কেবল আমাদের প্রত্যক্ষে, আমাদের মনে, কিন্তু সেই ভ্রমের অবসান হলে, সর্প-প্রত্যক্ষের বিলয় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে, সর্পও তিরোভূত হয়ে যায়, তার আর কোনোরূপ অস্তিত্বই থাকে না। সেই জন্যই বলা হয়েছে যে, কার্য "দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ", অথবা প্রথমে সত্যরূপে দৃষ্ট হয়, অথচ পরে সেই প্রত্যক্ষের বিলয় হ'লেই নিজেও নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ কার্যটী সম্পূর্ণরূপেই অনির্বচনীয়—তার স্বরূপ কোনোরূপেই ব্যাখ্যা করা যায় না, যেহেতু তা' সৎও

নয়, অসৎও নয়। সেই জন্যই বলা হয়েছে যে, কার্য "স্বরূপেণ অনুপাখ্য।"

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য। সেটী হল এই যে, শঙ্করের মতে, সর্প-ভ্রম ও জগদ্-ভ্রম একই প্রণালীতে উদ্ভূত হলেও, শেষেরটী উচ্চস্তরীয়।

সেজন্য, শঙ্করের মতে, বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্যরূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও, বস্তুতঃ ব্রহ্ম—জীব-জগতে পরিণত হন না—সংসার রজ্জু-সর্পবৎ মিথ্যা, মায়াই মাত্র। প্রকৃত সৃষ্টি বলে কিছুই নেই, ব্রহ্মও স্রষ্টা কারণ নন, ব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্ট কার্য নয়। অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের 'পরিণাম' নয়, 'বিবর্তই' মাত্র।

শঙ্করের মতে, সৃষ্টি প্রক্রিয়া রজ্জু-সর্প-ভ্রম প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। আমরা যেমন রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করি, ঠিক তেমনি ব্রহ্মকেও বিশ্ব বলে ভ্রম করি। এরূপ ভ্রমের লক্ষণ ও কারণ কি? প্রথমতঃ লক্ষণের কথা ধরা যাক! ভ্রম দুপ্রকার হতে পারে ঃ সাধার ও নিরাধার। প্রথম-ক্ষেত্রে, ভ্রমের একটী আধার বা অবলম্বন আছে। অর্থাৎ, কোনো একটী বস্তু সত্যই সেই ভ্রমকারীর সম্মুখে থাকে, এবং সেই বস্তুটীকেই সে অন্য এক বস্তু বলে ভ্রম করে। যেমন, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করলে, ভ্রমকারীর সম্মুখে সত্যই একটী রজ্জু থাকে, কিন্তু সে রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ না করে, সর্পরূপেই প্রত্যক্ষ করে, অথবা, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করে (Illusion)। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, কোনো বস্তুই ভ্রমকারীর সম্মুখে থাকে না, অথচ সে একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করে। যেমন, শূন্য ঘরে হঠাৎ মৃত বন্ধুর মূর্তি দর্শন, বা একটী সর্প দর্শন (Hallucination)। এরূপে, প্রথম ক্ষেত্রে ভ্রম একটী বস্তু, আধার বা অবলম্বনকে আশ্রয় করেই উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তা নয়। এই বস্তু, আধার বা অবলম্বনকে বলা হয় ঃ 'অধিষ্ঠান'। ভ্রমকালে, এরূপ অধিষ্ঠানে অন্য এক বস্তুর গুণ-কর্মাদি আরোপ করা হয় বলেই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। যেমন, রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করা হয় কেন? তার কারণ হল এই যে, রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে অন্য এক বস্তু বা সর্পের গুণ-কর্মাদি আরোপ করা হয়; এবং প্রকৃত-পক্ষে, রজ্জু ও সর্প দুটী ভিন্ন বস্তু হলেও, এই আরোপের ফলে, তারা অভিন্ন বলে প্রতীত হয়, অথবা রজ্জুকেই সর্প বলে মনে হয়। এক বস্তুর উপর অপর এক ভিন্ন বস্তুর এরূপ ভ্রমাত্মক আরোপ, অর্থাৎ, দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভ্রমাত্মক অভেদ প্রতীতির নাম "অধ্যাস"। যেমন, রজ্জু ও সর্প দুটী ভিন্ন বস্তু। অথচ তাদের অভিন্ন প্রতীতি, বা রজ্জুতে রজ্জুদৃষ্টির স্থলে সর্পদৃষ্টির নাম "অধ্যাস"। এস্থলে রজ্জুরূপ 'অধিষ্ঠানে' সর্প 'অধ্যস্ত' হয়ে রজ্জুতে সর্প-প্রত্যক্ষরূপ-ভ্রমের সৃষ্টি করেছে।

অন্য আরেক দিক থেকেও ভ্রম দুপ্রকারের ঃ সদর্থক বা ভাবার্থক, এবং নঞর্থক বা অভাবার্থক। প্রথম ক্ষেত্রে, একটী সত্যবস্তুর বিষয়েই যে কেবল জ্ঞানের অভাব থাকে, তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই স্থলে আরেকটী মিথ্যাজ্ঞানেরও উদয় হয় (Positive Mal-observation)। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র, সত্যজ্ঞানেরই অভাব থাকে, মিথ্যাজ্ঞানের অস্তিত্ব নয় (Negative Non-observation)। যেমন, রজ্জুটী আমাদের সম্মুখে থাকলেও, তা' কেবল-মাত্র রজ্জু বলে না জেনে সঙ্গে সঙ্গে সর্পও বলে জানা—এই হল প্রথম শ্রেণীর ভ্রম। কিন্তু কেবলমাত্র তা' রজ্জু বলে না জানা—এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রম। এই ভাবে, রজ্জু-সর্পভ্রম হ'ল সাধার বা বস্তুআশ্রয়ী এবং ভাবার্থক ভ্রম।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ রজ্জু-সর্প-ভ্রমের কারণ কি? কারণ হ'ল সেই ভ্রমকারীর রজ্জু-

প্রত্যক্ষের অভাব, অর্থাৎ রজ্জু সম্বন্ধে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ করলে, বা রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে কেহ রজ্জুকে সর্পবলে ভ্রম করতে পারেনা। সেজন্য রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই ভ্রমের মূল কারণ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই রজ্জু-সর্প-ভ্রম কেবল অভাবাত্মক বা সত্যজ্ঞানের (অর্থাৎ, রজ্জুজ্ঞানের) অভাবই মাত্র নয়, সেই সঙ্গে ভাবাত্মক বা মিথ্যাজ্ঞানরূপীও (অর্থাৎ, সর্পজ্ঞানরূপী) নিঃসন্দেহে। সেজন্য, ভ্রমের মূল কারণ, অজ্ঞানেরও ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক দুটী কার্য বা শক্তি। অভাবাত্মক শক্তির নাম "আবরণশক্তি", এবং ভ্রমের অভাবাত্মক দিকের কারণ হল এটী। ভাবাত্মক শক্তির নাম "বিক্ষেপ-শক্তি" এবং ভ্রমের ভাবাত্মক দিকের কারণ হল এটী। এরূপে, আবরণশক্তিশীল অজ্ঞান প্রথমে সত্য আধার বা অধিষ্ঠানটীর (রজ্জুর) স্বরূপ আবৃত করে দেয়—এই কারণে, সত্য রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হয়। সেইসঙ্গে, বিক্ষেপশক্তিশীল অজ্ঞান আবৃত রজ্জুর স্থলে মিথ্যা সর্পের বিক্ষেপ করে। মিথ্যাসর্পের যেন সৃষ্টি করে—অর্থাৎ রজ্জুটীকে যেন এরূপভাবে বিকৃত করে' দেয় যাতে তা' সর্পরূপেই প্রতিভাত হয়—এই কারণে, মিথ্যা রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হয়। এরূপে, আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানই অধ্যাসের জনক, এবং অধ্যাসই এরূপ সাধার ও ভাবাত্মক-ভ্রমের জনক।

শঙ্করের মতে, রজ্জু থেকে যে প্রক্রিয়ায় মিথ্যা সর্পের উদ্ভব হয়, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই ব্রহ্ম থেকেও মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ নয়। কিন্তু, অজ্ঞানবশতঃ, জীব সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের আরোপ বা অধ্যাস করে, এবং ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভ্রম করে। এরূপে, জীবাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে। 'ব্রহ্মই সত্য' এই সত্যজ্ঞান থেকে আমাদের বঞ্চিত করে। অপরপক্ষে, সেই অজ্ঞানই ব্রহ্মস্থলে যেন বিশ্বের সৃষ্টি করে—'বিশ্বই সত্য' এই মিথ্যাজ্ঞানেরও সৃষ্টি করে। এরূপে, জীবের দিক থেকে, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই মিথ্যা জগতের কারণ।

ব্রহ্মের দিক থেকে, তাঁর ভ্রম সংঘটক 'মায়া' শক্তিই মিথ্যা জগতের কারণ। এই শক্তি কিন্তু ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, এবং ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নয়।

অগ্নি থেকে উষ্ণতা যেমন স্বতঃই ও স্বভাবতই উৎসারিত হয়, অথচ, উষ্ণতা অগ্নিভিন্ন নয়—ব্রহ্ম ও মায়ার ক্ষেত্রও ঠিক তাই।

ভাষাতত্ত্ব—শব্দকথা

ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গোচর প্রভৃতি শব্দ।

সকল ভাষাতেই আমরা দেখিতে পাই কোন কোন সামান্য-বাচক শব্দ ক্রমশঃ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে, আবার কোন কোন বিশেষবাচক শব্দ ক্রমশঃ সামান্যবাচিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ভারতীয় ভাষাগুলিতে গোশব্দঘটিতপদগুলি প্রায়ই সামান্যার্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। গোচর-শব্দটীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

পাণিনির একটী সূত্রে * ঘ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের তালিকায় গোচরশব্দের উল্লেখ আছে। গাবশ্চরন্ত্যত্র অর্থাৎ গোরুরা এই স্থলে চরিয়া বেড়ায় এইভাবে অধিকরণবাচ্যে গোচরশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গোচরশব্দের অর্থ—গোচরণের মাঠ। আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে এই অর্থে গোচর-শব্দ দৃষ্ট হয়।

কঠোপনিষদের সময়েই শব্দটী সাধারণীকৃতির দিকে একটু অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে পাই। কঠোপনিষদে (১।৩।৩—৪) আছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব বলিয়া থাকেন, আর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে তাহাদিগকে গোচর বলিয়া থাকেন। মনীষিগণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

এ স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গোচর-শব্দটী গোচারণের মাঠ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া অশ্বের বিচরণ স্থান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কুমারসম্ভবে আছে—

অকিঞ্চনঃ সন প্রভবঃ সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥

তিনি কপর্দকশূন্য হইলেও সমস্ত সম্পদের মূল, তিনি শ্মশানে বাস করেন অথচ তিনি ত্রিভুবনের নাথ (রক্ষক), তাঁহার রূপ ভীষণ অথচ তাঁহাকে শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় বলা হয়। পিনাকধারী মহাদেবের সত্য স্বরূপ কেহই জানে না।

এ স্থলে পিতৃসদ্ম-গোচর-শব্দের অর্থ পিতৃসদ্ম অর্থাৎ শ্মশান হইয়াছে গোচর অর্থাৎ বাসস্থান যাঁহার তিনি। গোচর শব্দের গোরুর বিচরণ স্থান হইতে অর্থ হইল শুধু বিচরণ স্থান।

* গোচর-সঞ্চর-বহ-ব্রজ-ব্যজাপণনিগমাশ্চ। ৩।৩। ১১৯

রঘুবংশে (১০।২৫) আছে—

প্রণিপত্য সুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরদ্বিষাম্।
অথৈনং তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙমনসগোচরম্॥

তাহার পর অসুরবিনাশক বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া বাঙমনঃপথাতীত স্তুত্যার্হ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে অবাঙমনসগোচর-শব্দের অর্থ—যিনি বাক্য ও মনের গোচর নহেন অর্থাৎ বাক্য ও মন যতদূর বিচরণ করে বা করিতে পারে তাহা অতিক্রম করিয়া যিনি অবস্থিত।

কিরাতার্জুনীয়ে (৮।২৮) আছে—তরঙ্গ মালান্তর গোচরোঽনিলঃ অর্থাৎ তরঙ্গমালার মধ্যে গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান যাহার এরূপ বায়ু। কিরাতার্জুনীয়ে অন্যত্র (১৪।৫৫) আছে—অরুন্তুদত্বং মহতাং হ্যগোচরঃ, অর্থাৎ মর্মপীড়া মহদ্গণের বিচরণ স্থান নহে, অর্থাৎ মর্মপীড়া মহদ্গণের অবিষয়।

এইরূপে ইন্দ্রিয়গোচর শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় যতদূর বিচরণ করিতে পারে তাহা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, ইন্দ্রিয়পথাতিক্রান্ত, ইন্দ্রিয়বিষয়াতীত, beyond the range of the senses.

এরূপস্থলে টীকাকারগণ অর্থ করেন—গাব ইন্দ্রিয়াণি চরন্ত্যত্র গোচরম্। এরূপ অর্থ অত্যন্ত ক্লিষ্ট। আর যখন পূর্বোক্তপ্রকারে সহজেই অর্থ করা যাইতেছে তখন এরূপ কষ্টকল্পনা অনাবশ্যক।

এইরূপে সংস্কৃতে গোপাশব্দের অর্থ যিনি গোরুকে রক্ষা করেন, গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। (পরবর্তী সংস্কৃতে ও বাঙলায় অন্যান্য অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় এই শব্দটীও অকারান্ত হইয়া গিয়াছে।) ক্রমশঃ গোপাশব্দের অর্থ গোরক্ষক হইতে সাধারণভাবে রক্ষক হইল। ঋগ্বেদে আমরা পাই—গোপামৃতস্য দীদিবিম্ (১।১।৭), যজ্ঞের দেদীপ্যমান রক্ষক। ভুবনস্য গোপাঃ (১০।১৭।৩) লোকের রক্ষক। গোপাশব্দ হইতে নামধাতু হইল—গোপায়, অর্থ গো-রক্ষকের মত আচরণ করা, তাহা হইতে সাধারণীকরণের ফলে অর্থ হইল রক্ষা করা। এই গোপায় দেখিয়া লোকের ধারণা হইল ইহার মূলে গুপ একটী ধাতু আছে, ফলে রক্ষণার্থ গুপ ধাতুর সৃষ্টি হইল, আর গোপয়তি শব্দের অনুরোধে বৈয়াকরণগণ তাহার উত্তর স্বার্থে আয় প্রত্যয় করিতে বাধ্য হইলেন*।

গবেষণাশব্দের অর্থ গোরুর জন্য ইচ্ছা, গোরুর অন্বেষণ। ফলে ধাতুপাঠে একটী গবেষ ধাতু যোগ করিতে হইল। আজকাল এই research-এর যুগে ত সর্বত্র গবেষণা গম্ গম্ করিতেছে। মহাভারতে আছে—অহেরিব হি ধর্মস্য পাদং দুঃখং গবেষিতুম্ অর্থাৎ সর্পের পদের ন্যায় ধর্মের পদও অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর।

গোব্যূতি শব্দটী সম্ভবতঃ গো ঊতি এই দুইটী শব্দের সমাসের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক অর্থ গোরুর রক্ষণ বা খাদ্য যে স্থানে আছে অর্থাৎ গোচারণের মাঠ। ক্রমশঃ উহার সাধারণভাবে অর্থ হইল প্রদেশ বা বাসস্থান। এদিকে তখনকার দিনে গোচারণের মাঠ দুই ক্রোশ-ব্যাপী হইত বলিয়া গব্যূতি শব্দের অর্থ দেখা যায় দুই ক্রোশ। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের মতে গো যূতি এই দুইটী শব্দ সমস্ত হইয়া গব্যূতি আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন—একবার শকটে বৃষ যুক্ত করিয়া দুই ক্রোশ যাওয়া হইত, সেইজন্য গব্যূতি অর্থ দুই ক্রোশ, ঠিক যেমন খোলা মাঠে চীৎকার করিলে শব্দ এক ক্রোশ পর্যন্ত যাইত বলিয়া ক্রুশ ধাতু

* গুপূ-ধূপ-বিচ্ছি পণি পণিভ্য আয়। ৩।১।২৮

নিষ্পন্ন ক্রোশশব্দ দুই মাইল বোঝায়।

গোষ্ঠশব্দের অর্থ—যেখানে গোরুরা দাঁড়াইয়া থাকে। ঋগ্বেদে আছে—নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্ (১।১৯১।৪)। গোষ্ঠে অনেক গোরু একসঙ্গে থাকে বলিয়া যেখানে অনেকে একত্র হইয়া নানাবিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে গোষ্ঠী বলা হয়। আবার অর্থের সাধারণীকরণের ফলে গো-গোষ্ঠ বলিলেও পুনরুক্তি দোষ হয় না, মহিষ-গোষ্ঠ বলিলেও উদ্বেগ হয় না। মনুসংহিতায় আছে—গবাং গোষ্ঠে (৪।৫৮)।

গোযুগ শব্দের অর্থ একজোড়া গোরু, ক্রমশঃ উহা শুধু একজোড়া অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, ফলে বৈয়াকরণগণকে গোগোযুগম্, উষ্ট্রগোযুগম্ প্রভৃতি শব্দের সাধুত্বের জন্য সূত্র করিতে হইল—গোষ্ঠাদয় স্থানাদিষু পশুনামাদিভ্যঃ (৫।২।২৯ সূত্রের দ্বিতীয় বার্তিক।) অর্থাৎ পশুনামবাচকশব্দের উত্তর ও অন্যান্য শব্দের উত্তর স্থান প্রভৃতি অর্থে গোষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

এইরূপ ষড্‌গশব্দের অর্থ তিন জোড়া গোরু, কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণীকরণের ফলে অর্থ দাঁড়াইল—তিন জোড়া। ফলে গোষড্‌গবম্ উষ্ট্রষড্‌গবম্ প্রভৃতি প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

গোময়শব্দের প্রাথমিক অর্থ—গোরূপ, যেমন গোময়ং বসু (ঋগ্বেদ ১০।৬২।২) অর্থাৎ গোধন। তাহার পর অর্থ হইল গোরুর বিকার, তাহা হইতে বিশেষীকরণের ফলে গোরুর বিষ্ঠা অর্থাৎ গোবর দাঁড়াইল। তাহার পর সাধারণীকরণের ফলে অর্থ হইল যে কোন চতুষ্পদ প্রাণীর বিষ্ঠা। ফলে উষ্ট্র-গোময় (উটের গোবর), খর-গোময় (গাধার গোবর) প্রভৃতি প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

গোপতিশব্দের অর্থ—গো ও বলীবর্দসমূহের অধিপতি, কিন্তু ক্রমশঃ উহা সাধারণভাবে অধিপতি, প্রধান, নেতা অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদে (১।১০১।৪) আছে—যো অশ্বানাং যো গবাং গোপতির্বশী, অর্থাৎ যিনি অপরাধীন আর যিনি অশ্বগণের ও গোগণের অধিপতি।

গোস্বামীশব্দের প্রাথমিক অর্থ—গোরুদের স্বামী বা মালিক। ব্যাকরণের মূর্ধাভিষিক্ত উদাহরণ (stock examples)—গবাং গোষু বা স্বামী। ক্রমশঃ সাধারণীকরণের ফলে অর্থ দাঁড়াইল যে কোন মালিক, প্রভু বা বড়লোক। পুনরায় বিশেষীকরণের ফলে অর্থ দাঁড়াইল—আধ্যাত্মিক জগতে বড়।

পুরোগশব্দের অর্থ—গোযূথের অগ্রগামী বৃষ। তাহা হইতে অর্থ হইল পুরোগ, অগ্রগামী, নেতা। আবার পুরোগবীশব্দের অর্থ হইল নেত্রী, ঋগ্বেদে আছে—জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী (১০।১৩৭।৭), জিহ্বা বাক্যের নেত্রী। অথর্ববেদে আছে—ইন্দ্র এতু পুরোগবঃ (১২।১।৪০) নেতা ইন্দ্র আসুন।

বৌদ্ধ সাধনা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সত্য উপলব্ধি করে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করলেন ও চোয়াল্লিশ বৎসর ধরে তিনি যে সত্য প্রচার করেছিলেন সেই আর্যসত্যের মূল কথা হচ্ছে এই যে দুঃখ হচ্ছে সব উৎপত্তি-গত জীবনের ধর্ম, এই দুঃখের মূল হচ্ছে তন্হা অর্থাৎ তৃষ্ণা—তন্হায় জায়তী সোকো, তন্হায় জায়তী ভয়ং, তন্হায় বিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভয়ং?—ধম্মপদ; দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব ও এই দুঃখ দূর করবার আটটি উপায় বা পথ আছে।

বৌদ্ধধর্মের মতে এই দুঃখ হচ্ছে মানুষের নিজের কর্মের ফলস্বরূপ। এই দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে ও করবে শুধু নিজের প্রচেষ্টায়—আত্মোপলব্ধির দ্বারা। ভগবানের মধ্যস্থতায় দুঃখ দূর হবে না। ভগবানের মধ্যস্থতা বৌদ্ধধর্ম মানে না। ভগবৎকৃপার স্থান তাই মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টাতেই নিজেকে ও সামাজিক আবেষ্টনীকে বদল করতে পারে ও নেই বৌদ্ধসাধনায়। মানুষ তার সামাজিক আবেষ্টনী তৈরী করেছে, নিজেকে তৈরী করেছে। অতিক্রম করতে পারে। এটা ক্রমাভিব্যক্তির পথ ধরেই ঘটবে। যাঁরা বুদ্ধ তাঁরা যুগে যুগে এই পথই দেখিয়ে গেছেন।

বৌদ্ধধর্ম-মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে নয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে উচ্চ আদর্শের দিকে, আর্য-সত্যের দিকে পরিচালিত করেই মানুষ মুক্তি পাবে। ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্রে দেখি বুদ্ধদেব গুরু পারাশার্থ-এর শিষ্যকে প্রশ্ন করে যখন জানলেন যে তাঁর গুরু তাঁকে এমন করে ইন্দ্রিয়নিরোধ করতে বলেছেন যাতে ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব কার্য—দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি—থেকে বিরত হয়, তখন বুদ্ধদেব এই শিক্ষাকে অর্থহীন শিক্ষা বল্লেন। তিনি বল্লেন এই শিক্ষা যদি মানুষকে মুক্তি দিতো তাহোলে অন্ধ, বধির প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দোষাক্রান্ত লোকেরাই তো শ্রেষ্ঠ সাধক। বুদ্ধদেবের মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে তুচ্ছ পার্থিব বস্তুতে আবদ্ধ না রেখে প্রথমে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান বা 'সংজ্ঞা' লাভের চেষ্টা করতে হবে। এই সংজ্ঞার সাহায্যে 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। তারপরে এই বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞানের সহায়তায়, 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ অনুভূতিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সবশেষে এই প্রজ্ঞার সাহায্যে 'বোধি' অর্থাৎ সাক্ষাৎ-উপলব্ধিজাত জ্ঞান লাভ হবে। এই হচ্ছে প্রকৃত দর্শন, সর্বোত্তম জ্ঞান। বৌদ্ধধর্ম আষ্টেপৃষ্ঠে-বাঁধা শাস্ত্র-মতের জ্ঞানের চেয়ে এই বোধিকে অনেক উচ্চে স্থান দেয়। এই জ্ঞানের ফলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পায় ও পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম-মতে সত্য-উপলব্ধি সত্যের উপর বিশ্বাস বা ভক্তি থেকে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় মানুষের জন্যে। এই সত্য উপলব্ধি করতে গেলে আটটি বস্তুর প্রয়োজন—(১) উচিত জ্ঞান (২) উচিত উদ্দেশ্য (৩) উচিত বাক্য (৪) উচিত কর্ম (৫) উচিত জীবিকা-অর্জনের উপায় (৬) উচিত চেষ্টা (৭) উচিত সজাগতা ও (৮) উচিত একাগ্রতা।

উচিত জ্ঞান

এই উচিত জ্ঞান কাকে বলে? সব ভৌতিক দ্রব্য, ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান, এসব অনিত্য এই চেতনাই হচ্ছে উচিত জ্ঞান। ঘটনা, দ্রব্য ও ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি বস্তুত যা অর্থাৎ

অনিত্য, এই চেতনা-লাভ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করবার জন্যে সাধককে হিংসালেশ-শূন্য জীবন যাপন করতে হবে ও ধ্যান (ভাবনা) করতে হবে; তবে অজ্ঞানতার হাত থেকে ও অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে তার মুক্তি হবে। এই জ্ঞান-লাভের পথে সাধক যতো এগোবে ততই তার মন থেকে লৌকিয় ভাব অর্থাৎ এই লোক-সংক্রান্ত ভাবগুলি—ঝরা পাতার মতো খসে পড়বে। সাধকের চেতনা এক উচ্চতর চিৎভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উচিত উদ্দেশ্য

যে জ্ঞান বা সত্য উপলব্ধি করা হয়েছে সেই জ্ঞান বা সত্যকে জীবনের সর্ব কার্যে প্রতি-ফলিত করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা উচিত উদ্দেশ্য। জ্ঞানলাভ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞান জীবনের প্রতিটি কাজে আপনাকে স্বপ্রকাশ না করে সে জ্ঞান নিষ্ফল থেকে যায়। যে মানুষ জ্ঞান লাভ করে তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, তার বাক্যে, আচরণে ও কর্মে সেই জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, সে মানুষ জীবনে জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে নি; তার জ্ঞান বন্ধ্যা।

দুই জাতের কিম্বা দুই স্তরের উদ্দেশ্য আছে, একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, আর একটি হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই সংসারের সীমার মধ্যে জ্ঞানের বা সত্যের প্রকাশ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের লক্ষ্য। চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বোধি লাভ করে সব আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া বা নির্বাণলাভ করা।

উচিত বাক্য

সত্য ও করুণা-সিক্ত বাক্যই উচিত বাক্য। যে বাক্য জ্ঞানের উৎস থেকে নিঃসারিত হয়নি, শুধু অজ্ঞানতা ও সংস্কারের অন্ধ অভ্যেস থেকে জন্ম লাভ করেছে, সেই বাক্য নিরর্থক। যে বাক্য মানুষের প্রতি প্রেমের রসে সরস নয়, উজ্জ্বল নয়, সে বাক্য মৃত বাক্য। জ্ঞান ছাড়া করুণা সম্ভব নয়। জন্মমৃত্যুর চক্রে জীব বাঁধা রয়েছে এই জ্ঞান থেকেই করুণার উদ্ভব।

উচিত কর্ম

শান্তিময়, সৎ ও পরহিতকারী কর্মই উচিত কর্ম। যে কর্ম সংঘাত সৃষ্টি করে কিম্বা সংঘাতের সম্ভাবনা ঘটায়, সে কর্ম অনুচিত কর্ম, অমঙ্গলের হেতু। সৎ কর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যা জ্ঞান-প্রসূত, যা নিছক জড়-অভ্যাসজাত নয়। জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসা আছে, বিচার আছে। সৎ কর্ম বিচারমূলক লৌকিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ। যে কর্ম মানুষের কল্যাণ করে না সে কর্ম একেবারে নিষ্ফল। পরহিতকারী কর্মের প্রেরণা দেয় জ্ঞান ও করুণা। জ্ঞান ও করুণা মানুষকে আত্মাভিমানের খণ্ডতা-দোষ দূর করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের অনুভূতি দেয়। সেই অনুভূতি মানবহিতকারী কর্মের প্রেরণা যোগায়।

জীবিকা অর্জনের উচিত উপায়

যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করলে কারো ক্ষতি করা হয় না কিম্বা জীবিকা অর্জন কারো দুঃখের কারণ হয় না, জীবিকা-অর্জনের সেই উপায়ই হচ্ছে উচিত উপায়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সোজাসুজি ভাবে জীবিকা-অর্জনের ব্যাপারটিকে ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করে নি। এটি বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য। জীবিকা অর্জন যেন কোনো উপায়ে করা যেতে পারে, তার সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো যোগ নেই—এই হোলো শিক্ষিত(!) সমাজের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা! এই সর্বনেশে প্রবঞ্চনাকে আঘাত হেনেছে বৌদ্ধ মতবাদ। মানুষের জীবনের কোনো অংশকেই ধর্ম-সাধনা থেকে বাদ দেবার উপায় নেই। তার আহার-বিহার-

চিন্তা-অনুভূতি সব এক সূত্রে বাঁধা। একটি জায়গায় কলুষ স্পর্শ করলে সব কলুষিত হবে। সকালে চোরাকারবার করে সন্ধ্যে বেলা ধার্মিক সাজা যেতে পারে, সাজছেও লোকে এই সমাজে, কিন্তু ধার্মিক হওয়ার কোনো উপায় নেই।

উচিত চেষ্টা

চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবার, সংযত করবার চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। কামনার হাওয়ায় চিন্তা সতত আন্দোলিত, জ্ঞানের অনড়ভূমিতে চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। কামনার আলেয়ার পেছনে কর্মনিয়ত প্রধাবিত, মানব-কল্যাণের চেতনার আলোকে কর্ম উদ্ভাসিত হতে পারছে না। কামনার এই অসংযত ও ব্যর্থ ছোটাছুটি ও হয়রাণির হাত থেকে চিন্তা ও কর্মকে বাঁচানোর চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। যা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকবার প্রয়াস, যা সকলের হিতকারী তা সাধন করবার প্রচেষ্টা, কামনা ও অজ্ঞানতা অতিক্রম করবার নিরন্তর সংগ্রাম, নির্বাণের পথে অগ্রসর হবার জন্যে অবিরাম সাধনা—এই হচ্ছে উচিত চেষ্টা।

উচিত সজাগতা

ব্যক্তিগত জীবনের ও সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের বিভিন্ন চিন্তাধারার ও কর্মের কারণ ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে সজাগতাই হচ্ছে উচিত সজাগতা।

জীবনের পথ দিয়ে মানুষ চলে যায়, চলে যায় যেন তন্দ্রার ঘোরে। তন্দ্রার ঘোরে চল্‌তে চল্‌তেই তার জীবনের অবসান ঘটে মৃত্যুর জাগরণহীন নিদ্রায়। অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কার এরা দুটি হোলো ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, আমাদের চেতনাকে এরা সব সময়েই জড়তার ও অজ্ঞানতার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে। তার ফলে অন্তরের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় না, মানব-প্রেম জাগে না, কর্ম জ্ঞানের সংস্পর্শ লাভ না করে মানুষের কল্যাণ-সাধনের শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সজাগতার এতো প্রয়োজন। শরীর ও মন সম্বন্ধে সজাগতা, অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিচারশীল সজাগতা, বর্তমানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানসিক সজাগতা। এই সজাগতা থাকলেই মানুষ জ্ঞান লাভ এবং চিন্তায় ও কর্মে মহীয়ান হয়।

উচিত একাগ্রতা

সব চিন্তা বাদ দিয়ে বিশেষ একটি চিন্তার উপর মনকে কেন্দ্রস্থ করা ও প্রতিষ্ঠিত করাই হোলো উচিত একাগ্রতা। মন যেন হরিণ সে কেবলই ছুটে বেড়ায় অন্তর ও বাহিরের বনবনান্তরে। কোথাও তার স্থিতি নেই, তাই অস্থির মন কোনো বস্তুর সত্তার স্পর্শ পায় না। কেবল জীবনের উপরে উপরেই মনের যাওয়া-আসা, তাই কোনো বস্তুর সত্তার আস্বাদন করা তার ভাগ্যে ঘটে না। অথচ মন সত্তার আস্বাদ পেতে পারে ও মনের প্রকৃত কার্যই হোলো বস্তুর সত্তার প্রকৃত আস্বাদন। মন যখন এই উচিত একাগ্রতার সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সমাধি প্রাপ্ত হয় তখন পন্না অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় ও মনের অন্তর্দৃষ্টির বন্ধ দরজা খুলে যায়। এই একাগ্রতা (অথবা সমাধি) দুই রকমের —প্রাথমিক একাগ্রতা (উপকার সমাধি) ও পূর্ণ একাগ্রতা (অপপনা সমাধি)। উচিত একাগ্রতা লাভের পরে আত্মপ্রত্যয়মূলক চিন্তা (intuitive thinking) সুরু হয়। মহাযানীদের মধ্যে যাঁরা 'জেন' সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁরা 'সতরি' অর্থাৎ এক ঝলক সত্য-লাভে বিশ্বাস করেন। আত্মশুদ্ধি অবশ্যি অনেক কাল ধরে চলেছে তার আগে।

এই প্রাথমিক একাগ্রতা সাধনার জন্যে কতকগুলি বস্তুর সাহায্য নেবার নির্দেশ আছে। এই

বস্তুগুলিকে 'কসিন' বলা হয়। কসিন দশ প্রকার—মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, জল, লাল রঙ, নীল রং, শাদা রং, হলদে রং, আলো ও বিস্তৃতি।

ছুটন্ত মনকে সব কিছুর থেকে গুটিয়ে এনে একটি বিশেষ কিছুর মধ্যে সমাহিত করবার জন্যে এই কসিনগুলির সৃষ্টি। কসিনগুলি যে কোনো একটিকে নিয়ে মন যদি আপনাকে স্থিরতা ও সংযম শিক্ষা দেয় তাহোলে কাজ এগলো। এটা কিন্তু নিছক প্রাথমিক একাগ্রতার জন্যে প্রয়োজন। তারপরে কসিনগুলির আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মন আপনার সুপ্ত শক্তিকে উদ্ধার করে নিয়েছে জড়তার আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চৈতন্য-উদ্ভাসিত মনের আর বাইরের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

ধ্যানকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভাবনা' বলা হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন যে "ধ্যান ছাড়া জ্ঞান নেই, জ্ঞান ছাড়াও ধ্যান নেই। যার ধ্যান আছে ও জ্ঞান আছে, সে-ই এই ভৌতিক জগতে বস্তুর (reality) কাছাকাছি পেঁাচেছে।"

'ভাবনা'-র (ধ্যানের) জন্যে মনকে কঠোর শিক্ষা দেওয়া দরকার। মন চারিদিকে দৌড়তে চায় আগুনের শিখার মতো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় পারার মতো। তাকে স্থির করতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ধ্যান ছাড়া মন আত্ম-সমাহিত হয় না আর যে মন সমাহিত নয় জ্ঞান তার কাছে ধরা দেয় না। তাই ভারতীয় সাধনায় ভাবনা (ধ্যান) এতো গুরুত্ব লাভ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ভাবনা দু'রকমের—(এক) সমাধি ভাবনা (দুই) ভিপ্পস্সনা ভাবনা।

সমাধি ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক মনের একমুখিনত্ব লাভ করেন। মন তখন নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে নানা বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয় না। মন তখন একাভিমুখিন হয়ে স্থিরতা ও অচঞ্চলতা লাভ করে। তখন চারিদিকের ভৌতিক দ্রব্য তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না। ভৌতিক-দ্রব্য-সংস্পর্শ-জাত উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেয়ে মন প্রশান্তি লাভ করে। সমাধি ভাবনায় মনকে একবার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে মনকে স্থির করবার জন্যে বহির্জগতের কোনো দ্রব্যের অর্থাৎ কসিনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না। ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান তখন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখিনতা প্রাপ্ত হয়। এই ধ্যানের পথে মন শুচিতা লাভ করে ও ইন্দ্রিয়-পরবশতা সম্পূর্ণ-ভাবে অতিক্রম করে। তখন মন চারটি বিশেষ ecstatic অবস্থা প্রাপ্ত হয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই অবস্থাগুলিকে 'ঝানস্' বলা হয়। সমাধি ভাবনার চারটি ঝানস্-এর সর্বোত্তম ঝানস্ লাভ করলে শরীর ও মনের শান্তি ও অলৌকিক আনন্দ লাভ করা যায়। এই অবস্থায় পেঁাছলে সাধক পাঁচটি বুদ্ধিজাত-উপলব্ধি লাভ করেন। এই বুদ্ধিজাত-উপলব্ধিকে 'অভিন্না' বলা হয়। এই পাঁচটি অভিন্না হচ্ছে—(এক) অপ্রাকৃতিক আশ্চর্য ক্ষমতালাভ (দুই) দিব্য দৃষ্টি (তিন) দিব্য শ্রবণ (চার) পূর্বজন্ম-স্মরণ (পাঁচ) অন্যের চিন্তা ও মানসিক ক্রিয়া বোঝবার ক্ষমতা।

এগুলি কিন্তু 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) লক্ষ্য নয়। এই 'অভিন্না'-লাভ সাধনার নিম্নস্তরের বস্তু। যিনি এই সব ক্ষমতা-লাভের মোহে আবদ্ধ হলেন তাঁর ধ্যান ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেন না ক্ষমতা-লাভের জন্যে ধ্যান নয়, ধ্যান হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্যে। তাই যে সাধক এই 'অভিন্না'-প্রাপ্তির পরেও এগোতে চান তাঁকে 'কস্সিন'-এর সাহায্যে রূপ-ভাবনা থেকে অরূপ-ভাবনায় (অরূপ-ধ্যান) যেতে হবে। এই উপায়ে সাধক অরূপলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যেমন 'অভিন্না'-প্রাপ্তি সাধকের চরম লক্ষ্য নয়, তেমনি অরূপলোক-প্রাপ্তিও সাধকের চরম উদ্দেশ্য নয়। 'সমাধি-ভাবনা'-র চতুর্থ 'ঝানস্'-এ পেঁাছে সাধক 'ভিপ্পস্সা ভাবনা'-র দিকে তাঁর মনকে চালিত করবেন।

(দুই) ভিপস্সনা ভাবনা

ভিপস্সনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক বস্তুর আত্মপ্রত্যয়জাত (intuitive) জ্ঞান লাভ করেন। ভিপস্সনা-ভাবনা-সিদ্ধ সাধক কার্য-কারণের শৃঙ্খলে-বাঁধা আমাদের এই হেতু-ভূত অস্তিত্বের তিনটি লক্ষণ উপলব্ধি করবেন—(এক) অনিত্যতা (দুই) দুঃখময়তা ও (তৃতীয়) সব ভৌতিক পদার্থের বস্তুহীনতা।

এই যে সমাধি-ভাবনা ও ভিপস্সনা-ভাবনা, রূপ-ভাবনা ও অরূপ-ভাবনা, এই 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) বিষয় হচ্ছে চল্লিশটি—দশটি 'কসিন', দশটি অশুভা, একটি আহারের দোষ (আহারে পতিক্কুলসন্না), একটি ভূত-বিশ্লেষণ (চতুধাতুভভথবনম্), দশটি স্মরণ (অনুস্সতি), চারটি ব্রহ্ম-বিহার ও চারটি অরূপ-ঝানস্।

দশটি 'কসিন'-এর কথা আগেই বলা হেয়েছে। দশটি অশুভ জিনিস, আহারের দোষ অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর প্রতি লোভ এগুলি বর্জন করবার জন্যে মনকে এদের সম্বন্ধে জাগ্রত করতে হবে, হুঁশিয়ার করতে হবে। তার পরে ভূত-বিশ্লেষণ। প্রতিটি দ্রব্যের ধাতুগত বিশ্লেষণ করতে হবে তাতে তাদের অনিত্যতা-বোধ সম্বন্ধে মন নিঃসংশয় হবে। তার পরে দশটি 'অনুস্সতি' (স্মরণ) ধ্যানের বিষয় হবে। সেই দশটি 'অনুস্সতি' হচ্ছে—বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শীল, দান, দেব, শান্তি (উপসম) মৃত্যু, দেহের প্রতি মনযোগ (কায়গতা সতি), ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি (অনাপানা সতি)। এর পরে চারটি ব্রহ্মবিহার হবে ধ্যানের বিষয়। এই চারটি বিষয় হচ্ছে—(এক) মেত্তা (দুই) করুণা (তিন) মুদিতা (চার) উপেক্ষা। মেত্তা হচ্ছে প্রেম, তবে অন্ধ প্রেম নয়, নিরাসক্ত প্রেম। অন্ধ প্রেম থেকে কাম ও তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। এই অন্ধ প্রেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,—এই অন্ধ প্রেমের ছায়া হচ্ছে বিদ্বেষ। করুণা সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে এই করুণা জ্ঞান-জাতা। জীব জীব-ন্মৃত্যুর শৃঙ্খলে-বাঁধা, সংসার-চক্রে পিষ্ট—এই জ্ঞান যথার্থ ভাবে লাভ হলে জীবের প্রতি যে জ্ঞান-উদ্ভূত অনুভূতি তারই নাম করুণা। মুদিতা হচ্ছে অচঞ্চল স্থির আনন্দ। এ আনন্দ বোধি লাভের ফল। মন অসংশয় ভাবে 'বস্তু'-র (reailty) জ্ঞান লাভ করে সব ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি শেষ করেছে। বোধি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মন পূর্ণ চৈতন্যময় হয়ে আনন্দ ভোগ করছে। উপেক্ষা হচ্ছে মনের সেই প্রশান্ত অবস্থা যখন সুখদুঃখ সব সমান বলে মনে হয়। যখন জীব-অস্তিত্বের পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় তখন অস্তিত্বের ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি করে সুখদুঃখ সব সমান বলে প্রতীয়মান হয় মনের কাছে।

চারটি অরূপ-ঝানস্ হচ্ছে—(এক) অসীম বিস্তারের ক্ষেত্র (আকাশানানসায়তন) (দুই) চেতনার অনন্তবোধক্ষেত্র (ভিন্নানন্সায়তন) (তিন) নির্বস্তুতার ক্ষেত্র (অকিন্নায়তন) ও (চার) অনুভূতি-নয় অ-অনুভূতিও-নয় সেই ক্ষেত্র (নেভসন্নানাসন্নায়তন)। প্রথম ঝানস্-এ ধ্যানের বিষয় বিশ্লেষণ করে চিন্তা করা হয়। বাসনা ও কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, নিরাসক্তির আনন্দ অনুভব করে সাধক প্রথম লোকত্তর আনন্দলোক প্রাপ্ত হন।

প্রথম ঝানস্-এ থাকে—(এক) বিশ্লেষণ (ভিতক্ক), (দুই) চিন্তা (ভিকার), (তিন) আনন্দ (পিতি), (চার) সুখ (সুখ), (পাঁচ) চিত্ত-একাগ্রতা (চিত্ত-একাগ্গতা সমাধি)।

দ্বিতীয় ঝানস্-এ থাকে আনন্দ, সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। বিশ্লেষণ ও চিন্তার পৈঁঠা থেকে মন, উঁচু পৈঁঠায় পেঁছয়। এই ঝানস-এর ফলে মনে সুগভীর চিন্তা ও আনন্দ উপলব্ধি স্থায়িত্ব-লাভ করে। তৃতীয় ঝানস্-এ থাকে সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। আনন্দ বাদ হয়ে যায় এই ঝানস্-এ কেন না আনন্দ অনিত্য। এই অবস্থায় মন অত্যন্ত একাগ্র ও চৈতন্যময় হয়। চতুর্থ ঝানস্-এ শুধু থাকে

নির্বিকার ভাব। সুখে দুঃখে সমভাব। এই সমভাব প্রাপ্ত হলেই সাধক রূপ, বেদনা (sensation) বুদ্ধিগ্রাহ্যতা (সন্ন), সু এবং কু কর্মের জনক মনের অবস্থাগুলি ও ক্রিয়াগুলি(সংখারা) ও চেতনা (ভিন্নান)—এই পাঁচটির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে। এই পাঁচটি হচ্ছে ব্যক্তির স্কন্ধ অর্থাৎ অস্তিত্বের গুণ। এই পাঁচটি নিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

এই ঝানস্ সিদ্ধ হোলে লোকত্তর জ্ঞান (অভিন্না) ও লোকত্তর ক্ষমতা (ইদ্ধি) লাভ হয়। বৌদ্ধ সাধনার উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্না-ও নয় ইদ্ধি-ও নয়—উদ্দেশ্য নির্বাণ।

ভাবনা-র (ধ্যানের) এই চল্লিশটি বিষয়ের মধ্যে ব্যক্তি বিষয় নির্বাচন করে কি করে? বৌদ্ধ-শাস্ত্র মতে ব্যক্তির চরিত্রের উপর বিষয় নির্বাচন নির্ভর করে। ব্যক্তির চেতনার যে অবস্থা সেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তি ধ্যানের বিষয় বেছে নেয়। চেতনার এই রকম কুড়িটি অবস্থা আছে। অভি-ধম্ম পিটক গ্রন্থে এই বিভিন্ন চেতনার বিশদ আলোচনা আছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে চেতনাকে শুধু চেতনা ও অবচেতনা এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে এই বিভাগের সংখ্যা কুড়ি।

যে সব চিন্তা মানুষের অন্তরের রোগস্বরূপ, সেই সব চিন্তার বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছে যে সেগুলি অজ্ঞানতার ফল। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে মনের এই চিন্তাগুলির আট লক্ষ চুরাশি হাজার মিশ্রণ সম্ভব। এই চিন্তার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং এই চিন্তা কতো রূপ দিতে পারে তাই দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, অজ্ঞানতা-প্রসূত এই চিন্তাগুলিকে কি করে রোধ করা যায় তার উপায় বাত্‌লিয়েছে বৌদ্ধশাস্ত্র।

আমরা দেখেছি যে ধ্যানের বিষয় নির্বাচন ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্যক্তির এই চরিত্র কিসের উপর নির্ভর করে? বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে ব্যক্তির চরিত্র নির্ভর করে—(এক) তার দেহের প্রকৃতির উপর (দুই) তার বংশগত চরিত্রের উপর (তিন) তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর—আবেষ্টনীর উপর (চার) তার নিজের কর্ম ও কর্ম-ফলের উপর।

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ব্যক্তির চরিত্রের উপাদান ও হেতু বিশ্লেষণ বৌদ্ধশাস্ত্রের তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দেখে। আধুনিক মনবিজ্ঞান কিম্বা সমাজবিজ্ঞান এর চেয়েও বেশী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় নি মানুষের চরিত্রের হেতু বিশ্লেষণে। প্রতিটি ব্যক্তির দেহের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে কেন না প্রতিটি দেহই একটি বিশেষ মিশ্রণের ফল। অতএব একজন ব্যক্তির দেহের এই বিশেষ প্রকৃতি তার চরিত্রের বিশেষ প্রকৃতির জন্যে আংশিক ভাবে দায়ী। ব্যক্তি তো শুধু কার্যকারণ-রহিত ভুঁইফোড় জীব নয়। অস্তিত্ব হচ্ছে ধারা, জীব-অস্তিত্বও ধারা। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান। জীব-অস্তিত্বে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ হচ্ছে বংশগত সম্বন্ধ। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে ব্যক্তি যেমন দেহের উপাদান পায় যা তার দেহের চরিত্র নির্ণয় করে, তেম্‌নি মানসিক উপাদানও পায় যা তার মনের বিশেষ গঠনের হেতু। আধুনিক কালে বায়লজি ও জেনেটিক্‌স্ যা বলছে heredity সম্বন্ধে, দুহাজার বছর আগে বৌদ্ধ বিজ্ঞান সে কথা পরিষ্কারভাবে বলে গেছে। তারপরে এলো আবেষ্টনীর (environment) প্রভাব ব্যক্তির চরিত্র গঠনে। দেহের ও মনের বংশগত উপাদানগুলির উপর ব্যক্তির হাত নেই কিন্তু আবেষ্টনীর উপর মানুষের হাত আছে। আবেষ্টনী সামাজিক অবস্থার ফল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করলে আবেষ্টনী বদল করা যায়। ব্যক্তির চরিত্রের উপর এই আবেষ্টনীর প্রভাব আজকাল সর্বজনস্বীকৃত। তবে কোনো কোনো লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে আবেষ্টনীর যতোটা প্রাধান্য দেয় সে প্রাধান্য উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্বদোষদুষ্ট।

বৌদ্ধ মত বিজ্ঞানসম্মত মত, তাই তাতে সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যানির্ণয় ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। চতুর্থ ও শেষ প্রভাব ব্যক্তির চরিত্রের উপর হোলো তার কৃত কর্মের। যে কর্ম আমরা করি সে যেমন আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির দ্বারা নির্ণীত তেম্নি যে কর্ম আমরা করি সেই কর্ম আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও আবেষ্টনী—এই তিনটিকে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত করে। বৌদ্ধমত ব্যক্তির জীবনের উপর কর্মফলের প্রভাব স্বীকার করে কিন্তু নিছক্ কর্মফলের হেতু ব্যক্তির চরিত্র একটি বিশেষ রূপ পায় এটি স্বীকার করে না। বহু কারণের সমন্বয়ে মানবচরিত্র গঠিত,—একটি দেহ-জাত কারণ, একটি বংশ-জাত কারণ, একটি সামাজিক কারণ ও একটি কর্ম-প্রসূত কারণ।

ব্যক্তির চরিত্রের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধ শাস্ত্র ক্ষান্ত দেয় নি, চরিত্র-হিসেবে ব্যক্তিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগও করেছে—(এক) কামুক (দুই) ক্রোধপরায়ণ (তিন) অ-জ্ঞানী (চার) অবিশ্বাসী (পাঁচ) অল্পে-বিশ্বাসী (ছয়) জ্ঞানী।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সংযমী, বিগত-ক্রোধ ও সত্যনিষ্ঠ। জ্ঞানের ভিতরই সংযম, ক্রোধশূন্যতা ও নিষ্ঠা আছে বলেই পৃথক করে সংযমী, বিগতক্রোধ ও নিষ্ঠাবানের কথা বলার প্রয়োজন হয় নি।

এই ভাবে ভিপস্সনা ভাবনা-র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধক জ্ঞানের পঁয়ত্রিশটি নীতির চর্চা করবেন। এই পঁয়ত্রিশটি নীতিকে 'বোধিপক্ষিয় ধম্ম' অর্থাৎ বোধি-অনুকূল ধর্ম বলা হয়। এই নীতিতে সিদ্ধি লাভ করলে সাধকের মন সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, সাধক নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

এই নির্বাণ লাভ করতে গেলে যে দশটি শৃঙ্খলে (সন্নোজন-এ) প্রাণী শৃঙ্খলিত সেই শৃঙ্খলগুলি ছিন্ন করতে হবে। সেই দশটি হচ্ছে—(এক) আত্ম-মায়া (দুই) অবিশ্বাস (তিন) রীতি ও পদ্ধতিতে আসক্তি (চার) কাম (পাঁচ) দ্বেষ (ছয়) রূপ-জগৎ সম্বন্ধীয় বাসনা (সাত) অরূপজগৎসম্বন্ধীয় বাসনা (আট) অহংকার (নয়) উত্তেজনা ও (দশ) অবিদ্যা, অজ্ঞানতা।

যে সাধক আত্ম-মায়া, অবিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতিতে আসক্তি-মুক্ত হয়েছেন তিনি নির্বাণ-প্রাপ্তির প্রথম পৈঁঠায় পৌঁচেছেন। তাঁকে 'সোতাপন্ন' বলা হয়, সোতাপন্ন-র মানে যিনি নির্বাণের স্রোতে নেমেছেন।

যে সাধক কাম ও দ্বেষ জয় করেছেন তাঁকে 'সকদাগামিন' বলা হয়। তিনি নির্বাণের দ্বিতীয় পৈঁঠায় পৌঁচেছেন। সেই সাধক মাত্র আর একবার এই পৃথিবীতে আসবেন।

যে সাধক আত্মমায়া, অবিশ্বাস, রীতি-পদ্ধতি, কাম ও দ্বেষ জয় করেছেন তিনি 'অনাগামিন', তিনি কাম-লোক থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি আর এই লোকে ফিরবেন না। শুদ্ধ-রূপ-লোকে তাঁর বাস হবে। এটি নির্বাণের তৃতীয় পৈঁঠা।

যিনি এই দশটি শৃঙ্খল ছিন্ন করেছেন তিনি অরহৎ, তিনি বুদ্ধ, তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। এইটি হচ্ছে নির্বাণলাভের শেষ পৈঁঠা।

এই নির্বাণ-পথ-যাত্রী সাধককে শাস্ত্রের উপর কিম্বা গুরুর উপরে নির্ভর করলে চল্‌বে না। এ পথে সাধককে নিজের পথের আলো হতে হবে নিজেকেই। কেন না তথাগতেরা হচ্ছেন

"তুম্হেহি কিচ্চমাতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা
পটিপন্না পমোক্খন্তি জায়িনো মারবন্ধনা।" ধম্মপদ

আশ্বিন আকাঙ্ক্ষা

সন্তোষ দাস

অবসন্ন ভাদ্রের আকাশে
পেঁজানো তুলোর মেঘ, শিশুর সরল হাসি হাসে,
ঘাসে রোদ্দুর—
কাশে কী ঝালর ঝোলে, আশ্বিন আর কত দূর?

মখমলের মত ঘাস, সবুজ সবুজে
সমস্ত দিনের দাহ, চোখ আসে বুজে
অসহ্য আরামে—
দিগন্ত ময়ূর নীল, মেঘ থম থমে।

এখনিতো ছেড়ে যাবে, রাঁচী এক্সপ্রেস
ধোঁয়ার নিশান তুলে, এতটুকু রেশ
ট্রেণের বাঁশীর—
যদি ভুলে কানে আসে, দেহ শিরশির!

ছুটির ছুটন্ত শব্দ, পলাতক হরিণের মত
ক্লান্ত কেরাণীর কানে, আশ্বিন আশ্বাস আনে যত
সবই বৃথা হায়—
পথ কী রঙীণ হবে দুধে আলতায়?

আশ্বিন আকাঙ্ক্ষা তার, তাই বুঝি কাশে ও আকাশে
নরম তুলোর মেঘ, দামাল শিশুর হাসি হাসে।

পারাবত

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উড়ে যায় শাদা পারাবত।
নীলশূন্যে ভেঙে দিয়ে ডানায় ডানায়
ভেসে চলে য'ায় ঃ
স্বর্গগামী রথ।
ডানার ঝাপট লেগে ঃ রথের চাকার তলে গুঁড়ো-গুঁড়ো পথ।
উড়ে যায়, উড়ে যায় শাদা পারাবত।

স্বর্গ সে কোথায়?
শুধুই অসীম শূন্যে ডানা ঝাপ্টায়
পারাবত দু'টি শাদা-শাদা;
(স্বর্গ কি কোথাও আছে? সে প্রশ্নের হয়না সমাধা)
তবু বুঝি স্বর্গ থাকে নীল-নীল মেঘে-মেঘে বাঁধা।

পারাবত উড়ে চ'লে গেছে,
উড়ে-উড়ে স্বর্গ-সিঁড়ি পার কি হয়েছে?
গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে কি বাধা সে তারার—
শত-শত মেঘ-অন্ধকার?
তারপর বুঝি আছে স্বর্গের ঠিকানা!
জানিনা, উধাও শুধু পারাবত-ডানা।

পারাবত নয়-নয় আমাদের মন,
হৃদয়ের নীলশূন্যে করে বিচরণ।

ছায়া

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

পুড়েছে ঘর ভেঙেছে বুঝি আশা
চৈতী তাপে সবুজ ভালোবাসা
শুকিয়ে গেছে! পথের দিকে চেয়ে
এখনো সেই সর্বহারা মেয়ে
গুনছে ছায়া—নিবিড় নীরবতা
ছায়া ত নয়—বুকের ব্যাকুলতা।

সে মেয়ে তবে মরবে জ্বলে পুড়ে
দেখেছি খুঁজে হৃদয়টাকে খুঁড়ে
এই আগুনে একটুখানি ছায়া
একটুখানি ধূসরমনের মায়া
কোথাও নেই। পেয়েছে যাকে কাছে
গড়তে গিয়ে নিজের মনের ছাঁচে
ভেঙেছে কেউ; কেউ বা গেছে ছেড়ে
আবার কেউ হৃদয়টাকে কেড়ে
পালিয়ে গেছে।

পুড়ুক ঘর—ভাঙুক তবে আশা
ছায়া ত নেই—ছায়াই দুরাশা
ফাল্গুনে যে কান্না বয়ে আনে—
কাঁদাও তাকে. লুকাবে কোনখানে!

ভুলবে ব্যথা প্রাণের উল্লাসে
এই আকাশে শ্রাবণ যদি আসে।

মৃত্যুর অতীত

শ্যামদাস সেনগুপ্ত

শীতে উত্তরের বাতাস পেতেছে মৃত্যুর সাথে মিতালী,
জীবনের দ্বন্দ্বে যেন দোলে মৃত বাগানের ফুলগুলি,
পাতা ঝরে. . .
জীবনের বিদীর্ণ পাতার পরমায়ু ঝরে মৃত্যুর সাগরে।

হিংস্র হাওয়ার অহরহ প্রবাহ
বিয়োগান্ত কাহিনীর বিবর্ণ পাতায়
মৃত্যুর নিঃস্বরূপ রেখাঙ্কিত ক'রে যায়।
তবু পউষের এই শীত
মৃত্যুর অতীত।

সবুজ ফুলশাখে বসন্তে বর্ণ ও গন্ধের কলরব
আনে পরম প্রশান্ত ঃ অমৃত সৌরভ।

শীতের ধূসর শ্মশানে মৃত্যুর অপরূপ গান
ডাক দিয়ে যায় বিকশিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান
বিকাশের বিস্তৃতি মরণের স্পর্শে, ছোঁয়ায়,
শাখার শিখরে
নৃত্যরতা পাতা, ফুল; ঊর্ধ্বমুখী তাই।

প্রতিশোধ

সরিৎশেখর মজুমদার

ঝাড়ুদার রূপলালকে এই প্রথম এতোখানি রাগতে দেখলো সকলে। একেবারে অবাক কাণ্ড অমন যে দুঁদে সতরোশো টাকার সেক্রেটারী, যার দাপটে গোটা অফিসটা থরহরি কম্প, রূপলাল হাতের ঝাড়ু পটকে তারই মুখের ওপর সাফ জবাব দিলো—

—জরিমানাকা ডর্ হামকো মাত্ দিখ্লাও। হম্ নহি শকেগা।

অর্থাৎ, আমি পারবো না। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। সেক্রেটারী প্রভুরাম আগরওয়াল অবাক হয়ে গেলেন। অশিক্ষিত 'মিনিয়ল', উত্তেজিত হয়েছে। হয়তো আরও অপমান করে বসবে। অফিসের কয়েকজন কর্মচারী এপাশ-ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে শুনছে সব। শুনছে রূপলালের দুঃসাহসিক প্রতিবাদ। এক্ষেত্রে মান বাঁচিয়ে সরে যাওয়াই শ্রেয়। যেন শুনতেই পাননি, কিংবা ক্ষমাই করলেন রূপলালকে,—এমন নির্লিপ্তভাবে বাগানের একটা টুকটুকে গোলাপ পট্ করে ছিঁড়ে বাট্‌ন্‌হোলে লাগাতে লাগাতে এগিয়ে গেলেন লিফ্‌টের দিকে।

খট্ করে সেলাম ঠুকলো লিফ্‌টম্যান রহমান। লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হলো, ঝপাং। চক্ষের পলকে সাহেবকে নিয়ে ওপরে উঠে গেল যন্ত্র।

—সেলাম হুজুর!

—গুড্ মর্ণিং স্যার!

—দণ্ডবত!

চারপাশে প্রভুর উদ্দেশ্যে নুয়ে পড়ছে মাথা। ঝুঁকে পড়ছে কোমর পর্যন্ত দেহ। প্রত্যভিবাদনের বালাই নেই। জাত-অফিসারের কাজ হলো শুধু হন্‌হন্ করে এগিয়ে যাওয়া। সেলাম করতে যারা জন্মেছে, তারা করুক।

—সরকার!

নিজের ঘরের দিকে যাবার পথে পাইপ-কামড়ানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা সম্বোধন শুধু।

সেইটেই যথেষ্ট। 'ইয়েস স্যার' বলে হুড়বড় করে চেয়ার ছেড়ে সাহেবের ঘরের দিকে ছুটলেন বড়বাবু শ্রীশক্তিপদ সরকার।

সাহেব খদ্দরের গান্ধীটুপিটা খুলে ভাঁজ-বাঁচানো সন্তর্পণে হুকে টাঙালেন। তারপর কোট খুলতে খুলতে বললেন,—রূপলালের ফাইল!

—অল্‌রাইট স্যার!

অবাক বড়বাবু। কি হলো হঠাৎ?

অফিসে ঢুকেই রূপলালের ফাইল? কই, দত্তবাবু কই? আচ্ছা মুস্কিল। এখনও এসে পৌঁছোননি? বড়বাবুর সিনিয়র এ্যাসিস্‌ট্যান্ট হারাধন দত্ত। তাঁরই জিম্মায় ষ্টাফের ফাইল-গুলো থাকে। থেকে থেকে আজই তিনি লেট্। আশ্চর্য ব্যাপার! বলে বলে পারা যায়না এঁদের। আরে বাবা, এটা অফিস, শ্বশুরবাড়ী নয়।

বড়বাবু অস্থির হয়ে উঠলেন।

এমনসময় ছাতা বগলে ঢুকলেন দত্তবাবু।

—দশটা বারো! ঘড়ির দিকে চেয়ে সময়টা বলে দিলেন বড়বাবু। মানে, বুঝিয়ে দিলেন দত্তবাবুকে—আপনি আজ বারো মিনিট লেট্।

দশটা পনরো পর্যন্ত হাজ্‌রি-খাতা বড়বাবুর টেবিলে থাকে। মিনিটের কাঁটা পনরোয় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে খাতা চলে যায় সেক্রেটারীর ঘরে। দত্তবাবু আগেই এসেছিলেন। কিন্তু নিচে কি একটা ব্যাপার ঘটেছে দেখে আটকে পড়েছিলেন। ডেস্‌প্যাচ সেক্‌সনের বাবুরা আর পিওনরা রূপলালকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। রীতিমত উত্তেজিত পরিস্থিতি। থর্‌থর্ করে কাঁপছে লোলচর্ম রূপলাল।

—নিন্, তাড়াতাড়ি রূপলালের ফাইলটা বার করে দিন।

—রূপলালের ফাইল?

—হ্যাঁ, বড়সাহেব চাইছেন।

সব্বনাশ! এরই মধ্যে এদ্দুর গড়িয়েছে ব্যাপারটা?

—ওর ফাইল কেন চাইছেন জানেন নাকি স্যার?

—তা কি করে জানবো। চাইলেন, বার করে দিন, ব্যাস্।

—দিচ্ছি। নিচে কি সব গণ্ডগোল হয়েছে শুনছিলাম স্যার। বড়সাহেবের সঙ্গে রূপলালের একচোট্...

কথা শেষ হলোনা। একেবারে চোখ কপালে তুলে বড়বাবু বললেন, সে কি?

হ্যাঁ, সার। প্রায় হাতাহাতি। বলে, দত্তবাবু ফাইল বার করে দিলেন। বড়বাবু সেটা সাহেবের টেবিলে দিয়ে সোজা নেমে এলেন ডেস্‌প্যাচ্ সেক্‌সনে।

—কি হয়েছে? সব ভিড় করে কেন?

বড়বাবুকে দেখে সরে গেল সবাই। রইলো শুধু রূপলাল ও হেড ডেস্‌প্যাচার। রূপলাল তখনও উত্তেজিত। রাগে কাঁপছে।

—হাম্ আওর কাম্ নেহি করেগা বড়াবাবু। হাম্‌কো ডিস্‌মিস্ কর্ দিজিয়ে।

রূপলাল বলতে চায়, আমায় রেহাই দিন। রিটায়ার করিয়ে দিন।

—কি হয়েছে কি?

হেড্ ডেস্‌প্যাচার বিশু বাগ্‌চী এবার কথা কইলেন।

—সাহেব কম্পাউণ্ডে ঢুকেই এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ রূপলালকে ধম্‌কাতে লাগলেন। তুমি কিস্‌সু করোনা, ফাঁকিবাজ কোথাকার! চারিদিক নোংরা করে রাখো। তোমায় জরিমানা করবো। এই কথা শুনেই হঠাৎ যেন রূপলালের কি হলো স্যার। রক্ত চড়ে গেল মাথায়। হাতের ঝাড়ুটা মাটিতে আছড়ে সাহেবের মুখের উপর বলে দিলো—আমি পারবো না।

সর্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর কথা! ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো বড়বাবুর হাত-পা। কি দুঃসাহস! যুগটা কি হলো! নিশ্চয় পিছন থেকে ওকে উস্‌কোচ্ছে কেউ। ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন করেছে নাকি এরা?

—তোমার কি মাথা খারাপ হলো, রূপলাল?

রূপলাল অবাক। এরা সবাই দেখছি একজাতের লোক। বুড়োর দুঃখকষ্ট বোঝে না। গত দুটো বছর সে বারবার বলে আসছে ঃ—এতো কাজ একটা জোয়ান ঝড়ুদারও পারবে না। একটা উপায় করুন। সে-কথা কানে নেবে না এরা। উল্টে ওর ওপরই চাপ? মাথা খারাপ?

দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর হলো এই অফিসে কাজ করছে রূপলাল। পনরো বছরের একটি

উত্তরকিশোর সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়েছিল চুয়াল্লিশ বছর আগে। একটা হলঘর, একটা ল্যাভাটরী আর সামনে-পিছনে খোলা জমি; এইটুকু ঝাড় দেওয়া, মোছা, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখা ছিল তার কাজ। পনরোটাকা মাইনে। প্রচুর—প্রচুর ছিল ঐ পনরোটা মুদ্রা তার পক্ষে। সেদিনের সেই অফিস বেড়ে ফেঁপে কি বিরাট হয়ে গেল। ছিল একটা কেরানিবাবু, সে, একটা পিওন, একটা টাইপ মেশিন; আর আজ? একতলার মেইন বিল্‌ডিং দোতলা হলো। তাতেও কুলোলোনা। আবার একটা নতুন বিলডিং হলো তিনতলা, পুরোনোর গা-লাগা। মাইনে যতো না বাড়লো, তার পাঁচগুণ বেশী কাজ চেপে গেল কুঁজো দেহটার ওপর। একটার জায়গায় পঁয়ষট্টিটা বাবু। পাঁচটা ল্যাভাটরী। এতো খরচ হয় অথচ আর একটা ঝাড়ুদার হয় না? উল্টে সমালোচনা? ফাঁকিবাজ দুর্নাম? এতোগুলো লোকের পায়ের ধুলো আর কুচোনো কাগজ জড় করে করে কুব্জ ক্লান্ত হয়ে গেল বেচারা। এর ওপর জরিমানার জুজু?—মাথা খারাপ ক্যা বোলতা আপ্‌ বড়াবাবু? তোত্‌লার মত কথাগুলো বললো রূপলাল। নেহাৎ সমীহ করে তাই এটুকু বলেই থেমে গেল সে।

—জানো, সাহেব এসেই তোমার ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছে?

—হুঁ! ফাইল! উধার ভগবান ভি সব্‌ লিখ্‌তা হ্যায় ফাইলমে, হাঁ. . . .

একেবারে 'ফুঃ' করে উড়িয়ে দিতে চাইলো রূপলাল বিষয়টার গুরুত্ব। উপরে ভগবান আছেন, ফাইল নিয়ে কি করবে?

বড়বাবু আর কথা বললেন না। সকলকে ভিড় করতে মানা করে ফিরে গেলেন ওপরে।

দুই

একদিন গেল, দুদিন গেল। এমনি করে সাতদিন।

সারা অফিস যেন দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে—কি হয়, কি হয়!

কিন্তু, কই! রূপলালের ফাইলটা খোলাও হয়নি, তেমনি পড়ে আছে টেবিলে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আবার ডান থেকে বাঁয়ে। বড়বাবু আড়চোখে লক্ষ্য করছেন শুধু।

ওদিকে রূপলাল অনড়। রিজাইন সে করবেই। কোত্থেকে একটা চিঠি টাইপ করিয়ে এনেছে। পুরোনো সহকর্মীরা রাশ টেনে আছে। পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরী অগ্নি দাসের। তেত্রিশ, শীতলপ্রসাদের। অগ্নি রীতিমত ধম্‌কাচ্ছে রূপলালকে, আর শীতল ভালো কথায় বোঝাচ্ছে।—ভেবে দ্যাখ। ছেলেটা বড় হয়েছে। রাগারাগি না করে ছেলেকে তোর জায়গায় বসিয়ে তবে রিটায়ার কর্‌।

ঠিক কথা, সৎ পরামর্শ। কিন্তু রূপলাল বলে, ইজ্জতের দিকটা? এদ্দিন যে চাকরী করলে তার একটা ইজ্জৎ নেই?

—ধুত্তোর ইজ্জৎ! বলে, অগ্নি দাস কেড়ে নেয় টাইপ করা চিঠি। রেজিগ্‌নেশন পত্র দেওয়া আর হয় না। সিদ্ধান্ত অনড় থাকে অবশ্য।

—সরকার!

বিশ দিন পর অকস্মাৎ বড়বাবুকে ডেকে সেক্রেটারী নিতান্ত লঘুভাবে বললেন—রূপলালের চাকুরীর ফুল পার্টিকুলার্স আজই ছকে দাও। কবে জয়েন করেছিলো, কতদিন

ছুটি নিয়েছে, মাইনে, সব কিছু।

ছ্যাঁৎ করে উঠলো শক্তিপদ সরকারের বুক। এইবার তাহলে হাত পড়লো রূপলালের ঘাড়ে। কি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেওয়ার ধরণ। বিশ দিনেও রাগ পড়েনি? কেমন লঘু তরলসুরে অর্ডার দেওয়া! যেন কিছুই হয়নি।

হারাধন দত্ত কেশ্‌টা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন। রুলটানা কাগজে ঘর কেটে কেটে তৈরী করতে লাগলেন চার্ট। অফিসময় সুরু হলো মৃদুগুঞ্জন। গেল এবার রূপলাল। ডাইরেক্‌টার্সদের আগামী মিটিং-এ জবাই। নির্ঘাৎ।

সত্যি সত্যি রূপলালের বিষয়টা ডাইরেক্‌টারদের মিটিং-এর আলোচ্য বিষয় হয়ে দেখা দিল। কুড়ি দিন পর মিটিং। খবরটা শোনামাত্র হাতের ঝাড়ু ফেলে দিয়ে রূপলাল গ্যাঁট মেরে, বসলো। বললে—কাম্ নেহি করেগা! এর 'বদ্‌লা' নোবো আমি।

—এটা কি ভালো হচ্ছে, রূপলাল? বোঝবার চেষ্টা করলেন বড়বাবু।—গ্র্যাচুয়িটি পেতে কষ্ট হবে যে!

—ছক্ কেটে দিয়েছেন ত সব পেশ করে সাহেবের কাছে। দেখুন না, চুয়াল্লিশ বছরের চাকরীতে কতো মেডিক্যাল লীভ হয়। বেমারির সার্টিক্‌ফিকিট্ এনে দেবো আমি! নির্ভয় উত্তর রূপলালের।

পরদিনই এনে দিলো রূপলাল একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট। একেবারে পাকা-পোক্ত কাজ। কাজ সে করবে না, যতক্ষণ না সুবিচার হচ্ছে। শপথ তার, সে প্রতিশোধ নেবে।

ডিরেক্‌টারদের আগামী মিটিংটার গুরুত্ব অনেক। সারা অফিস হাঁ করে অপেক্ষা করছে ঐদিনটার। রূপলালের কেশ্‌টাও আলোচনা হবে। ভদ্রলোকের কন্‌ট্রাকট পাঁচ বছরের। পূর্ণ হতে চলেছে সেটা। উনি দরখাস্ত করেছেন মেয়াদবৃদ্ধির। কে জানে কি হয়! অফিসের সবাই ত বাঁচে লোকটা গেলে। অতিষ্ট হয়ে গেছে ওর অত্যাচারে।

এদিকে কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে রূপলাল কেমন যেন হয়ে গেল। একদিন, দুদিন, তিনদিন— কিন্তু ছ্যাঁকড়া গাড়ীর ঘোড়ার কি বসে থাকা সাজে?— দশদিনের মাথায় একেবারে বিছানা নিলো রূপলাল। ডাক্তারের সার্টিফিকেটের সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্বেই বোধহয়, মিটিং-এর সাতদিন আগে বুড়ো রূপলালকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হলো। অসুখ, ইউরেমিয়া।

যথাসময়ে মিটিং বসলো ডিরেক্‌টারদের। আশ্চর্য্য সহানুভূতির সঙ্গে ওঁরা বিবেচনা করলেন রূপলালের কেশ্। সেক্রেটারীকে এই নিয়ে যে কোনঠাসা করতেও কসুর করেননি তাঁরা, এ-খবর অফিসে ছড়িয়ে দিলো অগ্নি। নিরক্ষর হলে কি হবে, আশ্চর্য ক্ষুরধার বুদ্ধি অগ্নির। ইংরাজীতে যা আলোচনা হয়েছিল সব এসে বলে দিলো অফিসের সকলকে। আনন্দে লাফিয়ে সব এসে বলে দিলো অফিসের সকলকে। আনন্দে লাফিয়ে উঠলো সবাই। বললে,—একটা উড়ো চিঠিতেই কিস্তি মাৎ। ভগবান আছেন। মুখের মত জবাব হয়েছে। রূপলালের চাকরী ত থাকলোই, আর একজন সহকারীও পেলো সে। শুধু তাই নয়, ঐ সহকারী পদের জন্য রূপলালের আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে তার কথা যেন সর্বাগ্রে বিচার করা হয়, স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছেন ডিরেক্‌টার্স। আর, সেক্রেটারীর আবেদন মঞ্জুর করতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। প্রভুরামের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে অবশ্য থোক্ বিশহাজার টাকা বখ্‌শিস দিয়েছেন। যাকে

বলে, 'এক্স-গ্র্যামিয়া পেমেন্ট'!

তবু, আগরওয়াল একেবারে নিভে গেলেন! ছোট ছেলেটা বিলেতে রয়েছে। কোর্শ শেষ হতে আর মাত্র এক বছর। এইজন্যই দরকার ছিলো এই মেয়াদবৃদ্ধির। প্রভিডেন্ট ফন্ড বাবদ বার হাজার, বখ্‌শিস বিশ হাজার—দুটো মিলিয়ে বত্রিশ হাজার পাচ্ছেন প্রভুরাম। তবু—আর এক বছরের চাকরী হলে ভালো হত। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়েছে রূপলালের কথা। সে যেন সর্বক্ষণ ওঁর দিকে চেয়ে ফিকফিক করে হাসছে। একটা মেথরের যে-ভাবে জয় জয়কার হয়ে গেল তারপর এ-অফিসে চাকরী না করাই ভালো। রাগে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে তাঁর।

আফিসে আসতে পা সরছিলো না। কম্পাউন্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো প্রভুরামের, বুড়ো রূপলাল সেদিনের ঘটনার প্রতিশোধ নেবে বলে এবার যেন তার হাতের ঝাড়ুটা আরও জোরে মাটিতে আছড়ে খিলখিল করে হাসছে। প্রভুরামের পদক্ষেপেও আর সেই ধরাকে-সরা-জ্ঞান নেই। পা টিপে টিপে ঢুকলেন যেন অফিসে।

—সরকার!

শক্তিপদ সরকারও চম্‌কে উঠলেন এই সম্বোধনে।

গত পাঁচ বছরে একদিনের জন্যও এমন নির্জীব ডাক শোনেননি

ব্যাপার কি? হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন সাহেবের ঘরে।

—সরকার! আমি আর মাত্র পনরো দিন অফিসে আসবো। তারপর, লীভ প্রিপেয়ারেটারী টু রিটায়রমেন্ট।

—হোয়াট্ স্যার? শক্তিপদ সরকার যেন একটা সতরোতলার আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীকে ভূমিকম্পে ধ্বসে ধ্বসে যেতে দেখলেন চোখের সামনে।

—আপনি গেলে কি হবে স্যার এই অফিসের? দাসত্বের সেই আদিম ও অভ্যস্ত চাটুকারিতা শক্তিপদ সরকারের কথায়। প্রভুরাম আজ অন্য লোক; কথাগুলো মোটেই ভালো লাগলো না তাঁর।

—নেহাৎ জরুরী ব্যাপার না থাকলে তোমরা আমাকে আর ডিসটার্ব কোরো না। রাঘবন্ সাহেবের সাহায্য নিও।

—অল্‌রইট স্যার। বলে, বেরিয়ে এলেন শক্তিপদ।

পাঁচবছরের একছত্র দাপট কলমের এক খোঁচায় শেষ। অকারণ নিজের ঘরে পায়চারি করেন প্রভুরাম আগরওয়াল আর ভাবেন ঃ এই টেবিল-চেয়ার-টেলিফোন, দোয়াত-কলম, এতগুলো কর্মচারী, এদের আমি কেউ নই! এরা সবাই বোধহয় আজ মহাখুসী, আমি চললাম!

—স্যার! আপনাকে একটা ফেয়ারওয়েল দোবো ঠিক করেছি আমরা। বিকেলের দিকে মুখ কাচুমুচু করে নিবেদন করলেন বড়বাবু।

ফেয়ারওয়েল? শব্দটা হাতুড়ির মত বুকে গিয়ে আঘাতে করলো প্রভুরামের। পাঁজরার নিচের কি একটা জিনিষ যেন থেতলে রক্তাক্ত হয়ে গেল সেই ঘা খেয়ে।

—নো, নো সরকার। লেট্ মি কুইট্ কোয়াএট্‌লি!

—তা কেমন করে হয় স্যার! সবিনয়ে প্রতিবাদ করেলেন বড়বাবু।—ষ্টাফ্ চাইছে, আপনি অমত করবেন না স্যার!

প্রভুরাম আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে। ষ্টাফ্ চাইছে। আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। কেমন এক আচ্ছন্ন মৌনসম্মতি প্রকাশ পেলো তাঁর চোখেমুখে।

তিন

রূপলালের অবস্থা খুব খারাপ। ছলছল চোখে ছেলেটা এসে খবর দিয়ে গেল অফিসে। কাল থেকে জ্ঞান নেই। ডাক্তার বলছে ঃ আর কয়েক ঘন্টা!

এদিকে ফেয়ারওয়েল আজকে। বেলা তিনটেয়। অফিসের সকলে চাঁদা দিয়েছে। মালার অর্ডার নিউ মার্কেটে, নামকরা দোকানে সন্দেশ। এছাড়া আরও পাঁচরকমের মিষ্টি এখানে-ওখানে। বড়বাবু আর হারাধন দত্ত বিশেষ ব্যস্ত। সব জিনিষ সময়ে আনিয়ে রাখতে হবে। সকলের বসবার মতো হলঘরে চেয়ার সাজানো একটা বড় কাজ। প্রেস থেকে যে 'অভিনন্দন' ছাপা ও বাঁধাই হয়ে আসার কথা সেটা এখনও আসেনি। ফটোগ্রাফারকে আবার ফোন করতে হবে। নানাঝঞ্ঝাট।

রূপলালের ছেলে সন্তলাল তখনও ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে। বড় সাহেব কি একটা কাজে এদিকে এসে থামলেন।

—রূপলাল ক্যায়সা হ্যায়?

ছেলেটা কেঁদে ফেললো। অগ্নি দাস জবাব দিল—আচ্ছা নেই হুজুর। ও আর নহি বাঁচেগা।

প্রভুরাম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। সেকি? বাঁচবে না? বাঁচবে না রূপলাল?

—সন্তলাল কিছু টাকা আগাম চাইছে হুজুর।

হাসপাতালে বাকি আছে ওষুধের দরুণ। নিবেদন করলো অগ্নি।

—এ্যাকাউন্টেন্ট!

সেক্রেটারীর ডাকে ছুটে এলেন এ্যাকাউন্টেন্টবাবু।

—ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে দাও। এখুনি।

অর্ডার দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন প্রভুরাম। রূপলাল বাঁচবে না! ওকি তবে আমারই ফেয়ারওয়েলের দিনে চিরকালের ফেয়ারওয়েল নিয়ে চলে যাবে? আশ্চর্য শত্রুতা রূপলালের। এমনভাবে আমাকে বারবার আক্রমণ করছে কেন ও? মনে মনে 'শত্রুতা' শব্দটাই উচ্চারণ করলেন প্রভুরাম। তবু শত্রুভাব জাগলোনা। এক বিচিত্র বৈরাগ্যে চোখের পাতা ভিজে গেল। ফেয়ারওয়েল!

প্রভুরামের ইচ্ছে করছে, ফেয়ারওয়েল পার্টি বন্ধ করে দেন। বড় লজ্জা করছে তাঁর। কিন্তু তা সম্ভব নয়, টিক্‌টিক্‌, টিক্‌টিক্‌—মাথার ওপর ঘড়িটা বলছে, আর সম্ভব নয়। এখন বেলা সওয়া একটা। মালা, মিষ্টি সব এসে গেছে।

পঁচিশ টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিলো সন্তলাল। কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। দর দর করে চোখের জল গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে।

—পিতাজী মর্ গিয়া!

চেয়ার-টেবিল সাজানো হচ্ছিল ফেয়ারওয়েলের জন্য। বড়বাবুকে ডেকে খবরটা দিলো অগ্নি দাস।

—ইস্! শেষ পর্যন্ত মরেই গেল? জিদ বজায় রাখলে বটে, আর ঝাড়ুতে হাত দিল না।

—বড় সাহেবকে খবরটা দেবো?

—না, না, অগ্নি। এখন থাক্। পরে জানতেই পারবে। বাধা দিয়ে উঠলেন বড়বাবু।

—কিন্তু না জানিয়ে ত উপায়ও নেই, বড়বাবু! সন্তলাল জিগ্যেস করছে, রূপলালের লাস

হাসপাতাল থেকে এখানে আনতে পারে কিনা। পুজোপাঠ ও আর সব 'ক্রিয়াকরম' এইখানে সেরে তারপর ওরা মড়া নিয়ে যাবে।

অফিস-সংলগ্ন ষ্টাফ-কোয়ার্টারে রূপলাল দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর বাস করেছে। জীবনে যেমন, মরণেও তেমনি সমান অধিকার আছে তার। নিশ্চয় আসবে সে এখানে। কিন্তু, বড়সাহেবের ফেয়ারওয়েলের সময় রূপলালের মৃতদেহ এনে ফেলা অশুভ মনে হবে না ত? সমস্যায় পড়লেন বড়বাবু।। কি করা যায়? এটা কি ঠিক হবে? শেষ পর্যন্ত সহকারী সেক্রেটারী মিঃ রাঘবনের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করে অনুমতি দিলেন। সন্তলাল চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

টিক্‌টিক্‌....টিক্‌টিক্‌....।

ঘড়ির কাঁটা আড়াইটে পেরিয়ে গেল। টক্‌টকে বড় গোলাপের আর লালপদ্মের মালা এসে গেছে। পিওনরা প্লেট সাজাচ্ছে। ফুটন্ত জলে লপ্‌চু চায়ের পাতা ভিজছে। গন্ধ ছড়িয়েছে তার। চেয়ার টেবিল সাজানো। নিজের ঘরে ক্রমাগত পায়চারি করছেন প্রভুরাম। অফিসে আজ তাঁর শেষ দিন। এই চেয়ার-টেবিল, অর্থ-প্রভুত্ব, সব ফেলে চলে যেতে হবে! শুধু এই অফিস কেন? রূপলাল যেন আরও কিছু বলতে চাইছে। আরও বড় একটা ফেয়ারওয়েলের কথা!

—স্যার! উই আর রেডি। ছোটসাহেবকে খবরটা দেওয়া হলো। ছোটসাহেব আবার সেই খবর বড়কে দিয়ে তাঁকে আহ্বান জানালেন অনুষ্ঠানে।

—রেডি? সর্বাঙ্গে আশ্চর্য তৎপরতা ফুটিয়ে প্রভুরাম আগরওয়াল উঠে পড়লেন। হুক থেকে খদ্দরের টুপিটা নামিয়ে মাথায় পরলেন। তারপর পা বাড়ালেন হলঘরের দিকে। বুকের ভেতরটা বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে। ঘরের মেঝে, কাঠের পার্টিশান, চারদেওয়ালের ছবি, সকলে যেন প্রভুরামের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছে। হাসছে রূপলালের চুয়াল্লিশ বছরের সম্পর্কটাও।

কর্তারা এসে পৌঁছতেই সমবেত কর্মচারীরা উঠে দাঁড়ালেন একবার।

ফুল-কাটা টেবিল-ক্লথ আর ফুলদানি-দিয়ে সাজানো ছোট টেবিলের কাছে বসলেন সেক্রেটারী প্রভুরাম ও তাঁর সহকারী রাঘবন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন রাঘবন্‌। অফিসের সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী দুলাল ব্রহ্ম মাল্যভূষিত করলেন প্রভুরামকে। ছাপানো অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করতে লাগলেন বড়বাবু। ইতিমধ্যে পিওনেরা হাতে-হাতে এগিয়ে দিতে লাগলো মিষ্টান্নের প্লেট। বড়বাবু পাঠ-শেষে বাঁধানো অভিনন্দন-পত্রটি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন সেক্রেটারীর হাতে, এমন সময় ঝম্‌ঝম শব্দে বাজনা বেজে উঠলো। ব্যাগপাইপ, ঝালা, সানাই ও আরও কি সব বাদ্যযন্ত্রের সুসংবদ্ধ তাল। বাদ্যের ঝঙ্কার ছেয়ে ফেললো চারিদিক।

—তোমরা কি বাজনারও বন্দোবস্ত করেছো? জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রভুরাম।

—না ত স্যার।

—তাহলে কিসের বাজনা কম্পাউন্ডে?

তাইতো? কিসের বাজনা? বড়বাবু আর রাঘবন তাকালেন অগ্নি দাসের দিকে।।

অগ্নি ছুটে গিয়ে দেখে এলো।

রূপলালের লাস আনছে হুজুর! খবর দিল অগ্নি।

ওরা বাজনা বাজিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যায় সৎকারের জন্য।

—হোয়াট্? রূপলাল ইজ্ ডেড্?

প্রভুরাম সংবাদটা শোনামাত্র তড়িতাহতের মত কাঠ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। রূপলাল! মরে গেল রূপলাল! ড্যাংড্যাং করে বাজনা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে রূপলাল? কেন আসছে? যাবার আগে তার শেষ বিদ্রূপ করে যাচ্ছে নাকি? না, এই তার প্রতিশোধ? তা হোক্. . . .

সদ্য-উপহার-পাওয়া মালাটার দিকে একবার তাকালেন প্রভুরাম। ভাবলেন, এদের হয়ে আমি আবার দেবো নাকি এই মালা রূপলালের গলায় পরিয়ে? কাঁপতে কাঁপতে হাতটা থেমে গেল মালার কাছাকাছি এসে। না, না— এ-মালা নয়, বাধা দিল প্রভুরামের বিবেক। অনেক কুন্ঠা জড়ানো আছে এ-মালায়। প্রভুরাম যে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেননি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের এই দান! ভেবেছেন, এরা রূপলালের প্রতিনিধি হয়ে প্রতিশোধের মাল্য গেঁথে পরিয়ে দিয়েছে ওঁকে।

—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড্স্!

হঠাৎ অশ্রুসজলনেত্রে ভাবাচ্ছন্ন প্রভুরাম উঠে দাঁড়ালেন, টেবিলের উপর দুহাত রেখে। বাইরে তখনও বাজনা বাজছে গম্‌গম্ করে। ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ সানাই আর করোনেটের সঙ্গে তালে-তালে ঝঙকার তুলছে ঝালা। চুয়াল্লিশ বছরের জড়-করা ধুলো আর জঞ্জাল পৃথিবীর ডাস্টবিনে জমা দিয়ে মৃত্যুর পথ ধরে তালে তালে মার্চ করে চলে যাচ্ছে রূপলাল আর এক প্রভুরামের দপ্তরে।

—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস্!

গলা খাঁকারি দিয়ে আর একবার চেষ্টা করলেন তাঁর ভাষণ সুরু করার। চাপা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। প্রভুরাম বলতে চাইছিলেন, রূপলাল আমায় একটা লেশন্ দিয়ে গেলো। সে ভাববার সুযোগ দিয়ে গেল, কোন্ ফেয়ারওয়েলটা কাম্য। আমি হেরে গেলাম! ইয়েট্ আই এম্ হ্যাপি। তোমরাও হেরে গেলে, বন্ধুগণ! তোমরা যা পারোনি, রূপলাল তা পেরেছে। দেখো দেখি, কেমন গম্‌গমে বাজনার আয়োজন করেছে সে আমার ফেরারওয়েলের জন্য!

ফ্রেন্ড্স্!

থেমে থেমে কান্না চেপে বললেন প্রভুরাম—রূপলালের শ্রাদ্ধকৃত্যের জন্য আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে যাবো তোমাদের হাতে। তোমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে দেখো যেন সব কাজ সুসম্পন্ন হয়. . . .!

বাইরের বাজনাকে ছাপিয়ে এবার হলঘর মুখর হয়ে উঠলো মুগ্ধ বিস্মিত কর্মচারীদের স্বতোৎসারিত করতালিতে। সত্যি অবাক হয়ে গেছে তারা প্রভুরামের পরিবর্তন দেখে।

—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড্স্!

বিচিত্র কান্নামাখা হাসিমুখে যেন আরও কিছু বলবেন বলে আবার উঠে দাঁড়ালেন প্রভুরাম।

সহৃদয় হৃদয়

সুশীল রায়

স্টুডিয়োর গাড়ি বিদায় করে দিয়ে পার্বতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

পার্বতীর মনের মধ্যে ভীষণ-একটা আলোড়নের সৃষ্টি যে হয়েছে, হেমাঙ্গিনী কয়েক দিন থেকেই তা বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে বলেই হেমাঙ্গিনী পার্বতীকে আর বেশি কথার মধ্যে টানছে না।

হেমাঙ্গিনী উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে—পার্বতী যেন বড় ক্লান্ত, পা যেন তার চলছে না, যেন অনেক কষ্টে সে নিজেকে টেনে তুলছে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

উপরে এসে দাঁড়িয়ে পার্বতী একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আঃ।"

ব্যস্ত হয়ে উঠল হেমাঙ্গিনী, পার্বতীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল? শরীর খারাপ ঠেকছে নাকি, দিদিমণি?"

"না, আরাম।" পার্বতী ক্লান্ত গলায় জবাব দিল, "বড় আরাম পাচ্ছি, হেম। জবাব দিয়ে এলাম। ফিরিয়ে দিলাম গাড়ি। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি—আমি অভিনয় আর করব না।"

"তার মানে?"

"অভিনেত্রী-জীবন আজ থেকে সাঙ্গ হয়ে গেল।"

আঁৎকে উঠার মত করে হেমাঙ্গিনী বলল, "খতম? নিজেকে খতম করে দিলে? এত নাম-ডাক, এত হৈ হৈ, এত জল্পনাকল্পনা তোমাকে নিয়ে। এক ফুঁয়ে একসঙ্গে সব—"

হেমাঙ্গিনীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পার্বতী বলল, "সব ভুয়ো। সব মেকি। ওসব নামডাকের মানে আছে নাকি?"

"কিন্তু টাকা-পয়সা? তার তো দাম আছে?"

"আছে। অনেক জমিয়ে ফেলেছি, হেম, অনেক। একটা জীবন কাটাবার মত জমে গেছে টাকা। একটা মানুষের লাগেই বা কত?"

আজগুবি গল্পের মত মনে হচ্ছে এ-ঘটনা, যেন একটা অলৌকিক কান্ড। দেশের মানুষ যার নাম শুনলে পাগল, যাকে এক মিনিটের জন্যে চাক্ষুষ দেখার জন্যে উন্মাদ, ছবি-মহলে যার জুড়ি খুঁজে পাওয়া দায়, সেই চিত্রনটী চট করে ছায়াছবির পর্দা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে এত সহজে? বিশ্বাস হয় না হেমাঙ্গিনীর।

"আমারই কি বিশ্বাস হয়, হেম? আমিই কি কখনো ভেবেছি যে একদিন আচমকা এই ভাবে আমাকে ছুটি নিয়ে নিতে হবে?"

ঘরে এসে মোড়ায় বসল পার্বতী। কিন্তু বসতে যেন ভালো লাগল না তার। বিছানায় গিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

এতবড় একজন চিত্রনটী, কিন্তু তার জাঁক নেই এতটুকু। হেমাঙ্গিনীর চোখে যেন এ-দৃশ্য আজ নতুন পড়ল। ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল সে। দেয়ালের এক কোণে তার বাবা আর মায়ের ছবি, আর একটা দুটা তার নিজের। আসবাব বলতে ঘরে বিশেষ কিছু নেই। একটা হাল্কা পালঙ্ক, একটা ড্রেসিং টেবিল, আর খান দুয়েক সোফা।

হেমাঙ্গিনী বলল, "একটু খেয়ে নাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর।"

একটু থেমে বলল, "ভাবছিলাম অন্য কথা। তোমাকে-না ওরা বেকায়দায় ফেলে।"

হেমের কথা শুনে পার্বতী উঠে বসল, বলল, "কি?"

"যে ছবিটা আদ্দেকের বেশি উঠে গেছে, সেটা শেষ করার জন্যে চাপ দেবে নিশ্চয়। সহজে কি ছাড়বে ওরা? শর্ত তো একটা আছে?"

"আছে। কিন্তু আমি চুক্তিভঙ্গ করব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা আর ভাঙ্গতে পারব না। অনেক কষ্টে মন মজবুত করেছি। একটু আলগা দিলেই মন কাবু হয়ে যাবে। অভিনয় যে কত বড় নেশা, যারা অভিনয় করে তারাই জানে। এ-নেশা ছাড়া কঠিন। কিন্তু আমি ছেড়েছি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাকিটা শেষ করতে গেলেই আবার ফাঁদে পা দিতে হবে। ওরা যা পারে করুক। আমি যা ঠিক করেছি তা পাকা।"

হেম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এমন ধনুক-ভাঙা পণ করার হেতুই-বা কি? হেরম্বের বাঁদরামো নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ। কিন্তু হেরম্ব একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এ-লাইনে আমি যাদের দেখলাম তারা সকলেই এক-একটা হেরম্ব। ওদের কিছু বলিনে, কিন্তু নিজের উপরেই কেমন ঘৃণা এসে গিয়েছে। অভিনেত্রী জীবন মানে যে এই, তা যদি আগে জানতাম—"

"তবে বুঝি আসতে না?"

"বোধ হয় না। এটাও তো একটা জীবিকা। সব জায়গাতেই পুরুষ থাকবে, মেয়েরা কি তাহলে নিজের জীবিকার জন্যে কোথাও যেতে পারবে না? গেলেই ভৃঙ্গেরা আসবে ভাঁড়ামি করতে?"

হেসে ফেলল হেম, বলল, "তোমার ভাষা শুনেই বুঝতে পারছি তুমি ভীষণ রেগে গেছ।"

পার্বতীর সঙ্গে হেমাঙ্গিনী কথা বলছে, কিন্তু তার মন চিন্তা করছে অন্য কথা। ভাবছে, মেয়েটা বুঝি আত্মহত্যাই করল। আত্মহত্যার শামিলই তো তার এই কাজ। খ্যাতিতে-প্রতিপত্তিতে সে যখন সকলের মাথার উপরে, এমন কি মনক্কার মত চটুল নায়িকার খ্যাতিকে যখন তার খ্যাতি ছাপিয়ে গেছে, সেই সময় সে পর্দার গা থেকে নিজের ছায়া সরিয়ে নিল? হেম মনে-মনে তাই ভাবছে—এ তো মেয়ে মেয়ে নয়!

"ফিরে যাব।"

হেম জিজ্ঞাসা করল, "এবার তবে কী করবে?"

"তার মানে পুনর্মূষিক হবে?"

আপত্তি করে উঠল পার্বতী, বলল, "তা কেন? পুনর্সিংহ হব। সিংহই ছিলাম, মাঝে ছায়াছবিতে ছায়ানটীগিরি করতে এসে মনটা ছোট হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে মুষিক-মুষিক বোধ করেছি; এবার ফিরে যাব. ফিরে গিয়ে আবার সেই সিংহই হব, হেম।"

হেম কান পেতে শুনল সবটা, বলল, "বাবা। তাজ্জব।"

আর কোনো কথা বলল না হেমাঙ্গিনী। ধীরে ধীরে সে চলে গেল তার নিজের এলাকায়—রান্নামহলে।

এ ঘরে একা পড়ে রইল পার্বতী। সবই কেমন বিচিত্র মনে হতে লাগল তার। যেন, নদীর এক পার ভেঙে আর এক পার গড়া হচ্ছে। কোন এক অখ্যাত পল্লীর ঘৃণ্য জীবনের এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা মনক্কা মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে বিয়ে করে সমাজের ধাপে উঠে গেল, হয়তো ক্রমে সে আরো উঠবে; আর, সমাজের শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে তাকে ডেকে নিয়ে এল হরলাল

জোয়ারদার, নিরীহ বিশ্বাসে সে সাড়া দিল সেই ডাকে, আজ হেরম্ব পুরকায়স্থর দল তাকে টেনে নীচে নামিয়ে মনক্কার মত করে তোলার জন্যে দল বেধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করছে। তাদের চক্রান্তের মধ্যে নেই পার্বতী। সরে পড়াই মঙ্গল। মন যদি একদিন হঠাৎ লোভী হয়ে ওঠে তাহলে মনকে আর বাগ মানানো যাবে না।

অতএব, আর কি! এখন আর সে পার্বতী নয়। এখন সে মেদিনীপুর জেলার মল্লিকপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির সেই মেয়ে ত্রিনয়নী। সে এখন আবার তার পুরাতন নিজস্ব নামে পরিচিত হতে চায়। পর্দার নাম পরিহার করতে চায় সে। স্বনামধন্য হতে চেয়েছিল—হয়েছে। কিন্তু, পার্বতী একটু চিন্তিত আর বিচলিত হয়েই যেন উঠল। মনে পড়ল তার নয়নতারার কথা। ও আবার একটু লোভী ধরনের একটু লঘু টাইপের। নিজেকে ও সামলাতে পারলে হয়। না-ই যদি পারে, সে দায় ওর। সে দায় তার স্বামীর। তাকে সে এ-লাইনে আসতে উৎসাহ দিয়েছে বলেই সব দায়িত্ব তার নয়।

হেমাঙ্গিনীর আশঙ্কা, এবং সম্ভবত পার্বতীরও আশঙ্কা, প্রায় মিথ্যে হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল, হেরম্বরা হয়তো ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে পড়বে। হয়তো পিড়াপিড়ি করবে। হয়তো চুক্তিভঙ্গের জন্যে নানা ভাবে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে।। কিন্তু দুই দিন কেটে গেল, কেউ আর এল না। তারা কেউ এল না দেখে পার্বতী যে খুব খুশি হল, এমন কথা বলা যায় না। পিড়াপিড়ি করলেই যে সে তাদের অনুরোধ রক্ষা করত, এমন নয়। তবুও ওদের তরফের উদাসীনতায় পার্বতী একটু ক্ষুণ্ণই হল হয়তো। অলকাপুরী স্টুডিয়োর কর্তাব্যক্তিরা কেউ এল না বটে, কিন্তু এল তাদের চর। এল নয়নতারা, এবং—সঙ্গে এ কে?—

নয়নতারা বলল, "একে চিনলে দিদি?"

নয়নতারার প্রশ্নের ঢং দেখে, এবং সঙ্গের লোকটার চেহারা দেখেই সে বুঝল কে এ। বলল, "চিনেছি।"

স্টুডিয়োর দেখাকে দেখা বলা যায় না। সেখানে দেখার মধ্যে যেন আন্তরিকতার আঁচ নেই, যেন অভিনয়েরই একটা উত্তাপ আছে। নয়নতারা বলল, "ওরা সব মর্মাহত। তুমি ওদের দারুণ ঘা দিয়েছ দিদি।"

"তাই নাকি? কী বলে ওরা?"

ওরা কি বলে, সব কথা গুছিয়ে বলার সাধ্য নেই নয়নতারার। পালঙ্কের উপর দিদির পাশে বসে সে কথা বলতে লাগল। একটু দূরে মোড়ার মধ্যে বসে রইল তার স্বামী। মোড়ায় বসে বসে সে ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে চোখ বুলাতে লাগল। তার যেন কোনো কথাও নেই, কোনো কাজও নেই। পর্দার আড়াল থেকে হেমাঙ্গিনী একবার দেখে গেল এদের। কিন্তু এরা কারা সে চিনল না।

স্টুডিয়োর লোকরা প্রথমে নাকি ঠিক করেছিল, তারা তাদের নায়িকা পার্বতীকে এসে একটু চাপ দেবে। অন্তত ভোরের তারা ছবিটা শেষ করে দিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাবে। তাদের ধারণা হয়েছে, পার্বতীর অহংকার বেড়েছে; তাই পরে ঠিক করে, অনুরোধ করলে পার্বতীর পায়া আরো ভারি হয়ে উঠবে। তাই, চুপ করে থেকে কিছুদিন অপেক্ষা করবে। তবুও যদি পার্বতীর দিক থেকে কোনো গরজ না দেখে তাহলে অন্য ব্যবস্থার বিষয় তারা চিন্তা করবে।

আর, তাতে পার্বতীর অভিনেত্রী-জীবনেরই নাকি ক্ষতি—লোকে ধরে নেবে তাদের আশঙ্কাটা সত্যি।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করল, "কি সেই আশঙ্কা?" নয়নতারা একটু থেমে বলল, "নীরব বীণা! সে ছবিতে তোমার অভিনয় হয়েছে তো অপূর্ব। বোবা মেয়ের ভূমিকা এমন অদ্ভুত অভিনয় করেছ যে, সকলের ধারণা হয়েছে তুমি বুঝি সত্যিই বোবা হয়ে গেছ। এসব জান নিশ্চয়?"

"মানি। সত্যিই মানুষ কত বেকুব হতে পারে।"

নয়নতারা বলল, "মাইরি। যা বলেছ।" নয়নতারার কথা শুনে চমকে উঠল পার্বতী, বলল, "এসব ভাষা কোথায় শিখলি, নয়ন?" হেসে উঠল নয়নতারা, বলল, "জান না নিয়ম, যখন রোমে থাকবে তখন রোমানরা যা করে তাই করবে। এখন আমি স্টুডিয়োর জীব, স্টুডিয়োর ভাষা রপ্ত করতেই হবে।" নিঃশ্বাস ফেলল পার্বতী। বলল, "বেশ। কিন্তু ও-ভাষা তো মনক্কাদের, ওসব কি তোমার-আমার বলা সাজে?" এবার চমকে উঠল নয়নতারা, বলল, "বল কি। মনক্কা এখন সে-মনক্কা নেই। সে এখন কুলবধূ। তার চলা-বলা হাসা ভাষা সব এখন অন্যরকম। সে এখন আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে উঠে এসেছে: শেষে বুঝি আমাদের উপরেও টেক্কা দেবে।"

"ভালোই তো।"

নয়নতারা বলল, "তা হোক। তুমি চল দিদি। ও-সব অভিমান বাদ দাও। আমাকে এ-লাইনে নিয়ে এসে একা ফেলে পালিয়ো না।"

"উঁহু। হয় না। অভিমান নয়। অপমান। আর ভালো লাগছে না। একটা সুযোগও তো জুটে গেছে। একটা বই আধখানা ক'রে হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি দেখে সকলের আশঙ্কাটা সত্যি বলেই প্রমাণ হবে। তারা ভাববে সত্যিই আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। বাঁচা যাবে।"

নয়নতারা বলল, "স্টুডিয়োতেও ঠিক এই কথা হয়েছে। তারা বলছে—এতে উচিত শিক্ষা নাকি পাবে তুমি। তোমাকে অভিনয় আর করতে হবে না। কেউ আর ডাকবে না তোমাকে।"

মনে-মনে হাসল পার্বতী। ডাকবে না! স্টুডিয়োর কর্তাদের আচরণে বোবা সে ব'নে গিয়েছে বটে, কিন্তু বোকা ব'নে যায় নি। আর, সত্যিই যে সে বোবা নয়, তা প্রচার করতে সেও পারে। অলকাপুরী স্টুডিয়োই বাংলাদেশের একমাত্র স্টুডিয়ো নয়। কিন্তু সে-কথা আলাদা। কেউ ডাকলেও সে আর যাবে না, এটা ঠিক। অলকাপুরী-স্টুডিয়োর ব্যবহারে সে ক্ষুণ্ণ; অন্য স্টুডিয়ো যে সেইজন্যে এক-একটা স্বর্গের টুকরো, এমন নয়। সব শৃগালেরই এক রা। পার্বতী বলল, "আমিও তাই চাই। আমাকে আর যেন অভিনয় করতে না হয়। কেউ যেন আমাকে আর না ডাকে।" নয়নতারা বলল, "মনের জোর বটে তোমার দিদি। নামের মোহও কি নেই তোমার?"

"ছিল। কিন্তু আর নেই। এ-লাইনটা একটু অদ্ভুত। যত নাম বাড়ে, সেই অনুপাতে মান কমে।"

কেমন অদ্ভুত যেন লাগল এই কথা। নয়নতারার যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না তার দিদির এই অভিমতটা। সে নতুন এসেছে এ-লাইনে, এখনো অনেক অভিলাষ আছে অনেক উচ্চাশা আছে তার। মানুষের মুখে মুখে ছড়াবে নাম, শহরের ঘরবাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে বিজ্ঞাপিত

হবে চেহারা—এতে সুখ কি কম; এতে যে রোমাঞ্চ তার তুলনা কোথায়? আজ সে ছোট ভূমিকার টুকিটাকি অভিনয় করছে বটে; কিন্তু নাম ক'রে নামভূমিকায় নামতে একদিন সে পারবেই—এতে সন্দেহ কি! একটা কথা এখনো এখানে বলেনি নয়নতারা, সেটা হচ্ছে—ভোরের আলো ছবিটার বাকি অংশ শেষ করার জন্যে স্টুডিয়ো-মহলের গোপন পরিকল্পনা। পার্বতী যদি একান্ত আর নাইই আসে, তাহলে তাদের নতুন তারা নয়নতারাকে দিয়ে সেই অংশটা অভিনয় করিয়ে নেওয়া। মুখের আদল দুজনের প্রায় এক, গল্পের মোড় দরকার মত একটু ঘুরিয়ে নিয়ে অগত্যা বইটা শেষ করে ফেলতে হবে। যে-ছবির, অর্ধেক কেন, তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ তোলা হয়ে গিয়েছে, একজন খামখেয়ালী অভিনেত্রীর একটা দায়িত্ববোধহীন খেয়ালের জন্যে সেই ছবি তো ইনকমপ্লিট রাখা যায় না।

নয়নতারা ভুরুতে অদ্ভুত বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে বলল, "শুনছ?"

স্বামী বেচারা কোনো কাজ না পেয়ে দেয়ালের দিকে চোখ দিয়ে বসে ছিল, এতক্ষণে সে যেন কিছু শুনল, বলল, "আমাকে বলছ?" খিলখিল ক'রে হেসে উঠল নয়নতারা, বলল, "না। তোমাকে না। দেয়ালকে।" মোড়া সমেত ঘুরে বসল বৈদ্যনাথ, বলল, "কি? কি ঠিক হল তোমাদের?"

উঁহুঁ। রাজি না। কিছুতে রাজি না দিদি।" বৈদ্যনাথ বুঝি এই সংবাদ শুনে একটু পুলকিতই হল, বলল, "তাহলে তোমার ঘাড়েই পড়ল।" পার্বতী যেন ধরতে পারল না কথাটা, উৎসুখ ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কিসের কথা বলছেন উনি?" নয়নতারা একটু ঢোক গিলল, বলল, "ঘাড়ের কথা। আমার ঘাড়ের কথা। আমার ঘাড় সত্যিই শক্ত, নইলে এমন বুদ্ধিমান স্বামী জুটেছে আমার ঘাড়ে? কি বল দিদি। কি, কথা বলছ না যে।"

কথা আর কী বলবে পার্বতী। সে বুঝি সত্যিই বোবা হয়ে গিয়েছে। আর কোনো কথা না বলে নয়নতারা তার স্বামীর সঙ্গে বিদায় নিল দিদির কাছ থেকে।

পার্বতী বলল, "আজ আলাপ করা হল না। আর-একদিন আসবেন।"

নয়নতারার মুখের দিকে চাইল বৈদ্যনাথ, তারপর হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলল, "আসব।"

অদ্ভুত। বড় অদ্ভুতই লাগছে বৈদানাথের। কেবল বই আর খাতা নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে বয়স বাড়িয়ে ফেলল সে। ঘরের বাইরে যে এমন-একটা আশ্চর্য জগৎ আছে, এ খোঁজ জানাই ছিল না তার। রাস্তায় নেমে এসে বৈদ্যনাথ বলল, "খুব সিম্‌প্‌ল্‌। খুব সোবার্‌। তোমার দিদি লোক নিশ্চয় খুব ভালো। এত বড় একজন আর্টিস্ট, কিন্তু একটুকু অহংকার নেই। সাজ-গোজে এতটুকু আড়ম্বর নেই।" একটু বুঝি বিরক্তই হল নয়নতারা। বলল, হুঁ। তোমার খুব মনে ধরেছে। তুমি খুব সিম্‌প্‌ল্‌ কিনা। অল্পস্বল্প সিম্পল তুমি নও—এক আউন্স দু আউন্স নয়—এক টন।"

"তার মানে?"

"এরও মানে বুঝলে না। তুমি সত্যিই একটা আস্ত সিম্‌প্‌ল্‌ টন।"

হাত তুলে বৈদ্যনাথ গাড়ি ডাকল, "এই ট্যাক্সি।" স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে তীরবেগে ল্যান্স-ডাউন রোড ধরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে ছুটে চলল হাওয়া গাড়ি। নয়নতারা বলল, "সত্যিই একটা বোকা তুমি। বাকিটা আমাকে দিয়ে করাতে চায় কি না চায় সে-কথা ওখানে বলার মানে?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"দিদির মনে লাগতে পারে তো?"

বৈদ্যনাথ বলল, "তোমার দিদি তোমাকে ডেকে নিয়ে এল এ-লাইনে, আর তুমি একটা চান্স পাচ্ছ দেখে সে হিংসে করবে? কী তোমার বুদ্ধি!" নয়নতারা তার কপালের উড়ন্ত গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল একটু সামাল ক'রে বলল, "আমার উন্নতি ও চায় বটে, কিন্তু নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে কি আমার উন্নতি চায়?" বৈদ্যনাথ আপোস করে নিতে চাইল. বলল, "থাক্। ও-কথা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। যা হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু ভাবছি হেরম্ব, রেবতী, বিজয় তো চটে লাল হয়ে আছে। তোমার দিদির দুর্নাম রটাবে নিশ্চয়। বিজয় সোম আবার পাকা প্রোপাগাণ্ডিস্ট—সত্যিই যে তোমার দিদি বোবা হয়ে গেছে, নিশ্চয় তা প্রচার করার জন্যে সে কোমর বাঁধবে এবার।"

"বাধুক।" শক্ত হয়ে বসল যেন নয়নতারা, মনে হ'ল সেও যেন আঁট ক'রে জড়িয়ে নিল শাড়ী। সে যেন তার উন্নতির সংকেত পেয়ে গেছে। বলল, "যে-লাইন যেমন। এ-লাইনে এলে অত সিম্‌প্‌ল্‌ আর অত সোবার্‌ হলে চলে না। সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, হাসতে হবে, খেলতে হবে।"

বৈদ্যনাথ একটু ঝুঁকেই তাকাল তার স্ত্রীর মুখের দিকে, বলল, "কিন্তু তোমাদের মনক্কাও তো আজকাল একটু গম্ভীর আর একটু রাশভারি হচ্ছে—কই, এ-লাইনে কোনো অসুবিধে তা সে ভোগ করছে না।"

"দোহাই।" নয়নতারা যেন দুই হাত দিয়ে তার স্বামীর মুখ চেপে ধরল, বলল, "ওর কথা তুলো না। আমরা হচ্ছি ভদ্রঘরের মেয়ে, ভদ্রঘরের বউ। কার সঙ্গে কার তুলনা করছ বলো তো?" হতভম্ব হয়ে বৈদ্যনাথ, বলল, "তা বটে। কুলবধূর সঙ্গে কি বরবধূর তুলনা হয়? আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু—" বৈদ্যনাথ রাস্তার দিকে তাকাল, ট্যাক্সিকে ডান দিকে বাঁক নিতে নির্দেশ দিয়ে নয়নতারার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "কিন্তু মনক্কাও তো এখন কুলবধূ। সে তো এখন মিস্‌ দ্রাক্ষা নয়, মিসেস দ্রাক্ষা বসাক।" নয়নতারা তার স্বামীর দিকে না তাকিয়ে একটু ঝাঁজ দিয়ে বলল, "থামুন মিস্টার মুখার্জি। লেকচার দেবেন কলেজে গিয়ে, এখানে নয়। আজ মিসেস বসাক বটে, ক দিন থাকে এই পরিচয় দেখা যাক।" বৈদ্যনাথ একটু ব্যাকুল ভাবেই যেন বলল, "আর তোমার পরিচয়টা ঠিক থাকবে তো মিসেস মুখোপাধ্যায়?"

"কেন, সন্দেহ আছে নাকি?"

"সন্দেহ নয়। আশঙ্কা।"

নয়নতারা কোনো আশ্বাসের কথা বলার আগেই তাদের ট্যাক্সি পৌঁছে গেল স্টুডিয়োর ফটকে।

বিজয় সোম। বিজয় দাঁড়িয়ে ছিল ফটকে। এখনি নাকি মনক্কার আসবার কথা, তারই প্রতীক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ট্যাক্সি থেকে নামল। বৈদ্যনাথ ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে ওদিকে।

বিজয় মৃদু হেসে বলল, "অপেক্ষা করছিলাম আমড়ার, এসে গেল আম।"

একটু হেসে নয়নতারা বলল, "অর্থাৎ।"

"এরও ব্যাখ্যা দিতে হবে? কিন্তু, খবর কি নিয়ে এলে শুনি।" বিজয় নয়নতারার মুখের দিকে তাকাল।

বিজয়ের মুখ থেকে হঠাৎ তুমি সম্বোধন শুনে নয়নতারা সামান্য একটু চমকে উঠল, চমকটা কাটিয়ে সে সংক্ষেপে জানাল খবরটা।

উল্লসিত হয়ে উঠল যেন বিজয় সোম, বলল, "এ নিউ স্টার ইন আওয়ার হোরাইজন। আমি তোমাকে নিয়ে কী ভাবে প্রচার করি দেখ। চল, হেরম্বরা অপেক্ষা ক'রে বসে আছে; তাদের গিয়ে খবরটা দেওয়া যাক আমাদের দিগন্তে নূতন তারার আবির্ভাব ঘটেছে।"

ওরা এগিয়ে চলল, বৈদ্যনাথ আসছে পিছন-পিছন আসছে। বকুলের ব্যাকুল গন্ধ এসে লাগল তাদের নাকে, বিজয় বলল, "কী মাইল্‌ড। কী সুইট।"

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, "কি ?"

"ওই বকুল।" কয়েক পা হেঁটে বিজয় বলল, "আর, আমার সঙ্গীও।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল নয়নতারা, বলল, "আপনি নিশ্চয় কবি। ফুলের গন্ধে এমন পাগলা হয়ে যান।"

বিজয় বলল, "ছিলাম বটে কবি। কবিতাও লিখেছি বিস্তর। কিন্তু আর ভালো লাগল না, তাই এখানে এসে হলাম প্রচারসচিব।"

"ভালোই করেছেন।"

তা আর বলতে? কবিতা লিখতাম কল্পনার সুন্দরীদের নিয়ে, এখানে এসে পেয়ে গেলাম জীবন্ত—"

"থাক্। চুপ করুন। মিস্টার মুখার্জি আসছেন।"

পিছনে তাকিয়ে বিজয় বলে উঠল, "ওকি মশায়, পিছিয়ে রইলেন কেন? এগিয়ে আসুন। শুভসংবাদ শুনতে শুনতে উৎসাহে পা চালিয়ে জোর কদমে চলেছি আমরা। মিসেসের তো এবার পোয়া বারো।"

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, "যার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি তো এলেন না।"

"কে ?"

"মিসেস বসাক।"

হেসে উঠল বিজয় সোম, "ওঃ। মনক্কা? দ্রাক্ষা? এসে পড়বে এখনি। ভোরের আলোর ছোট একটা সেটে একটা রি-টেক আছে। ও এখন মোটা খুঁটিতে ভেলা বেঁধেছে, ওকে পায় কে? আমাদের দিয়ে কাজ তো গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে ওর।"

"কি কাজ?" নয়নতারা কিছু না-বোঝার ভঙ্গি ক'রে জিজ্ঞাসা করল।

"ছি।" বিজয় বলল, "আপনারা কুলবধূ, সেসব কথা আপনাদের জানা ঠিক না। কি বলেন, মিস্টার মুখার্জি?"

বৈদ্যনাথ মাথা নাড়ল।

বিজয় বলল, "আমার হাতে কাগজ, আমার হাতে কলম। মিসেস মুখার্জিকে এবার আমি কী দাঁড় করাই দেখুন।"

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, "কি ?"

"গ্রেটেস্ট আর্টিস্ট ইন ইণ্ডিয়া নয়, গ্রেটেস্ট আর্টিস্ট ইন দি ইস্ট। এশিয়ার মধ্যে সেরা নটী।"

শেষের কথাটা শুনে বৈদ্যনাথের বুকের ভিতরটা ধক্ ক'রে উঠল। নয়নতারার দুচোখ ছলছল ক'রে উঠল, প্রবল আবেগে থরথর ক'রে যেন কেঁপে উঠল তার ঠোঁট।

নয়নতারা বলল, "আমার নিজের যদি কোনো শক্তি না থাকে—"

"না থাক্। ভক্তিতে হবে। ভক্তরা সে ভার নেবে। যেমন আমি নিলাম।"

কথাটা ব'লেই বিজয় নয়নতারাকে আলগোছে ছোট্ট একটা ইশারা করল, হেসে ফেলল নয়নতারা। লোভে নয়নতারার চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বিজয় সোমের দিকে কটাক্ষে তাকাতে লাগল। বৈদ্যনাথ বলল, "চলুন। ওঁরা বুঝি বসে আছেন। হেরম্ববাবুরা।"

যেন খেয়াল ছিল না কারো কথা। যেন হঠাৎ মনে করিয়ে দিল বৈদ্যনাথ, এই রকম ভাণ ক'রে বিজয় সোম বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। চলুন। ওরা সব স্টুডিয়োর মধ্যে বসে জটলা করছে।"

আর কয়েক পা মাত্র তার পরেই স্টুডিয়োর দরজা। দরজার পাশেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সাউন্ড-ট্রাক।

বিজয় বলল, "একটা কথা সেরে নিই। কয়েকটা স্টিল-ছবি আমি নিয়ে নেব। তার জন্যে একটু সময় দিতে হবে আজ। পাবলিসিটি, মানে প্রচার, এই কাজটির জন্যে ছবি তো দরকার।

নয়নতারার চোখের তারা-দুটি চিকচিক করে উঠল, তার স্বামীর দিকে একটু তাকাল, কিন্তু সেদিক থেকে সমর্থনের কোনো ইঙ্গিৎ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে বলল, "নিশ্চয়। তাতে আর আপত্তি কি। বরঞ্চ এতে আগ্রহই আছে। কি বল?" বৈদ্যনাথ সজোরে মাথা নেড়ে উঠল। সম্ভবত সম্মতিরই।

বিজয় বিগলিত ভঙ্গিতে বলল, "থ্যাংক ইউ। আর্টিস্টদের কাছে আমাদের দাবি আর কতটুকু? তাদের কাছ থেকে আমরা যা চাই তার নাম কোঅপারেশন। একটু সহৃদয়তা। তাহলেই আমরা ধন্য।"

বৈদ্যনাথ কি বুঝল জানি নে, বিজয়কে বলল, "ধন্যবাদ।"

বিজয় হেসে উঠে বলল, "না। ও কথা বলবেন না, ওটি বাদ দিতে চাইবেন না। আমরা একটু ধন্য হতে চাইই।"

বিজয়ের রসিকতায় খিলখিল করে হেসে উঠল নয়নতারা।

উদ্ধৃতির আতঙ্ক

শ্রীনেহেরু একবার বলেছিলেন—It is dangerous for politicians to write books--কারণ নাকি যে কোন পাঠকই তা থেকে খণ্ডিত অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

উক্তিটি সরস এবং নিঃসন্দেহে সেটা তাঁরই আতঙ্কগ্রস্ত মনের পরিচয়। শোনা যায়, গ্রন্থ-রচনা অশায়েস্তা মুহূর্তের তাগিদ। বিশেষ, মনীষীদের বেলায় ত' বটেই। বিরাট ভাবসমুদ্রে কত খুঁটিনাটি মুহূর্তের চিন্তাধারা তাছাড়া তাঁদের সমগ্র জীবন পরিক্রমায় কত অলৌকিক, অসাধারণ ঘটনার সন্নিবেশন হয়। সেই কারণে দেখা যায় চিন্তাধারার মৌলিকতা সত্ত্বেও অনেক সময়ই তা সঙ্গতিহীন এবং হয়ত পরস্পরবিরোধী। তবুও এইটুকুই বিশেষত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই সঙ্গতিহীনতা ও পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার চতুর অন্বেষণ যদি আলোচনাকারী-দের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে তাহলে ত' গ্রন্থরচনাই চলে না; এবং সেক্ষেত্রে পৃথিবীর তাবৎ মনীষীবৃন্দের উচিত একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে জীবিকা-জীবন শেষ করে মাত্র একখানা বই লেখা—আত্মচরিত। কিন্তু তা সম্ভব নয় আর সম্ভব নয় বলেই শ্রীনেহেরুর আশঙ্কার অনাদর হওয়া উচিত নয়। বরং বলা যেতে পারে আশঙ্কা শুধু রাজনীতিবিদ বা দেশনায়কদের মধ্যেই সীমিত নয়। এ আশঙ্কা সর্বজনীন, সর্বস্তরের লোকের।

উদ্ধৃতি সম্পর্কে পন্ডিতি-আলোচনার কথা বাদ দিলেও তার মূল্যবোধ অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে সবাই একমত যে উদ্ধৃতি শুধু যে রচনানীতির শালীনতাই বাড়ায় তা নয়, তাকে যথেষ্ট শৈলীপ্রধানও করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বক্তব্যবিষয়ের জটিলতা অস্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গির দরুণ জটিলতর হয়ে উঠেছে। সে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও মনোজ্ঞ উদ্ধৃতির স্বাদ সত্যই আকর্ষণীয়। রচনারীতিকে অলঙ্কারমুখর ও ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে সব দেশের সব লেখকই উদ্ধৃতির ব্যবহার করেন। প্রায়ই তাই দেখাও যায় বিষয়বস্তুর গুরুত্বানুযায়ী রচনারীতিতে উদ্ধৃতির অবকাশ থাকে। উদ্ধৃতির এ হ'ল একটা দিক মাত্র। পরীক্ষার খাতা থেকে শুরু করে ভবিষ্যত কর্মজীবনে ধন্য ও মান্য হওয়ার শেষ অধ্যায় অব্দি এইভাবেই আমরা মনীষা ও প্রতিভার স্মরণ করে আসছি। কিন্তু উদ্ধৃতির আর একটা দিক আছে—আশঙ্কার দিক। শ্রীনেহেরুর দার্শনিক উক্তির জন্ম ওই আশঙ্কা থেকে।

বার্ট্রান্ড রাসেল একবার প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন, জার্মান কবি গ্যেটের অমর কাব্য "ফাউস্টে" শয়তান মেফিস্‌টোফিলিয়ের যে উক্তি তাকে যদি কবির নিজের উক্তি বলে কেউ মনে করেন তাহলে কাব্যসাহিত্য বিচারে তাঁর আপন অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেবেন। রাসেল সাহেবের এ আতঙ্ক যুক্তিহীন নয়। বরং এমন অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় যে অনবধানতা নয় তার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত হ'ল রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসখানি যখন সবুজপত্রে মুদ্রিত হচ্ছে তখন থেকেই উপন্যাসটির নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা কবি পেতে শুরু করেন। মূল কটি সমালোচনা হ'ল নিম্নরূপ।

(১) ঘরে বাইরে রচনার উদ্দেশ্য (২) নিখিলেশ চরিত্রের দুর্বোধ্যতা (৩) সন্দীপের

অসংযম উক্তি। উপন্যাস বা গল্পে জোর করে উদ্দেশ্য অন্বেষণ-বৃত্তি কবির মতে নিছক রাজনীতি। ওথেলোর দৃষ্টান্ত তুলে তিনি বলেছেন যদি তেমন উপদেশ, তত্ত্ব বা উদ্দেশ্যসন্ধানীর মনে হয় যে কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল ওথেলোরপ্রতি ডেসডীমোনার "একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নিদারুণ পরিণাম দেখিয়ে—সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত কিংবা ইয়াগোর চাতুরীকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করে সরলতার প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ" তাহলে বিভ্রান্তকারীর প্রচার সাধনার সাময়িক সিদ্ধিলাভ হয়ত হতে পারে, কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারের মনের সাগর ছেঁচে এই উদ্দেশ্য, তত্ত্ব আহরণ প্রবৃত্তি সাহিত্য-বিচারের পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা। মাত্র এইটুকু নয়। রবীন্দ্রনাথের ওপর সবচেয়ে সাংঘাতিক অভিযোগ ছিল, ঘরে-বাইরে উপন্যাসে কবি সীতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন কি, আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম, লোকে উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছে এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্বাসিত হইয়াছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি ঘরের টেবিল হইতে নির্বাসিত থাকিল।"

নীতিবাগীশ সমালোচকবর্গ তাঁদের বক্তব্যের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সন্দীপের উক্তি উদ্ধৃত করেন। ঠিক উক্তি না বললেও, আত্মসমালোচনা বলা চলে একে। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে যেটুকু স্বাভাবিকতা সেটুকুরই পূর্ণ প্রতিফলন পাই আত্মচিন্তায়। উপন্যাসে, সন্দীপ-বিমলার সম্বন্ধটি খুব স্পষ্ট না হয়েও রহস্যপূর্ণ নয়। সন্দীপের মনের অলি-গলিতে অস্পর্শিক বিমলার অনুধ্যান অনেকটা রাবণরাজার মতই। তাই সন্দীপ ভাবতে পেরেছিল "যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক-বনে রেখেছিল। অত বড় বীরের অন্তরের মধ্যে ওই এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল, তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজা করত।"

বিস্তারিত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। উৎসাহী পাঠক "সাহিত্যবিচার" পড়ে দেখতে পারেন এবং অবিমৃষ্যকারিতা প্রসঙ্গে এই দীর্ঘায়ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। মোট কথা, সাহিত্যের ভাণ্ডার যাঁর অফুরন্ত তাঁরই সংগ্রহশালা থেকে বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা খণ্ডিত অংশ আপন উদ্দেশে কাজে লাগান। হয়ত আইনত তিনি দণ্ডনীয় নন্, কিন্তু যাঁর খণ্ডিত উদ্ধৃতি নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি হল, অনেক ক্ষেত্রেই পাঠক পূর্বাপর সম্বন্ধ বিযুক্ত হয়ে তাঁকে বিচার করে আর এক ভাবে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কথা এসেই পড়ে। ধরা যাক না, সাহিত্যে কুম্ভীলক-বৃত্তির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত তিনি আপন যুক্তির সাথে বীরবলের যুক্তি জুড়ে অনায়াসেই বলতে পারেন যে বীরবল বলেছেন "মাতৃভাষা যখন কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করার সকলেরই সমান অধিকার আছে"। অবশ্য বীরবলের মূল বক্তব্যের সঙ্গে ওই খণ্ডিত অংশটুকুর কেমন সম্বন্ধ তা কেউ জানুক না জানুক, সাহিত্যে চৌর্যপরাধের স্বপক্ষে ওই খণ্ডিত অংশটুকুই কী যথেষ্ট নয়!

মোটকথা দৃষ্টান্ত দিয়ে যা বলা হল তা হল উদ্ধৃতিকারের "মন ভোলাবার ছলা কলা" পদ্ধতি —যা অবশ্যই লেখকের মুন্সিয়ানা। এ মুন্সিয়ানা অস্বীকার করা যায় না কারণ একদল সুধী-জনের মতে ঠিক সময়ে ঠিক কথার ব্যবহারই যথার্থ প্রতিভা। বিশল্যকরণী খুঁজে নেওয়াটাই ত' কীর্তি! গন্ধমাদন বয়ে আনার দুর্জয় সাহসিকতাটুকু সে কৃতিত্বর কাছে নিতান্তই নস্যাৎ।

সুতরাং যাঁর বাণী উদ্ধৃত হল তিনি সেখানে গৌণ, পরশ-পাথর অন্বেষণকারীর প্রতিভাই মুখ্য। কিন্তু উদ্ধৃতিকারের এই পরশপাথর অন্বেষণ বৃত্তিতে যতই কৃতিত্ব থাক, তার উদ্ধৃতি যে মূল লেখকের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে না কে বলতে পারে! উদ্ধৃতিকার ত' মূল লেখকের অবিশ্রাম কীর্তি থেকে রত্ন আহরণ করে গরীয়ান হলেন কিন্তু রত্নভাণ্ডারে যাঁর সৃষ্টি প্রতিভার সাক্ষ্য, তাঁর নিরাপত্তার জামিন কোথায়! বর্তমান কালের চলচ্চিত্র-শিল্পে এই আর্টের মাত্রাধিক্য প্রয়োগটুকু উল্লেখ না করে পারা যায় না। প্রেমাভিলাষী নায়ক-নায়িকার মুখে মুখে প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাথের সেই সব সাধনসংগীত যার আদর্শগত বা নীতিগত পর্যায় সম্বন্ধে প্রচারকর্তারা নেহাৎই অজ্ঞ। অথবা বৈষ্ণব পদকর্তাদের বিরহসংগীত। কৃষ্ণপ্রেমের যে কাব্য তার বিলাস বিচিত্রতাময়। লৌকিক প্রেমের মত সেখানে দেহতর্পনেচ্ছা নেই। সেখানে শ্রীরাধিকার অন্তরের আকুতি হল কৃষ্ণসুখ। নারীর অন্তরের ধন। কিন্তু নেহাৎই জীবপ্রেমের আখ্যানভাবে যদি শ্রীরাধিকার বিবশ আত্মার আকুতির উদ্ধৃতি দেখা যায়, তাহলেই মনটা বিমুখ হয়।

উদ্ধৃতির গুণাগুণ বিচারে যা বলা হল, জ্ঞানীগুণীর কাছে তার কেমন আদর হবে জানা নেই। তবে রসিক পাঠকের কাছে এর আদর উপেক্ষণীয় হবে না। কারণ উদ্ধৃতির সংগে আতংকের সুস্পষ্ট সম্বন্ধটা অনুধাবন করে তাঁরা পূর্বাহ্নেই সচেতন হতে পারেন। উদ্ধৃতি-সহযোগী যে রচনা তাতে বক্তব্য বিষয় স্বচ্ছ হয়; কিন্তু উদ্ধৃতি-সমৃদ্ধ রচনা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যও হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় বুঝি বা বিচারশীল মনের বিশ্লেষণী প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে; কিংবা মৌলিক দৃষ্টিভংগির অভাবে মনের শিল্পবোধ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। শেষোক্ত আতংকও যুক্তিহীন নয়। উদ্ধৃতির মাত্রাহীন প্রয়োগ ও আলোচ্য বিষয়ের গতানুগতিক বিচারই যদি আলোচনা সাহিত্যের মূল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভাবের ক্ষেত্রে যে দৈন্য তা কী ঢাকা পড়ে যাবে! আলোচনা-স্তম্ভের প্রতি গাঁথুনিতে যে কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার অংকুরোদ্গম হবে, মনের শিল্পবোধের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করতে কি সেটুকুই যথেষ্ট নয়।

রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত

বর্তমান রঙ্গমঞ্চে 'একাংকিকা'-র প্রভাব

নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। অধিকাংশেরই অভিমত, থিয়েটারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পেশাদারী দলগুলির দিকে দৃকপাত করলেই বোঝা যাবে যে নাটক অভিনয়ের চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেও যখন রুপালী পর্দার সংগে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হল না তখন যেন দৃশ্য সজ্জার টেক্‌নিক উন্নততর করে যাতে সিনেমার সংগে পাল্লা দিতে পারে সেই দিকে নজর রেখেই নতুন নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। অর্থাগমের দিক থেকে সিনেমার সাফল্য দেখেই বোধকরি পেশাদারীমঞ্চের ধারণা হয়েছে যে শিল্পপরিবেশন ক্ষেত্রে মঞ্চ ও রুপালী পর্দা সমধর্মী। এমনকি একথাও যে মঞ্চের সবকিছুই ছায়াচিত্রের মধ্যে রয়ে গিয়েছে এবং তাছাড়াও রয়েছে পরিবেশনের টেক্‌নিকে ছায়াচিত্রের সুবিধা। তাই মঞ্চকে রুপালী পর্দার টেক্‌নিক ঘেঁসা করবার ভুলপথ বেছে নিয়েই মঞ্চশিল্পে সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চই যদি নাট্যশিল্পের একমাত্র পরিবেশনের মাধ্যম হত তাহলে হয়ত তার অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকতো না। কিন্তু বাংলা নাট্যশিল্পের উল্লেখ-

যোগ্য অঙ্ক হল অপেশাদারী মঞ্চের নির্ভীক অভিযান। অধুনা অনেক সখের দলের খবর চোখে পড়ে এবং জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার নমুনাও দেখা যায় প্রচুর। একদিকে যখন পেশাদারী মঞ্চগুলির দর্শকবৃন্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে অন্যদিকে সখের দলগুলির অভিনয় দেখার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত নেই। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে রূপালী পর্দার উন্নতি মঞ্চের অবনতির কারণ নয় এবং পেশাদারী মঞ্চ অপেশাদারী দল-গুলির থেকে মঞ্চশিল্পে অনেক পেছিয়ে পড়েছে।

পেশাদারী মঞ্চ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে,—কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকতার হাত থেকে এখনও বেরোতে পারেনি। পুরাতন মঞ্চাভিনয়ের সাফল্যের দিকে নজর রেখে এঁরা অর্থাগমের ভিত্ পোক্ত করতে চান। তাই নামকরা পুরাতন নাটকগুলি বা তারই আদর্শে নতুন নাটক উন্নত-তর টেক্‌নিকের সাহায্যে পরিবেশন করতে পারলেই অর্থাগমের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে করেন।

নাটকের মূল কথা হল সংঘাত। কখনও বা মানসিক কখনো বা বাহ্যিক সংঘাতের অবতারণা করে নাটক গড়ে ওঠে। পুরাতন নাট্য-পদ্ধতি হল যুদ্ধ বিগ্রহের অবতারণা করে সংঘাত লাগিয়ে তোলা অথবা কথার উপর কথার জাল বুনে মানসিক সংঘাত দেখানো। তার পটভূমিকাও ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ এবং মানব মনের প্রাথমিক চাহিদানুযায়ী 'মিলনান্তক' 'বিয়োগান্তক' 'হাস্যরসাত্মক' ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগের মধ্যেই নাটকের পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়াবেগ এবং চরিত্র চিত্রণের মধ্যেই ছিল এর সীমারেখা। সাধারণতঃ নাটকে চরিত্রের গতি নিয়ন্ত্রিত হত নিয়তির সাহায্যে, তাই নাটক আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে পরিণতি স্পষ্ট হয়ে পড়লেও পরিণতির ক্রমে নিয়তির কর্তৃত্ব দর্শকদের আকর্ষণ করতো। এগুলি নাট্যশিল্পের দোষ নয় বরং গুণই বলতে হবে. যখন এরই ওপর "ওথেলো", "কিংলীয়র. 'চন্দ্রগুপ্ত' বা প্রফুল্লের সাফল্যজনক অভিনয় রজনীগুলি নির্ভর করেছে। কিন্তু বর্তমান সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এর দোষ ধরা পড়েছে।

এখন ছোট নাটকের অভিনয়ের উপরই ঝোঁক বেশী। সেই ছোট পূর্ণাঙ্গ নাটক ক্রমশ একাঙ্কিকার দিকে বেশী ঝুঁকেছে এবং নতুন একাঙ্কিকা লেখা ও অভিনয় প্রচেষ্টায় জন-সাধারণের স্পৃহা দেখা দিয়েছে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষীণকায় নাটক বা নাটিকার উদ্ভাবনের যৌক্তিকতা চিন্তা করলেই ইংরাজী-মঞ্চ-ইতিহাসের কথা উল্লেখ করতে হয়। ইংরাজ-দের রাত্রের খানার সময়ের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্যে মূল নাটকাভিনয়ের আগে ছোট ছোট নাটিকা (কথোপকথনের ধাঁচে) গড়ে ওঠে। ইংরাজীতে এদের বলা হত "কার্টেন রেজার।" (cartain raiser)। যাঁদের দেরীতে খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁরা এই সময়টুকু পার করে অথবা এই অভিনয়গুলির মধ্যেই থিয়েটারে পেঁাছতেন। এই "কার্টেন রেজার"গুলি প্রথমতঃ অপেক্ষামান অস্থির দর্শকদের শান্ত করতো এবং দেরীতে আসা পৃষ্ঠপোষকদের অভিনয় দেখবার সুযোগও বজায় রাখতো। ১৯০৩ সালে ওয়েষ্ট এন্ড থিয়েটারে এইরূপই একটি ছোট নাটিকা W. W. Jacobsএর নাট্যরূপ দেওয়া monkey's paw অভিনীত হবার পর অনেকেই মূল নাটকাভিনয়ের জন্য অপেক্ষা না করে সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরে যান এইরকম শোনা যায়। সেই থিয়েটারেরর মালিক শুনেছি এরপর "কার্টেন রেজার" দেখানো বন্ধ করে দেন যদিও নাটিকার স্বাদ জনসাধারণ তখন পেয়ে গিয়েছে।

নাটিকা বা একাঙ্কিকার নাট্যরস, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকাবর্জিত।

যে কোন হৃদয়াবৃত্তি ও সামাজিকতার পরিপ্রেক্ষিতে নাটিকা গড়ে ওঠে। মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিকে সংঘাতের ভিতর দিয়ে জাগ্রত করাই এদের কাজ। নতুন নতুন বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে এগুলি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। চরিত্র চিত্রণের বা কথার মালা দিয়ে বিষয়বস্তুর পরিচয়ের অবকাশ না থাকলেও নাট্যরস ব্যহত হয় না। চিরাচরিত প্রথামত নাটকের দুর্বল অংশটুকু ঢাকবার জন্য মাঝে মাঝে সংঘাতের চরম উত্তেজনা দেখিয়ে (climax) পার পাবার প্রচেষ্টা থাকে না এবং সুরু থেকেই জমাট বেঁধে নাটিকাগুলি এগিয়ে চলে চরম পরিণতির দিকে। আধুনিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা বোধকরি এই নাটিকাগুলির উপরই নির্ভর করছে তাই নাটক বাছতে বসে সখের দলগুলি একটার পর একটা পুরাতন পদ্ধতির নাটকগুলি বর্জন করে নতুন এই একাঙ্কিকা বা নাটিকাগুলির ওপরই মনোনিবেশ করেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ধরনের নাটক বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই তাই এখনও নির্ভর করতে হয় খ্যাতনামা লেখকদের ছোট গল্প-গুলির নাট্যরূপ এবং ইংরাজী playlet গুলির ভারতীয় রূপ প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

বিরিঞ্চি বাবা প্রসংগে

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পরমশ্রদ্ধেয় "পরশুরাম" বিরিঞ্চি বাবা ও শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর (সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্) চরিত্র অংকন করিয়া এইসব ভন্ড সাধু সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী এই চরিত্র দুইটিকে ব্যঙ্গ চিত্র হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে, এইসব ভন্ড দুষ্টদের সম্বন্ধে কোন সাবধানতা অবলম্বন করে নাই। ফলে ইহাদের প্রতাপ অব্যাহতই আছে বরং দেশে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধির কল্যাণে(!) ভয়াবহরূপে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইঁহারা সহস্র সহস্র শিষ্য ও তাঁহাদের আশ্রিত পরিবারবর্গের মস্তক নির্বিবাদে চর্বণ করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিতেছেন। সাম্প্রতিক বহু গল্প উপন্যাসে এই সব বাবাদের কীর্তিকলাপ উল্লেখিত হইতেছে, যাঁহারা চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া থাকেন না তাঁহারা জানেন, এই সব গল্প উপন্যাস বর্ণিত বিবরণগুলি সত্যের সহিত সম্পর্কহীন নহে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা গুলিতেও এই সব বাবাজী মহারাজদের বহু কীর্তিকলাপের কাহিনী বহুসময়ে প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালী জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এই হাঙ্গর, কুম্ভীর, অক্টোপাসশ্রেণীর গুরু মহারাজদের দ্বারা কবলিত। ইহাদের দ্বারা সম্মোহিত শিষ্যদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা এমন কি নিজস্ব ধনসম্পদ বলিতে কিছুই থাকে না। যুবতী স্ত্রী অথবা কন্যা থাকিলে অনেকক্ষেত্রে তাহাদিগকেও মহারাজের অথবা "বাবার" শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত করিতে হয়। আসামের এক বাঙ্গালী "বাবা" এমনি এক নিরীহ শিষ্যের স্ত্রীকে করায়ত্ত ও আশ্রমজাত করিয়াছিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও জবরদস্ত অফিসর হইয়া মাতাকে বহু কষ্টে উদ্ধার করেন। অতি অল্পদিন পূর্বে এইরূপ এক বহুশিষ্য-শিষ্যা-সেবিত "বাবা" শিষ্যা-সম্ভোগের অপরাধে ধরা পড়িয়াছিলেন। এই বিচারকাহিনী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঠ করিবার দুর্ভাগ্য সকলেই বহন করিতে হইয়াছে। যে বাবা শিষ্যা পরিবৃত হইয়া থাকেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ স্ত্রী সম্ভাষণে যিনি বিরত নহেন এইসব 'সাধু' সম্বন্ধে স্বতঃই মানুষের সন্দেহ জাগা উচিত। মোহগ্রস্থ শিষ্যশিষ্যাদের গুরুর চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে বিস্ময়কর ঔদাসীন্য দেখা যায়। প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এক প্রিয় সহচরের মুখ দর্শন করেন নাই, এই শিষ্য মনোদুঃখে প্রয়াগে গিয়া আত্মহত্যা করেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত-শিষ্য মহাশয়দের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

এইসব বাবাদের দ্বারা শোষিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর পারমার্থিক কি সুবিধা হয় তাহার হিসাব বাহির করা কোন সংখ্যাতত্ত্ববিদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে অসংখ্য পরিবারের ঐহিক সুখ-শান্তি ও ভবিষ্যৎ যে এইসব বাবারা নষ্ট করিয়া দিতেছেন তাহা ত চর্মচক্ষেই বেশ অনুধাবন করা যায়। শিষ্য-শিষ্যাদের ত্যাগ সংযম ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি অতি সদুপদেশবর্ষণকারী এইসব ভন্ড সাধুর দল রাজোচিত ঐশ্বর্যের মাধ্যমে সকল রকম ভোগবিলাসের মধ্যে বহুক্ষেত্রে স্ত্রীপুত্র সহ নিজ আশ্রমে মহানন্দে কালাতিপাত করে। ইহারা বিবাহিত শিষ্য-শিষ্যাদের দাম্পত্য-সুখ হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে বঞ্চিত করিয়া রাখে। অপরিণত বুদ্ধি বালক অথবা শিশু শিষ্যপুত্র ও

শিষ্যকন্যাকেও শৈশবেই ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণী রূপে দীক্ষা দিয়া ইহারা তাহাদের উপর ভবিষ্যৎ প্রভুত্বের ব্যবস্থা পাকা করিয়া লয়। ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া গেলেও অসংখ্য বাবার আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যা ও তাহাদের গৃহস্থাশ্রম-জাত পুত্রকন্যারা বাবাদের ক্রীতদাস-দাসী ব্যতীত আর কিছু নহে। পুরুষানুক্রমিক ক্রীতদাস-দাসী এইসব হতভাগ্য-হতভাগিনীদের মুক্তির জন্য কোন দিন কোন উইলবারফোর্স অথবা লিংকলন আমাদের দেশে আবির্ভূত হইবেন কিনা কে জানে?

দেশে যেখানে যত সাধু-সন্ন্যাসী-মঠাধীশ, গুরু, ধর্মোপদেষ্টা আছেন তাঁহারা সকলেই ভণ্ড ও প্রতারক এবং মঠ-আশ্রম মাত্রই ব্যাভিচারের লীলাক্ষেত্র ইহা প্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ চেষ্টাও বাতুলতার নামান্তর। সত্যধর্ম ন্যায়নীতিরই একটা আদর্শ রূপ। প্রকৃত ধর্ম সুস্থ মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর হইতে শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক কালের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রমণ মহর্ষি প্রভৃতি বহু ধর্মনেতা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সুস্থ জীবন ও নীতি ধর্মের পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে জনসাধারণের ক্ষীয়মান নীতিবোধ লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুত জয়প্রকাশ-নারায়ণের মত বাস্তববাদী নেতাও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে জাতির নৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এখন শ্রীঅরবিন্দ অথবা রমণমহর্ষির নেতৃত্ব প্রয়োজন। যে সময়ে জয়প্রকাশজী ইহা বলেন যে সময় শ্রীঅরবিন্দ ও রমণমহর্ষি দুইজনেই জীবিত ছিলেন। এই সন্ন্যাসী ও ধর্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে জনসাধারণের যে সহজাত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহাকে ভাংগাইয়া যাহারা ব্যবসা করে তাহারা কি সমাজের জঘন্যতম দুর্বৃত্ত নহে? এই ধর্মের নামে যে সব ধূর্ত ভণ্ড লম্পটেরা বহু নরনারীকে সম্মোহিত করিয়া নিজেদের ঘৃণিত কামনা পরিতৃপ্তির ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করিতেছে জনসাধারণের তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। মডার্ন ভূঁইফোঁড় বাবাদের চিনিয়া লওয়া মোটেই শক্ত নয়। ভক্তি বিহ্বল গদ্ গদ্ ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলে সহজেই আসল সাধু ও ভণ্ড বাবাদের প্রভেদ ধরা পড়ে, আসল মঠ আশ্রম ও ব্যাভিচারের লীলা-ক্ষেত্রের পার্থক্য ধরা পড়িতে দেরী হয় না। শুধু যে দৃষ্টি থাকিলে আসল নকলের প্রভেদ ধরা পড়ে আমাদের মধ্যে সেই দৃষ্টির অভাব। আমাদের নিজেদের চরিত্রের শৈথিল্যও ইহার জন্য অনেকটা দায়ী।

সরকারের পাওনা ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দিয়া অথবা জাল-ঔষধের কারবারে ধরা পড়িয়া আমাদের অনেকে সাধু বাবার সন্ধানে বাহির হন। সুচতুর বাবা এইরূপ ভক্ত পাইলে যে বেশ কিছু দোহন করিয়া লইবেন এবং ক্রমশঃ বাগুরা-বন্ধ ভক্তের স্ত্রী-কন্যার দিকে হাত বাড়াইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? পরীক্ষার পড়া না পড়িয়া পাশ করিতে হইবে—দৌড়াও বাবার কাছে, যোগ্যতা নাই অথচ ভাল চাকুরী চাই যাও বাবার কাছে, ব্যাভিচারের মামলায় পড়িয়াছ চল পরিত্রাতা বাবার কাছে—এই করিয়া আমরাই এই সব ধূর্ত প্রতারক তথাকথিত 'স্বামী' 'মহারাজ' অমুকানন্দ তমুকানন্দদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকি। চালাকী দ্বারা আমরা কার্য সিদ্ধি করিতে চাই—এই পথে সহায়তার জন্য মানুষের demand আছে; এইসব বাবারা এই প্রয়োজনেরই supply অথবা সৃষ্টি। আমরা মনে করি এই বাবাদের কৃপায় আমরা ঘোরা পথে অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইব। সংসার যে একটি দুরতিক্রম্য নিয়ম-শৃংখলার অধীন—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার সাধ্য কোন 'বাবার' নাই এই বোধ আমাদের মধ্যে বহু বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরও নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় দুর্ধর্ষ আইন ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক জবরদস্ত শাসক ও রাষ্ট্রনেতা প্রভৃতি স্তরের ব্যক্তিরাও বাবাদের প্রসাদলাভের আসায় তাঁহাদের

স্বারস্থ। সমাজের শীর্ষস্থানীয় এইসব ব্যক্তিদের বাবাদের ভক্ত শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া সাধারণ লোকও মোহগ্রস্থ হয় ও বাবাদের ভক্তসংখ্যা স্ফীতি লাভ করে। ভুঁইফোড় বাবাদের অনেক প্রচারবিদ্ শিষ্য আছেন ইঁহাদের প্রচার কৌশল খ্যাতনামা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও হার মানাইয়া দেয়। আমাদের দেশের বিবেচনাহীন সংবাদপত্রগুলি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এই প্রচারের ফাঁদে ধরা পড়েন। ধনলক্ষ্মী, নেপালবাবা অথবা নিখাকীমার সংবাদ প্রকাশে চমক সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রচারের পূর্বে সংবাদের সত্যতা পরীক্ষিত হইলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইত না। এই সকল সংবাদ প্রচারের যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পাইয়াছিল সেই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রণোদিত হইয়াই আমাদের "জাতীয়" সংবাদপত্রগুলি নির্বিচারে "বাবাদের" মহিমা প্রচার করেন।

কিছুকাল পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় **ভবতোষ ঠাকুর** ও দেশ পত্রিকায় (শারদীয়া-১৩৬২) **স্বাপ্নিক কবিতা** পরশুরামের এই দুইটি গল্পের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। কাহারা **ঠাকুরত্ব** লাভ করে এবং কাহারা ঠাকুরত্বলাভের উপায় এবং কাহারা ঠাকুরদের শিকার হয় এবং ব্যক্তিত্বহীন মেরুদণ্ডহীন এইসব শিষ্য-শিষ্যাদের অবস্থা আশ্রমগুলিতে কিরূপ এই গল্প দুইটি হইতে তাহা সুন্দরভাবে বুঝা যাইবে।

স্বার্থান্ধ দুষ্টের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফাঁদ পাতিবে ইহা জানা কথা, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ ও ভ্রান্ত জনগণকে এই বিপদ হইতে রক্ষার দায়িত্ব কি সমাজ ও রাষ্ট্রের নহে, সমাজ ও রাষ্ট্র যতদিন এ দায়িত্ব গ্রহণ না করিবে ততদিন পর্যন্ত বিরিঞ্চিবাবাদের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেই থাকিবে। ইহাই দুর্ভাবনার কারণ।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

সম্প্রতি বিশ্বভারতী থেকে জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি যথাযোগ্য সম্পাদকীয় টীকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে জগদীশচন্দ্রকে লেখা ছত্রিশখানি এবং অবলা বসুকে লেখা সাতখানি পত্র। পরিশিষ্টে আছে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিবন্ধ, অন্যের নিকট লিখিত পত্র, রবীন্দ্র-জগদীশের প্রশ্নোত্তর, রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ভগিনী নিবেদিতার পত্র। অতঃপর বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রভূত পরিশ্রম করে ১০৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী টীকা রচনা করেছেন। পরিশিষ্ট এবং টীকা রবীন্দ্র-জগদীশের সম্পর্কটিকে গভীর অন্তরঙ্গতায় এবং প্রায় চল্লিশ বৎসরের বন্ধুত্বকে অসামান্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে স্বভাবতই প্রবল আগ্রহ জন্মে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলি পড়তে। চিঠিপত্র প্রকাশের পরিকল্পনায় সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হবার অবকাশ অবশ্য ছিল না। গ্রন্থপরিচয়ে জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন পত্রের উল্লেখ থাকায় পাঠকের সেগুলি পড়ে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

এই চিঠিগুলি আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। দুটি অসাধারণ কালজয়ী প্রতিভা কি করে বন্ধুত্বের বন্ধনে ধরা দিল; আপন-আপন সাধনার নিরন্তর অনুসরণের মধ্যেও দু'জনের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় হয়ে এসেছে, সে-কাহিনী আমাদের কাছে চিরকালের জন্য ঔৎসুক্য এবং শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে থাকল।

বিশেষতঃ নিঃসঙ্গতাই হচ্ছে বড়ো প্রতিভার ধর্ম। তাঁরা আপনার স্বপ্ন ও আদর্শের মধ্যেই মগ্ন। অগণিত মানুষের মধ্যে থেকেও তাঁদের যেন সঙ্গী নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির জীবনে এই নির্জনতা যেন আরো স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রজীবনীকার বারবার তাঁর এই নিঃসঙ্গতার উল্লেখ করেছেন। অসংখ্য কর্মের জালে জড়িয়েও একটা মুহূর্ত আসে যখন সেই জাল সরিয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। যৌবনকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক একটা আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন আবার নতুন কর্মপন্থার আহ্বানে তিনি সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। কাব্যপ্রেরণার দিক দিয়েও রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিবর্তনশীল নবীনতা রবীন্দ্রকাব্য পাঠককে বিস্মিত করে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি এক একটি স্তরকে এমনি করেই অতিক্রম করে গিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যকে পেরিয়ে এসে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সভ্যতার সংকটের অন্তিম বাণীতে তিনি যুগান্তরণের স্বপ্ন দেখেছেন। এর মধ্যে কত নতুন সমস্যা, নতুন পরিবেশ তাঁর চিন্তাধারাকে শাণিত করে নিয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দু'জনেই প্রতিভার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খুঁটিনাটি কতদূর পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন বলা শক্ত। জগদীশচন্দ্রের

আবিষ্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবন্ধ লিখলেন 'জড় কি সজীব' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮, শ্রাবণ) এই প্রবন্ধ পড়ে জগদীশচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পদার্থ বিদ্যা বা উদ্ভিদ বিদ্যার নিছক বিজ্ঞানঘটিত তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক হয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বুঝতে পারা হয়তো সম্ভব ছিল না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি সুদূর ঐতিহ্যের ধারা দেখতে পেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র রয়েল সোসাইটিতে বক্তৃতার উপসংহার করেছিলেন এই বলে—

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns and shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the bank of the Ganges thirty centuries ago.*

এই উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষে যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি।" জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণের যে লীলা উদ্ঘাটিত হল, রবীন্দ্রনাথকে সেই তথ্যটিই মুগ্ধ করেছিল। ঋষিদের উপলব্ধ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হল, রবীন্দ্রনাথ যেন অতি সহজেই তখন তাঁর ঔপনিষদিক শিক্ষা এবং কবিদৃষ্টি নিয়ে জগদীশ-চন্দ্রের সত্যটি অন্তরে গ্রহণ করে নিলেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সত্য যেন একটা সৃষ্টি, অখন্ড চৈতন্যের প্রগাঢ় উপলব্ধি যা জড় এবং জীবনকে মৈত্রী বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল। রবীন্দ্র-নাথের ছিন্নপত্রেও এই উপলব্ধির কবিত্বময় প্রকাশ আছে—

যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শষ্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। (শিলাইদা ২০ আগষ্ট, ১৮৯২)।

রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনা দিয়ে এই চেতনার উপলব্ধি করেছেন, প্রায় সেই সময়েই জগদীশচন্দ্র গবেষণাগারে এই সত্যটিকে সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট। কবিজীবনের এই অধ্যায় এবং বৈজ্ঞানিক-জীবনের এই অধ্যায়টির মধ্যে ঐক্যই দুজনকে এমন নিবিড় বন্ধুত্বে বেঁধে দিতে সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়। এই সত্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বাণী। জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক হয়েও পরমাশ্চর্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় অভিষিক্ত। এই জন্যেই তাঁর বাংলা রচনা এমন শিল্পস্পর্শে প্রদীপ্ত। বস্তুকে শুধু বস্তুরূপে দেখেননি বলেই তাতে যুক্ত হয়েছে কল্পনার আভা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্বপরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।**

এই উক্তি বন্ধুত্বজনিত প্রশস্তি মাত্র নয়, জগদীশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তাঁরাই সে-কথা জানেন। সুতরাং তাঁদের বন্ধুত্বে সহায়তা করেছিল দু'জনের মননচেতনার সাদৃশ্য। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিকসুলভ বিশ্লেষনী বুদ্ধি তাঁর অধ্যাত্ম

---

* চিঠি পত্র ৬ পৃ ১১১

** চিঠি পত্র ৬ পৃ ৭০

উপলব্ধির অখন্ডতাকে কোনো দিক দিয়েই ক্ষুন্ন করেনি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি সত্যই অর্থগভীর—

ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে।*

I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality.**

নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কাব্যসমালোচকদের কাছে বিশেষ কৌতূহলো-দ্দীপক হবে। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বলে শুধুই আবেগপ্রবণ ছিলেন, এমন কথা বলা তাঁর সমগ্র বিচার নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনী অনুধাবন করলে তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়বে। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "বালক-বয়সেই রবীন্দ্রনাথ যে ভাবুকতা, চিন্তা ও বিচারশক্তির (critical faculty) পরিচয় দিয়াছিলেন—সেকালে যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ ও আলোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ছিল।...ষোল বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ বৎসর—এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা ও লিখিত প্রবন্ধ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে এই প্রতিভার আদি-উন্মেষ কোন পথে হইয়াছে। বাস্তবিক এত অল্প বয়সে মানস-শক্তির (intellect) এমন জাগরণ কবিজীবনে অতিশয় বিরল।†" এই মানসশক্তি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রূপে বিকাশ লাভ করেছে। কবিতাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছে মানসচেতনার নিত্যনবরূপ। সমাজতত্ব, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা সাহিত্য—সব কিছুর আলোচনাতেই তার প্রমাণ অক্ষুন্ন। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই আদর্শবাদিতায় পূর্ণ ছিল কিন্তু যুক্তি এবং বিশ্লেষণে কখনই তিনি অস্পষ্ট ছিলেন না। তিনি শব্দতত্ত্ব লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' লিখেছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বজনশ্রদ্ধেয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিকে চিন্তায় অপূর্ব স্বচ্ছতা এসেছিল। পূর্ববর্তী যুগের বাক্যালঙ্কারের পদ্ধতি তিনি পরিহার করলেন। তিনি লিখলেন বিশ্বপরিচয় এবং বাংলা ভাষাপরিচয়। এই সময়েরই লেখা তিনসঙ্গীতে সংকলিত গল্পগুলির নায়কদেরও তিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় প্রতিভাবানরূপে কল্পনা করেছেন।

এটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। লিওনার্তো দা ভিঞ্চি এবং গ্যেটের সঙ্গে এই দিক দিয়ে তাঁর মিল। কিন্তু অনুরূপ আর বেশী নেই। কল্পনা ও মননের যুগ্মধারার প্রতিভা সত্যই বিরল। এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল বলেই এই নিঃসঙ্গ কবির বৈজ্ঞানিকের বন্ধুত্ব অর্জনে বিলম্ব হয় নি।

৪

সেই যুগটাও স্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্ভবতঃ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।* রবীন্দ্রকবিজীবনে তখন চিত্রা-কথা-কল্পনার

* চিঠিপত্র, ৬ পৃ ১২২
** পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১২৮ ক
† কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য (১ম খণ্ড) পৃ৩৫-৩৬
* চিঠিপত্র ৬ পৃ ১৫৫

যুগ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশের ঘরে। জগদীশচন্দ্র চলেছেন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনের পথে আর রবীন্দ্রনাথের তখন মধ্যাহ্নপর্ব আরম্ভ হয়ে গেলেও তেমন সর্বপরিচিত হননি। তখনও রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কার্যে ব্যাপৃত, ব্রাহ্মধর্ম আলোচনায় উৎসাহী। রাজনীতি নিয়ে ও দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় নিরত।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার আদর্শের দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িক আন্দোলন থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র ছিলেন না। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব রবীন্দ্রনাথের কবিস্বপ্নকে আছন্ন করেছে। ভারতবর্ষের যে নিজস্ব পথ ও আদর্শ আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে য়ুরোপীয় মদমত্ত সভ্যতার উপরে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্য ছাড়াও পূর্ববর্তী অন্যান্য কাব্যেও প্রাচীন ভারতের শান্তিময় গৌরবমণ্ডিত জীবন সৌন্দর্যপ্রভা বিকীর্ণ করেছিল। সে- সময়কার প্রবন্ধ ইত্যাদিতেও একই সুর ধ্বনিত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ত্যাগের বাণী ও অধ্যাত্ম মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই ঐতিহ্যবোধ এবং জাতীয় আদর্শ বল সঞ্চয় করছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভারতসংস্কৃতির বাণী প্রচারে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকের ইতিহাস-চিন্তায়। ভগিনী নিবেদিতা উদাত্ত ভাষায় লিখেছেন,

I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,—a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanisads & pronounced it one shall again survey the vast accumulations of physical phenomena......*

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make out one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,—we shall lose our chance for ever and deserve to lose it.†

জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যে সব পত্র লিখেছিলেন তাতে এই আদর্শকেই বার বার উচ্চারিত হতে শুনি—

ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন।*

এই ভাষাতে এবং এই আদর্শে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরে প্রেরণার আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রও বলেছেন 'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে।' তাঁর সাধনা যে ভারত-সংস্কৃতিরই বিকাশের ধারায় এসেছে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জগদীশ-

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৫২

† পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৪৫

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৩

চন্দ্রকেও তাই তিনি এই গুরুভার বহন সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনা ব্যক্তির নয়, জাতির। এই আদর্শের দীপ্তিতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। জগদীশ-চন্দ্রের দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় রাজার দাক্ষিণ্য ছিল অকুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এমন প্রস্তাবও করেছিলেন, গভর্ণমেণ্ট যদি জগদীশচন্দ্রকে ছুটি না দেয়, তবে তিনি যেন সরকারী কাজ ছেড়ে দেন; তাঁর ব্যয়ভার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সুহৃদ্‌গণই বহন করবেন। এই আশ্চর্য সৌহৃদ্যের প্রতিদানে জগদীশচন্দ্রও বন্ধুকে বিশ্বের গুণিসমাজে পোঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন—

তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? *

তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন তাঁর সম্বর্ধনাসভায় জগদীশচন্দ্রই হলেন সভাপতি। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে সংক্ষিপ্ত সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন, বর্তমান গ্রন্থে তার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৭-এ জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত দুজনের বন্ধুত্ব অন্যনিরপেক্ষ আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দুজনের পত্রসংখ্যা বেশি নয়। প্রথম যুগের সেই আদর্শবাদ তাঁদের পত্রে আর নেই। এর কারণ বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এবং দেশের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার সঙ্গে যে যোগ রক্ষা করে চলতেন, জগদীশচন্দ্র বোধহয় সে-রকম সক্রিয় যোগ রাখতেন না; সম্ভবতঃ এই জন্যই তাঁদের চিঠিতে এই অভিমত-বিনিময় নেই। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন

রবীন্দ্রনাথের সহিত জগদীশচন্দ্রের যে নিবিড় যোগ এককালে ছিল তাহার কথা আমরা এই জীবনীমধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ক্রমে কালের ব্যবধানে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা হেতু দুই-জনের মধ্যে পূর্বের সে নিবিড়বন্ধন শিথিল হইয়া যায় তৎসত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। *

জগদীশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর [illegible] বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে (৩০ নবেম্বর) রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি বক্তৃতায় প্রথম বক্তৃতা দেন। সেই ইংরেজি বক্তৃতাটি চিঠিপত্রের ৬ষ্ঠ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেটি পড়লে বোঝা যায় কত সুন্দর ছিল বন্ধুত্ব।

ভবতোষ দত্ত

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৭৫

* রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড) পৃ ১০৪

সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ ঃ কার্তিক ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়াময় এই সংসারে সর্বত্রই মায়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ার প্রসাদেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, মরীচিকায় স্রোতস্বতীভ্রম হয়। শব্দরাশিও এই মায়াপাশ অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণে অনেক স্থলে পরস্পর অসম্বদ্ধ শব্দগুলিও সুসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষা হইতে এইরূপ কয়েকটী শব্দের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বৃথা ও ব্যর্থ

বৃথা ও ব্যর্থ এই দুইটী শব্দের শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট, অথচ ইহারা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র শব্দ। বিগত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার এইভাবে বি এই উপসর্গের সহিত অর্থশব্দের বহুব্রীহি করিলে 'ব্যর্থ' হয়, আর বৃ ধাতুর উত্তর থা প্রত্যয় করিয়া 'বৃথা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা, বাছিয়া লওয়া, ইচ্ছা করা। থা প্রত্যয়ের অর্থ প্রকার। থা প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদগুলি ক্রিয়ার বিশেষণ (adverbs of manner)। সুতরাং বৃথা-শব্দের অর্থ —স্বেচ্ছায়, অনায়াসে, সহজে বেদের বিধি অনুসারে নহে, কিন্তু অবাধে, নিজের ইচ্ছানুসারে (at one's own sweet will) আর যাহা শাস্ত্রের বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সার্থক যাহা স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মের দিক্ দিয়া তাহা নিরর্থক, ফলে ক্রমশঃ বৃথাশব্দের অর্থ হইল—নিরর্থক, অবিধিপূর্বক। তাই আমরা অমরকোষে পাই—বৃথা নিরর্থকাবিধ্যোঃ। বিশ্ব-প্রকাশকার আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—বৃথা নিষ্কারণে বন্ধ্যে বৃথা স্যাদ্বিধিবর্জিতে। ঋগ্বেদে (১।৯২।২) উষার বর্ণনায় আছে—

> উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা
> স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
> অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা
> রুষন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ॥

অরুণবর্ণ রশ্মিগুলি সানন্দে (বৃথা) উৎপতিত হইয়াছে, অতি সহজে যে গোরুগুলিকে রথে যোজিত করা যায় সেই অরুণবর্ণ গোরুগুলিকে রথে যোজিত করিয়াছেন, উষারা পূর্বের মত

আলোকের জাল রচনা করিয়াছেন, অরুণবর্ণ উষারা উজ্জ্বল আলোক সুদূরে বিস্তারিত করিয়াছেন।

বৃথা পশুহনন শব্দের অর্থ—নিজের সুখের জন্য পশুহনন, যজ্ঞাদির জন্য নহে। বৃথা মাংসভক্ষণ শব্দের অর্থ—নিজের ইচ্ছায় মাংসভক্ষণ, শাস্ত্রের নির্দেশে নহে। মনুসংহিতায় বৃথাট্যা বা বৃথাভ্রমণ ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৩।৬) আছে—ঋগ্ গাথা কুম্ব্যা তন্মিতং যজুর্নিগদো বৃথা বাক্ তদমিতম্ অর্থাৎ ঋক্ গাথা ও কুম্ব্যা (আচারশিক্ষাদাত্রী কুম্ব্যা, যেমন ব্রহ্মচার্যসি, অপোঽশান, কর্ম কুরু, মা সুষুপ্থাঃ ইত্যাদি) এইগুলি মিত। আর যজুর্মন্ত্র, নিগদ ও স্বেচ্ছায় উচ্চারিত শব্দ অমিত। এ স্থলে বৃথা শব্দের মধ্যে যেন একটু নিরর্থকতার আভাস আছে বলিয়া মনে হয়।

কালিদাসের সময় যে বৃথাশব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুমারসম্ভবে আছে—

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা
ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ॥ ৫।৪৫

"স্বর্গই যদি কামনা তোমার কাজ কি এ তপে তবে
অমরাবতী ত তোমারি পিতার রাজ্যে জানে তা সবে।
তবে কি কামনা প্রিয়পতিলাভ বৃথা এ সাধনা হায়
রত্ন আপনি খোঁজে না জহুরী, জহুরীই খোঁজে তায়॥"

উত্তররামচরিতে এই অর্থে বৃথা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্যং হরীণাং বৃথা (৩।৪৫)। যেখানে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ব্যর্থ, যেখানে বানরগণের বীরত্ব ব্যর্থ।

চাণক্য শ্লোকে আছে—

বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তস্য ভোজনম্।
বৃথা দানং সমর্থস্য বৃথা দীপো দিবাপি চ॥

একটী উদ্ভট শ্লোকে আছে—

বৃথা কথং নৃত্যসি চাতক ত্বং
ন নীলমেঘোঽয়ং গজো মদান্ধঃ।
স তাদৃশেভ্যো ন দদাতি নূনং
মতঙ্গদানং মধুপেভ্য এব॥

হে চাতক, তুমি কেন (আনন্দে বিহ্বল হইয়া) মিছামিছি নৃত্য করিতেছ? এ ত নীলমেঘ নহে, এ মদমত্ত হস্তী। সে কখন তোমার মত প্রার্থীদের কিছু দান করে না। মধুপগণের (ভ্রমর-গণের) জন্যই মাতঙ্গের দান (মদবারি)।

বৃথাশব্দের এই অর্থের পরিবর্তনে সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত। প্রথমে লোকের ধারণা ছিল, যাহাতে আত্মার আনন্দ, যাহাতে আত্মতুষ্টি তাহাই সৎ। পরে সভ্য-সমাজে স্বেচ্ছাচারের অপ্রতিহত প্রসার দেখিয়া লোকের মনে হইল—যাহা নিজের ইচ্ছায় করা যায়, যাহার পশ্চাতে শাস্ত্রের নির্দেশ না থাকে, তাহাই নিরর্থক, তাহাই অসৎ।

শ্রদ্ধা ও অদ্ধা

আপাতদৃষ্টিতে অদ্ধা শব্দটী শ্রদ্ধাশব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।, যেমন 'পবন' ও 'বনে'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন 'মানব' ও 'নব'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রদ্-শব্দের উত্তর ধা ধাতুর পরে অঙ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রদ্ধাশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্-শব্দের অর্থ হৃদয়, গ্রীক্ Kardia, ল্যাটিন Cor, Cordis, লিথুয়েনীয় শির্দিস্, জার্মান্ Herz, ইংরাজী heart ইহারা এই শ্রদ্-শব্দের জ্ঞাতি। ধা ধাতুর অর্থ স্থাপন করা, দান করা, সুতরাং শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ হৃদয়দান, বিশ্বাসস্থাপন, বিশ্বাস।

অদ্ শব্দের উত্তর প্রকার অর্থে ধা প্রত্যয় করিয়া অদ্ধা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইভাবে, অর্থাৎ সত্য সত্য ঠিক ভাবে, যথার্থভাবে। এই শব্দটী আবেস্তায় azda আকারে দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ নিশ্চয়, জ্ঞান।

যাহা সত্য হয় লোকে তাহা বিশ্বাস করে, আবার যাহা বিশ্বাস করে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে. ফলে শ্রদ্ধা ও অদ্ধা এই দুইটী শব্দের মধ্যে অর্থগত একটু সাদৃশ্য আছে, আর শব্দগত সাদৃশ্য ত সুপরিস্ফুট। কোন কোন স্থলে দেখা যায় শব্দের আদিস্থিত স লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন ইংরাজীতে আমরা পাই star কিন্তু সংস্কৃত স্তৃ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তারাকেও দেখিতে পাই। প্রাচীন স্তরশব্দ অশ্বতর, বৎসতর প্রভৃতি শব্দে তর-আকারে দৃষ্ট হয়। অনেকের মনে হয় এই-ভাবেই শ্রদ্ধার আদিস্থিত শ্ ও র্ লুপ্ত হইয়া অদ্ধা হইয়াছে। এই সব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন অদ্ধা শব্দটী শ্রদ্ধারই অপভ্রংশ। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া মনীষিবর বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর—

"সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।"

'অর্থাৎ সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যহীন আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে ইঁহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি, যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।

'এ কথা বড় অধিক দূরে গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে।'

শঙ্করাচার্যপ্রভৃতির মতে শেষ অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে ঃ এই লোক হইতে গমন করিয়া ইঁহাকেই অনুভব করিব, যাঁহার সত্যই এইরূপ জ্ঞান হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে পাইয়া থাকেন।

অদ্ধাশব্দের অর্থ যে সত্য সত্য, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে (১০ ১২।৬) আছে

যো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনা-
থা কো বেদ যত আবভূব॥

কে ঠিক ভাবে জানে, কে এখানে বলিবে, কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, কোথা হইতে এই নানাবিধ সৃষ্টি আসিল? দেবগণ এই বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ববর্ত্তীকালের পরবর্ত্তী (কেননা তাঁহারাও সৃষ্টির অংশ।) তাহা হইলে কে জানে কোথা হইতে ইহা আসিল। কালিদাসের রঘুবংশে (১৩।৬৫) আছে—

অদ্ধা প্রিয়ং পালিতসঙ্গরায়
প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্
সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে ।।

যুদ্ধে খরপ্রভৃতি রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ যেমন (রাক্ষসাক্রমণ হইতে) সুরক্ষিত তোমাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সাধুও প্রতিজ্ঞা-পালনপূর্বক প্রত্যাগত আমাকে, অনুপভুক্তা রাজলক্ষ্মীকে সত্যসত্যই প্রত্যার্পণ করিবেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ভামিনীবিলাসে আছে—

হালাহলং খলু পিপাসতি কৌতুকেন
কালানলং পরিচুচুম্বিষতি প্রকামম্।
ব্যালাধিপং চ যততে পরিরব্ধুমদ্ধা
যো দুর্জনং বশয়িতুং তনুতে মনীষাম্ ।

যিনি দুর্জনকে বশ করিতে মানস করেন তিনি সানন্দে কালকূট বিষ পান করিতে ইচ্ছা করেন, প্রাণ ভরিয়া প্রলয়কালীন অগ্নিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, সত্য সত্যই সর্পরাজকে আলিঙ্গন করিতে প্রযত্ন করেন। রসগঙ্গাধরে আছে—

প্রণিপত্য বিধে ভবন্তমদ্ধা
বিনিবদ্ধাঞ্জলিরেকমেব যাচে।
জনুরস্তুকুলেক্রষীবলানা-
মপি গোবিন্দপদারবিন্দভাজাম্॥

সুতরাং দেখা গেল শ্রদ্ধা ও অদ্ধার সম্বন্ধ প্রাতিভাসিক পারমার্থিক নহে।

বাব ও বাবা

তৈত্তিরীয়সংহিতা-প্রভৃতি গ্রন্থে অবধারণার্থক বা বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত বাব এই নিপাত মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত 'বা' এই নিপাতের দ্বিত্ব করিয়া বাব হইয়াছে মনে হয়। ইহার সহিত বাংলার বাবাশব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের গীতা ব্যাখ্যা ভূমিকায় ১৮৮ পৃষ্ঠে দেখা যায়— কোথাও বাব অর্থাৎ বাবা বা বৎস বলিয়া শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন, যেমন অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে আছে—মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোহধিষ্ঠানম্। আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ

হে ইন্দ্র, এই শরীরটী মরণধর্মী, সর্বদা মৃত্যুদ্বারা গৃহীত। সেই অমরণধর্মী ও অশরীরী আত্মার ইহাই অধিষ্ঠান। শরীরবিশিষ্ট আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয়কর্তৃক আক্রান্ত

(সুখ ও দুঃখের অধিকারভুক্ত) কেন না যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ প্রিয় বা অপ্রিয়ের বিনাশ হয় না (সুখ দুঃখের পাশ হইতে মুক্তি নাই)। শরীরশূন্য হইলেই প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্যের মধ্যস্থিত অপাদাদিস্থিত সম্বোধন পদ অনুদাত্ত হয়। বাবশব্দের অনুদাত্ত হওয়া ত দূরের কথা একটী স্বরের স্থলে ইহার দুইটী স্বরই উদাত্ত। সুতরাং ইহার অর্থ কিছুতেই বাবা বা বৎস হইতে পারে না।

পর ও অপর

সংস্কৃত ব্যাকরণে সর্বনামসংজ্ঞক শব্দের তালিকায় পর ও অপর এই দুইটী শব্দই পঠিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পর্যাপ্ত অপর্যাপ্ত, কুমারী অকুমারী প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ন্যায় পর অপর এই দুইটী শব্দও একার্থবোধক। মনে হয় এস্থানে অ-টী নিষেধার্থক নহে, অবধারণার্থক (intensive)। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। পরশব্দের প্রাথমিক অর্থ দূর, ইংরাজী far ও fore শব্দের ইহা জ্ঞাতি। দূর হইতে অর্থ হইল দূরবর্ত্তী, পরবর্ত্তী, ভবিষৎ, তাহা হইতে অর্থ হইল অন্য।

এক—নিকটবর্ত্তী, পর—দূরবর্ত্তী অর্থাৎ অন্য, তাহা হইতে অর্থ হইল অপরিচিত, তাহা হইতে অর্থ হইল শত্রু। অন্যদিকে আবার দূর, দূরতর হইতে অর্থ হইয়াছে শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ—অবর। পৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া (ইংরাজী ferry) তাহা হইতে 'পর' শব্দ আসিয়াছে।

ঋগ্বেদে (২।১২।৮) আছে—

> যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে
> পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
> সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা
> নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ।

যাঁহাকে উচ্চশব্দকারী সেনাদ্বয় দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী উভয় শত্রুই একত্র হইয়া বিবিধভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, দুই জনে একই রথে আরোহন করিয়া যাঁহাকে পৃথগ্‌ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

অপ-শব্দের উত্তর রপ্রত্যয় করিয়া অপর হইয়াছে। ইহা পূর্বশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার অর্থ—পশ্চাদ্বর্তী, পরবর্তী কালের, তাহা হইতে অর্থ হইল—পরবর্তী অন্য। ঋগ্বেদে আছে (১।১২৪।৯)—

> আশাং পূর্বাসামাহসু স্বসৃণা-
> মপরা পূর্বামভ্যেতি পশ্চাৎ।
> তাঃ প্রত্নবন্নব্যসীর্নূনমস্মে
> রেবদুচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ॥

এই প্রাচীন ভগিনীগণের মধ্যে পূর্ববর্তিনী প্রতিদিন পরবর্ত্তিনীর পশ্চাতে আগমন করেন। এই নূতন ঊষারা পূর্বকালের ন্যায় এক্ষণেও আমাদিগের উপর ধন ও সুদিন বর্ষণ করুন।

উপম ও উপমা

এই শব্দ দুইটী প্রথম দর্শনে সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয়, কারণ উপমাশব্দ বহুব্রীহি সমাসের

শেষে থাকিলে উপম আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটীর মধ্যে কোন জ্ঞাতিত্ব নাই। উপ-শব্দের উত্তর ম (তম) প্রত্যয় করিয়া উপমশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ—উচ্চতম। উপ-পূর্ব্বক মা ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় করিয়া উপমা হইয়াছে। ইহার অর্থ সাদৃশ্য।

লক্ষ্মী ও Lucky

সংস্কৃত লক্ষ্মী-শব্দের সহিত ইংরাজী Luck বা Lucky শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে Lucky শব্দটী লক্ষ্মীর অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানকালে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে কাহার না বাসনা হয়? ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের কথাও প্রায়ই শোনা যায়। লক্ষ্মী বলিলে আমরা সম্পদ্ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝিয়া থাকি। লক্ষ্মীশব্দের প্রাথমিক অর্থ কিন্তু চিহ্ন, লক্ষণ, নিমিত্ত। 'পাপা লক্ষ্মী' বলিতে অশুভ নিমিত্ত (evil omen) ও 'পুণ্যা লক্ষ্মী' বলিতে শুভ নিমিত্ত বোঝাইত। ক্রমশঃ লক্ষ্মী-শব্দের অর্থ হইল—সৌভাগ্য, সম্পদ, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বেদে যিনি উষা ছিলেন, পুরাণে তিনি লক্ষ্মী হইলেন। ইংরাজীতে luck শব্দের প্রথমতঃ অর্থ ছিল দৈব, ভাগ্য, যেমন good luck, bad luck, hard luck, try one's luck, as luck would have it ক্রমশঃ অধিকাংশ স্থানেই শব্দটী সৌভাগ্য অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল, যেমন to have no luck, same people have all the luck, to be in luck, to be off one's luck, for luck ইত্যাদি। Luck শব্দটী জার্মান্ ভাষায় Glueck আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবত প্রাচীন জার্মান lockon (আকর্ষণ করা, ভুলাইয়া আনা) হইতে Luck আসিয়াছে। লক্ষ ধাতু হইতে লক্ষ্মী আসিয়াছে। লক্ষ-শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। লক্ষ-শব্দের অর্থ যাহা কিছুতে আটকাইয়া থাকে অথবা আটকাইয়া দেওয়া হয়, চিহ্ন। তাহার পর অর্থ হইল যাহা লক্ষ করিয়া লোকে প্রবৃত্ত হয়, পণ। সেকালে সম্ভবতঃ লক্ষ টাকা পণ হইত। ক্রমশঃ লক্ষ শব্দের অর্থ হইল শত সহস্র।

Character ও চরিত্র

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি সংস্কৃত চরিত্র ও ইংরাজী character একই মূল শব্দের বিভিন্ন রূপ, কেন না শব্দ দুইটীর মধ্যে অর্থগত বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শব্দ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

চর্ ধাতুর অর্থ —বিচরণ করা, চলা। এই চর ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ইত্র প্রত্যয় করিয়া চরিত্র হইয়াছে। অর্থ—যাহার দ্বারা বিচরণ করা যায়, অর্থাৎ পা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ— চরণ। ঠিক এইভাবে গত্যর্থক ঋ ধাতুর উত্তর ইত্রপ্রত্যয় করিয়া অরিত্র হইয়াছে, অর্থ যাহার দ্বারা নৌকা গমন করে অর্থাৎ দাঁড়। গ্রীক্ ভাষায় ইহা আরোত্রোন্ ও লাটিন ভাষায় আরাত্রুম্ আকারে দৃষ্ট হয়। অর্থ—লাঙ্গল। বহনার্থক বহ্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া বহিত্র হয়, অর্থ—যাহা বহন করে অর্থাৎ গাড়ী। (Lat. vehiculum ইংরাজী vehicle.) ছেদনার্থক লূ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া লবিত্র হইয়াছে, অর্থ—যাহা দ্বারা ছেদন করা যায়, কাটারি। খন্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া খনিত্র হইয়াছে, অর্থ—যাহা দ্বারা খনন করা যায়। পাণিনি ইহাদের জন্য সূত্র করিয়াছেন অর্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ ৩।২।১৮৪

সুতরাং দেখা গেল চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ চরণ। বেদে আমরা এই অর্থেই চরিত্র-শব্দের প্রয়োগ পাই। যেমন, চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্—পাখীর ডানার মত বিশ্পলার পা

ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার পর চরিত্র শব্দের অর্থ হইল—কার্যক্ষেত্রে বিচরণ অর্থাৎ আচরণ, কার্যকলাপ, ইংরাজীতে যাহাকে behaviour বা conduct বলে। সংস্কৃতে character বা স্বভাব অর্থে চরিত্র শব্দ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এই অর্থে কখন কখন চারিত্র শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই জন্য বাংলায় আমরা বলি স্বভাব চরিত্র--character and conduct.

ইংরাজীতে character শব্দটী গ্রীক্ খর্ ধাতু (kharassein) হইতে আসিয়াছে। ধাতুটীর অর্থ ধারাল করা, অঙ্কিত করা, ক্ষোদিত করা। এই ধাতুনিষ্পন্ন গ্রীক্ kharakter শব্দের অর্থ—মুদ্রিত চিহ্ন, চিহ্ন। ইহা লাটিনে character হইল। অর্থ—দাগ দিবার যন্ত্র, চিহ্ন, প্রকার, রীতি। ইংরাজীতেও প্রথমতঃ চিহ্ন, চিহ্ন অর্থে শব্দটী ব্যবহৃত হইত। বর্ণমালা বা অক্ষরকে এখনও character বলা হয়। তাহার পর অর্থ হইল বিশেষক চিহ্ন, বিশেষ গুণ। তাহার পর অর্থ হইল—বিশেষ গুণসমূহের সমষ্টি, স্বভাব, প্রকৃতি।

Butter ও Buttery

Butter (মাখন) ও Buttery (খাদ্য রাখিবার স্থান) এই দুইটী শব্দের জন্মগত কোন সম্বন্ধ নাই। যেখানে কাকজাতীয় rook-এরা থাকে তাহাকে rookery বলা হয়, যেখানে কাটিবার যন্ত্রপাতি থাকে তাহাকে cutlery বলে, যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে, আর যেখানে বোতল, পিপা, প্রভৃতি থাকে তাহাকে buttery বলে! যেখানে শুধু butter বা মাখন থাকে তাহাকে buttery বলে না, pantry-তেই butter থাকে। সুতরাং butter শব্দের সহিত buttery-র কোন সম্বন্ধ নাই। Bottle ও butler শব্দ Buttery-র জ্ঞাতি। ফরাসী ভাষার bouteillerie (যে স্থানে বোতল পিপা প্রভৃতি রাখা হয়) হইতে Buttery আসিয়াছে।

Pan ও Pantry

অনেকের ধারণা যেখানে pan বা কড়া থাকে তাহাকে pantry বলে, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ল্যাটিন panetus শব্দের অর্থ ছোট রুটি, সুতরাং যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে।

সংস্কৃত গবেষণার দু'একটী দিক

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরা-বাঁধা পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট বেষ্টনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যখন গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁদের অনেকেই গবেষণার বিষয় নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়ে যান। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের যাঁরা প্রজা, তাঁদের তো এ ভাবনার কোনও কারণ দেখি না। একদিকে বিগত দুই শত বৎসরে ভারতে অতি সামান্য, ভারতের বাইরে সংস্কৃত বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে--কিন্তু হাজার হাজার বৎসরের এ প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য—অধ্যেতার গবেষণার জন্য সত্যিকার ধ্যান ও নিষ্ঠা থাক্‌লে, পরিশ্রম তৎপর হলে—এখনও শত শত বিষয়ে অতি অভিনব পরমাশ্চর্য ফল লাভ করা যায়।

এক কথায় বল্‌তে গেলে ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ কাল থেকে বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ সময় পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের যে পরিপুর্তি ঘটেছে, সে বিষয়ে তো আমরা একান্ত উদাসীন শুধু নই, এখনও এক মিথ্যা ধারণার সম্পূর্ণ বশবর্তী হয়ে আছি। সাহেবেরা বলে দিয়েছেন—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে সংস্কৃতের কোনও সমুন্নতি ঘটেনি--সে কথাকেই আমরা বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছি। মহীধর বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা; বাঙ্গালী স্বপ্নেশ্বর —আমাদেরই বাসুদেব সার্বভৌমের পৌত্র—ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রপঞ্চয়িতা—শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের টীকাকার; শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক গঙ্গাদাস সেন; আলঙ্কারিক জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ—এঁরা কোন্ যুগের লোক,—তাও আমরা খোঁজ রাখি না। ভারতের প্রত্যেকটী প্রদেশে ভারতের মধ্যদেশে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম-সূফী ধর্মের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে যে আলোড়ন-বিলোড়ন হলো--যুগযুগন্তকারী ঘটনা ঘটলো, তার কোনও স্থির সন্ধান আমাদের গবেষণার আলোকে এখনো ধরা পড়্‌লো না।

আমাদের মনকে সমস্ত পূর্ব সংস্কার থেকে বিমুক্ত করে একবার বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার—কোন্ রসের আস্বাদন লাভ করার জন্য মহম্মদ শাহ সংস্কৃতে সঙ্গীত-গ্রন্থ সঙ্গীতমালিকা, শেখভাবণ অল্লা উপনিষদ্, সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভারতের সর্বপ্রকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও সংস্কৃতরসিক খান-খানান আব্দুল রহমান খেট-কৌতুকাদি সংস্কৃত গ্রন্থ ত্রয়, আব্দুল রহমান সন্দেশ-রাসক এবং মহম্মদ দারা শুকোহ সংস্কৃত সমুদ্র-সঙ্গম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সঙ্গীতের মহাসাধক মহম্মদ সাহ সঙ্গীত-মালিকার প্রারম্ভেই করেছেন নৃত্যাধীশ শঙ্করকে প্রণাম। সম্রাট শাহজাহানের চোখের মণি, সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্য অধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র দারা শুকোহ ১৬৫৭ সালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সদা জাগ্রত রাখ্‌বার জন্য—যা কোনও কালে কেও করেনি, তাই করলেন। সমুদ্র-সঙ্গম গ্রন্থে বল্‌লেন তিনি—আমি দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান শ্রেষ্ঠ সুধীজনের সঙ্গে "গোষ্ঠীমকরবম্"—গোষ্ঠী করলাম, আমার হিন্দু গুরু বাবালাল এবং মুসলমান গুরু সেখ অজহারের সঙ্গে নিরন্তর ধর্মালাপ করলাম। এবং হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র অহর্নিশ আলোচনা করলাম। তারপর গভীর মননের পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে স্বরূপ অবাপ্তি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে কোনও ভেদ নাই।—"স্বরূপাবাপ্তৌ ন কঞ্চন ভেদমপশ্যম্"। আমরা এও জানি যে এই রাজপুত্র যে উপনিষদের সুললিত সারগর্ভ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, তাই পরে ওলন্দাজ ভাষায় অনূদিত হয়ে তাৎকালিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সো পেনহাউয়ার প্রভৃতিকে কেবল বিমুগ্ধ করেনি, এই উপনিষৎ-

সমূহকেই জ্ঞানের ও শান্তির শ্রেষ্ঠ আকর বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। উপনিষদ্-গ্রন্থের ভূমিকাতেও দারা শুকোহ-ও একই মত প্রাচার করেছেন। অথচ এই মনীষিশ্রেষ্ঠই "সমুদ্রসঙ্গম" গ্রন্থ লেখার দু'বৎসর পরে ১৭৫৯ সালে দিল্লীর রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘাতকের হাতে "কাফের" আখ্যায় বিভূষিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আকবর যে সৃষ্টির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—তাঁরি প্রপৌত্র দারা শুকোহে তাঁর সৃষ্টি-সাধনা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা' সইলো না। ভারতের মধ্যযুগের অপূর্ব সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কেন এলো গেলো—তা' ভেবে দেখ্‌বার সময় এখনও পর্যন্ত আমাদের হলো না।

দারা-শুকোহ পরমধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন, তা তিনি বারে বারে ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু তিনি দু'চোখ খোলা রেখেছিলেন; অন্ধ গোঁড়ামিকে স্থান দেননি। এত বড় মহাপ্রাণ যে যুগে জন্মেছিলেন, তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে এবং অব্যবহিত পূর্ব কালে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল আমাদের দেশে? এক পূর্ববঙ্গেই তখন একশতের অধিক হিন্দু-সংস্কৃতি ভাবাপন্ন মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মহিমা কীর্তন করছেন। সেই যুগের চরগ্রামের সাধক কবি সৈয়দ সুলতান যেমন একদিকে "নবীবংশ" গ্রন্থ রচনা করছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে "যোগতত্ত্ব-নিবন্ধ" এবং বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করছেন। দারা শুকোহের ভ্রাতা সুজা নানা চক্রান্তে আরাকানে প্রাণ হারান। যে মহাত্মা দৌলৎ কাজী তাঁর সঙ্গে সে সময়ে আরাকানে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি আলাওলের গুরু—সেই দৌলৎকাজিও "লেফ-চন্দ্রাণী"তে বারমাস্যায় বল্‌ছেন—

"ভাদ্রে মাসি চন্দ্রমুখী সুচরিতা কামিনী
একাকী বসতি অতিঘোরম্।
অধরো মধুরো তাম্বুল বিনা ধূসরো
নিচোল চকোর-আঁখি কোরম্
ময়নাবতি! ত্যজ নিজ মান পরিখেদম্॥
ভণতি কাজী দৌলত দূতী চাটুপাটুকৃত
সতীকর্ণে অট বিষমানম্।
লস্কর গুণমণি দানে কল্পতরু
শ্রীযুত আসরফ খানম্॥

পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ চট্টগ্রাম—বেরসাদের মুসলমান কবিবৃন্দের লেখা এ রকম সংস্কৃতবহুল শুধু নয়, স্থানে স্থানে পূর্ণ সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত। প্রায় দুই শত মুসলমান বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি সাহিত্যিক বঙ্গদেশে এই সাধনায় বিভোর, বঙ্গের বাইরে অন্যান্য বহু প্রদেশেও সেই সাধনা সমভাবে অগ্রসর হচ্ছিল।

আজ সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে ও সমস্ত সংস্কৃত রচনার মূল্যনির্ধারণের এবং তার প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয়ের দিন এসেছে। মুসলমান কবিদের সংস্কৃতবিষয়ক রচনা, সংস্কৃত-বহুল বা পূর্ণ সংস্কৃত রচনা কোন্ ভাবসম্পদের বার্তা ঘোষণা করে? কিসে তা নষ্ট হলো? তার পুনরুদ্ধারের উপায় কি?

সংস্কৃত কোনও সম্প্রদায় বিশেষের বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি নয়। ভারতের বা বহির্ভারতের প্রত্যেক জাতির পূর্বপুরুষদের অস্থিমজ্জা এ পুণ্যতোয়া সংস্কৃতভাগীরথীধারার

মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সংস্কৃত গবেষণা আরো অগ্রসর হলে এর পূর্ণতর রূপ প্রকটিত হবে। হাজার হাজার জাতির মহাযান সংস্কৃতগ্রন্থ তিব্বত, চীন, কোরিয়া, মধ্য এসিয়া, জাপান, মালয়দ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অনুবাদের মাধ্যমে বা ধর্ম-দর্শন প্রচারণার সৌকর্যার্থে প্রবন্ধ নিবন্ধের আকারে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। এখনও অনেক রয়েছে অনাবিষ্কৃত। তারপর দেড় হাজার—দুই হাজার বছর ধরে ভারতীয় সাহিত্য এ সকল এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে যে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণা জাগিয়েছে এবং নিজেও অনেক সময় অংশতঃ রূপান্তর লাভ করেছে— তার ইতিহাসও কে নির্ণয় করছে? এই অতি মনোরম বিষয় সংস্কৃত-গবেষণার আর একটী দিক। সমকালীনের অন্য কোনও পরবর্তী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ—কাশ

শরতের আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে শরতের কাশ। নীল আকাশে শুভ্র দুগ্ধফেননিভ মেঘখণ্ড আর নদীর তীরে বালুর চরে, সবুজ মাঠের ধারে শরৎ মেঘের স্বপ্ন-মাখা কাশ ফুল। কাশের সৌভাগ্য যে এই পৃথিবীর দুজন সেরা মহাকবির—কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের—মনহরণ করতে পেরেছে সে। মালব্যের কবি আর বাংলার কবি, দুজনেই তাঁরা কাশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। শরতের কতো গানে, কতো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাশকে অপরূপরূপে চিরন্তন করে বেঁধে রেখেছেন। কালিদাসও কাশকে কম ভালবাসা ঢেলে দেন নি, কম মাধুর্যের সঙ্গে তার ছবি আঁকেন নি। 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে ও 'ঋতুসংহারম্' কাব্যে কাশ ফুলের চমৎকার ছবি এঁকেছেন কালিদাস। 'কুমারসম্ভবম্'-এর সপ্তম সর্গে কবি পার্বতীর বিবাহ সজ্জার বর্ণনা করে বল্‌ছেনঃ—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়-বস্ত্রা।
নির্বৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ।। ১১ ।।
মঙ্গল স্নানে নির্ম্মল দেহে বিবাহের রাঙা বাস. পরিলেন প্রিয় মিলনের তরে সতী,
শুভ্রকাশের আভরণ-পরা বারিধারা-অভিসিক্তা, ধরণীর মত রাজিলেন পার্বতী।

'ঋতুসংহারম্' কাব্যের তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কাশের কথা বারবার জেগেছে কবির মনে। নব বধূ সাজে শরৎ এসেছে, তার রূপের বর্ণনা করে কবি বলছেন ঃ—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরাতনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যাঃ ॥ ১॥
শুভ্র কাশের অংশুক-পরা বিকচ-কমল-আননা মরালের ধ্বনি নূপুরেতে রণরণিয়া,
পক্ক ধানের শীষসম অতি-উজ্জ্বল-হেম-বরণা এসেছে শরং নববধূ সম সাজিয়া।

শরতে আকাশ ধরণী, বনতল, সায়র ও নদীজল কি সাজে সেজেছে, তার বর্ণনা করে কবি বলছেন—কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।

সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্ব্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২॥
কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি, মরাল-শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম ফুলেতে শুভ্র বনানী, মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্র-বরণী।

শরতের সাজের বর্ণনা করে ঋতুসংহারের তৃতীয় সর্গে কবি বলছেনঃ—

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬॥
নবীন কাশের শ্বেত অংশুক পরি
বিকশিত নীল-উৎপল-আঁখি বিকচপদ্ম-আননা,
মদ-উন্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত
শরৎ-লক্ষী শুভ্র কুমুদবরণা ।।

ছয়—কুসুম্ভ

রক্ত-বরণ কুসুম্ভ হোলো বসন্তের ফুল। এ কালে নামের যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে আরো মিষ্টি কুসুম নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে বনানীতে আগুন লেগেছে। সেই আগুনের রূপ দেখে লাল কুসুম্ভ ফুলকে স্মরণ করেছেন কবি। কুসুম্ভ ফুলকে তিনি ব্যবহার করেছেন সেই দাবানলের বর্ণনায়। 'ঋতুসংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে এই বর্ণনাটি আছে ঃ—

বিকচ নবকুসুম্ভ স্বচ্ছসিন্দুরভাসা প্রবলপবনবেগোদ্ভূত বেগেন তূর্ণম।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪॥

নব-কুসুম্ভ-পুষ্প-বরণ সিন্দুর সম রাঙা
আগুন প্রবল পবনে দ্বিগুন জ্বলে,
ব্যাকুল অনল অটবীলতারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে
ধরণীরে ঘিরি দাহ করে পলে পলে।

তারপরে এসেছে বসন্ত দিন। তখন কি কুসুম্ভ ফুলকে ভুলে থাকা যায়?

বিলাসিনীদের বসনের দিকে তাকালেই তো কুসুম্ভের অবদান চোখে পড়ে। বসন্তের দিনে বিলাসিনীদের রূপ-বর্ণনা করে 'ঋতুসংহারম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস লিখেছেন ঃ—

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগ-গৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তনমন্ডলানি ॥ ৪॥

রাঙায়ে দিয়েছে বিলাসিনীদের চারু নিতম্ব, মরি,
নব কুসুম্ভে রাঙানো বসন আজি বসন্ত-দিনে,
কুঙ্কুমে রাঙা লঘু উত্তরী স্তন-মন্ডলোপরি
অপরূপ কোন্ সুষমার সুর বাজিছে দেহের বীণে।

সাত—লবঙ্গ

কালিদাসের বড়ো প্রিয় ছিলো মালব্য ও মলয়স্থলী। পুগ, তমাল ও চন্দনের মতো লবঙ্গও হচ্ছে সেই মলয়স্থলীর গাছ।

মলয়স্থলীতে লবঙ্গ ফুলের রেণু-মাখা বাতাস কেমন করে প্রেয়সী নারীর ক্লান্তি দূর করতো তার মনোহর বর্ণনা আছে—কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম্ সর্গে—

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতেধূর্তচন্দনলতঃ প্রিয়াক্লমম্।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিল ॥ ২৫॥

লবঙ্গ ফুল-কেশর মাখিয়া চন্দনবন কাঁপায়ে দখিন বায়,
চাটুকার সম ঘুচাতো প্রিয়ার সুরত-ক্লান্তি মলয়স্থলী-ছায় ।।

লবঙ্গ ফুল ফোটে সাগরের দ্বীপে। সেখান থেকে সেই ফুলের গন্ধ ভেসে আসে তাল বনানীর মর্মর-মুখরিত সিন্ধুতীরে। রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস সেই সিন্ধুতীরের বর্ণনা করেছেন—অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্ম্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত স্বেদলবামরুদ্ভি ॥ ৫৭॥

তালবনানীরমর্ম্মরধ্বনিমুখর সিন্ধুতীরে
প্রিয় সাথে বালা বিহর পরম সুখে,
সাগরদ্বীপের লবঙ্গফুল-গন্ধ বহিয়া আনি
ঘুচাবে পবন সুরত-ক্লান্তি বুকে।

আট—পুন্নাগ

পুন্নাগ হলো আমাদের নাগকেশর। এই ফুল সেদিন সাধারণ-আদৃত ছিলো বলে তো মনে হয় না। আমাদের কালেও নয়। অথচ সাধারণ-উপেক্ষিত এই ফুল কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতির দাক্ষিণ্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় নাগকেশর বারে বারে দেখা দিয়েছে। যারা চলে যাবার সময় প্রাণকে উদাস করে পাগল করে দিয়ে যায় তাদের কথা যে গানটিতে বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই গানে সেই "চলে-যাওয়ার দল"-এর মধ্যে যে "নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলোর সাথে মিতা" সেও স্থান পেয়েছে।

কালিদাস নাগকেশরকে তাঁর কাব্যে একটি বার মাত্র স্থান দিয়েছেন আর সেও নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। নাগকেশরের কোন মর্যাদা কবির কাছে ছিলো না। 'রঘুবংশম্'-এর চতুর্থ সর্গে কালিদাস মত্তহস্তীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন ঃ—

খর্জুরীস্কন্ধনদ্ধানাং সদোদ্‌গারসুগন্ধিষু।
কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ।। ৫৭ ।।
খেজুর-স্কন্দে বন্ধ মত্ত-বারণ-গণ্ড হতে,
অবিরল ধারে মধুর-গন্ধ মদধারা পড়ে ঝরি,
সেই সুগন্ধে আকুল হইয়া ব্যকুল ভ্রমর দল
পুন্নাগ ত্যজি বসিছে আসিয়া তাদের কপোলোপরি।

নয়—শেফালিকা

নাগকেশরের প্রতি উপেক্ষা না হয় ক্ষমা করা গেলো, কিন্তু শিউলির প্রতি কবির যে অনাদর, এটা কি করে ক্ষমা করা যায়? যে ফুল তার গন্ধ দিয়ে রূপ দিয়ে কঠিন-হৃদয় অ-ভাবুকেরও প্রাণের বন্ধ আগল খুলে অন্তরে পশে সেই শিউলিকে শুধু বারেকের তরে আস্‌তে দিলেন কালিদাস তাঁর কাব্যলোকে, এ বড়ো আশ্চর্য বলে ঠেকে। মনে হয় যাঁরা উপমার বস্তুগুলি পর্যন্ত ধরে বেঁধে ঠিক করে দিতেন কাব্যের সেই আচার্যদের কাছে শিউলির কোনো আদর ছিলো না কালিদাসের কালে। আর বস্তুতান্ত্রিক রাজদরবার আর বিলাসিনীরা, সূক্ষ্ম জিনিসের কদর করা উভয়েরই প্রকৃতিগত নয়। বেচারী কালিদাস! কাব্যের সংস্কার আর রাজদরবার ও বিলাসিনীদের স্থূল রুচি-বোধ—এই দুইয়ের দম-বন্ধ-করা বন্ধনের মধ্যে তাঁকে কাব্য-সৃষ্টি করতে হোতো। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হোলে কি এই সেই আট-ঘাট-বাঁধা কালের বন্ধনের মধ্যে এমন সব অনুপম সৃষ্টি তিনি কখনো করতে পারতেন?

'ঋতুসংহারম্'-এর তৃতীয় সর্গে শরতের উপবন বর্ণনা করেছেন কালিদাস। সেই বর্ণনায় কবি শিউলিকে ডেকে এনে যতো সংক্ষেপে তার সমাদর সেরে নিয়ে সরে যেতে পারেন তাই করেছেন। বল্‌ছেন কবি—

শেফালিকাকুসুমগন্ধমনোহরাণি স্বস্থস্থিতাণ্ডজকুলপ্রতিনাদিতানি।
পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি প্রোৎকন্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম ।। ১৪ ।।
শেফালি ফুলের রঙে রাঙা উপবনে
পাখির কাকলীগান উঠিয়াছে বাজি,
হরিণী-নয়ন-কমল পাইছে শোভা
পুরুষ-চিত্ত উতলা করিছে আজি।

দশ—কহ্লার

পদ্ম ও কুমুদ এরা তো অলংকার শাস্ত্র ও রাজদরবারের রুচির নির্দেশে ফুলেদের মধ্যে

অভিজাত বংশীয়। তা'ছাড়া রূপের দিক থেকে তাদের নিজস্ব দাবীও কিছুটা আছে বৈকি। তবে যতোটা প্রাধান্য তাদের দেওয়া হয়েছে ততোটা গৌরব পাবার উপযুক্ত তারা কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ আছে। কবিরা সংস্কার বশে পদ্ম বলতেই আত্মহারা, তুলনা করতে গেলেই পদ্ম এসে হাজির হয়। কালিদাসের কাব্যে পদ্মের ছড়াছড়ি—তবে সেটা লাল পদ্ম। শাদা পদ্ম, নীল পদ্ম তেমন সমাদর পায় নি তাঁর কাব্যে। 'ঋতুসংহারম্'-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কহ্লার, শাদাপদ্ম কোনো রকমে তার স্থান করে নিয়েছে। কবি বল্‌ছেন ঃ—

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্ব্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিক শীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ ।। ১৫ ।।

পদ্মকুমুদ কহ্লারে কাঁপাইয়া তাদের পরশে সুশীতল সমীরণ,
পত্রলগ্নশিশির বহিয়া আনি করে বায়ু আজ ব্যাকুল সবার মন।

এগারো—স্থলকমলিনী

একটি কবিতাতেই স্থলপদ্ম যে গৌরব লাভ করেছে 'মেঘদূতম্'-এ তা অন্য ফুলগুলির ভাগ্যে কচিৎ ঘটেছে। অলকায় প্রিয়ার ভবনে প্রিয়াকে কিভাবে মেঘ দেখ্‌তে পাবে তার বর্ণনা যক্ষ মেঘকে দিচ্ছেন। যক্ষ প্রিয়ার আর যে সব বর্ণনা 'মেঘদূতম্'-এ আছে, সেগুলি সবই শুধু নারী দেহের বর্ণনা। এই কটি লাইনে দেহের সঙ্গে মন এসে মিশেছে। দেহের ও মনের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেছে। নিছক্ দেহের গন্ধ একেবারেই নেই এই লাইনগুলিতে, আছে শুধু স্নিগ্ধ বেদনার মধুর প্রশান্তি।

'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘের সেই কবিতাটি হচ্ছে—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখম্ সংনিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাত্সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ৩১॥

বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ প্রবেশি কক্ষে জাগাবে যখন অমৃত-শীতল-নেশা,
অতীতের প্রীতি স্মরি তার পানে ধাইবে সহসা প্রিয়ার দুইটি আঁখি
কি পরিয়া মনে থামিবে সহসা, বেদনা-সিক্ত ঘন পল্লবে নয়ন দুইটি ঢাকি,
মনে হবে যেন বাদল দিনের স্থলকমলিনী জাগা-না-জাগায় মেশা।

বারো—কুন্দ

কুন্দ কবির সোহাগ পেয়েছে। 'মেঘদূতম্', 'ঋতুসংহারম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', এই কাব্য ও নাটিকাগুলিতে কুন্দ তার সৌন্দর্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে মহাকবির কাছ থেকে। চর্মণ্বতী নদী পার হয়ে মেঘ যখন দশপুর জনপদে যাবে তখন দশপুর বধূদের ভ্রূবিলাসচাতুরী দেখবার সৌভাগ্য তার হবে। 'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘে এই দশপুরবধূদের অপাঙ্গ-লীলার অপূর্ব বর্ণনা আছে। কবি বলছেন—

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমানাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসত্কৃষ্ণশারপ্রভানাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্দশপুরবধূনেত্রকৌতুহলানাম্ ।।৪৭ ।।

চর্মণ্বতী পার হয়ে মেঘ, যেও আনন্দে সেই দশপুর পানে
যেথা বধূদের ভ্রূলতা-বিলাস মনোহরা লতা সম শোভে সর্পিলা,

যবে কুতুহলে তারা কালো-পল্লব আঁখি তোমা পানে হানে,
মনে হয় যেন নব-প্রস্ফুট শুভ্র কুন্দফুলে কালো মধুপের নয়ন-ভোলানো লীলা।

তারপরে মেঘ যখন অলকায় পৌঁছবে তখন যে রমণীদের দেখবে তারা যে সৌন্দর্যে আর সব নারীদের হার মানাবে অন্তত কাব্যের ও যক্ষের খাতিরে সেটা তো আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি। কাব্যটি হচ্ছে বিরহী যক্ষ ও তার প্রিয়াকে নিয়ে। যে প্রিয়ার জন্যে যক্ষের এতো ব্যাকুলতা, যার জন্যে মেঘকে পর্যন্ত সে সন্দেশবাহীর কাজে লাগিয়েছে সেই প্রিয়া তো অলকার নারী। তাই অলকা-র সাধারণ নারীরা যে কি অপরূপ সুন্দরী সেটা তো জানাতে হবে, তবে তো তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তমা সেই যক্ষ-প্রিয়ার অতুলনীয়তা আমাদের বোধগম্য হবে। তারপরে যাকে দিয়ে খবর পাঠাতে হবে, অলকাপুরী-সুন্দরীদের অনুপম রূপের বর্ণনা দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করা তো প্রাচীন ও নবীন কোনো চাতুর্য-বিধি-বহির্ভূত নয়। এই নিরপরাধ ডিপ্লোমাসির জন্যে যক্ষকে দোষী করা কোনো মতেই চলে না। 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে অলকা-পুরবাসিনীদের এই মোহন বর্ণনা যক্ষ করছেন—

হস্তেলীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ৬৫ ॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব-কদম্ব দোদুল।

এ ছাড়াও 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে "আশ্বাশৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং শখীম্‌তে ইত্যাদি যে চারটি লাইন আছে তাতেও "প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলংজীবিতং ধারয়েথা"।
এই লাইনে কুন্দ ফুলের বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। তাই এই শ্লোকটির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত দিলুম।

শীতের অবসানে বসন্তের কুন্দ ফুল দেখা দিয়েছে। ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় কালিদাস কুন্দের শুভ্রতাকে বিলাসিনী নারীর হাসের মতো শুভ্র বলে বর্ণনা করেছেন। বিলাসিনী নারীর হাসি যে কি করে শুভ্র বলে ঠেকেছিলো মহাকবির চোখে তা বোঝা গেলো না। কুন্দ লাঞ্ছিত হোলো এই ব্যর্থ তুলনায়। শ্লোকটি হচ্ছে এই

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূ-হসিতাবদাতৈরুদ্দ্যোতিতানুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্ ।। ২২ ।।

মিলন-পিয়াসী রমণীর হাসি শুভ্র কুন্দফুল,
আজি সুন্দর উপবনে ওঠে ফুটে,
নিস্পৃহ-মুনি চিত্তটিরেও হরিছে কুন্দ ফুল
ভোগী-যুব-হিয়া আগেই নিয়েছে লুটে।

ঋতু-সংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে নিম্ন-লিখিত এই শ্লোকটিও পাওয়া যায়। এটি কালিদাস রচিত নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এই শ্লোকটিতে কুন্দ ফুলের উল্লেখ আছে।

পরভৃত- কলগীতৈর্হলাদিভিঃ সব্বচাংসি
স্মিতদশনময়ূখান্ কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ।
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রুমাভৈর
উপহসতি বসন্তঃ কামিনীনামিদানীম্ ।।

মধুর কোকিলকূজনে নারীর মধুর কন্ঠধ্বনি
হাসিমাখা চারু দশনের শোভা বিকচ কুন্দফুলে,
সুন্দর করপল্লবশোভা নবকিশলয় দলে,
আজি বসন্ত এদেরে দেখায়ে উপহাসে নারীকুলে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয় অংকে বিদূষকের কাছে রাজা মালবিকার রূপ-বর্ণনা করছেন—শাদার সংগে ঈষৎ হলুদে মেশানো মালবিকার কপোলদুটির রঙ। রুচি তার এমনি মার্জিত যে সে বাহুল্যের দিকে কখনো যায় না, কখনো বেশী অলংকারে সাজায় না তার দেহ। বলছেন রাজা—

শরকাণ্ডপাণ্ডু গণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা,
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয় কুসুমেব কুন্দলতা ॥
শরবৃক্ষের কাণ্ডের মতো পীতাভ কপোল-শোভা,
পরিমিত-আভরণা সুন্দরী যৌবনভারনতা,
যেন চৈতালি রোদে হলুদ-বরণ-পল্লব মনলোভা,
স্বল্প-ফুলের-আভরণ-পরা তন্বী কুন্দলতা।

দুষ্মন্তের সভায় যখন শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর সংগে শকুন্তলা এসে হাজির হয়েছেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটিকায় পঞ্চম অংকে কালিদাস সেই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। দুর্বাশার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলার সংগে তাঁর প্রণয়-লীলা ভুলে গেছেন। অম্লান-লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে দেখে রাজা আকৃষ্ট হয়েছেন অথচ স্মরণ করতে পারছেন না এই নারীকে। মন সন্দেহে দোলায়িত। একে নিতেও পারছেন না, বিদায় দিতেও প্রাণ চায় না। ঠিক যেমন ভ্রমর কুন্দকোরকে বস্‌তে চায়, কিন্তু শিশিরে কোরক পূর্ণ থাকায় সেখানে বস্‌তে পায় না, চারিদিকে ঘুরে মরে। দুষ্মন্ত বলছেন—ইদমুপনতমেবং রূপমাক্লিষ্টকান্তি

প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যাব্যবসান্ ।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ ।।

অম্লান-রূপলাবণ্যভরা এই সুন্দরী নারী
ছিল কি আমার কিম্বা ছিল না সন্দেহ মনে জাগে,
যথা শিশিরপূর্ণ কুন্দ-কোরকে ভ্রমর বসিতে নারে
সেই মত এরে নিতেও পারি না, ছাড়িতে যে ব্যথা লাগে।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এ মাধবী লতা ও কুন্দলতার কথা আছে, কুন্দ ফুলের কোনো উল্লেখ নেই। বাতাস মাধবীলতা ও কুন্দলতাকে কম্পিত করছে, নৃত্য-ছন্দে দোলাচ্ছে, বাতাসের এই কৌতুক-লীলা তার স্নেহ ও দাক্ষিণ্য বলে বোধ হচ্ছে। বাতাস যেন প্রেমিক, মাধবী ও কুন্দকে নিয়ে তাই এই খেলা। বিক্রমোর্বশীয়ম-এর দ্বিতীয় অংকে পবনের এই লীলা লক্ষ্য করে রাজা

বিদূষককে বলছেন—নিষিঞ্চন মাধবীমেতাং লতাং কৌন্দীং চ নর্তয়ন।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে ।।

কম্পিত করে মাধবীলতারে বায়ু,
কুন্দলতারে দোলায় নৃত্য-তালে,
বাতাসের লীলা দেখে মনে হয় বাতাস প্রেমিক বুঝি
স্নেহ-উদারতা তাই লতা-পরে ঢালে।

তেরো—লোধ্র

সৌন্দর্যের সঙ্গে উপকারিতার যোগ সব সময়ে থাকে তা ধর্মবুদ্ধি থাকলে সব সময়ে বলা যায় না। তুলনায় বহু-প্রচারিত মাকাল ফল তার সর্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত। লোধ্র কিন্তু এ দোষে দোষী নয়। লোধ্র ফুল দেখতেও যেমন সুন্দর, কাজেও তেমনি আসে। তার রেণু পাউডারের মতো করে মুখে মাখতেন সে যুগের সুন্দরীরা। লোধ্র. ফুলের রসও সুন্দরীরা মুখে মাখতেন। তাতে তাঁদের পান্ডুর মুখ শুভ্র দেখাতো। 'ঋতুসংহারম্'-এর চতুর্থ সর্গে হেমন্ত-বর্ণনায় কবি বল্‌ছেন—

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ
প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
বিলীনপথঃ প্রপতত্তুষারো
হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্ ।। ১ ।।

নবকিশলয়ে সুন্দর আজি তরুদল প্রান্তরে
পাকিয়াছে ধান, লোধ্র কুসুম-নত
বিলীন হয়েছে সায়রে পদ্ম, পড়িছে তুষার ঘন,
হেমন্তকাল আজি প্রিয়ে সমাগত।

'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের সপ্তম্ সর্গে পার্বতীর গৌর বরণের অনুপমতার বর্ণনা করে কালিদাস বল্‌ছেন যে এমন উজ্জ্বল উমার শুভ্র দেহ-কান্তি যে ঝল্‌সে যেতো চোখ, কেউ তাকাতে পারতো না তাঁর দিকে যদি না কানের যবাংকুরের আভরণ সেই শুভ্রতাকে সহনীয় করে তুল্‌তো। বলছেন কবি—

কর্ণার্পিতোলোধ্রকষায়রুক্ষে
গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্
ববন্ধ চক্ষুংষি যবপ্ররোহঃ ।।

কপোল দুইটি রুক্ষ উমার লোধ্র ফুলের রসে,
অতীব শুভ্র হইল কপোল গোরোচনা-অবলিপ্ত,
তাকানো যায় না কপোলের পানে এমনি উজল-শুভ্র,
যব-অঙ্কুর কর্ণে পরায় নয়ন হইল তৃপ্ত।

বিবাহের মঙ্গল-স্নান করাবার জন্যে উমাকে নিয়ে চল্‌লো সখিরা। কতো তার আয়োজন। তার বর্ণনা করে কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম্ সর্গে কবি বল্‌ছেন—

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলা—
মাশ্যান কালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং
নার্য্যশ্চতুষ্কাভিমুখমনৈষুঃ॥
লোধ্রফুলের তৈল মাখালো উমার কোমলদেহে
কালেয়-রচিত অঙ্গরাগটি অনঙ্গ-মন টানে,
স্নানের বসনে সাজায়ে উমারে সযতনে সখিদল,
নিয়ে চলে তারে মহা-আনন্দে ধারামণ্ডপপানে।

সুন্দরীদের মুখ-শ্রীর বর্ণনায় লোধ্রকে বাদ দেবার যো নেই। শুধু আমাদের এই মর্তলোকের সুন্দরীদের নয়, অলকাপুরীর সুন্দরীদের লাবণ্য ম্লান ঠেকবে রসিকদের নয়নে যদি না লোধ্র ফুলের রেণু তাঁরা মেখেছেন এটি আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া হয়।

কবির কল্পনা কোনো বাঁধন মানে না। পাটল রঙের বনভূমিতে সিংহ বিরাজমান। এই ছবিটি কবির মনে আর একটি ছবি সৃষ্টি করলো— পাহাড়ের পাটলবরণ অধিত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে লোধ্র তরু ফুল্লকুসুমে ভরা। 'রঘুবংশম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে এই শ্লোকটি আছে—

স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং
ধনুর্ধর কেসরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাং
লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্ ।। ২৯ ।।
হেরিলেন তবে মৃগয়াভিলাষী নৃপতি ধনুর্ধর
রক্তবরণ বনভূমিতলে সিংহ বিরাজ করে,
যেন পাহাড়ের পাটল-বরণ উচ্চভূমির পর
ফুটিয়া উঠেছে লোধ্র বৃক্ষ নবকুসুমেতে ভরে।

শুধু কি তাই? রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সন্তান-সম্ভবনা হয়েছে। কৃশ তাঁর দেহ, মুখখানি পাণ্ডুর। সেই পাণ্ডুর মুখ লোধ্র ফুলের পাণ্ডুর রং মনে পড়িয়ে দিলো। 'রঘুবংশম্'-এর তৃতীয় সর্গে সুদক্ষিণার এই বর্ণনা আছে—

শরীর সাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যতে লোধ্র-পাণ্ডুনা।
তনু-প্রকাশেন বিচেয় তারকা
প্রভাতকল্প শশিনেব শর্ব্বরী ॥ ২ ॥
স্বল্পাভরণা সুদক্ষিণার কৃশ মধু-তনুখানি,
পাণ্ডুর মুখ লোধ্র ফুলের পাণ্ডুতা নেছে হরি,
এ মধুর রূপ হেরি মনে হয় যেন এই অঙ্গনা
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আসন্ন-ঊষা তারাহীনা শর্বরী।

(ক্রমশঃ)

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

মডেল

রেপো, অর্‌ভোয়ার্‌ আদেম্যাঁ ১ —সকলেই চলে গেছে। আমার আর মার্থের কাজ কিছু বাকি পড়ে যাওয়ায় আমরা আতলিয়েতে সেদিন রয়ে গেছি। হঠাৎ আকস্মিক প্রশ্ন এল, 'তোমার দুঃখটা কিসের?' ভাবছি কথাটা মার্থ না আর কেউ বললে। তার গলার আওয়াজ চেনবার সুযোগ আমার আগে হয়নি। আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। জবাব দিলাম না মাদ্‌ময়জেল্‌ আমার কোন দুঃখ নেই। সে বললে 'তবে তুমি এত চুপ চাপ কেন?' জানালাম—কথা বললে হবে পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে হবে নিমন্ত্রণ এবং সে নিমন্ত্রণের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই বলে, থাকি চুপচাপ। কিন্তু তুমি যে চুপ ক'রে থাকো, তা নিশ্চয়ই কোথাও ঘা খেয়েছ ব'লে।' সে বললে 'আমি ঘা খেয়ে নির্বাক হয়েছি তা তোমাকে জানিয়েছে কোন্‌ পণ্ডিতে?' বললাম পণ্ডিতে বলেনি—তুমি এইমাত্র বললে যে আমি চুপচাপ থাকি আমার দুঃখটা কিসের? কাজেই বোঝা যাচ্ছে তোমার ধারণায় দুঃখ না পেলে কেউ হয় না পরিচয় নিসক্ত—নীরব।' তার জবাব এল 'পরিচয় চাও না, তাহলে নিজেকে নিয়ে কাজের ফাঁকে কর কি?' উত্তর দিলাম 'স্যেন্‌ নদীর পারে ঘুরি আর হাওয়া খাই। আর রবিবার যাই লুভ্‌র্‌-এ। এ দুটোই পাওয়া যায় বিনামূল্যে। সে বললে 'বেশ বেশ, আমিও যাই লুভ্‌র্‌ এ আর স্যেন্‌এর ধারে হাওয়া খাওয়া আমারও অভ্যেস আছে। এ দুটোরকোনটায় যদি তোমাকে কোনদিন নিমন্ত্রণ করি তাহলে তার প্রতি নিমন্ত্রণ দিতে বোধহয় তোমার পকেট খালি হবে না।' চমকে গেলাম। ভাবলাম এই কি সেই,—খ্যাপা কুকুরের চেয়ে যার বিষ বেশী? সে ব'লে চললো! কিন্তু এই নিমন্ত্রণের একটি সর্ত আছে। সেটা হচ্ছে যে, আমরা কেবল পরিচিতের গণ্ডির মধ্যে রেখে দেব এই আমন্ত্রণ। তার বাইরে যেন যেতে চেষ্টা ক'র না এবং সেই ইংগিত কোন দিন পেলেই আমাদের এই নিমন্ত্রণ ও প্রতি নিমন্ত্রণের হবে সমাপ্তি। বেশ অব্যাহত ভাবেই বললাম 'ভয় নেই মাদ্‌ময়জেল্‌, আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চুক্তিহীন নিমন্ত্রণ ঘটে ওঠে না। তাই তোমার দেওয়া গন্ডীকে ডিঙিয়ে যাবার প্রচেষ্টা আমার দিক থেকে হবে না। কারণ এতে হবে আমার সংকোচ ও ভয়।' সর্ত রইল যে আতলিয়েতে আর কাউকে আমরা জানাব না এই নিমন্ত্রণের কথা, কারণ তারা জানলেই, করবে কানাকানি, হবে নির্লজ্জ রহস্য।

এর পর কয়েকদিন ধ'রে আতলিয়েতে এক গোলমাল উপস্থিত হওয়ায়, আমরা প্রায় ভুলে গেলাম একসঙ্গে বেড়ানোর নিমন্ত্রণ। ডাগারম্যান্‌ মোমার্তএ দেখেছিল দুটি জিপ্‌সী মেয়েকে। তারা পথচারীদের হাত দেখে পয়সা ভিক্ষে করছিল, ডাগারম্যান্‌ তাদের একজনকে কাজ দেবে বলে এনেছে আতলিয়েতে। যখন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে সে থ্রোনের উপর দাঁড়াবে সম্পূর্ণ নগ্না এবং তাকে দেখে আমরা গড়ব মূর্তি, তার হাতের রেশমী রুমালখানা অস্ত্রের মত আমাদের সামনে নেড়ে, রুমানি ভাষায় অনর্গল কত কি বল্‌ল। ভংগি আর আওয়াজে আমরা বুঝলাম যে সে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। সজোরে মাটিতে পা দু' একবার ঠুকে সে চল্‌ল দরজার দিকে। সেই মুহূর্তে ডাগারম্যান ছুটে মেয়েটির সামনে গিয়ে তার বিরাট বাহুদ্বয় প্রসা-

রিত ক'রে হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে এবং অভিনয় কেতাদুরস্ত চালে বল্‌ল, 'মাদ্‌ময়জেল্ যাচ্ছ কিন্তু যাবার আগে আমার বুকে একটা ছুরি মেরে আমাকে শেষ করে দিয়ে চলে যাও।' মেয়েটি তাকে ঠেলে সরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেই বপুর পাহাড়কে নড়াবার ক্ষমতা তার ভুজলতায় ছিল না। ডাগারম্যান বলে চলেছে, 'যবে থেকে তোমায় দেখেছি মোমার্তএ, আমার চোখে ভাস্‌ছে আধুনিক ভেনাসের মূর্তির ছাব এবং সে মূর্তি হচ্ছে তুমি। আমরা বেশী তো কিছু চাইনা তোমার কাছ থেকে মাদ্‌ময়জেল্, কেবল চেয়েছি একটু তোমার অনবদ্য রূপের দর্শন। ভেবে দেখ, আজ কত শত বৎসর ধ'রে লোকে মিলোর ভেনাস্‌কে অর্পণ করে রূপদৃষ্টির অর্ঘ ও মুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি। তোমায় দেখে আমি যে মূর্তি গড়ব, আশা করি যখন তুমি থাক্‌বে না বা আমিও থাকবো না, এ জগতে থেকে যাবে শুধু আমার সাধনা ও তোমার রূপের মিলন, যা তৃপ্ত ক'রবে কত শত বৎসরে কত সহস্র রূপপিপাসুদের। দেখ না আমরা সবাই সৌন্দর্যের পূজারী আমরা শুধু পুরুষের দল হ'লে না হয় তোমার বলবার কিছু কারণ থাকত কিন্তু ঐ দেখ না আমাদের মধ্যে মেয়েরাও এক সাথে একই কাজ করছে'—ব'লে ডাগারম্যান মার্থএর দিকে হাত দেখাল এবং সেই সংগে তার চোখ যেন মার্থকে বল্‌ল 'দোহাই তোমার, বেয়াড়া একটা কিছু ব'লে সব পন্ড ক'রে দিও না।' সকলকে অবাক ক'রে 'নির্বাক মার্থ' বল্‌ল—'ডাগারম্যান ঠিকই ব'লেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল রূপের সৃষ্টি করা এবং তার আয়োজনে সমাজগত শ্লীলতা ও আচারের সংকীর্ণ গন্ডীকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে তাদের —যাদের আদল থেকে চয়ন করে পরিস্ফুট হবে শিল্প, ' সে আরও ব'লে চল্‌ল, 'এই ধর না গোয়্‌য়ার তৈরী নগ্না এল্‌বার ডাচেস্। যাদের সামাজিক রুচি তুলে ধরে নিষেধের যষ্টি, তাদের মতেই প্রমাণ চেষ্টা চলে, এ ছবির নায়িকা ডাচেস্ নয়। আমি বলি গোয়্‌য়ার সংগে গুপ্ত প্রেমকে চরিতার্থ করাবার জন্যে ডাচেস্ গোপনে দেখাননি শিল্পীকে তাঁর নগ্ন দেহ। তিনি চেয়েছিলেন বহুযুগ ধ'রে বহুজন দেখবে, শিল্পীর চোখে ধরা তাঁর নগ্ন দেহের মাধুরী।' 'ব্রাভো' ব'লে ডাগারম্যান তার দিকে এগিয়ে গেল তার অভ্যাস মত বক্তার পিঠে বিরাশী সিক্কার চাপড় দিয়ে তারিফ জানাতে কিন্তু মার্থএর উদ্যত তর্জনী যেন তাকে ধাক্‌কা মেরে থামিয়ে দিল। 'থাক্ মঁসিয়ো, আমার যা বিশ্বাস তাই বলেছি, তোমার তারিফ দিতে হ'লে অন্যকে দিও।'

মেয়েটি এসব নাটকীয় কথা বুঝল কি না জানি না। সে হঠাৎ ফিরে এল। থ্রোনের উপর লাফিয়ে চ'ড়ে ক্ষিপ্র হস্তে তার সব কাপড়গুলি খুলে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর দু'হাতের আঙ্গুল চালিয়ে খোঁপা দিল এলিয়ে এবং সজোরে থ্রোনের উপর পা ঠুকে চেঁচিয়ে বলল—'নাও কর শিগ্‌গির তোমার ভেনাস্।' তারপরে প্রায় অস্ফুট স্বরে বল্‌ল, 'যদি ফ্লোরিয়ান্ জানতে পারে যে আমি এতগুলি পুরুষের সামনে দাঁড়িয়েছি ভেনাস হয়ে—যে ছুরি তোমার বুকে বসাতে বলেছিলে মঁসিয়ো, সে তা আমার বুকে হাতল পর্যন্ত বসিয়ে দেবে।'

সেদিন আতলিয়ে বন্ধ হবার সময়ে মার্থকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা মাদ্‌ময়জেল, তুমি ডাচেস্ এল্‌বা হ'লে কি করতে?' সে ব'ললে, 'আমি গোয়্‌য়াকে আঁকতে বলতাম আমার নগ্নরূপ এবং ছবি শেষ হলে আমার ভৃত্যদের হুকুম দিতাম আমার সামনে শিল্পীকে ধরে অন্ধ ক'রে দিতে, যাতে সে যতদিন বেঁচে থাকে—তার চোখের সামনে ভাসবে কেবল আমার রূপ এবং জগতও জান্‌বে যে গোয়্‌য়ার আমি শেষ ও একমাত্র নায়িকা।' মনে মনে বল্‌লাম 'ভাগ্যিস্ তুমি ডাচেস্ হওনি বেচারি গোয়্‌য়া খুব বেঁচে গিয়েছেন।'

আতলিয়েতে আন্তর্জাতিক মডেলদের সুন্দরের হাটে জিপ্‌সী আদেলিতার দেহের গঠন

ও লালিত্যের আভা আর সকলের রূপকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল। তার মাথায় এক ঝিণুক জল ঢাল্‌লে নিম্নগামী সে জলের ধারা বহমান রেখায় দেখাত উচ্চ অনুচ্চ দেহের সকল গঠনের অতুলনীয় আদর্শ সমন্বয়। অনতিরিক্ত মেদ, ঋজু ও সুঠাম এই দেহের কোথাও কাঠিন্যের আভাস মাত্র ছিল্‌ না। বেতসের মত নমনীয়তা থাকলেও এ শরীরে তেজ ও শক্তি যেন উপ্‌চে উঠছিল। এ হেন দেহবল্লরীতে বৃন্তান্তের ফুলের মত তার মুখখানা, সুগঠন চোখ নাক ও ওষ্ঠ বিম্বাধরে লালিত্যের টল্‌টলে মধুক্ষরণ করত। তার আদর্শে মূর্তি গড়া পিগ্‌মেলিয়ানের গ্যালাটিয়াকে প্রাণ দেওয়া নয়; এ যেন তার রূপের সোনার কাঠিটি ছুঁইয়ে পিগ্‌মেলিয়ান চাইছে অন্তরে সুপ্ত রাজপুত্তুর ও পক্ষীরাজকে জাগিয়ে রূপকন্যার মালা পেতে সাগর জঙ্গমে পাড়ি দিতে।

ডাগারম্যান অনেক সময় কাজ থামিয়ে মুগ্ধ নয়নে তার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকত। মার্থ একদিন ঠাট্টা ক'রে তাকে বলল, 'অত ক'রে ওর দিকে চেয়ে থাকলে, তোমার দৃষ্টির তাপে একদিন বেচারী গ'লে যাবে।'

আতলিয়েতে স্কেচিং ও পেন্টি-এর জন্য যত মডেলের প্রয়োজন তারা প্রতি সোমবার আমাদের আতলিয়েতে আসত মনোনীত হ'তে। আদেলিতাকে নিয়ে আমরা দু' সপ্তাহ কাজ করেছি এবং সোমবার আসায় সকাল আট্‌টা থেকে কর্মপ্রত্যাশী পুরুষ ও মেয়ে মডেলদের ভীড় লেগে গেছে। হঠাৎ সুষ্ঠু সবল ও রোদে-পোড়া তামাটে রঙের একটি যুবক ঝোলা নীল রেশমের সার্ট পরে হাজির হল। তার কাল তেল চুপ্‌চুপে চুলে টেরি কাটা, লম্বা জুল্‌পি ও ইস্পাতের ফলার মত ধারাল চাহনি দেখে কারোর বুঝতে বাকী রইল না যে, সেও জিপ্‌সী। আদেলিতা তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু সে এক লাফে তার পাশে গিয়ে তার হাত শক্ত ক'রে ধরে বললে,—'আদেলিতা, এখানে কি করছিস?' সে জবাব দিল যাই করি না, তুমি এখানে কেন?' লোকটি একবার সবায়ের দিকে জ্বলন্ত চাউনি দিয়ে বললে 'বুঝেছি, তুই এখানে মডেল হয়েছিস। গত দু'সপ্তাহ ধ'রে মনোলিতা একা মোমার্থে হাত দেখে বেড়াচ্ছে, আর তোর কথা জিগ্যেস করলেই সে বলে, তুই মোঁপারনাস্‌এ কাজ নিয়েছিস। লজ্জা করে না তোর এতগুলো লোকের সামনে উলঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াতে? তুই যখন আমার স্ত্রী হবি এবং তোর ছেলেরা যখন শুনবে যে তাদের মা নির্লজ্জের মতো বস্ত্রহীনা হ'য়ে বাজারে দাঁড়াত, তখন কোথায় আমি মুখ দেখাব?' আদেলিতা তখন গলা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে আরম্ভ করেছে, 'আমার ছেলেরা কি ভাববে, সে খোঁজে তোর দরকার নেই—আর তোকে যে আমি তাদের পিতার অধিকার দেব,—এ তোকে কে বলেছে? আমায় দেখে এরা গড়ছে ভেনাস্‌, আর তোকে দেখে এরা কি গড়বে? — বোধহয় চোরের সর্দার।' আমরা সবাই বুঝলাম ইনি ফ্যোরিয়ান্‌। ততক্ষণে তার রাগে মাথায় রক্ত চড়েছে। সে আদেলিতাকে জাপ্‌টে ধরে তার নিতম্ব দেশে দ্রুত চপেটাঘাত বর্ষণ শুরু করল। হট্টগোল চারিদিক মুখর ক'রে তুলল এবং সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছিল ফ্যোরিয়ানের গর্জন ও আদেলিতার গালি। 'এ্যাম্বেশিল্‌, শালো, সোভাজ্‌ ইত্যাদি। সারা আতলিয়ের তত্ত্বধায়িকা মাদাম রোজ্‌ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন 'সিলাঁস্‌ সিলাঁস— মঁসিয়ো হেন্সর্বরক্‌ আসছেন। ভীড় করা পুরুষ মেয়েরা দুপাশে সরে রাস্তা করে দিল, আগত প্রফেসার হেন্সর্বরককে। তিনি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন এত গোলমাল কিসের?' ফ্যোরিয়ান্‌ ও আদেলিতা ঝগড়া থামিয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখিয়ে স্বল্প কথায় তাঁকে জানানো হল যে তারাই এই অস্বাভাবিক গোলমালের জন্য দায়ী। তিনি তাদের সদর দরজা দেখিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও এখনি কক্যাঁরা, একি মোমার্তএর খুনে গলি পেয়েছ?' তারপর মাদাম রোজকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'এসব ছট্‌কো বাজারে--মডেলদের যেন আর আতলিয়েতে

ঢ়ুক্‌তে না দেওয়া হয়।' প্রফেসার হেন্নরিকের কথায়, ফেব্রারিয়ান্-এর রোষ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তার উত্তাপ পেল কেবল আদেলিতা। সে প্রায় তাকে কাঁধের উপর ফেলে বল্‌তে বল্‌তে চল্‌ল 'শয়তানী, তোর জিব কেটে দেব, যাতে আর কোনদিন না বলতে পারিস, তোর সন্তানরা কোন পিতার জিম্বায় থাকবে।'

আমরা সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। যে আশা ও উদ্যমে আরম্ভ করেছিলাম আদেলিতার মূর্তি তাকে অসমাপ্ত ও ব্যাহত ক'রে সে চ'লে গেল। আমরা সকলেই ভাবলাম বেচারা ডাগারম্যান বোধহয় তার বিচ্ছেদে মুষ্‌ড়ে পড়বে। কিন্তু সে হঠাৎ সারা আতলিয়েকে অট্টহাসে কাঁপিয়ে দিল। হাসির গমক থামলে সে বলল, 'আমাদের ভেনাস গড়া শেষ হল না, কিন্তু নানেৎ যে আমাকে ধমকে শাসিয়ে কর্তৃত্ব ফলায়, এই উপলক্ষ্যে তার প্রতিকারের একটা পথ আজ জানলাম।'

মডেলদের সম্বন্ধে যে চলিত ধারণা আছে, আমারও তাই ছিল যে—তারা সমাজ-বর্জিত অখ্যাত শ্রেণীর থেকে আসে শিল্প কর্মশালায়, অর্থলুব্ধ হয়ে। তাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শ্রেণীর রুচির ও কৃষ্টির তফাৎ আছে তা আতলিয়েতে যোগদান করবার আগে আমার ধারণা ছিল না। যাদের উদ্দেশ্যে প্রফেসার হেন্নরিক 'ছুট্‌কো' মডেল ব'লে তাঁর বিরাগ প্রকাশ করলেন, তাদের মধ্যেই দেখা যায় জিপ্‌সী, রাস্তার বারাঙ্গনা, উঞ্ছবৃত্তিজীবী ট্রাম্প্ ও রেফুজিরা যারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় সুযোগ পেলে হয় মডেল। কিন্তু বেশীর ভাগ আতলিয়েতে ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত কর্মশালায় পেশাদারী মডেলরাই কাজ পেয়ে থাকে। এদের অনেকে মডেল হয়েছে বোধহয় প্রথমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কিন্তু পরে শিল্প সৃষ্টির মজায় মজে আতলিয়ের আবহাওয়া ও রূপচর্চার আনন্দটাই তাদের জীবনে বেশী প্রাধান্য এনে দিয়েছে। অনেকে শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে তার অনুরাগে হ'য়েছে মডেল। চতুর্দশ শতাব্দীর ফ্রা ফিলিপো লিপ্পি ও নান্ বুত্তির মতো প্রেমাভিনয় আজও চ'লছে ইয়োরোপে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

ফ্রান্সের কোন অখ্যাত গ্রাম থেকে তরুণী সুজান্ ভালাদ' ভাগ্যান্বেষণে সহরে এসে পড়েছিল সার্কাসের ট্রাপিজ খেলোয়াড় হিসাবে, কেবল দৈবক্রমে মাটিতে পড়ে ভগ্নাঙ্গ হওয়ায় ভালাদ' সে পেশা ছেড়ে হ'ল মডেল। তাও অর্থের কারণে নয়, কোন এক শিল্পীর প্রেমে পড়ে। তারপর আর আদলকে নিয়ে শিল্প রচনায় উৎসুক হ'ল প্রায় ডজন খানেক 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য শিল্পরথীরা। পিসারো রেনোয়া, দ্যোগার-ও নাম সেই তালিকায় দেখা যায়। তরুণী ভালদ'র হ'ল সন্তান এবং কোন্ শিল্পী যে তার পিতা তা কেউ জানে না। শিল্পী উত্রিল্লো তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করায়, সে আজ মারিস উত্রিল্লো নামে পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী। ভালাদ' শুধু শিল্পী-দের মডেল হয়েই জীবন কাটাননি। তাদের দেখাদেখি তিনিও করেছিলেন শিল্পের প্রচেষ্টা এবং তাঁর করা ছবি আজ প্যারীর বিখ্যাত আধুনিক শিল্প সংগ্রহশালা মুজে দার মদার্ন্-এর একটি বিশেষ কক্ষে অন্য বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের মহলে দক্ষতার সঙ্গে পড়শী হ'য়েছে। ভালাদ' ছন্নছাড়া মদ্যপ ও অর্দ্ধউন্মত্ত মারিস্‌কে ঘরে তালাবদ্ধ করে শিল্পে নিযুক্ত না করলে আজ জগৎ পেত না এই শিল্পীর দান।

পিতৃদত্ত সামান্য ধন নিয়ে পোলিশ মহিলা জেন্‌ভিয়েভ্ সোফি ব্রেজ্‌কা এল বার্টেনে লেখাপড়া করতে। সেই কেবল দেখল ভাগ্যভ্রষ্ট ফরাসী যুবক আঁরি গদিয়ের-এর মধ্যে বিরাট শিল্পীর উন্মেষ। সে একাধারে মাতা, সঙ্গিণী, পেট্রোন্, প্রণয়িনী ও মডেল হয়ে চাইল যাতে শিল্পী গদিয়ের-এর শিল্প সাধনা হয় সম্পূর্ণ। গোদিয়ের প্রণয়ে কি কৃতজ্ঞতায় নিল ব্রেজ্‌কার নাম নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে। সে যদি অকালে নিজ দেশপ্রেমে মেতে প্রথম মহাযুদ্ধে

মাত্র তেইশ বছর বয়সে প্রাণ না হারাত তাহলে জগৎ আজ পেত বিংশ শতাব্দীর এক সেরা শিল্পীর সম্পূর্ণ দান। ব্রেজ্‌কা তার প্রতিভা ঠিকই ধরে ছিল। গোদিয়ের-এর মধ্যে যে শিল্পী ছিল তার বিরহে কিংবা প্রণয়ীর বিচ্ছেদে পাগল হয়ে উন্মাদাশ্রমে আমৃত্যু জীবন কাটাল ব্রেজ্‌কা। কিন্তু যে কয়েকটি মূর্তি ও ছবি গোদিয়ের-এর নাম বহন করছে, সেগুলি চিরকাল কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো ব্রেজ্‌কারও নাম বহন করবে।

কত শিল্পীর স্ত্রী, স্বামীর পেশাকে ভালবেসে অসংকোচে হয়েছে তার মডেল। আবার কত মহাশিল্পী মডেলকে ভালবেসে, করেছিলেন গৃহিণী। রুবেন্‌স্‌-এর দুই স্ত্রী, রেম্‌ব্রাণ্ট্‌-এর সাসকিয়া ও হেন্‌ড্রিখিয়ে তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। অনেক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরাও মডেল হ'য়ে রোজগার করে, তাদের পড়াশুনোর খরচ যুগিয়ে নেয়। বিশেষ করে যারা বিদেশী তাদের পক্ষে এত সহজে অন্য কোন কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অন্য সব পেশায় বিদেশীদের, সরকারী অনুমতি লাগে এবং সে অনুমতি পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বহু শিল্পীর দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে তাদের মনের শিল্পাদর্শকে জাগায় মডেল বিশেষের শরীর ও রূপের ধাঁচ। অনেক সময় পুরোন শিল্পীর নাম-না-লেখা ছবিতে তাঁর প্রিয় মডেলের আদর্শের সাদৃশ্য দেখে ধরে নেওয়া হয়, সে কার হাতের কাজ। আতেলিয়েতে কতবার প্রফেসার ও শিক্ষার্থীদের শুনেছি, কোন মডেলকে দেখিয়ে বলতে—রুবেন্‌স্‌, এ্যাঁগ্‌র বা ভাস্কর মাইয়ল্‌-এর টাইপ। মাইয়ল্‌ যখন তাঁর আদৃত মডেল 'দীনা'র সন্ধান পান, তখন তাঁকে লেখেন 'মাদ্‌মায়জেল, শুনলাম তুমি যেন নাকি একটি মাইয়ল-এর ভাস্কর্য। যদি তাই হও, তাহলে আমার আতেলিয়েতে এসে ভাস্কর্য রচনায় সাহায্য করলে বিশেষ সুখী হব।' তিনি আমৃত্যু এই দীনাকে সামনে রেখে গড়ে ছিলেন তাঁর সেরা ভাস্কর্যগুলি এবং তার আদলে গড়া একটি বিরাট টরসো'র উপর সারাজীবন কাজ করেও তিনি মনে করেননি যে তার চোখে উদ্ভাসিত দীনার গঠনের সবটা রূপ তিনি দিতে পেরেছিলেন এই মূর্তিতে।

পেশাদারী মডেল ছাড়াও অনেকে শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির কৌতূহল নিয়ে আসেন সখের মডেল হ'তে। শিল্প ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে প্রচুর। একবার সুবিখ্যাত ভাস্কর এপ্‌ষ্টাইন্‌ এক প্রৌঢ়ার নগ্না মূর্তির ভাস্কর্য দেখিয়ে আমায় বললেন—জান এ কে?' 'না' বলায় বল্‌লেন.—'একদিন এই মহিলাটি আমার ষ্টুডিয়োতে উপস্থিত হ'য়ে জানালেন, তিনি রাজকুমারী ব্র্যাগান্‌জা এবং তাঁর একটি নগ্ন মূর্তি গড়তে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন—'তোমার করা ভাস্কর্য কিনবার সামর্থ আমার বর্তমানে নেই। কিন্তু আমার অনেক দিনের ইচ্ছে যে নিজের চেহারার আদলে তোমার গড়া ভাস্কর্য কেমন হয় দেখব।' ভাবলাম সে পাগল এবং কোন অজুহাতে তাকে বিদায় করলাম কিন্তু আবার বার বার এল সে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সত্যিই, মহিলাটির জন্ম শেষ পর্তুগীজ রাজার পরিবারে। কি জানি কেমন তার প্রতি একটা মায়া হল এবং গড়লাম এই বিগলিতা বিশীর্ণা প্রৌঢ়ার দেহ। মনে করলাম, মস্তিষ্কের বিকৃতিতে সে বোধহয় এখনও মনে করে নিজেকে, সুগঠিতা দেহে সুন্দরী যুবতী এবং আমার করা তার বর্তমান স্বরূপ দেখে হয়ত স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবে। কিন্তু সে নিজেই বল্‌ল 'মনে ভেব না যে আমার জরাময় দেহের কুরূপ সম্বন্ধে আমি অবচেতন কিন্তু জান, আমি এক সময় ছিলাম সুরূপা সুন্দরী। সে সময় এরকম করে যেচে মডেল হতে চাইলে, তোমরা শিল্পীরা আমায় পাবার জন্যে লাগিয়ে দিতে লড়াই। কিন্তু কেবল যৌবনের জোয়ারকে ধরে কেন হবে সেরা ভাস্কর। তুমি যদি জীবনের অপরাহ্নের ক্ষীণ স্রোতের ছবিতে জাগিয়ে তুলতে পারো, চলে-যাওয়া সে ভরা জোয়ারের স্মৃতি তবেই তোমাকে বলব—কৃতী শিল্পী।' এপ্‌ষ্টাইন্‌ আমায়

বললেন, 'ভালো ক'রে দেখ, সত্যিই লোলচর্মের রেখা ধ'রে ফুটে উঠবে তোমার চোখের সামনে উন্নতবক্ষা ক্ষীণকটি যৌবনগর্বিতার ছবি। জিজ্ঞাসা করলাম 'রাজকুমারী ব্র্যাগান্‌জা এখনও কি আসেন এই মূর্তি দেখতে আপনার ষ্টুডিও তে?' এপ্‌ষ্টাইন্ বল্‌লেন 'না। এই মূর্তিটা শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি কয়েকতলা বাড়ীর উঁচু ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।'

মডেলদের মধ্যে রাশিয়ান ইয়ানিনার একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রথমতঃ অন্যান্য শ্লাভ্ মেয়েদের মতো সে মেদবহুল প্রশস্তবক্ষা ও জঘনা ছিল না। তাদের মত ছিলনা তার পদদ্বয় ভাঁজা মুগুরের মতো। তাদের যেমন চৌকশ মুখে মোটা নাক ও ঠোঁট দেখা যায় ইয়ানিনার মুখ ছিল তার ঠিক বিপরীত। অণ্ডাকৃতি স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে ছিল সূক্ষ্ম নাসাপুটে সাজান সোজা নাক, জ্বলজ্বলে ভাসা দুটো কালো কালো চোখ আর ছোট বিম্বোষ্ঠ অধরে মানানো বক্ত্র। এই সুশ্রী মুখমণ্ডলকে সগর্বে উন্নত রাখত তার মৃণালগ্রীবা। আর তার নীচে যেমন আমাদের চোখ নামত দেখতাম তার নাতি প্রশস্ত পিনোন্নত স্তনশোভিত বক্ষ, কৃশোদর, সুপুষ্ট ও মসৃণ শ্রোণিদেশ এবং তার ভারবহনকারী সুগঠিত ক্রমদীর্ঘ পদযুগল। সে নাকি ছিল কাউন্ট কন্যা। রাশিয়ান বিপ্লবে বিতাড়িত হয়ে এখন হয়েছে প্যারীর শিল্পশালার মডেল। এক সময়ে খ্যাতনামা শিল্পীরা নিযুক্ত হ'ত তার শিল্প-শিক্ষকের কাজে আর এখন সে হয়ে গেছে শিল্প-অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর শিল্প সাধনার উপলক্ষ্য মাত্র। তার স্বভাবজাত আভিজাত্যকে অন্য মডেলরা সমীহ করে তফাতে চলত। যখন সে বুল্‌ভার্ মোঁপার্‌নাস্ দিয়ে হেঁটে চলত, পাশের ক্যাফেতে বসা শিল্পীরা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানাত। এমন কি প্রফেসার হ্যোর্বারিকও আর্তালিয়েতে তাকে ভঙ্গির নির্দেশ দিতেন বেশ সম্মান সহকারে। একদিন সে খুব উৎফুল্ল হ'য়ে এল আর্তালিয়েতে বল্‌ল 'তোমরা আমাকে ফেলিসিতাসিয়ঁ ২ জানাও কারণ আমি কন্‌জারভেতোয়ার্-এর ৩ শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছি। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সে কন্‌জারভেতোয়ার-এর খরচ চালিয়েছে মডেলের পারিশ্রমিক দিয়ে। ক্ষুণ্ণ হলাম সবাই যখন সে বল্লে যে তাকে আর মডেল হিসাবে পাবনা। আমাদের যেন একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লে "অবশ্য এত পরিশ্রমের পর যদি অপেরায় গাইবার সুযোগ না পেয়ে আমাকে ক্যাফের গায়িকা হতে হয় তা হলে ফিরে আসব আবার তোমাদের মাঝে" তারপর সে আমাদের সকলকে অনুরোধ করল কোন ক্যাফেতে গিয়ে তার ভবিষ্যত শুভ কামনা করে আমরা তার সঙ্গে কিছু পান করি।

গেলাম তার সঙ্গে মোঁপার্নাস্ এর একটি অতি সাধারণ কাফেতে। এর একদিকে রেস্তরাঁ সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন ও রাতের আহারে বেশী লোক সমাগম হয়। বাকি অংশে দিবারাত্র লোক আসে খায় কফি বা মদিরা পান্ করে খোসগল্প জমাতে। দু' এক কোনে ছবি ও রং বেরঙের বাতি দেওয়া জুয়া খেলার বাক্‌স। তাতে পয়সা ফেলে স্প্রিং-এর ঘায়ে বল গড়িয়ে হাজার বা দশ হাজার নম্বরগুলি ছুঁয়ে, পূর্বে অপারগ লোকেদেওয়া জমা পয়সা তুলবার চেষ্টা করে চ'ল অনেকে। কেউ বাজী মাত করলেই ক্রিং করে ঘন্টা বেজে যায়। উপস্থিত সকলের একটু টনক্ নড়ে বাক্‌স ও খেলোয়াড়ের প্রতি। গার্‌স' এসে চাবি খুলে দেয় বাক্‌সর আধারে জমা পয়সার থোক। আবার চলে নতুন উদ্যমে বাজীজেতা খেলোয়াড়ের স্প্রিং ও বলের ঠোকাঠুকি। আমরা সদলবলে হৈচৈ করে কাফেতে বসলাম যেন ইয়ানিনার বাজী জেতার উপলক্ষে।

---

১. বিদায় কাল দেখা হবে। ২. শুভকামনা। ৩. শ্রেষ্ঠ সংগীতশিক্ষালয়।

বসন্তের স্বাদ

অসীম সোম

আমি যেন বসে আছি, তুমি কিছু বলবে
মুখ তুলে চাইবে
তারপর কী হবে, কী হবে?
ভুল যদি করে চলি, ভুরু ভেঙে বকবে
ঠোঁট শুধু কাঁপবে
তারপর কী হবে, কী হবে?

বসে থাকা, কথা বলা, চোখ ঠেরে দূরে ঠেলা —
দিবারাত্র এ-কাহিনী পাথেয় সঞ্চয় হ'য়ে
হয়তোবা পড়ে এলো বেলা ঃ

তবুও তো শোনা যায় সমুদ্রের স্বর —
ঢেউ-এর কল্লোল শুনে অনেকেই পাড়ি দিল
অনেকের নোঙরের হ'য়েছে তো সাধ
মাঝে মাঝে মনে হয় আমিও তো পেতে চাই বসন্তের স্বাদ।
আজ তবে এ-প্রতীক্ষার শেষ করে দাও,
আঁচলের আল বেয়ে ফাল্গুন ছড়িয়ে যাক
ভেঙে দাও দীর্ঘ অভিশাপ —
শীতের নির্মোক ছিঁড়ে মুখ ভরে নাও আমার হাতের উত্তাপ।

অনুবেদন

উৎপল চৌধুরী

ঘুরেছি কত না দেশ, কত গঞ্জগ্রাম,
ঊষর প্রান্তর কত পেরিয়ে এলাম।
নগরের কোলাহলে, জনতার হাটে
শ্যামল বনানী ছায়ে, জনহীন বাটে
বারে বারে গেছি আমি, অতৃপ্ত অন্তরে
উদ্দীপ্ত প্রেরণা নিয়ে খুঁজেছি তোমারে,
প্রতীক্ষার তীর হতে অভীপ্সার দেশে
কেবলই খুঁজেছি ফিরে তোমারই উদ্দেশে।

ব্যর্থ মনে হয় সবই—এই আনাগোনা
তোমার ঠিকানা তবু রয়ে গেল আজও যে অজানা।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

প্রমদাসুন্দরী বলে চলেছে,—এত জিলিপী প্যাঁচ ভেতর ভেতর! জানো, তোমাকে জন্মের মত দূর করে দিতে পারি। নদা'কে আমি আবার বিয়ে দোব।

মৃগনয়নী কথা বলে না। বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী বেরিয়ে আসেন। সরলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মৃগনয়নীর পাশে দাঁড়ায়।

—দিব্যি করে বলছি, ন'দাকে আবার বিয়ে না দিই তো আমার নামে গাধা পুষবি। তোকে দূর করে দিয়ে জলস্পর্শ কোরব। পিতিজ্ঞে করে বললুম।

বনবিহারী ঘরে বসে চমকে ওঠে। মেজদা বেরোয় বাইরে।

চ্যালা কাঠ একগাদা শুকোচ্ছিল উঠোনে। প্রমদা রাগে জ্ঞান হারিয়ে একখানা কাঠ তুলে নিয়ে আসে।— বল হারামজাদী কে তোকে আমার ভাইদের তাড়াবার পরামর্শ দিয়েছে। নয়তো আজ তোর হাড়-মাংস আলাদা কোরব।

মেজদা তাড়াতাড়ি এসে প্রমদার হাত থেকে কাঠটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বেশ কড়া করে বলে, — বড্ড বাড় বেড়েছিস। বৌমা আমার লক্ষ্মী। ওর গায়ে হাত দিলে সব যে উড়ে পুড়ে যাবে রে পাগলী!

প্রমদা হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।—ওগো দেখে যাও গো। মেজদা আমায় মারলে! নক্কি বউয়ের জন্যে মেরে ফেললে আমায়।

মেজদা আকাশ থেকে পড়ে।— মারলুম কোথায় তোকে ?

হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। আবার মারলুম কোথায়! মার কি আবার গাছ থেকে পড়বে! ভগবান দেখবে ! সব ছারখার হয়ে যাবে। সাতদিন যাবে না, যে আমায় মার খাওয়ালে সে যেন গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরে!

আশে পাশের বাড়ীর মেয়েরা ছুটে আসে। মেজদা বনবিহারী আবার ঘরে ঢোকে। দোর ভেজিয়ে দেয়। শ্বাশুড়ী ঘরে দোর দেয়।

সরলা ভয়ে ভয়ে বলে।—চ' তোর ঘরে গিয়ে খিল দি।

মৃগনয়নী গম্ভীর মুখে বলে,—কেন মেজদি, ভয়ে?

হ্যাঁ তাই, আমার গা কেমন কাঁপছে।

মৃগনয়নীর মুখখানা কালো হয়ে উঠেছে। তবু হাসে, বলে,—আমার একটুও ভয় করছে না। দু' ঘা মারলে তো আর মরে যাব না।

চোয়ালদুটো ওর কঠিন হয়ে আসে, বলে,—তুমি জানো না মেজদি। ওকে আমি ছদিনে টিট্ করে দিতে পারি।

—চুপ্! শুনে ফেলবে!

—শুনিয়েও বলতে পারি।

সরলা ওকে রান্নাঘরের ভেতরে টেনে নেয়। বাইরে উঠোনে প্রমদা চীৎকার করতে থাকে।

শুধু চিৎকার করেই শান্ত হোল না প্রমদা। ওর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে এবার। সেদিন জলস্পর্শ করলে না। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কিছু খেল না। বুড়ী মা দুবার বলতে গেল।

ধমক খেয়ে চলে এল। সরলা একবার ভয়ে ভয়ে গেল।

—ও ঠাকুঝি!

—দূর হও। দূর হও।—প্রমদা মারমুখো। সরলা ভয়ে পালিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত মেজদা আর বনবিহারীকেই যেতে হোল। ছোটভাই গেল পিছন পিছন। ও বাইরের আড্ডায় থাকে বেশী সময়। সাতে পাঁচে যায় না। তবু এ ব্যাপারে যেতে হোল। প্রমদা কি শেষ কালে না খেয়ে মরবে। কিছুতেই কিছু হোল না।

—ও বউকে না তাড়ালে জলগ্রহণ করবে না প্রমদা। কিছুতেই নয়।

তা কি করে হয়! একটা অসম্ভব কথা বললে তো চলে না! মেজদা' রাজী হতে পারে না। প্রমদা যা বলছে তাই। নড়চড় হবে না। না খেয়ে মরা যদি কপালে থাকে। তবে তাই হোক। কিন্তু এমন একটা অন্যায় জিদ্ করা কি ঠিক? মেজদা অনেক বোঝাল। না। কিছুতেই নয়। দিন কেটে গেল। প্রমদা কিছুই খেল না।

সন্ধ্যায় মেজদা' বনবিহারীকে ডেকে নিয়ে বললে,—তুই বরং এক কাজ কর।

বনবিহারী সব কাজ করতে রাজী। ন'বৌমাকে নিয়ে তবে বনবিহারী কাল চলে যাক। ওকে বাপের বাড়ী রেখে আসুক। এসে ওরা কলকাতায় রওনা হবে। কথাটা মন্দ নয়। তবে সেধে বউকে বাপের বাড়ী পাঠান!

তা' উপায়ই বা কি!

মেয়েটা কি শেষ অব্দি না খেয়ে মরবে?

কলকাতা যাবার টাকাটা না হয় মেজদার কাছে রেখে যাক বনবিহারী!

না। তা হয় না।

বনবিহারী বলে,— আমি ঘুরে এসে টাকা দোব।

তবে তাই হোক।

পরমর্শটা মেজভাইকে দিয়েছিল সরলা। বড় ভাল বুদ্ধি দিয়েছে।

মেজভাই অবশ্য কথাটা ফাঁস করে না। যেন নিজের বুদ্ধিতেই ওর এমন উপায়টা পাওয়া গেছে!

মৃগনয়নীকে রাত্রে বলে বনবিহারী। সব কথা খুলে বলে।

বোনটা বড় জেদী। এক গুঁয়ে। মৃগনয়নী না গেলে হয়তো না খেয়ে মরেই যাবে। রাত্রেও প্রমদা কিছু খায়নি। মাথায় নাকি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। মা বললে। মাথায় জলপটি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আঁচলটা এঁটে বাঁধছে মাথায়।

—কি আর করা যায় বলো!

মৃগনয়নী চুপ করে সব শোনে। একটা নিশ্বাস ফেলে।

—যা ভাল বোঝ, করো।

এ ছাড়া আর কিই বা বলতে পারে মৃগনয়নী। এ ভাবে যাওয়াটা তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি! কি অদ্ভুত কালের প্রভাব! কাল কি হবে, আজ জানা যায় না। গতকাল ভাবতেও পারেনি মৃগনয়নী যে আগামী কাল তার এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। সবই মেনে নিতে হবে। কেন মেনে নিতে হবে, প্রশ্ন করাও চলবে না।

একটু হেসে বলে মৃগনয়নী,—তোমার মা যে এমন করবেন জানতাম না।

গলায় বেদনার আভাস।

বনবিহারী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে।—মা আমার ভালই করছে। দেখো

ভাল হবে।

কি বিশ্বাস! এক স্থির আলোর প্রকাশ যেন!

বনবিহারী অকারণে খুসী হয়। ওটা ওর স্বভাবই!

—দেখো না। তোমার গয়নাটা তো আর এখুনী নিতে হচ্ছে না!

—তা বটে।—স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে মৃগনয়নী। হয়তো ওখানে কর্তাবাবুকে জানিয়ে কিছু টাকা পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

—তবে তো ভালই হবে। গয়নাটা আর যাবে না—বনবিহারী খুব খুসী।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

এমন অকস্মাৎ তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছে না। ও বুঝতে পারছে, মনের সঙ্গে কোথায় যেন এ বাড়ীর প্রতিটি বিন্দু বাঁধা পড়েছে। মনে টান লাগছে ছেড়ে যেতে। টন্ টন্ করছে। আবার কবে এ বাড়ীতে আসবে, কে জানে? মেজদিকে ছেড়ে যেতে হবে। ওকে ছেড়ে থাকতে হবে। আর বুড়ী! নীরব অসহায় বুড়ী শ্বাশুড়ীকে যে সে এ কদিনেই এতখানি ভালবেসেছে, ভাবতেও পারেনি সে। ছোট চৌকো জানালাটার কাছে যায়। কলা গাছটা এবার বর্ষায় পচে নষ্ট হয়ে গেছে। চৌকো এক ফালি আকাশ।

গাঢ় নীলে ভরা। চোখদুটোয় আকাশের নীল ছায়া নামে। বড় বড় চোখদুটো ওর দু' আঙুলে একবার ডলে নিয়ে মুখ ফেরায় মৃগনয়নী।

—কাল কখন যেতে হবে।

বনবিহারী বিঁড়ি ধরিয়েছে।— এই দুপুরের আগে। খাওয়া দাওয়া সেরেই গরুর গাড়ীতে উঠব।

আবার জানালার দিকে তাকায় মৃগনয়নী। ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোথায় কি যেন একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুর ঘর কি হারিয়ে যাবে! স্বামী কি আবার বিয়ে করবে? আর কি এখানে আসা হবে না? মনটা শূণ্য হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। মুখ ফিরিয়ে দেখে। বনবিহারী শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ও আলোটা বাড়িয়ে তোরঙ্গটা খোলে। কাপড় চোপড় আজ গুছিয়ে রাখলেই ভাল। কাল সময় পাবে কিনা কে জানে! আজই সব গুছিয়ে রাখবে।

রাত কেটে যায়। পরদিন সকালে বাড়ীটা যেন থম্‌থম্ করছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মৃগনয়নীও হাসতে পারে না আর। গম্ভীর হয়ে যায়। সরলার মুখটা একরাত্তিরেই যেন শুকিয়ে গেছে। চোখদুটো নিদারুণ অসহায় ভাব। কোন কথা বলে না সরলা। মুখ নীচু করে কাজ করে যায়। খাওয়া শেষ হয়। মৃগনয়নীও খেয়ে নেয়। গলা দিয়ে ভাত আর নামে না। দুটি খানি খেতে হয় তবু। যাবার সময় হয়ে এসেছে। বাইরে গরুর গাড়ীতে মাল তুলছে গাড়োয়ান। বনবিহারী মাল পত্র তুলতে ব্যস্ত। এবারে তাহলে প্রস্তুত হতে হয়। বনবিহারী তাড়া দেয় একবার। সরলা ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছে। কেন কে জানে? মৃগনয়নী মাথার ওপর ঘোমটা তুলে সরলার ঘরের দিকে এগোয়।

ঘর ঠেলে। বন্ধ।

কি হোল? ও মেজদি! মেজদি!

কিছুক্ষণ ডাকবার পর দোর খোলে সরলা। চোখদুটো ফুলো ফুলো রাঙা। অনেক কেঁদেছে। অনেকক্ষণ। মৃগনয়নী প্রণাম করে। মুখখানি থম্‌থমে মেঘলা। সরলা কথা বলতে পারে না। সর্বশরীর ওর কাঁপছে। নিজেকে সামলে নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে শ্বাশুড়ীর ঘরে যায় মৃগনয়নী।

শ্বাশুড়ী গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন দাওয়ার ওপর। মুখ আমসীর মত বিশুষ্ক।

মৃগনয়নী প্রণাম করে। বুড়ী দুহাত মৃগনয়নীর পিঠের ওপর রাখে।

ফিস্ ফিস্ করে বলে,—আমাকে আর দেখতে পাবে না মা। আমি আর বাঁচব না। বুড়ীর অসহায় জোলো চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে সামলায় মৃগনয়নী ওখান থেকে সরে আসে। উঠোনে মেজভাসুরকে প্রণাম করে।। ছোট দেওর ওকে প্রণাম করে।

আস্তে আস্তে এগোয় বাড়ীর বাইরে গরুর গাড়ীর দিকে। পিছন ফিরে ঘরগুলোর দিকে তাকায় একবার। তাকায় রান্নাঘরের দিকে।

বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে যেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাইরে গিয়ে গরুর গাড়ীতে উঠে বসে।

দুর্গা। দুর্গা। গরুর গাড়ী চলতে সুরু করেছে। ফুল গাছটা পেরিয়ে যায়। তারপর বেতঝোপ। মঙ্গলার মায়ের ঘর পেরিয়ে গেল। পেরিয়ে গেল ওদের নিত্য স্নান করবার গা-ধোবার পুকুর। মৃগনয়নী চোখে দেখতে পাচ্ছে না আর। সব ঝাঁপসা। বনবিহারী শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকায়। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মৃগনয়নী। আশ্চর্য!

বনবিহারী পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরায়।

আট

ভাগ্যি মানুষ ভুলে যেতে পারে। জীবনে বহুবার মৃগনয়নীকে বলতে শুনেছি।—ভাগ্যি ভুলে যাওয়া যায়। ভাগ্যি সব মনে থাকে না। নইলে মানুষ বড় বড় আঘাতের স্মৃতিগুলোর ব্যথাবেদনায় মরে যেত।

কথাটা যে কত বড় সত্য নিজেও টের পেয়েছি। মৃগনয়নীর কাছে সত্য উদ্ভাষিত হয়েছে অভিজ্ঞতার আলোয়?

মানুষ যদি কিছুই ভুলে না যেত, জীবনের বড় বড় বেদনা। কঠোর অভাবের কথা সবসময় তাকে জ্বালিয়ে দিত। কালের প্রলেপ পড়ে স্মৃতির ওপর। ভুল হয়ে যায়। অতীত বিলীয়মান হয়ে যায়। তা না হলে সংসারটা দুদিনে নরক হয়ে উঠত।

কাল তার হাতে সব বেদনার চিহ্ন ধুয়ে মুছে দেয়। আবার স্নিগ্ধ সরস করে তোলে মানুষকে। আশ্চর্য তাঁর কঠোর করুণা। যেমন কঠিন। তেমনি করুণ। সংসারের সব বিধানের ভেতর এমন শুভ বিধান বোধহয় দুটিনেই।

না জেনে কত আক্ষেপ করি! কেন ভুলে গেলাম। জীবনের সবচেয়ে যে প্রিয়। তাকে কেন ভুলে গেলাম। জীবনে অনেক মুহূর্তে যাদের কাছে অনেক পেলাম, দিলামও অনেক তাদের কেন ভুলে গেলাম! কেন ভুলে যেতে হয় অনেক ভালবাসা স্নেহের দিনগুলো!

এ আক্ষেপ—আক্ষেপই! ভুলে না যেতে পারার চেয়ে যন্ত্রণা সংসারে কল্পনা করাও যায় না। মৃগনয়নীর জীবনের বহুদিনের কাহিনী এ কথা সত্য করে দিয়ে গেছে।

ভুলে যেতেই হবেই। মৃগনয়নীও ভুলে গেল ধীরে ধীরে ওর শ্বশুর ঘরের অনেক স্মৃতি। বাপের বাড়ী পৌঁছে প্রথম প্রথম সরলার ভ্রমর কালো মুখখানা, সজল ম্লান চোখদুটো কিছুতেই ভুলতে পারত না ও। শ্বাশুড়ীর শেষ কটি কথা ওর চোখদুটোকে ভাসিয়ে দিত জলে। কিন্তু কদিন? মাত্র কয়েকটা দিনেই ভুলতে সুরু করল মৃগনয়নী।

দিনদুই মাত্র থাকবে বনবিহারী। কথাটা কর্তাবাবুকে বলতে হয়। কর্তাবাবু বছর খানেকের ভেতরেই যেন অনেকটা স্থবির হয়ে গেছেন। কাণের একটু গোলমাল হয়েছে। জোরে না বললে শুনতে পান না।

নায়েব মশাইকেই কথাটা চেঁচিয়ে বলতে হয়।—জামাই বলছে কাল চলে যাবে।

—কাল? কর্তাবাবু ঘাড় নাড়েন।—না, তাকি হয়। কতদিন পর এলো। দিনকতক থেকে যাও বাবা!

কর্তাবাবুর মুখের ওপর কথা বলা চলে না—এটা যেন চিরকালের নিয়ম।

বনবিহারীও কথা বলে না।

মনে মনে একটু খুসীই হয়। যেকটা দিন থাকা যায়। এর পর আর কতদিন মৃগনয়নীর সঙ্গে সাক্ষাত হবে না— কে জানে।

দিন সাতেক থাকাই ঠিক করে ফেলে বনবিহারী।

রাত্তিরের আগে মৃগনয়নীর মুখ দেখবার উপায়ও নেই। বাইরের ঘরগুলোতেই শুয়ে বসে কাটাতে হয়। বসে বসে বিঁড়ি টানতে হয়। বিঁড়ির পয়সা নায়েবমশাইয়ের কাছ থেকে নেয় হৃদয়। দরকার হলে শুধু হৃদয়কে বলা, এক বাণ্ডিল নিয়ে এসোত' হে!

রাত্তিরে শুতে যাবার জন্যে ডাকতে আসে হৃদয়। তাও অনেক রাত্রে। বড় বাড়ীর খাওয়া চুকতে চুকতে রাত দেড়টা। প্রায় দুটোর সময় শুতে যাওয়া। এই নিয়ম। রাত নটা দশটা তো সন্ধ্যে। বিকেলের জলখাবারের ক্ষীর চিঁড়ে তখনও পেটে পাক খেতে থাকে। কাজেই খেতে যেতে হয় বারোটায়। কখনও সাড়ে বারোটায়।

মৃগনয়নী মাকে একবার বলবে ভেবেছিল,—রোগা মানুষ। অত রাতে খেলে সইবে না! বলতে কিন্তু পারলনা। কিছুতেই পারল না বলতে। সেই শুতে রাত দুটো। ভোরে উঠতে হয় আবার। রোদ্দুর ওঠবার পরও যদি ঘরের দোর বন্ধ থাকে, তবে আর রক্ষে নেই। কর্তামা খুড়ীমা ওরা তাকাবে বিরক্ত হয়ে। আর সমবয়েসী বৌ বোনদের মুচ্‌কী হাসির জ্বালায় টেকা যাবে না। দেখবে আর হাসবে।

মৃগনয়নীকে ভোরে উঠে বেরোতেই হয়। বনবিহারী দোর খোলা ঘরে একা একা কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে আরও। অত ভোরে কিছুতেই উঠতে পারে না।

তাতেও বৌঠান বলে বসে মৃগনয়নীকে—আহা, বেচারীকে বোধহয় একদম ঘুমুতে দাও না

—ধ্যেৎ! বড্ড বাজে বলো! — মৃগনয়নী চটে যায়।—যার যা অভ্যেস। অত রাতে শুয়ে ভোরে উঠতে ও পারে না।

বৌঠান তবু হেসে বলে যাবে,—কর্তামাকে বলি তবে তোমাদের সন্দে-সন্দি শোবার ব্যবস্থা করতে। বলেই চলে যায়। মৃগনয়নী বিরক্ত হয়। জানে বৌঠান বলবে না। তবু বিরক্ত হয়।

পুঁটি আজ মাস তিনেক শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। তারা নিতে আসেনি এখনও। তরঙ্গিনী আসেনি। একবার এসে দিন সাতেক ছিল। তাতেই নাকি অস্থির।

—না গেলে ওরা রাগ করবে কর্তামা।

কর্তামা হেসে বলেছিলেন—পাগলী! এর ভেতর শ্বশুর ঘরের ওপর এত টান!

কিছুতেই থাকবে না তরঙ্গিনী। পুঁটিকে নাকি বলেছেও,—যাই বলিস ভাই, থাকতে পারি না ওকে ছেড়ে। মাথা-টাথা সব গরম হয়ে যায়। পুঁটি অবাক। বৌঠানও টিপ্পনী কাটে। তরঙ্গিনীর ভালই লাগে।

বিয়ের পর রূপে যেন ওর ফেটে পড়ছে। আরও গতরে ভারী হয়েছে। রঙ হয়েছে যেন পাকা সিন্দুরে আমের মত। চোখে যেন দুটো কালো ভ্রমর ভাসছে! উড়ি-উড়ি। পালাই পালাই ভাব। ফুলের খোঁজে উধাও। ফুলের ওপরে ধীর। নইলে অস্থির।

—থাকতে-টাকতে পারব না বাপু!

চলে যায় তরঙ্গিণী। ওর বর এসে নিয়ে যায় ওকে। সুশীলকে বৌঠানের সামনেই নাকি ধমকে উঠেছিল।—না এলেই পারতে! জন্মভোর থাকতুম এখানে! সুশীল মাথা চুলকেছিল। বৌঠান হেসে লুটোপুটি। পুঁটি দেখে স্তম্ভিত। চক্‌চক্‌ করে জল খেয়ে ফেলে এক গেলাস।

ভাবগতিক বুঝতে পেরেছিল কর্তামা ওরাও। কেউ আর অমত করলে না। পরের দিনই সুশীলের সঙ্গে তরঙ্গিণী চলে গেল। আর আসেনি।

পুঁটি মাস তিনেক এসেছে। একা একাই থাকে বেশীর ভাগ সময়। বৌঠান ওরাও কাছে ঘেঁষে না বেশী। ওর কাছ ঘেঁষে আরাম নেই। মজা নেই। হোত তরঙ্গিনী? হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলত।

মৃগনয়নী এসে পুঁটিকে দেখে খুব খুসী,—খুব কিন্তু রোগা হয়ে গেছিস পুঁটিদি! পুঁটি ভয়ে ভয়ে তাকায় ওর দিকে।

—ওকিরে। অমন করে তাকাচ্ছিস কেন?

ও কথার জবাব না দিয়ে পুঁটি বলে,—তোকে বুঝি এ্যাদ্দিন ছাড়ে নি?

—না, তা নয়। আমিই আসিনি। আসবার লোকও ত চাই! দূর ত' কম নয়!

—তা বটে! ওখানকার সবাইকে কেমন লাগলরে?

—ভাল। খুব ভাল লেগেছে। আমার জা'র মত মানুষ হয় না!

—আর আমার জা'। ওরে বাবা! আমার বিয়ের পর থেকেই বলে বাড়ীঘর দোর ভাগ করো। আর আমার দিকে এমন চোখ বড় বড় তাকাত তাই!

পুঁটির ভয় দেখে মৃগনয়নী হেসে ফেলে—অত যদি সখ তবে। ভাগ করতে বললেই পারতিস।

—কি হবে বলে!—পুঁটির স্বরটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

—কেন? বলবি তোর বরকে!

—বরকে? ম্লান হাসে পুঁটি।

মৃগনয়নীর একটু কেমন কেমন লাগে ওর ভাব-সাব। চটকরে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কানের কাছে মুখটা এনে পুঁটি বলে,—হ্যাঁরে। তুই নাকি পোয়াতি? বৌঠান বলছিল।

চোখদুটো নামায় মৃগনয়নী। ঘাড় নাড়ে।

পুঁটির মুখটা যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বলে তেমনি ফিস্‌ ফিস্‌ করে,— ক 'মাস'?

—চার। দিদির খবর কিরে? ও নাকি বরকে ছেড়ে একদম্‌ থাকতে পারে না?

—না। তুই?

—কি করে বুঝব বল?

—তবু কি মনে হয় তোর?

মৃগনয়নী একটু চুপ করে থেকে বলে,—মনে হয়? মনে হয় রোগা মানুষ। ওখান থেকে এ মাসেই কলকাতা যাবে। অসুখ বিসুখ কিছু হয়ে পড়ে যদি। ভয় হয়। বলতে বলতে সত্যিই

মৃগনয়নীর গলাটা একটু নরম হয়ে আসে। পুঁটি কথা বলে না। নিজের মনেই কি যেন ভাবে। মৃগনয়নী পাদুখানা মুড়ে ওর পাশে ভাল করে বসে। কতদিন পরে পুঁটিদির সঙ্গে নিরালায় আলাপ!

—মানুষটা বড় দুর্বল। বাড়ীতেও ওকে কেউ মানে না। বাইরেই থাকে বেশী।

বনবিহারীর গালভাঙ্গা মুখের ওপর পিঙ্গল চোখদুটি ওর মনের ওপর পরিষ্কার ভেসে ওঠে।

—আর এমন সোজা মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটু যদি সংসারী বুদ্ধি থাকে।

—তাই নাকি?—পুঁটিও সরে আসে ওর আরও কাছে।

—হ্যাঁ, এখন ত' সবকিছু আমাকেই বলে কয়ে করাতে হয়!

—তোকে বুঝি খুব মানে?

মৃগনয়নী একটু রাঙা হয়ে ওঠে,—ঠিক তা নয়। মানে নিজে ত' ওসব বোঝে না। যদি বলি ছেলেপুলে হলে কি করে চলবে? বলবে,—মা জানে।

—মা কে? তোর শ্বাশুড়ী?

—না। ও আবার মা কালীর ভয়ানক ভক্ত কিনা?

—সত্যি? বড় সুন্দর মানুষটি ত'?

স্বামীর প্রশংসায় মৃগনয়নীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বলে,—মনটা একেবারে সাদা। দোষের ভেতর একটুও ভাবনা চিন্তা করবে না।

পুঁটির কিন্তু খুব ভাল লাগে বনবিহারীর কথা শুনতে। বলে,—ভাবনা চিন্তা বেশী নাই বা করল?

—তা কখনও হয়? সংসার করতে গেলে সবই ভাবতে হয়।

—তা বটে।—পুঁটি সায় দেয় অগত্যা।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে। কলকাতায় গিয়ে বনবিহারী যদি ভাল একটি চাকরী পায়। তবেই মঙ্গল। কলকাতায় বাসা করবে। ছেলে কোলে নিয়ে ও যাবে নোতুন বাসায়। নোতুন বাসা! কথাটার ভেতরও যেন এক রোমাঞ্চকর নতুন স্বাদ আছে। কি যে আস্বাদ মুখে বলে বোঝাতে পারে না ও।

পুঁটির দিকে তাকিয়ে আপনমনেই একটু হেসে ফেলে। চাপা খুসী উপছে পড়ে ওর চোখে মুখে। হঠাৎ পুঁটির মুখটার দিকে নজর পড়ে। পাংশু মুখে বসে আছে ও।

—পুঁটিদি!

পুঁটি তাকায়।

—তোর বর কবে আসবে রে?

পুঁটি ভীতু চোখ দুটো তুলে তাকায়।—জানি না ত'।

—সে কিরে। কিছু বলেনি।

—না।

—কেন? কবে আসবে, কবে নেবে। কিছু বলেনি?

পুঁটি চোখদুটো নামায়।

ঝগড়া হয়েছে বুঝি?—মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে।

—ঝগড়া!—পুঁটি চোখ তোলে,—কই না ত'?

—তবে? আসবার আগে কিছু কথা হোল ত?

—কথা হয়েছে।

—বল না। কি কথা?

পুঁটি চুপ করে থাকে একটু সময়। কি যেন ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে।

—কি ভাবছিস? আমার কথা সব শুনে নিজের কথা কিছু বলবি না।

পুঁটির মুখটা ম্লান হয়ে যায়। মৃগনয়নী হাতখানা নিজের রোগা ঠাণ্ডা হাত দুটোর ভেতর নেয়। একটু চাপ দেয় সস্নেহে। বলে,—আমার যে কিছু বলবার নেই ভাই।

মৃগনয়নী কৃত্রিম রাগে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

বলে,—বললেই ওমনি বিশ্বাস করব।

পুঁটি মুখখানি নীচু করে বসে থাকে।

আস্তে আস্তে বলে,—ও ত' কথা খুব কম বলে।

—তুইও বলতিস না?

—আমার কথা বলতে ভয় করত।

—কেন?

মৃগনয়নী কি আর বলবে! বেদনায় ওরও মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে গালের ওপর।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে বলে,—সেকি পুঁটিদি। কেন?

ও যা চাইত' আমার কাছ থেকে পেত না। ওকে দেখলেই রাত্তিরে আমি কাপড় মুড়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকতুম।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

বড্ড ভয় করত ভাই, বিশ্বাস কর।

পুঁটি চোখদুটো তোলে,—কি করে বলব বল? আমাকে বিয়ে করে ও সুখী হয়নি। শেষ অব্দি রাত্তিরে—

বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে পুঁটির পাণ্ডুর গালের ওপর,—শেষ অব্দি রাত্তিরে আমায় মারত। পিঠে লাথি মেরে ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে যেত অনেক রাত্তিরে। তবু আমি—।

গলাটা বন্ধ হয়ে আসে পুঁটির।

এক পশুর কাহিনী শুনছে মৃগনয়নী। মৃগনয়নীর চোখদুটোও জলে ভরে ওঠে। পুঁটির চোখের জল অনেক পড়ে। অনেক। আঁচলে চোখ মোছে। আবার গালদুটো ভিজে যায়। অনেক সময় কেটে যায়। একবার ডাকে মৃগনয়নী,—পুঁটিদি! পুঁটি চোখ তুলতে পারে না।

এখন তুই কি করবি পুঁটিদি?

পুঁটি সময় নেয়। আরও সময় নেয়।

মৃগনয়নীও ওকে সময় দেয়।

অনেক পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা গলে পড়ছে আজ। এতদিন কাউকে এ কথা বলতে পারেনি পুঁটি। জমাট আক্ষেপের ভারে নুয়ে পড়ে সময় কাটাচ্ছিল। আজ বুকটা যেন অনেক ফাঁকা লাগছে। মৃগনয়নী ওকে বাঁচাল। মৃগনয়নীর হাতখানা আবার ধরে ওঠে। হাতদুখানি ওর বরফের মত ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে একটু একটু কাঁপছে। মৃগনয়নী নিজের হাতের ভেতর ওর হাত দুখানা নিয়ে চেপে ধরে।

(ক্রমশঃ)

প্রবাস-পুরাণ

প্রবাসপুরাণ অতীব বিধুর। যিনি অপ্রবাসী তিনি এ পুরাণের খোঁজ রাখেন না। যিনি প্রবাসী তিনি কখনো এ পুরাণের খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করেন কিনা সন্দেহ। সকলের অবহেলায়, অনাদরে ও অজ্ঞাতে প্রবাসীর চোখের সামনে যেসকল সমস্যা প্রচণ্ডভাবে ক্রমবর্ধমান, সেইত আমাদের প্রবাস-পুরাণ!

"আমি আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী"—কবিচিত্তের এ-চিরন্তন হাহাকার সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে খুব বেশি সাড়া দেয়না। মানুষ যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ঠাঁই তার কাছে স্বর্গসমান। স্বর্গ হতে বিদায় দেবতারাই নিতে কাতর হন; তা আর মানুষের কথা কি ছার। কাজেই ঘরের মানুষ বিদেশ-বিভূঁইয়ে সহসা পাড়ি জমাতে একেই তেমন বেশি উৎসাহ পায়না, তাতে আবার সে-পাড়ি অদূরভবিষ্যতে চিরস্থায়ী নির্বাসনে পরিণত হলে স্বতই তার অন্তর ডুকরে কেঁদে ওঠে—আমি প্রবাসী।

এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম কিসে না আছে! আসলে স্বভাবিকভাবে সাধারণত যা ঘটে সেইত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরবাসী নয়, প্রবাসী। প্রবাসে মানুষ আসে নানা কারণে। সহজে কেহ নিজের জন্মস্থান ছেড়ে প্রবাসী হতে চায়না। প্রধানত পেটের তাগাদায় মানুষকে জন্মস্থানের সীমানা পেরিয়ে জীবিকার অন্বেষণে ছুটতে হয়। দ্বিতীয়ত মানুষের অন্তরে যে ঘুমন্ত-যাযাবর বাস করে সময় সময় কোন-না-কোন রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ভাগ্যপরিবর্তনের দুর্বার তাড়নায় সেই যাযাবর ঘুম ভেঙে নূতন দেশের হাতছানি লক্ষ্য করে অন্ধকারে পরবাসের পথে ছুটে চলে। কিন্তু ভাগ্যপরিবর্তন অন্তে কেহ কেহ স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন যেমন পছন্দ করেন, তেমনি কেহ কেহ পরবাসে স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হয়ে প্রবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি ক'রে থাকেন।

ইংরেজ আমলের প্রায় দু'শ বছর ধরে অনেক বাঙালী ঘর ছেড়ে প্রবাসী হয়েছেন। কারো কারো প্রবাসে কয়েক পুরুষ কেটে গেছে। কারো বা অল্প কিছুকাল প্রবাসজীবনের এইত সবে সুরু। কিন্তু প্রবাসী বলতে তাঁদেরই ধরা যায়, যাঁরা আর দেশে ফিরতে কখনো তেমন ইচ্ছুক নন। এমন বাঙালীর সংখ্যা বাঙলার বাইরে সারা ভারতে কম নয়। সংখ্যায় কমবেশিতে সমস্যার ইতরবিশেষ না ধরেই প্রবাসী বাঙালীর সমস্যা বহুবিধ।

সমস্যাগুলির কথায় পরে আসা যাবে। আপাতত প্রবাসীর গুণগত হিসাবের দাড়িপাল্লায় একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

ইংরের রাজত্বের প্রথম আমলে যেসকল বাঙালী জন্মভূমির সীমানা ডিঙিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই পদার্থের ওজনটা পরিমাণে একটু ভারিই ছিল। তারই কল্যাণে তাঁরা একরকম সর্বত্র সর্বেসর্বার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন প্রায় সর্বভারতীয় সর্বক্ষেত্রেই। ইংরেজের নতুন আইন প্রয়োগে এবং সে-আইনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে বাঙলার বাইরে প্রবাসী

বাঙালীর সমকক্ষ খুঁজে মেলাই ছিল ভার। ইংরেজী শিক্ষার নতুন নতুন অবদানে সারা ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীরা প্রথম থেকে যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন তার ঐতিহ্যবাহী প্রবাসী বাঙালীরাও কোথাও কারো অপেক্ষা পিছিয়ে ছিলেননা। আর জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনায় প্রবাসী বাঙালীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। সর্বোপরি কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং চরিত্রসম্পদে ও নৈতিক দৃঢ়তায় প্রবাসী বাঙালী জীবনের নানাক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সে ছিল একদিন! ইতিহাসের যুগবিবর্তনের বন্ধুর গতিপথে বর্তমানে সেদিনের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট হতে বসেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা।

প্রবাসী বাঙালীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তাই বলে চির-অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু যে অশেষ সমস্যার সম্মুখীন একালের প্রবাসীরা তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি এবং তার সমাধান ব্যতিরেকে ঐ ঐতিহাসিক ভূমিকায় তার অংশগ্রহণ অবাস্তব স্বপ্ন বইত নয়!

প্রবাসীর বহুবিধ সমস্যাকে প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলা চলে। যেমন; সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আবাসিক ও অর্থনৈতিক। এর মধ্যে যদিও শেষোক্ত সমস্যাটি প্রধানতম তবুও বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বিচারে অন্যান্য সমস্যাগুলির স্বীকৃতি সর্বাধিক।

বাঙালীর সামাজিক চরিত্রে যেমন প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি তেমনটা অন্যত্র সচরাচর দুর্লভ। নমুনাস্বরূপ—স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ নিয়ে যতটা তার মাতামাতি ততোধিক তার নারীসমাজের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শৃঙ্খলের বন্ধন উপহারের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির উল্লেখ করা যায়। আর সামাজিক বাদবিচারে বাইরে তাঁরা যতই বক্তৃতায় উদার হননা কেন, বাস্তবক্ষেত্রে 'মনু'ই তাঁদের আমরণ ত্রাণকর্তা। প্রবাসী বাঙালী 'কমলিকে ছাড়লেও কমলি তাঁকে সহজে ছাড়েনা।' তাই সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতার পঞ্চভূত প্রবাসীর সমাজজীবনে অকস্মাৎ একদিন পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যাপারে দশপাটি দাঁত মেলে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। যেখানে মেলামেশায়, আহার-বিহারে, অবাধমিলনে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকেনা, সেখানে হঠাৎ একসময় পুত্রকন্যার পিতা-মাতা আচম্বিতে আবিষ্কার করে বসেন যে, তাঁদেরও জনে-জনের কোন-না-কোন মহামুনির রক্তসম্ভূত কৌলীন্যে সমাজে ছোটবড় বংশগৌরবের অধিকার আছে! তখন সমপর্যায়ের ও সমকুল তথা সমমেলের ধাক্কায় পিতামাতাকে পুত্রকন্যার বিবাহের একটি যোগ্য গতির ব্যবস্থা করতে প্রায়ই বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। প্রবাসে কেহত আর কুল মেল খুঁজে-পেতে এসে ডেরা পেতে বসেননা। সুতরাং কুল বাঁচাবার জন্যে প্রবাসীর প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়।

এ ছাড়া সামাজিক সমস্যার অন্য একটা দিক আছে। কোন কোন প্রবাসী পরিবারে স্বাভাবিক নিয়মেই তথাকার মূল-বাসিন্দাদের আনাগোনা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কেবল যে উভয় সমাজের ভালমন্দ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে তাই নয়; ক্ষেত্রবিশেষে নতুন সংমিশ্রণের উদ্ভবও হয়। এমন অবস্থায় প্রবাসী সমাজে সমস্যার রূপান্তর ঘটে।

প্রবাসী বাঙালীর সাংস্কৃতিক সমস্যাই বড় সুকঠিন। বাঙালীর নিজস্ব একটি জাতীয় সংস্কৃতি গভীরতম প্রভাব নিয়ে বাঙালীর চরিত্রে বিদ্যমান। সেই কারণে জাতীয় চরিত্রের ভালমন্দ বাঙালী যেখানেই যায়, সেখানেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। অনেক অপবাদ আজকাল বাঙালীর প্রতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বাঙালী প্রবাসী হয়েও তাঁর সম্বল কালীবাড়ী, দুর্গাপূজা—এবং ঐ দুটিকেই কেন্দ্র করে ঘুটমণ্ডলী পাকাতে ও কোন্দল করতে তাঁরা আসক্ত বলে শোনা যায়। উপরি 'সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স' তীব্র অপবাদের সূত্র জোগায়। যেদেশে বাঙালী প্রবাসী সেখানকার সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা দূরে থাক,

প্রবাসী বাঙালীরা স্থানীয় জনসাধারণকে প্রায়শ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, এ অভিযোগও নতুন নয়। তা ছাড়া, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা প্রবাসীর মধ্যে ক'জনই-বা করে থাকেন।

উপরোক্ত দ্বিবিধ সাংস্কৃতিক সমস্যার সঙ্গে প্রবাসীর সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার সমস্যাও উল্লেখযোগ্য। সত্যি বটে, উত্তরভারতের কোন কোন নগরীতে প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকাদের মাতৃভাষা শিক্ষার যৎসামান্য ব্যবস্থা এতদিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐ যৎসামান্য ব্যবস্থা যেমন কয়েকটি জায়গায় মাত্র সীমাবদ্ধ তেমনি বহু জায়গাতে প্রবাসী শিশুদের বিদেশে কাটিয়ে একদা ছেড়ে আসা বাসভূমিতে আবার যে ফিরে গিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নেবেন, তেমন যোগ্যতাও তাঁদের মধ্যে সুলভ নয়। এবং অনেকেরই আদিম আবাস ইতিমধ্যে চির-অবলুপ্ত হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প এক-রকম উপহাস উৎপাদনেরই সহায়ক হয়।

যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে বাঙালী একদিন প্রবাসী হতে ইতস্ততঃ করেননি, ইতিহাসের রূঢ় পরিহাসে আজো তাঁর সে সমস্যা অনেকটা যেমন তেমনই রয়ে গেছে। বরং প্রবাসে যাঁরা কয়েক পুরুষ প্রবাসী তাঁদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজ আগেকার চেয়ে ভয়াবহ। কোন কোন প্রবাসী পরিবারের দুই তিন পুরুষের ভাগ্যবিবর্তন ও বিপর্যয় যেমন নাটকীয় তেমনি গবেষণার বিষয়। এমন পরিবারও প্রবাসে দুর্লভ নয়, যাঁদের প্রথম পুরুষ একমাত্র বিধাতাপুরুষের আদিম ও অকৃত্রিম উপহার সম্বল করে প্রবাসে এসে অর্থসম্পদে সৌভাগ্যশালী, সুখী পরিবার হিসাবে কিছুদিনের মধ্যেই নাম কিনে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী পুরুষ অতিমাত্রায় অত্যাধুনিক ও কৃত্রিম পরিবেশ ও ভোগবিলাসে আসক্ত হওয়ায় ভাগ্যের নির্মম রথচক্রতলে নিস্পিষ্ট হয়ে বর্তমানে নিঃসম্বল ভিখিরীতে পরিণত হতে চলেছেন।

আদিতে প্রবাসী বাঙালীর অর্থনীতিক বনিয়াদ মূলত তৈরি হয়েছিল চাকরির ভিত্তিতে। দুই শতাব্দী আগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন ইংরেজরাজের ভারত শাসন কার্যের নানান্ শাখা-প্রশাখায় বাঙালী চাকুরিজীবীরূপে কেবল যে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাই নয়; ক্রমঅর্জিত সেই সুনামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তথা প্রবাসী বাঙালীর তথাকথিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠাই ক্রমাগত কঠোর প্রয়াস ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়না। শ্রেষ্ঠত্ব বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করাও মোটেই সহজ নয়। এই কথাগুলি আজিও যে অভ্রান্ত, বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালীর চাকুরি-আশ্রয়ী অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিপর্যয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অদূরদর্শিতা এবং অতিকঠোর-শ্রমভীতি তৎসহ জাতীয় চরিত্রগত ব্যবসা-বিমুখতার কারণে প্রবাসী বাঙালী এ পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতেই সন্তুষ্ট হয়ে এসেছেন। অধ্যাপনা, সেও চাকুরিহিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এরই ব্যতিক্রম ঘটেছিল ওকালতি এবং ডাক্তারিতে। তথাপি শেষোক্ত ক্ষেত্রদুটিতেও বর্তমানে প্রবাসী বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বীর একেই অভাব নেই, তদুপরি ক'জন প্রবাসী তরুণ-ই-বা আজকাল আর ওকালতি ডাক্তারির ক্ষেত্রে দশের একজন হবার কঠোর সাধনায় লিপ্ত আছেন!

মোটের উপর প্রবাসী বাঙালীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারেই ঘাতসহ নয়। যে কোন মুহূর্তে সামান্য আঘাতে সে বনিয়াদ ভঙ্গুর।

প্রবাসজীবনের এক পিঠ শেষ হল। কিন্তু অপর পিঠ না দেখলে এ-দেখা অসম্পূর্ণই

থেকে যায়।

বাঙালীর একটা দুর্ণাম দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে, সে বড় ঘরকুণো জাত। ঘর আকড়ে বসে থাকতে পৃথিবীতে তার জুড়ি অমিল। কবিগুরু তাই দুঃখ করে বলেছিলেন,

"দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।"

তারপর অতীত হয়েছে অনেককাল। বঙ্গজননী স্বেচ্ছায় আজিও স্বীয় সন্তানদের গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া করতে একান্তই নারাজ। অথচ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের নরনারী ইতিমধ্যে দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে নানা প্রবাসে। মাড়োয়ারী, গুজরাটী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মালাবারী, তামিল, তেলেগু এমন কি মারাঠী প্রবাসীর সংখ্যা আজ নগণ্য নয়। তাই বলে বাঙালীকে সাধ করে মাড়োয়ারী বা মালাবারী হতে হবে, এ যুক্তির অবতারণার পক্ষপাতী আমরা নই। কিন্তু বাঙালীকে মানুষের মত বাঁচতে হলে বর্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের তরুণেরা বিশেষ করে মাড়োয়ারী, মালাবারীরা যেমন হাজারে হাজারে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ছে তেমনি তাঁদেরকেও ছড়িয়ে না পড়লে চলবে কি?

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, বাঙালী ত মাড়োয়ারী বা মালাবারী নয়। অর্থাৎ বাঙালীর জাতীয় চরিত্র মাড়োয়ারী বা মালাবারী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কে না জানে, জাতীয় চরিত্র সহসা কেন, দীর্ঘকালেও কদাচ কখনো অতি স্বল্পই পালটাতে দেখা যায়। কাজেই বাঙালীকে মাড়োয়ারী বা মালাবারী চরিত্র আশ্রয় করতে বলা অসম্ভবকেই সম্ভব করতে বলার সমান। যদিও ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে আসল অধিকারী এবং অনুকরণকারীর মধ্যে প্রতিযোগিতা যথার্থই অসম। সুতরাং বাঙালীকে প্রবাসে দাঁড়াতে হলে দাঁড়াতে হবে নিজেরই পায়ে ভর দিয়ে।

অতীতের ধারা বেয়ে যেসকল বাঙালী এপর্যন্ত প্রবাসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে স্বীয় উৎকর্ষ প্রমাণ করে জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। কিছুকাল থেকে প্রবাসে প্রবাসী বাঙালীর প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরবার কারণ ইদানীং তাঁদের পরাশ্রয়ী মনোভাব ও তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে উৎকর্ষের আকাল-আবির্ভাব। তদুপরি মূল বাঙালীর জাতীয় জীবনে বর্তমানে যে হতাশার-বান ডেকেছে তারও আঘাত প্রবাসী-জীবনের বেলাভূমিতে আঘাত হানছে।

তথাপি প্রবাসী বাঙালীকে প্রবাসী হিসেবে বাঁচতে হবে। বাঙলার ছিন্নমূল নরনারীর উল্লেখযোগ্য একটা প্রবাহের প্রবাসেই ঘর গড়বার জন্য উদ্যোগী হওয়া আজ প্রয়োজন। কারণ জন্মভূমির বৃহত্তর ভূখণ্ড হারিয়ে এখন কেবল ক্ষুদ্রতম অংশ জুড়ে আশ্রয়ের জন্যে কামড়া-কামড়িতেই বাঙালী তথা ছিন্নমূল বাঙালীর বৃহত্তর কোনো সমস্যারই সমাধান হবেনা। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীরই যেখানে টিঁকে থাকা দায় হয়ে ওঠার অবস্থা, সেখানে ছিন্নমূল কিংবা তরুণ বাঙালীদের প্রবাসে ছড়িয়ে পড়তে বলায় অনেকেই মুচ্‌কে হাসবেন বইত নয়। যেই যত হাসুকনা কেন, হাসি-মশ্‌করা উপেক্ষা করে, ভাবপ্রবণতার আড়ম্বর ছেড়ে, স্বার্থীদের প্ররোচনায় না ভুলে বাঙালীকে ভবিষ্যৎ ভেবে ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে প্রবাসে নতুন ঘর গড়বার জন্য বাস্তব রূঢ়তার মুকাবেলায় না নামলে আর চলবেনা।

কথায় কথায় আমরা কিছুটা প্রসঙ্গান্তরে এসে যদি পড়েই থাকি, মূল সমস্যার কারণেই তেমনটা ঘটেছে। আসল প্রসঙ্গে এবারে ফিরে গেলে মন্দ হয়না কি!

প্রবাসী বাঙালীর ইতিহাসে এ স্বীকৃতির অভাব নেই যে, বাঙালীর প্রতিভা ভারতের প্রতি প্রান্তের নমস্য। সেই প্রতিভার মন্বন্তর আরম্ভেই তাঁর দুর্গতির শুরু। এখন তাই প্রবাসী বাঙালীর প্রতিষ্ঠাকে স্থায়িত্ব দেবার একমাত্র পথ, নতুন প্রতিভার আত্মপ্রকাশ। বাঙালীর

মধ্যে প্রতিভার চির-অপমৃত্যু ঘটেছে,—এমন অসত্যভাষণে তাঁর অতিবড় শত্রুরও আস্থা হবার কথা নয়। আসলে সমস্যা হচ্ছে, বিপথগামী এবং সাময়িক বিভ্রান্তিতে হতাশ ও বিহ্বল প্রবাসীদের সচেতন করবার সমস্যা। বাঘের সন্তান সে বাঘই! কিছুকালের জন্য আপন সত্ত্বা হারিয়ে বস্‌লেও বারেক চেতনার কশাঘাতে তাঁকে স্বীয় সত্ত্বায় পুনর্জীবিত করে তুলতে পারলেই দেখা যাবে, বাঘ জেগে উঠেছে।

এর পরই প্রয়োজন, প্রবাসীর নতুন সমাজজীবন সম্পর্কে নতুনতর আসক্তির। যে সমাজ থেকে প্রবাসী বাঙালী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিংবা অদূরভবিষ্যতে পড়বে; সে-সমাজের মূলগত সত্যটুকু আকড়ে-ধরে আর যত মায়া-মোহ, বন্ধন-শৃঙ্খল অসঙ্কোচে তাঁকে অতি দুঃখে হলেও যেমন ছাড়তে হবে, তেমনি নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রবাসী বাঙালীকে তাঁর নিজস্ব সমাজের ভিত্তিস্থাপনে তৎপর না হলে চলবে কেমন করে?

তাছাড়া যেদেশে প্রবাসী, সেদেশের সঙ্গে হৃদ্যতার আদানপ্রদান না বাড়লেই প্রবাসীর জীবন স্বচ্ছন্দগতিতে চল্‌বার সম্ভাবনা কোথায়! অপরের মধ্যেকার শ্রেয়কে আপন করে নেবার প্রয়াসেই জীবনের জয় সূচিত হয়। প্রবাসী বাঙালী দেওয়া ও নেওয়ার নীতিতে অগ্রণী হয়ে,—'তারাই সেরা, তারাই সব' এ ভ্রমাত্মক কম্‌প্লেক্‌স্‌ ত্যাগ করে প্রবাসে স্থানীয় জনসাধারণের বন্ধুত্ব অর্জনে তৎপর হলে বহু অপ্রিয় সমস্যার আস্তে আস্তে শুভ সমাধান অনেকটা সম্ভবপর।

অমল ঘোষ

একান্নবর্তী পরিবার

বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ের কথা হচ্ছিল। কন্যাপক্ষরা যাতায়াত আরম্ভ করে দিয়েছে। চিঠিতে অনুরোধ আসছে ঃ আপনারা অনুগ্রহ করে এসে মেয়ে দেখে যান। মেয়েটি গৌরবর্ণা, সুশ্রী সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা ইত্যাদি।

গৃহকর্তা একদিন শুভলগ্নে গেলেন মেয়ে দেখতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলেন, বাড়ীর মেয়েদের তাগিদে। বিবাহের ব্যাপারে পণ্য খরিদের মত মেয়ের রূপ খুঁটিয়ে দেখার ঘোরতর বিরোধী তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাবী কুলবধূ নির্বাচন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করা উচিৎ বংশ-পরিচয়ে। যাই হোক, মেয়ে আসনে এসে বসলে পর কর্তা মধুর মাতৃসম্বোধনে মাত্র দুটি প্রশ্ন করলেন তাকে। একটি, মায়ের নাম। আর একটি ঃ একান্নবর্তী পরিবার মানে কি মা?

মেয়েটি 'একান্নবর্তী পরিবার' কথাটার মানে বলতে পারেনি। ফলে, কর্তা তাঁকে মনোনয়ন করেননি।

উপরোক্ত ঘটনাটি কল্পিত নয়, সত্য। লেখক স্বয়ং সেদিন সেই রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটিকে দর্শনমাত্র সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন, মেয়েটিকে পুরা পাশ মার্ক দিয়ে "বৌদি" রূপে বরণ করে বসেছিলেন। কিন্তু কন্যাপক্ষের বাড়ী থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামহাশয় লেখককে হতাশ করে রায় দিয়েছিলেন, নাঃ, এখানে পছন্দ হল না।

অপছন্দের প্রধান কারণ, মেয়েটি 'একান্নবর্তী পরিবার' কথাটার মানে বলতে পারেনি। না, না, আমাদের এই বড় সংসারটাকে এক হাঁড়িতে বেঁধে রাখতে পারবে না; একলা ঘরের মেয়ে,

এখনও পর্যন্ত ঐ একান্নবর্তী পরিবার শব্দটাও শোনেনি সে; ওখানে আমি বিয়ে দোবো না ছেলের, তা সে যত রূপবতীই হোক্ না কেন ও-মেয়ে!—জোরে জোরে মাথা নেড়ে কথাগুলো বলেছিলেন জ্যাঠামশাই।

হয়তো সেদিনের সেই কুমারীকন্যা অন্য কোনো একান্নবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সেই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে চলেছেন আজও—কিন্তু তবু তাঁর দোষ দেখিনা আমি। তিনি রূপ চাননি, রূপাও নয়, চেয়েছিলেন বংশের একটি আদর্শকে জিইয়ে রাখার মত শিক্ষা-দীক্ষা-সম্পন্না একটি মেয়ের সন্ধান।

এই একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ বাংলাদেশের ঘর থেকে একেবারে নির্বাসিতপ্রায়। এ এক দুর্লক্ষণ। কিন্তু, কেন এমন হচ্ছে? এ-আদর্শকে ফিরিয়ে আনার ও জিইয়ে রাখার কি কোনো উপায় নেই?

মেয়েদের 'ঘর ভাঙানে' অপবাদ আছে। একথা সত্যি যে, মেয়েরা উদার, সহৃদয়া ও সহ্য-শীলা না হলে একান্নবর্তী পরিবারে ফাটল ধরতে দেরী হয়না। কিন্তু সব দোষটা তার একার নিশ্চয় নয়। পুরুষকেও সেই সঙ্গে উদার ও স্বার্থত্যাগী হতে হবে। কিছুটা কঠোরও। অর্থাৎ স্ত্রীকে সৎপরামর্শ দিয়ে স্বীয় আদর্শে দীক্ষিত করতে না পারলে একটু কঠোর হয়েও তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ঃ তুমি ভুল করছো সহধর্মিণী!

এক পরিবারের বড় ভাই সবচেয়ে বেশী উপার্জন করতেন। এত বেশী যে তাঁর নিজের স্ত্রী ও দুটি পুত্রের পক্ষে তা অঢেল। কিন্তু, আর তিনভাইয়ের ছিলো একেবারে ছা-পোষা কেরাণীর আয়, অথচ বড় সংসার। চারভাই চার-বৌ এক হাঁড়ি নিয়ে থাকতো সুখে। বড় বৌয়ের কিন্তু বুকের ভেতর কেবল খচ্‌খচ্ করতো। আমার সোয়ামি, আমার ছেলে এদের জন্য ভালো খেতে-পরতে পায়না এই তাঁর ক্ষোভ। পুজোর সময় বড় ভাই একই প্রকারের ধুতি আনলেন চারটি। চার ভাই পরবেন। বড়বৌ আড়ালে বললেন, হ্যাঁগো! তুমি নিজের জন্য একটা ফাইন ধুতি আনলেই পারতে! এ-ধরণের প্রস্তাব বড়বৌয়ের এটা প্রথম নয়। প্রায়ই তিনি বলেন। স্বামী বারবার বিরক্তি প্রকাশ করা সত্ত্বেও। এইবার কর্তা তাঁকে উচিৎ শিক্ষা দিলেন রাত্রে আহারে বসে। চার ভাই একসঙ্গে বসে খাচ্ছেন, বড়বৌ পরিবেশন করছেন, সেই-সময়। জানিস্, তোদের বড়বৌদি বলছিলো. . .। কথাগুলো সপাং সপাং করে চাবুক কষালো বড়বৌয়ের পিঠে। সেই তাঁর শেষ সংকীর্ণ প্রস্তাব। এরকম কঠোরতা পুরুষের থাকা দরকার। অন্ততঃ বড়বৌ এ-কঠোরতার ফলে 'ঘর ভাঙানে' অপবাদের হাত থেকে রেহাই পায়।

এমন সংসারও আছে যেখানে উল্টোটা দেখা যায়। অর্থাৎ স্ত্রী চায় মিলে-মিশে সমদুঃখী সমসুখী হয়ে এক সংসারে থাকতে। নিজের ছেলেকে জুতো কিনে দেয়না, যদি জায়ের ছেলের পায়ে জুতো না থাকে। স্বামীকে ধিক্‌কার দিয়ে শেখায় একান্নবর্তীতা। মোট কথা, স্বামী ও স্ত্রী দুজনার মধ্যে এ-বিষয়ে সহযোগিতা ও সম-আদর্শ-প্রবণতা না থাকলে একান্নবর্তী সংসার টিকে থাকা মুস্কিল।

এ-যুগে এ-ধরণের সংসার ভেঙে-চুরে যাচ্ছে। এজন্য দায়ী কিন্তু শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রীরা নন। না চাইলেও আজকাল ভাইয়ে-ভাইয়ে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় পরস্পরের কাছ থেকে। রোজগারের তাগিদে। বড়ভাই হয়তো চাকরী পায় কলকাতায়, মেজ ভাই লক্ষ্ণৌয়ে, সেজো কাণপুরে, আর ছোট থেকে যায় গ্রামে। চারজন চারদিকে ছড়িয়ে থাকার ফলে তেমন টান

থাকেনা পরস্পরের প্রতি। প্রত্যেকে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, আসে সঙ্কীর্ণতা। সেই সঙ্কীর্ণ-তাকে আবার প্রশ্রয় দেয় অর্থনৈতিক কারণ কয়েকটা। যে-ভাই কলকাতায় বসে পাঁচশো-টাকা রোজগার করছেন আজকাল, পাঁচটা ছেলে-মেয়ের সংসার হলে তাঁর পক্ষে বড় কষ্টসাধ্য হয় সেই আয় থেকে কিছু বাঁচিয়ে গ্রামের অভাবী ভাইকে নগদ টাকা পাঠানো। আগেকার কালের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অন্যরকম। আবাদী জমিই ছিল সংসারের গ্রন্থি। জমি থেকে সম্বৎসরের খাদ্য আসতো এবং সেই জমির অনুগ্রহেই অতি বড় একলষেঁড়েও থাকতো একান্ন-বর্তী সংসারের একজন হয়ে। কিন্তু সে-যুগ আর আসবে কি? না। অসম্ভব তা ফিরে আসা। এই কল-কব্জার যুগকে মানুষ এনেছে; ফিরে-যাবার উপায় নেই, ফিরে-যাবার চেষ্টাও অর্থহীন। পেটের দায়ে চার ভাই চার দিকে ছিটকে পড়বেই। কিন্তু তবু সে ইচ্ছে করলে পেটের কাছে মনটাকে গোলাম করে না-রাখলেও পারে। অর্থাৎ একান্নবর্তী সংসারের যে-মূল কথা, সেই প্রেম-প্রীতিকে নিশ্চয় সে জাগ্রত রাখতে পারে। বছরে একবারও যদি চারটে পরিবার এক হয়ে আর্থিক অসাম্য ভুলে থাকতে পারে কিছুদিন, তা হবে মন্দের ভালো।

সেটাও কি এ-যুগে অসম্ভব?

সরিৎশেখর মজুমদার

গুরুজন-সমস্যা

অন্যান্য সমস্যার মত গুরুজনেরাও যে বাংলাদেশের একটি সমস্যা একথা অপাতবিচারে হাস্যকর মনে হলেও তা একান্ত সত্য।

এই সমস্যা গুরুজনেরা সৃষ্টি করেন নি, সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে আমাদের সামাজিক রেওয়াজের জন্য। বাপ-দাদা-জেঠী-খুড়া ইত্যাদি গুরুজনের সঙ্গে কনিষ্ঠদের সম্পর্ক গুরুতর যতটা না প্রীতির তার শতগুণে ভয়-সম্ভ্রমের। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, ভারত-বর্ষেও অন্য কোথাও সম্ভবত ভয়-সম্ভ্রম আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ককে এভাবে ছাপিয়ে ওঠে নি। গুরুজনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ত কল্পনাতীত, সম্ভ্রম বজায় রাখার জের টানতে টানতে তাঁদের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কথাবার্তার রেওয়াজই উঠে গেছে। সাধারণত পরিবারের পুরুষদের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য, কিন্তু আজকাল মহিলাদের ক্ষেত্রেও সম্পর্ক কাঠিন্যের এই ছোঁয়াচ লেগেছে।

ফলে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়েছে? বাল্য অতিক্রান্ত হতে না হতে আমাদের ছেলেরা বহির্মুখী হয়ে পড়ে (মেয়েরা যদি না হয়, তার কারণ, বিভিন্ন সামাজিক কারণে তাদের নিরু-পায়তা; কিন্তু আজকাল মেয়েরাও অনেকটা বহির্মুখী হয়ে পড়েছে)। পারিবারিক বন্ধুত্বের, হৃদ্যতার রস থেকে বঞ্চিত হয়ে বাইরে তারা এ রসের সন্ধান করে। বাবা, দাদা প্রভৃতি গুরুজনদের সঙ্গেও যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এ ধারণা বাংলাদেশে আজ কল্পনাতীত। পরিবারের বাইরে সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বাভাবিকতা বা প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু পারিবারিক বন্ধুত্বের দিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার ফলে আত্মীয়-সম্পর্কের ভারসাম্য আমরা হারিয়ে ফেলেছি, এবং তা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই মঙ্গলজনক হয় নি।

পারিবারিক সখ্যতার অভাবে পারিবারিক আকর্ষণও শিথিল হয়ে পড়েছে। (এই শিথি-লতার মূলে অবশ্য বর্তমান সামাজিক রূপান্তরও অনেকটা দায়ী।) আমাদের ছেলেরা কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বয়স্কদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ সেই ব্যবধান যেন বেড়েই চলে। তারপর থেকে তাদের অন্তরঙ্গতা সম্পূর্ণভাবে সমবয়সী বন্ধুদের (ইয়ার বলাই সঙ্গত) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বয়স্কদের সাহচার্য এই বয়সে কিশোরদের যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক। যথার্থ পরিচালনা শুধু শাসন বা সাময়িক উপদেশে অসম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের। কিন্তু বাংলাদেশে তা ঘটে কি? ঘটে না বলেই আমাদের দেশের কিশোরেরা তথা যুবকেরা বিপথগামী হয়ে পড়ে, চারিত্রিক পঙ্গুতায় সমাজকে আরও অসুস্থ করে তোলে।

একটা উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের লভ্য না হলেও আমরা সকলেই জানি যে বাঙালী ছেলেমেয়েদের মধ্যে শরীর ও মনের বিশেষ ক্ষতিকারক কয়েকটি কু-অভ্যাস অত্যন্ত ব্যাপক (অস্বাভাবিক যৌন-অভ্যাস সবদেশেই আছে, কিন্তু সঙ্গত

কারণেই আমাদের অনুমান, এই অভ্যাস বাংলাদেশের মত অন্যত্র কোথাও এত ব্যাপক নয়।) আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌনতা বা যৌনচর্চা প্রায় সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে। এর একটা প্রধান কারণ, মানুষের আমোদের একটি বিশেষ দিক, পারিবারিক আমোদ, আমাদের বাঙালী সমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশে আগে পারিবারিক আমোদের ঘাটতি ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ'—এর মধ্যে, নানা ব্রত-উৎসব আর পারিবারিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে এই আমোদ, এই সাহচর্য আগে সহজলভ্য ছিল। সামাজিক রূপান্তরের মুখে স্বভাবতই সেই সব পুরনো আচার-প্রথা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার পরিবর্তে পারিবারিক সাহচর্যের তথা আমোদের নূতন কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না, এমনকি সেদিকে সচেতনতাও নেই। আধুনিক জীবনযাত্রাতেও এই সাহচর্য সম্ভব। ইংরেজেরা সপরিবারে বেড়াতে যায়; লম্বা ছুটীতে দূরে স্বাস্থ্যকর জায়গায়, ছোটখাট ছুটীতে এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কাছে পিঠে কোথাও পিকনিকে, বা এমনি ঘুরে আসে। ওদের পরিবারে বাবা-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধ শুধু শাসন বা সম্ভ্রমের নয়, সখ্যতারও বটে। বয়স্করা কনিষ্ঠদের সঙ্গে নানা খেলাধূলায় যোগ দেয়, যা আমরা ভাবতেই পারি না। পারিবারিক রঙ্গ-রসিকতাও বাঙালী পরিবার থেকে ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে (বৌদি বা বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে আত্মীয়দের মধ্যে রস-রসিকতায় যৌনতার ছোঁয়াচ আছে বলেই তার রেওয়াজ এখনও আছে। দাদু-দিদিমার রঙ্গ-রসিকতা কি অধিকাংশ পরিবারে প্রথামাত্র হয়ে পড়ছে না?) আজকাল আমাদের কাছে রসিকতা মানেই 'ইয়ারকি'। এটা হল কেন? হ'ল এই কারণেই যে আমরা মিশি শুধুমাত্র সমবয়সীদের সঙ্গেই। কৈশোরের মেলামেশা যদি শুধুমাত্র সমবয়সীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে স্বভাবতই তাদের চিন্তা এবং কৌতুহল বিশেষভাবে যৌন চর্চাতেই ব্যায়িত হবে। রসরসিকতাতেও যৌনতাই প্রাধান্য পায়। আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক কু-অভ্যাসের মূলে তাদের মনকে নানামুখী করে তোলার জন্য সামাজিক ব্যবস্থার অভাব কতখানি দায়ী তা ভেবে দেখতে হবে।

আমাদের রসিকতা মানে ইয়ারকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইয়ারকির মধ্যে সম্ভ্রমের স্থান নেই। সম্ভ্রম বজায় না রাখতে পারলে বয়স্কদের সঙ্গে মেশাও অসম্ভব আর সম্ভ্রমের চেয়ে বড় কোন কথা হতে পারে না! ধরুণ, সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, বয়স হলে যে ছেলেরা সিগারেট খাবে একথা মেনে নেওয়া হয়েছে। অথচ আমাদের পরিবারে বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়া মানে পৃথিবী রসাতলে যাওয়া! কারণ, এটাকে অসম্ভ্রমের চিহ্ন বলে ধরা হয়। আর সব সহ্য হবে, সম্ভ্রমের ঘাটতি হলে চলবে না! আমাদের এই সম্ভ্রমকাতরতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। হয়ত তা আমাদের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিণতি; হয়ত বা বর্তমান সামাজিক বিপর্যয়ের বিশৃঙ্খলায় মানুষের আত্মবিকাশ বা সামাজিক স্বীকৃতিলাভের পথে যে সংকট দেখা দিয়েছে তারই প্রতিক্রিয়ায় পারিবারিক গন্ডীর মধ্যে আমাদের এই সম্ভ্রম-কাতরতা প্রকট হয়ে উঠেছে। বয়স-গোষ্ঠি (age-group) নিয়েও তাত্ত্বিক আলোচনা চলতে পারে। তবে আপাতত আমরা সমস্যাটিকে সাদাচোখেই খতিয়ে দেখছি।

প্রথমতঃ গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন এমন এক পর্যায়ে এসে পোঁছেছে যে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাই প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। যে আলাপে সরসতার অভাব ঘটে তাকে সকলে এড়িয়েই চলে এবং এইভাবে সম্পর্কে এমন একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয় যে তা ক্রমশঃ অলঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। শুনতে অস্বাভাবিক হলেও, বলা চলে যে বাংলাদেশে পিতাপুত্রের মধ্যে যে সম্ভ্রমাত্মক ব্যাবধান প্রচলিত তা সম্ভবতঃ অন্য যে-কোন আত্মীয়তাসম্পর্কের চেয়ে বেশী দূরের হয়ে

দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারের সকলের সঙ্গে সহজ মেলামেশার অভাবে আমাদের সাহচর্য বহির্মুখী এবং বয়স-গোষ্ঠির অলিখিত রীতি অনুযায়ী বাইরেও আমাদের বন্ধুত্ব একান্ত-সমবয়সীদের সংকীর্ণ গোষ্ঠির মধ্যেই আবদ্ধ। ফলে, আমাদের চারিত্রিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে না। তৃতীয়ত, এই সীমাবদ্ধতার ফলেই রসিকতা এবং রসবোধও যৌনতার মধ্যেই ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। (অথচ বাঙালীরা বেরসিক জাতি এ অপবাদ দেওয়া অসম্ভব ছিল) রসের ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও নেবে গেছে স্বভাবতই। চতুর্থত, আমাদের বহির্মুখিতার ফলে আমাদের এখন 'ঘর' বলতে আর কিছু নেই। আমাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে। তরুণদের কাছে, ঘর হোটেলের বেশী কিছু নয়— আহার এবং নিদ্রার স্থান মাত্র। সর্বশেষে, পারিবারিক এবং মানসিক এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংস্কৃতিও ব্যাহত হচ্ছে। কারণ আমাদের চরিত্রগঠনের অসম্পূর্ণতার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃষ্টিক্ষমতা বা সৃজনীপ্রতিভার যথার্থ বিকাশ অসম্ভব। বাঙালীর জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সৃজনশীলতার যে অভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার মূলে আমাদের পারিবারিক জীবনে বয়স্ক-কনিষ্ঠের এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক যে অনেকাংশে দায়ী নয় তা কি জোর করে বলা চলে?

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

হিমাদ্রি ঃ— রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। সাড়ে তিন টাকা।

"শুনেছি আর দু-চার বছরের মধ্যেই বদরীনাথ পর্যন্ত বাস-রাস্তা হয়ে যাবে। এত যে মাধুর্য এই পথের, এ আর তখন থাকবে না। মোটর হাঁকিয়ে আসবে সবাই, ঝনঝন টাকা ঢালবে, টাট্‌কা টাট্‌কা পুজো দিয়ে নগদানগদ ফলাফল নিয়ে বাড়ি ফিরবে।" কেদার-বদরী দর্শন শেষ করে এই কথা লিখেছেন শ্রীরাণী চন্দ তাঁর "হিমাদ্রি" ভ্রমণকাহিনীতে। পড়তে পড়তে মনে হ'ল সত্যিই, আর দুদিন বাদে আধুনিক সভ্যতা এসে গ্রাস করবে ভারতের এই তীর্থভূমিকে। হিমালয়ের গা ঘেঁযে চলে গেছে যে সর্পিল, বন্ধুর পথ তার চার পাশে ছড়ানো আছে ভারত-আত্মার কত বাণী, লুকিয়ে আছে ইতিহাসের অজস্র উপকরণ। ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে জানবার ও চেনবার, তার অতীত পরিচয়ের যে সব সাক্ষ্য আজও এইসব সুদূর তীর্থের পথে পথে অবশিষ্ট আছে, দুদিন পরে তা যদি আর না থাকে, তাহ'লে আমাদের ঐতিহ্যের একটা বিশেষ দিকই যাবে লুপ্ত হয়ে। তবুও সান্ত্বনা যে এই সব তীর্থভূমির স্মৃতি ধরা থাকছে, তার পথ আর পাথরের, মানুষ আর মন্দিরের ছবি আঁকা রয়েছে 'হিমাদ্রি'র মত তীর্থভ্রমণ কাহিনীর পাতায় পাতায়।

গত কয়েক যুগে, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। ভ্রমণকাহিনীর দিকটা কিন্তু সমান তালে পা ফেলে চলতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় জলধর সেনের "হিমালয়" একদিন কেদার-বদরীর পথে আমাদের নতুন করে হাতছানি দিয়েছিল। তারপর কত শত তীর্থযাত্রী হৃষিকেশের পথ বেয়ে চলেছে কঠিন-কেদার আর বিশাল-বদরী দর্শন-মানসে। অভিযানকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ কাহিনীও অনেক লেখা হয়েছে। কোথাও রোমান্সের ছোঁয়া লাগিয়ে কাহিনীকে রঙীন করা হয়েছে, কোথাও আছে বিজ্ঞানীর সন্ধানীদৃষ্টিতে রহস্য ভেদের প্রাণপন প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে ভ্রমণকাহিনীতে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবারও অভাব নেই। কিন্তু "ধনী দরিদ্র সবাই আসে বিপৎসংকুল এই একটি পথে; কী-না, দেবদর্শন করবে" নিছক সেই তীর্থ-পথের কথা, তীর্থকামী ধনী দরিদ্রের ভক্তি আর বিশ্বাসের ওপর ভর ক'রে পথ চলার কথা, দেবদর্শনের আকুল আকাঙ্খার কথা নিয়ে পথ চলার কাহিনী হ'ল "হিমাদ্রি"। যাঁরা শুধু ভ্রমণ ভালবাসেন তাঁদের যেমন এই বই ভাল লাগবে, তেমনি ভাল লাগবে তাঁদের যাঁরা বিশ্বাস করেন "তীর্থভ্রমণ সংসারী লোকের পক্ষে আর কিছুই নয়—চালুনী দিয়ে ছেঁকে মাঝে মাঝে নিজেকে পরিস্কার করা।"

লেখিকা সমালোচনার জটিলতা, সূক্ষ্ম ও সন্ধানী দৃষ্টির আঁকাবাঁকা পথ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন বলেই তাঁর লেখায় ভ্রমণকাহিনীর স্বাদও যেমন পাওয়া যায় তেমনি জায়গায় জায়গায় জমে ওঠে কাব্যের মাধুর্য আর গল্পের রস। এরসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহেরও অভাব নেই, যেমন কেদার-বদরী ভ্রমণের "সুবিধে-অসুবিধের জরুরী কথা", "চটির নাম, পথের হিসাব" আর টুপি, লাঠি ইত্যাদি কি কি জিনিষ কাজে লাগে তার বিবরণ। "এ যেন এক অখণ্ড জ্যোতি, দিবারাত্রি জ্বলছে বদরীনাথের শিয়রে। নানা রঙের আলোর ছটা ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে নিশিদিন তার এই আরতির নিবেদন, চোখের সামনে যেন আর কার রূপের আভাস ইঙ্গিতে ধরিয়ে দিয়ে যায়।”—এই জ্যোতির ছটা ছড়িয়ে আছে লেখার ছত্রে ছত্রে, এই অরূপের আভাস আছে নগাধিরাজ হিমালয়ের রূপ বর্ণনায়। এক কথায় সমস্ত কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি চিত্রধর্মী, সংবেদনশীল, ভক্তিরসাপ্লুত মনের পরিচয়। এরই মধ্যে 'চম্পাকে' এনে একটু রহস্যের চমক না লাগলেই যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত। কাহিনীর শেষে এসে এই রহস্যের চমকে কেমন যেন সুর কেটে যায়।

গ্রন্থের ভাষা বিষয়বস্তুর বর্ণনায় আর পরিবেশ সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। “পূর্ণকুম্ভে”র পর “হিমাদ্রি” নিঃসন্দেহে সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি।

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ মেঘ ঃ— অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়। এম. সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। দু'টাকা।

আধুনিক কবিতার নামে অনেক শিক্ষিত পাঠকও আঁত্‌কে ওঠেন। এর জন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুত, অনেক আধুনিক কবির এমন সব কবিতা আছে যা শুধুমাত্র কথার কারিগরী বা তত্ত্বের কচ্‌কচানি। এগুলিকে কবিতা না বলে দুর্বোধ্য বাক্যের সমষ্টি বলাই ভাল।

আশার কথা “নিঃসঙ্গ মেঘে”র কবি সে পথে পা বাড়াননি। তাঁর প্রতিটি কবিতার ভাষা সুন্দর ও সহজ, কিন্তু ভাবটি চিরন্তন কবি-মনের। উপরন্তু তাঁর কবিতা চিত্র-বহুল। প্রতিটি কবিতা থেকেই একটি দুটি চোখের ওপর ফুটে ওঠে। কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে এবং তার মাধুর্য মনকে বহুক্ষণ ছেয়ে রাখে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিঃ

“স্বপ্নের সোনার শস্যে—
ভ'রে ওঠে মনের প্রান্তর;
পাকা ধান ভাবে; কবে—
কার দুটি হাতের ছোঁয়ায়
স্থান পাবে স্মৃতির ভাণ্ডারে।
পড়ন্ত রাতের আলো—
ঠিক যেন শেষের কবিতা—
সুরের প্রত্যাশা সুরে—
ঠিক যেন সমাপ্তির গান!
এইখানে শেষ তাই—
প্রতীক্ষার তপস্যা তোমার। (প্রতীক্ষার রাত)

মালবিকা সরকার

॥ দেশবিদেশের খবরের জন্যে ॥

উইক্‌লী ওয়েস্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬·০০ টাকা; ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা।

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩·০০ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২·০০ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত হিন্দি-বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক ০·৭৫ টাকা।

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩·০০ টাকা ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগরেবী বংগাল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩·০০ টাকা; ষান্মাসিক ১·০০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;

(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক নিচের ঠিকানায় লিখুন :

প্রচার অধিকর্তা,

রাইটার্স বিল্ডিংস্,
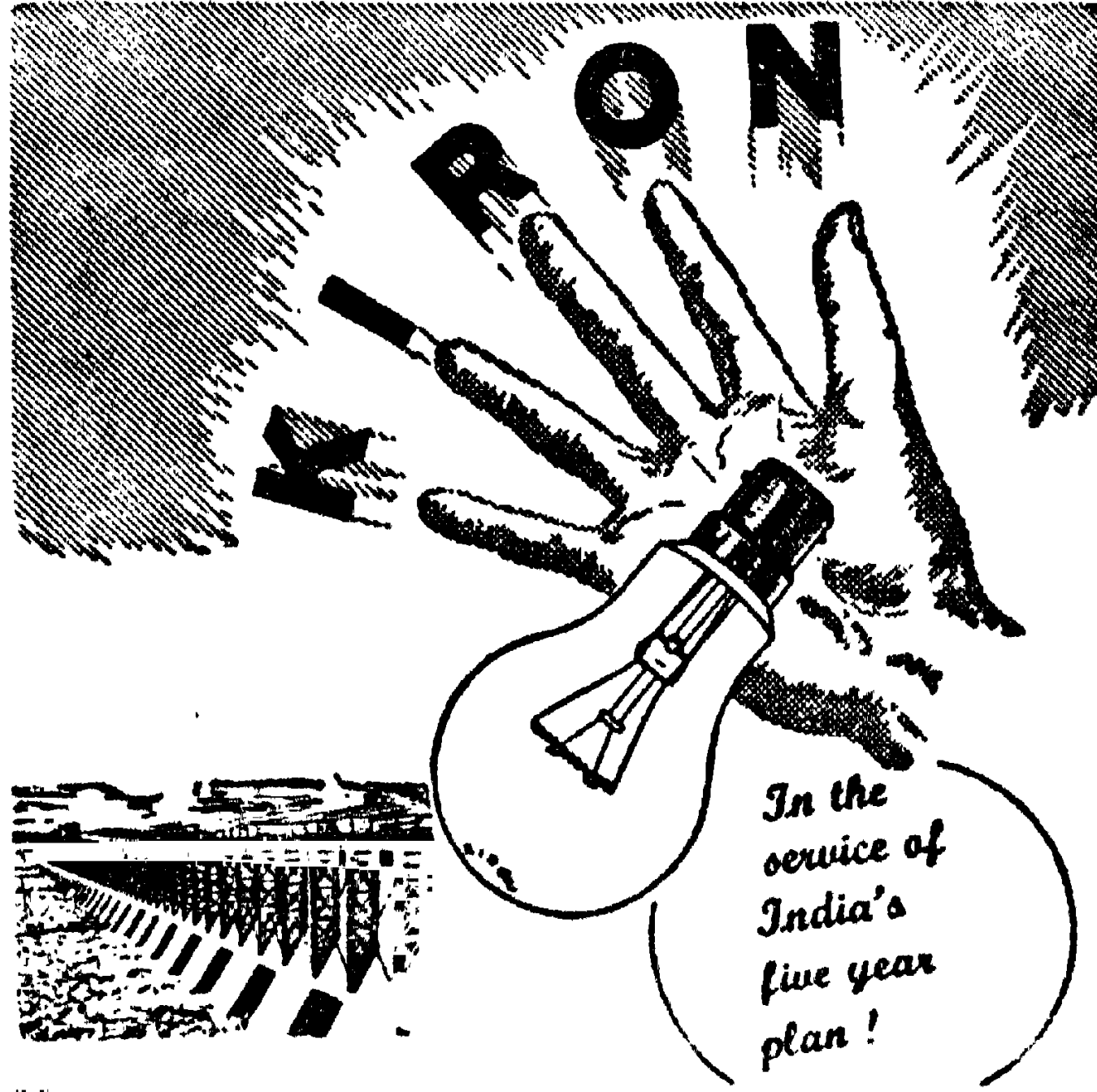
কলিকাতা ১

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মধ্যে সাদৃশ্যের অন্বেষণ ও সম্বন্ধের আবিষ্কারণ মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সকলেই অল্পবিস্তর philologist বা ভাষাতত্ত্বান্বেষী। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়ম না মানিয়া যেখানে সম্বন্ধ নাই সেখানে সম্বন্ধের উদ্ভাবন করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধ প্রাতিভাসিক পারমার্থিক নহে। ইহার কতকগুলি উদাহরণ গত মাসে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবারে আর কতকগুলি সন্নিবেশিত হইল।

Come ও ক্রামতি

পরলোকগত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন গল্প করিলেন—"একদিন চৌকিদারের আওয়াজ শুনিলাম—হুকামদার। তখনই মনে হইল—ইহার মূল হইতেছে—কঃ ক্রামতি তত্র। তাহার অপভ্রংশ—who comes there? তাহার আবার অপভ্রংশ হুকামদার?" এই মত কিন্তু একেবারেই সমীচীন নহে। সংস্কৃতের কঃ ইংরাজীতে who বটে, কিন্তু সংস্কৃত ক্রামতি ইংরাজীতে come নহে। ইংরাজীর come সংস্কৃত গম্। সংস্কৃতের গ সাধারণতঃ ইংরাজীতে ক হয়। যেমন সংস্কৃতে যুগ ইংরাজী yoke, সংস্কৃত গোঃ, ইংরাজী cow।

Cow—Coward ও Cud

গোরু বড় নিরীহ, ভীরু জন্তু, কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজী cow শব্দের সহিত coward-এর কোন সম্বন্ধ নাই। আর গোরু জাবর কাটে বটে, কিন্তু cow শব্দের সঙ্গে cud এরও কোন সম্বন্ধ নাই। ফরাসী coe, come শব্দের অর্থ লাঙ্গুল, ইহার উত্তর ard প্রত্যয় করিয়া coward হইয়াছে। যে লাঙ্গুল প্রদর্শন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, রণে ভঙ্গ দেয়—ইহাই coward শব্দের প্রাথমিক অর্থ। ফরাসী ভাষায় ard প্রত্যয়টী অতিশয় অর্থে ও নিন্দা বা কুৎসিত অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইংরাজী coward, drankard, sluggard প্রভৃতি শব্দে এই অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী sweetheart মূলতঃ sweetard। এস্থলে অতিশয় অর্থ দেখা যাইতেছে। Cud শব্দটী অনেকের মতে টিউটনিক ক্বি ধাতু হইতে আসিয়াছে, ইহার সহিত cow শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

মণি ও Money

অনেকের ধারণা ইংরাজী money ও সংস্কৃত মণিশব্দ মূলত এক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই শব্দ দুইটী সর্বথা অসম্বন্ধ। লাটিন ভাষায় moneta শব্দের অর্থ ট্যাঁকশাল, ইহা হইতে money আসিয়াছে। শাব্দিকগণের মতে মূলতঃ 'ল'র পর 'ন' ছিল বলিয়া মণি শব্দের ন মূর্ধণ্য হইয়াছে। ইহার জ্ঞাতি লাটিন monile (হার, নেকলেশ)।

শোক ও Shock

শোকের ফলে আমরা মনে আঘাত পাই বটে, কিন্তু আঘাতবাচক shock-এর সহিত শোক শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। শুচ্ ধাতুর অর্থ জলা, এই ধাতু হইতে শোক আসিয়াছে। শোক শব্দের প্রাথমিক অর্থ—জ্বলন, তাপ, জ্বলন্ত, উত্তপ্ত; তাহার পর অর্থ হইল বিয়োগজ দুঃখ। শোক একেবারে শরীরকে জ্বলিয়ে দেয় সেই জন্য ইহাকে শোক বলে। এই অর্থ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ফলে শোক অনেকটা ফিকা হইয়া গিয়াছে। ঐ ধাতু হইতেই শুচি শব্দ আসিয়াছে, তাহারও প্রাথমিক অর্থ,—জ্বলন্ত, উজ্জ্বল, তাহার পর অগ্নিদগ্ধ বস্তু মালিন্যশূন্য হয় বলিয়া অর্থ হইল—পবিত্র।

ভারী ও Very

বাঙ্গালা ভারী ও ইংরাজী very-র মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকিলেও শব্দ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভার (weight) আছে যাহার তাহা ভারী (সংস্কৃত ভারিন্ শব্দ), তাহা হইতে ক্রমশঃ অর্থ হইল অত্যধিক, খুব। ইংরাজী very শব্দটী লাটিন্ verus (মূলতঃ veros ও সংস্কৃত বদ্ ধাতু) শব্দ হইতে আসিয়াছে, উহার প্রাথমিক অর্থ সত্য, তাহা হইতে অর্থ হইল যথার্থ, সত্য সত্য, ক্রমশঃ উহা ভারী শব্দের মত অতিশয়, অত্যধিক অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। অনেকের ধারণা ইংরাজী very bad ও বাঙ্গালার ভারী বদ মূলতঃ এক। এই ধারণাও ভ্রান্ত।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন বর্তমান লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন সকলের দাদামহাশয় ৺ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভক্তদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,—আরে philology কি জান না? যেমন ইংরাজী Hither up আর আমাদের ইধার আও!

Sorrow ও sorry

ইংরাজীতে Sorrow শব্দ হইতে বিশেষণ হইয়াছে Sorry ইহাই আমাদের দেশের সকলের ধারণা, মূলতঃ কিন্তু শব্দ দুইটীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। Sorrow শব্দের জ্ঞাতি জার্মান্ Sorgen 'দুশ্চিন্তা', যেমন Borgen macht Sorgen (ঋণ দুচিন্তা উৎপাদন করে)। (frau Sorge—দুশ্চিন্তা দেবী)। Sorrow শব্দটী প্রাচীন ইংরাজীতে Sarig দুঃখানুভব-কারী বা দুঃখ প্রকাশক। Sore throat প্রভৃতিতে যে Sore শব্দ দেখা যায় সেই Sore শব্দ ইহার জ্ঞাতি।

Touch ও Touchy

Touch শব্দের অর্থ স্পর্শ, আর Touchy শব্দের অর্থ—ক্রোধন, কোপনস্বভাব, অত্যন্ত অভিমানী। মনে হয় Touch হইতেই Touchy আসিয়াছে (যেমন bloody, crafty, dusty, foamy, flowery), যে স্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারে না, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু Touch শব্দের মূলে দ্বারে আঘাত করিলে যে টক্ টক্ (toc, toc) শব্দ হয় তাহাই।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের ফুল কুরবক। বসন্তের মতো রঙীন তার লাল ফুল। কুরবকের ফুটে-ওঠার রহস্য জানতেন যে রসিকেরা তাঁদের মতে—আলোকনাৎ কুরবকং কুরুতে বিকাশম্—সুন্দরীদের নয়নের স্পর্শ পেলেই কুরবক ফুল ফুটিয়ে দেয়। বসন্তের দিনে বরবর্ণিনীদের কালো কেশে শোভা পেতো রক্তিম-বরণ কুরবক ফুল। নারীরা তখন জানতেন প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে রঙ বাছাই করে নিজেদের সাজাতে। এখনকার মতো দোকানের থাক থেকে নির্বিশেষে সাধারণ রঙ তাঁরা আহরণ করতেন না। সেকালের নারী বিশেষের দ্বারা রুচির পরিচয় দিতেন, একালের নারী কি রুচিতে কি লালিত্যে অ-বিশেষের পূজারিণী। কুরবক খুব বেশী না এলেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে কালিদাসের কাব্যে। 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে কুরবক দু'বার দেখা দিয়েছে। অলকা-বাসিনী বধূদের রূপ ও প্রসাধন বর্ণনা করে যক্ষ মেঘকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে। যক্ষ-প্রিয়ার কাছে তাড়াতাড়ি তার খবরটি পেঁাছে দিতে যক্ষ ব্যাকুল। তাই, আষাঢ়ের মন্থর মেঘকে চপল-গতি করবার জন্যে যক্ষ যদি অলকার বধূদের রূপ-বর্ণনা করে থাকে তো এমনই বা কি অপরাধ করেছে!

হস্তে লীলাকমলকলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ তদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব কদম্ব দোদুল।

অলকায় কুবেরের প্রাসাদের উত্তরে যক্ষের বাড়ি। সেই বাড়ির বর্ণনা করে যক্ষ বল্‌ছেন ঃ—

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্খত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

সেথা রক্ত-অশোক বকুলেতে নবপল্লব-শিহরণ,
মাধবীকুঞ্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবীথি মাঝে,
অশোক সে চায় তোমার সখির বামপদপরশন,
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মদিরা যাচে।

অযোধ্যা নগরীতে বসন্ত কাল সমাগত। নব-প্রস্ফুট অশোক লোকের মনে অনুরাগের উদ্দীপনা আন্‌লো। অশোকের নব পল্লবগুলি নারীরা কর্ণভূষণ করলো। শুধু অশোক নয়, কুরবকও

বসন্তের দূত হয়ে এলো অযোধ্যার উপবনে। রঘুবংশের নবম সর্গে তার বর্ণনা করে কালিদাস লিখ্‌ছেন ঃ—

বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্র-বিশেষকাঃ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ ॥ ২৯ ॥

আজি বসন্ত নবপ্রস্ফুট কুরবক ফুল দিয়া
বনলক্ষ্মীর দেহেতে পত্রলেখা করে অঙ্কিত,
মধুদান দিতে উদার ও নিপুণ কুরবক-ফুল-হিয়া
মধুপানরত ভ্রমর-সোহাগে গুঞ্জন-মুখরিত।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয় সর্গে দেখছি নৃপতি অগ্নিমিত্রের আর দিন কাটতে চায় না। কোন কাজে তাঁর মন লাগে না। হৃদয় আকুল হয়ে রয়েছে মালবিকার জন্যে। বয়স্য বিদূষককে রাজা বল্লেন—দিন শেষ হয়ে গেলো, এখন এই সময়টা কোথায় কাটানো যায় বলতো? বিদূষক তার উত্তরে বল্লেন ঃ— অদ্যৈব প্রথমাবতার-সুভগানি রক্তকুরবকাণি উপায়ন প্রেষ্য নব-বসন্তাবতারব্যপদেশেন ইরাবত্যা নিপুণিকামুখেন প্রার্থিতো ভবান। ইচ্ছামি আর্য্যপুত্রেণ সহ দোলাধিরোহণমনুভবিতুমিতি। ভবতাপি প্রতিজ্ঞাম্। তৎ প্রমদ-বনমেব গচ্ছাব ॥ ১৯ ॥

নব বসন্তের প্রীতি-উপহারের ছলে আজই রাণী-ইরাবতী তোমাকে সদ্য-ফোটা রক্তকুরবক ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন ও নিপুণিকার মুখ দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—বড় সাধ হয়েছে আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবে এই প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। চলো তবে প্রমোদ-কাননে যাই।

প্রমোদ-কাননে গিয়ে বিদূষক রাজাকে বল্‌লো—দেখ, আজ বসন্তলক্ষ্মী কি সুন্দর সাজে সেজেছে নানা ফুলের গয়না পরে। নারীদের প্রসাধন লাগে কোথায় এর সাজের কাছে!

রাজা বল্লেন, সত্যিই তাই, আমি বসন্তের বন-লক্ষ্মীর শোভা দেখে অবাক হয়ে দেখ্‌ছি—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেকাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্ ॥ ৩০ ॥

রক্ত-অশোক নারী-অধরের লালিমা-গর্ব হরে,
শ্যাম শ্বেতলাল কুরবক দেয় পত্রলেখারে লাজ,
ললাট-তিলকে তিলক ফুলের অলি-শোভা ম্লান করে,
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ।

বিদূষক রাজাকে বল্‌লেন, শুনলে তো বন্ধু মালবিকা কি বল্লেন? তিনি বল্লেন তিনি উৎকণ্ঠিতা হয়েছেন। রাজা বল্লেন শুনলুম বটে, কিন্তু এর থেকে তুমি যা অনুমান করছ সেটি ঠিক, এটা মানতে পারছি না। কেননা কারণবশত মানুষ উৎকণ্ঠিত হয় তা নয়, অকারণেও উৎকণ্ঠা জাগে মনে।

বোঢ়া কুরবকরজসাং কিসলয়পুটভেদ-শীকরানুগতঃ
অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়াবাতঃ ॥ ৪৪ ॥

শীকর-শীতল মলয় পবনে নব কিশলয় জাগে,
কুরবক-রেণু-বাহী বায়ু ভরে হিয়া অকারণ অনুরাগে।

'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্'-এর দ্বিতীয় অঙ্কে বসন্তশোভা বর্ণনায় কুরবক মহাকবির কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। বসন্ত কাল। রাজা পুরূরবা তাঁর বিদূষককে নিয়ে প্রমোদবনে বেড়াচ্ছেন। বিদূষক রাজাকে বল্লেন—প্রেক্ষতাং ভবান বসন্তাবতারসূচিতমস্যাভিরামত্বং প্রমদ-বনস্য—দেখ, নববসন্তের সূচনাস্বরূপ প্রমোদ বনের শোভা। রাজা বল্লেন—আমি তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারিধারে।— অগ্রে স্ত্রী-নখ পাটলং কুরবক শ্যামং দ্বয়োর্ভাগয়ো

বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদেন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈষদ্বদ্ধরজঃ-কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য সখে মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা ॥ ৪৯ ॥

নারীর নখের ডগার মতন রক্তিম কুরবক, দুধারে সবুজ আঁকা,
নবীন অশোকে রাঙা পল্লব প্রস্ফুট মনলোভা,
হল রক্তিম সহকার-শাখা মুকুল-পরাগ-মাখা,
যৌবন-মুগ্ধতা দুঁহু মাঝে রাজে বসন্ত-শোভা।

বসন্তের ছবি অঙ্কনে কালিদাস কুরবককে বারে বারে স্মরণ করেছেন। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্মন্তের রাজধানীতে বসন্ত-বর্ণনায় কালিদাস কুরবককে ভোলেন নি। বসন্ত এসেছে তবু উৎসবের চিহ্ন নেই রাজপ্রাসাদে কিম্বা প্রমোদ-কাননে। রাজার আদেশে সব উৎসব বন্ধ। দুটি সখি প্রমোদ কাননে বেড়াতে এলো। আমের মুকুল দেখে এক সখি মুকুল তুলে কন্দর্পের পূজা করতে অধীরা। মুকুল তুলে মদনকে স্মরণ করে মুকুল ছড়াচ্ছে এমন সময় রাজার কঞ্চুকীর প্রবেশ। ক্রুদ্ধ কঞ্চুকী বল্‌লে—মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কিমারভসে। —মহারাজের নিষেধ বসন্তোৎসব হবে না। তুমি কোন সাহসে আমের মুকুল ছিঁড়ছো? মেয়েদুটি ভয়ে ভয়ে জানালো যে তারা জান্‌তো না মহারাজের নিষেধ। কঞ্চুকী বল্‌লে—দেখছো না যে গাছ পাখী সব মহারাজের নিষেধ মেনে চল্‌ছে ঃ—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ।
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকারবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম ॥ ১৩ ॥

আম্র-মুকুল কবে দেখা দেছে, নাহি পরাগের লেশ,
প্রস্ফুট-প্রায় কুরবকগুলি কুঁড়ি হয়ে থেকে গেলো,
কোকিল-কণ্ঠ সুর বেধে গেলো, যদিও শীতের শেষ,
মদনের তূণে আধো-বার-করা সায়কটি ফিরে এলো।

পনেরো — কুটজ

কুটজ বর্ষার ফুল। কালো মেঘের দিকে মুখ তোলে ফোটে কুটজের শাদা ফুল। কুটজ হচ্ছে আমাদের কুরচি ফুল। 'মেঘদূতম্'-এ পূর্বমেঘ খণ্ডে কুটজের দেখা আমরা দুবার পাই। মেঘকে তো খুশি করতে হবে, তবে তো সে যক্ষের বারতা নিয়ে যাবে অলকায় যক্ষ-প্রিয়ার কাছে। তাই ঃ—

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

আষাঢ় ঘনালে বাঁচাতে প্রিয়ারে বিরহ-দহন হতে,
মেঘ দিয়া নিজ কুশল-বারতা পাঠাইতে অভিলাষী
নবপ্রস্ফুট কুটজ কুসুমে করি পূজা বিধিমতে
স্বাগত জানালো আষাঢ়ের মেঘে যক্ষ সে পরবাসী।

মেঘ তো কুর্চিফুলের নৈবেদ্য পেয়ে তুষ্ট হয়ে যক্ষের বারতা নিয়ে চল্‌লো অলকাপুরীর দিকে। বিরহী বন্ধুর বারতা তার প্রিয়াকে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছে দেবার সদিচ্ছেও মেঘের ছিলো। কিন্তু শীঘ্র যেতে ইচ্ছে থাকলেই কি যাওয়া যায় শীঘ্র? অলকায় যাবার পথে মন টানবার যে কতো কী আছে? তাই যক্ষ মেঘকে সাবধান করে দিচ্ছে ঃ—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং বিথাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২২ ॥

ত্বরা করি সখা চাহ যাইবারে আমার প্রিয়ার তরে,
তবু কাল যাবে গিরিতে গিরিতে কুটজ ফুলের টানে,
কেকাধ্বনি করি স্বাগত জানাবে ময়ূর সজল-আঁখি,
ত্বরা করি কভু যাওয়া চলে যবে শিখীরা নয়ন হানে?

'রঘুবংশম্‌'-এর একোনবিংশ সর্গে নৃপতি অগ্নিবর্ণ-এর রাজত্বকালের বর্ণনা আছে। নৃপতি অগ্নিবর্ণ ছিলেন বীর্যহীন বিলাসী পুরুষ। রাজকার্য ছেড়ে তিনি পুরনারীদের নিয়েই দিন কাটাতেন। বর্ষা ঋতু এলে ক্রীড়া-শৈলেতে গিয়ে বিহার করতেন ঃ—

অংসলম্বিকুটজার্জ্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কুটজ কুসুম-অর্জুন ফুলে রচিত মাল্য গলে,
কদম ফুলের পরাগে রঙীন নৃপতির কলেবর,
যেথায় আসিত মদ-ভরপুর ময়ূরেরা দলে দলে,
বর্ষা আসিলে সে ক্রীড়া-শৈলে যাপিতেন নৃপবর।

বর্ষা এসেছে। বিলাসিনীদের মনে কতো আনন্দ। প্রিয়ের প্রতীক্ষায় সাজছে তারা কতো ছাঁদে। কদম্ব যেমন তাদের প্রিয়, তেমনি কুটজ। 'ঋতুসংহারম্‌'-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় মহাকবি বল্‌ছেন ঃ—

"মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি-
রাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভ-মঞ্জরীভি-
রিচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

কদম বকুল কেতকী কুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালিকা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে,
কুটজ কুসুম-মঞ্জুরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কত না ছাঁদে।

ষোল—নীপ—কদম্ব

কদম্বের আদর ছিলো প্রাচীন ভারতে, কিন্তু সে আদর ছিলো কদম্বের ভুবন-ভোলানো সৌন্দর্যের আদর। কদম তখনো সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে নি ভক্তির আবিলতায়! মহাকবিকে মুগ্ধ করেছিল কদম। তাঁর নানা কাব্যে বর্ষার বর্ণনায় কদমের আবির্ভাব। কালিদাস কিন্তু নীপ ও কদম্ব এই দুটি ফুলের কথা একই শ্লোকে ব্যবহার করেছেন ঃ—

মুক্তবা কদম্ব-কুটজার্জ্জুন-সর্জ-নীপান সপ্তচ্ছদানুগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নীপ ও কদম্ব এদুটি ফুলকে তিনি এক করে দেখেন নি। নীপ আর কদম এক জাতের হলেও তারা ঠিক এক নয়। এই পার্থক্যটুকু কালিদাসের কবিতা থেকেই ধরা পড়ে। দুইয়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য তা আমাদের জানা নেই। তবে মহাকবিরা যা বলেন তা আর্ষ হলেও গ্রাহ্য। তাই মহাকবি-নির্দিষ্ট এদের পার্থক্য স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু এরা দোঁহে দোঁহার এতোই কাছাকাছি যে এদের একসঙ্গে গেঁথে না দিলে মনে ব্যথা দেওয়া হবে।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে মেঘের অলকা-যাত্রার মনোহারিণী বর্ণনা করেছেন কালিদাস। আম্রকূট পাহাড় পার হয়ে মেঘ চল্‌লো বিন্ধ্যপর্বতের দিকে। অতোটা পথ চলায় মেঘের তো পথশ্রান্ত হবার কথাই। তাই শ্রান্ত মেঘ বন্যহস্তীদের গণ্ড থেকে নিঃসারিত মদধারা মিশ্রিত ঝরণার জল পান করে তৃষ্ণা দূর করবে। তার পরে যে পথ দিয়েই মেঘ যাবে সেখানে তার বর্ষণে ফুল ফুট্‌তে সুরু করবে। বর্ষা কাল। বর্ষার কদম্ব কি মেঘের স্পর্শ না পেয়ে পারে ঃ—

নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈরাবির্ভূত-প্রথম মুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

শ্যাম-পাংশুল নীপের কেশর ফুটে ওঠে চঞ্চলি,
ভুঁইচাপাদলে প্রথম মুকুল বরিষণ-উদ্গত,
নিহারিবে নীপে হরিণহরিণী, খাবে তারা চাঁপা কলি,
সিক্ত মাটির আঘ্রাণ নেবে, দেখাবে তোমারে পথ।

এম্‌নি করে শ্যাম জম্বুবনের উপর দিয়ে সিক্ত কেতকীর গন্ধ আঘ্রাণ করে। নানা জনপদের উপর দিয়ে মেঘ একদিন পৌঁছবে অলকায়। অলকার পুরনারীরা সাজ্‌তে জানে। তাই তাদের প্রসাধনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে নীপ।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ তদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব কদম্ব দোদুল।

রতি-মদন-বসন্ত তিনজনে মিলে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে এসেছেন। অপেক্ষা করে আছেন উমার। উমা এলেন, হাতে তাঁর মন্দাকিনী থেকে নিজে হাতে তোলা পদ্মের বীজির মালা। সেই মালা নিবেদন করবেন ধ্যানী শঙ্করের চরণে। এ সুযোগ কি কন্দর্প-রতি-বসন্ত ছাড়তে পারেন? পার্বতীর হাত থেকে মালাটি নেবার জন্যে শঙ্কর যেই হাত বাড়ালেন অমনি মদন তাঁর পুষ্পধনুতে 'অমোঘ' সম্মোহন বাণ জুড়লেন। তখন উমার কি হোলো তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস 'কুমারসম্ভবম্'-এর তৃতীয় সর্গে ঃ—

বিবৃন্বতী শৈলসুতাপিঃ ভাবসঙ্গেঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥

উমার পরাণে ভাবের বিকার উপজিল সেই ক্ষণে,
নব কদম্ব সম দেহে জাগে রোমাঞ্চ অনুপম,
মুখ ফিরাইয়া আনত নয়নে রহে উমা উপবনে,
দাঁড়ায়ে রহিল শিবের সমুখে স্থির আলেখ্য সম।

'রঘুবংশম্'-এর একোনবিংশ সর্গে নৃপতি অগ্নিবর্ণ-এর ক্রীড়া-শৈল-বিহারের বর্ণনা করে মহাকবি বলছেন ঃ—

অংসলম্বিকুটজার্জ্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কুটজ কুসুম-অর্জুন ফুলে রচিত মাল্য গলে,
কদম ফুলের পরাগে রঙীন নৃপতির কলেবর,
যেথায় আসিত মদ-ভরপুর ময়ূরেরা দলে দলে,
বর্ষা আসিলে সে ক্রীড়া-শৈলে যাপিতেন নৃপবর।

'ঋতু-সংহারম্'-এ দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় কদম্ব ও নীপ বার বার দেখা দিয়েছে। বর্ষা ঋতুতে নারীরা বর্ষার ফুল-আভরণে সাজছে ঃ—

কদম্বসর্জ্জার্জ্জুনকেতকীবনং প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ।
স-শীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কংন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ১৭ ॥

বনে উপবনে শাল-কদম্ব-অর্জুন-কেতকীরে
কাঁপায় আজিকে সুরভিত সমীরণ,
আজি বরষায় জলভরা-মেঘ-পরশে শীতল বায়ু
করে উৎসুক কার না বিরহী মন।

এই নব-বর্ষায় নারীরা কদম্বের আভরণ পড়ছে ঃ—

"মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি-
রাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোহদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভ-মঞ্জরীভি-
রিচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

কদম বকুল কেতকী কুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালিকা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে,
কুটজ কুসুম-মঞ্জুরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কত না ছাঁদে।

নববর্ষার ধারায় বনস্থলীর সমস্ত তাপ দূর হয়েছে, তার আনন্দের আর অবধি নেই ঃ—

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃসমন্তাৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্ত ॥ ২৩ ॥

নব বারিধারে প্রশমিত আজি বনানীর তপজ্বালা,
বনানীর দেহে রোমাঞ্চ সম ফুটেছে কদম ফুল,
কেয়া-মঞ্জুরী ফুটেছে যেন গো হাসিতেছে বনতল,
পবনে দুলিছে তরুশাখা যেন বনানী নৃত্যাকুল।

শুধু কি বনস্থলী সেজেছে বর্ষার ফুলে? নারীরাও আজ সেজেছে বকুলের সঙ্গে মালতী ও যূথী মেশানো মালা পরে, কাণে দিয়েছে নবকদম্বের আভরণ ঃ—

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং
বিকসিত নবপুষ্পৈর্যূথিকাকুটমলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষ ॥ ২৪ ॥

বনফুল যূথী মালতীর সাথে বকুল মালিকাখানি
প্রিয়জন সম সোহাগে ভরিয়া মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষাঋতু,
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নবকদম্ব-আভরণ।

বর্ষা চলে গেছে, এসেছে শরৎ। বর্ষার ফুল কদম আর কুর্চি ফুট্‌ছে না। তাই পঞ্চশর তার পূর্বের আশ্রয় ত্যাগ করে সপ্তপর্ণ তরুতে নতুন আশ্রয় নিয়েছে। 'ঋতুসংহারম্'-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কবি বল্‌ছেন ঃ—

নৃত্যপ্রয়োগ-রহিতাঞ্ছিখিনো
বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুর-প্রগীতান্।
মুক্ত্বা কদম্ব-কুটাজ্জর্জুন-সর্জ্জ-নীপান
সপ্তচ্ছদানুগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ ॥ ১৩ ॥

করে না নৃত্য আর ময়ূরেরা তাই তাহাদেরে ত্যজি,
মধুর-কণ্ঠ মরালের কাছে গিয়াছে পঞ্চশর,
কদম-কুটজ-শাল-অর্জুনে ত্যজিয়া শারদ-শোভা
ফুলে ফুলে ভরা সপ্তপর্ণ পানে ধায় সত্বর।

সীতাকে রাবণ হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেছেন। বিরহ-দুখে রাম কাতর। আগে যা তাঁকে আনন্দ দিতো, তাই তাঁকে আজ দুঃখ দেয়। 'রঘুবংশম্'-এর ত্রয়োদশ সর্গে রাম তাঁর সেই বিরহ-বেদনা জানাচ্ছেন ঃ—

গন্ধশ্চ ধারাহত-পল্বলানাং কাদম্বমর্দ্ধোদ্‌গত-কেসরঞ্চ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে ॥ ২৭ ॥

সিক্ত মাটির মধুর গন্ধ বরিষা ধারায় নব,
আধো-ফোটা সব কদম-মুকুল পরিয়াছে নব-সাজ,
বারি-বর্ষণে সুখ-বিহ্বল ময়ূরের কেকা-রব,
তোমার বিহনে সকলি হে প্রিয়ে অসহ হয়েছে আজ।

কদম-মুকুলের সঙ্গে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটার তুলনা সুন্দর তো বটেই, অভিনবও। দিব্য বিমান এসে উপস্থিত, রাম স্বর্গে চল্‌লেন। প্রজারা চোখের জলে তাঁর যাত্রা-পথ সিক্ত করেছে। 'রঘুবংশম্‌'-এর পঞ্চদশ সর্গে তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস ঃ—

জগৃহুস্তস্য চিত্তজ্ঞাঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ।
কদম্বমুকুলৈঃ স্থূলৈরভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুভিঃ ॥ ৯৯ ॥

কদম-মুকুল সম বড়ো বড়ো অশ্রুর ফোঁটা ঝরে,
প্রজাদের আঁখিজলধারে হোলো পথখানি নির্মল,
চলিলেন রাম আঁখিজলেভেজা সেই পথখানি ধরে,
চলিল সে পথে রামের ভক্ত কপি-রাক্ষসদল।

নৃপতি পুরূরবা উর্বশীর বিরহে পাগল প্রায়। যা দেখেন তাই তাঁকে উর্বশীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপবনে হরিণকে দেখে তাকেই উর্বশীর কথা জিজ্ঞেস করছেন। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন রক্ত-কদম্ব তরু। মনে পড়ে গেলো অতীতের একটি দিনের কথা। 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্‌'-এর চতুর্থ অঙ্কে কালিদাস পুরূরবার এই অবস্থার মনোহারিণী বর্ণনা দিয়েছেন ঃ—

রক্তকদম্বঃ সোঽয়ং প্রিয়য়া ঘর্ম্মান্তশংসি যস্যেদম্‌।
কুসুমমসগ্রকেশর-বিষমমপি কৃতং শিখাভিরণম্‌ ॥ ৮৩ ॥

এই সেই তরু রক্ত-কদম অতি-পরিচিত মোর,
নিদাঘ-অন্তে আধো-প্রস্ফুট কদমের ফুল নিয়া,
মাথার ভূষণ রচিত প্রেয়সী হয়ে আনন্দে ভোর,
সাজিতো প্রেয়সী কালো কেশে তার কদম-কুসুম দিয়া।

সতেরো — কেতকী

নদীর তীরে নেহাৎ অযতনে জন্মায় কাঁটার বর্ম-পরা কেতকীর ঝোপ। তার ফুল সেও কাঁটার সাঁজোয়া পরে লুব্ধ পথিককে দূরে রাখতে ব্যস্ত। হৃদয়ের মধু সে দিতে চায় না কাউকে, কাঁটা দিয়ে আগ্‌লে রাখে পরাণের মধু-সঞ্চয়। বাঙলার কবি, কেয়া ফুলের প্রেমিক তিনি। কেন কেয়া কাঁটা দিয়ে মধু ঢেকেছে, কার অভিসারে সে বের হয়েছে, নিজেকে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া চল্‌ছে কেয়ার—এসব কবির জানা আছে, কেয়ার-এসব গোপন কথা তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন। বাঙলার কবি রূপের তরী দিয়ে অরূপের ঘাটে পৌঁচেছেন। উজ্জয়িনীর কবি রূপের ঘাটে তাঁর যাওয়া-আসা দেহজ সৌন্দর্যের খেয়া বেয়ে। কেতকীর কেশরে বিলাসিনীরা কেশ সুরভিত করে, তাই তাকে অনাদর করা চলে না। তাই কেতকীর কথা এসেছে

কালিদাসের কাব্যে।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে মেঘের অলকা যাত্রার বর্ণনা করেছেন কবি। যখন মেঘ নানা পথ চলে দশার্ণ-তে গিয়ে পোঁছবে তখন কেতকীর বেড়া-দেওয়া উপবন তার নজরে পড়বে। মেঘের পরশনে কেতকীর মুকুল ধরবে ঃ—

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ।
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রাম চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল-শ্যাম-জম্বুবনান্তাঃ,
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি-হংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৩ ॥

বনের প্রান্তে মেঘের-ছায়ে ফোটে কেতকীর কুঁড়িগুলি,
হবে পাখীদের নীড়-রচনায় মুখর গ্রামের পথ,
রবে দর্শানে মরালেরা কিছু কাল মানসেরে ভুলি,
জম্বু-কানন শ্যাম ফলভারে নত হবে ধারা পেলে।

হরপার্বতীর মান-অভিমানের লীলা বর্ণনা করেছেন কালিদাস কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম্ সর্গে। শিবের উপর পার্বতী অভিমান করেছেন। পূজা বন্দনা নিয়ে অনেকটা সন্ধ্যে নষ্ট করেছেন শিব। এমন সন্ধ্যে বেলাটা এম্নি করে নষ্ট করতে হয়! শিব ভোলাবার চেষ্টা করছেন পার্বতীর মন—দেখ, পার্বতী, সন্ধ্যের অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে আস্ছে, সন্ধ্যা যেন লুটিয়ে পড়ছে পৃথিবীর উপরে। মনে হচ্ছে যেন গেরুয়া নদী বয়ে চলেছে আর তার তটভূমিতে ঘননীল তমাল তরু। অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে পৃথিবীকে। দেখ, পার্বতী, দেখ ঃ—

নূনমুন্নমতি যজ্বনাং প্রিয়ঃ শার্ব্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে।
পুণ্ডরীকমুখি! পূর্ব্বদিঙ্মুখং কৈতকৈরিব রজোভিরাহতম ॥ ৫৮ ॥

কমল-আননা প্রিয়া হের ঐ চন্দ্রিমা উঠিতেছে,
যাজ্ঞিকদের প্রিয় নিশানাথ নিশার আঁধার নাশে,
প্রাচী-দিগ্-বধূ-মুখখানি, হের, কে যেন রাঙায়ে দেছে,
কেতকী-পরাগে রাঙায়ে আনন দিগ্-বধূ যেন হাসে।

নৃপতি রঘুর সঙ্গে অন্য রাজাদের যুদ্ধ চল্ছে। সেই যুদ্ধ হচ্ছে মুরলা নদীর ধারে। সেই নদী ধারে কেতকীর বন। 'রঘুবংশম্'-এর চতুর্থ সর্গে সেই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন কালিদাস ঃ—

মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ।
তদ্‌যোধ-বারবাণানামযত্ন-পটবাসতাম ॥ ৫৫ ॥

মুরলা নদীর তীরেতে রয়েছে ঘন কেতকীর বন,
কেতকী-পরাগ পবনের বেগে নভতলে উড়ে যায়,
রঘুর সেনার দেহপরে হয় কেয়া-রেণু-বর্ষণ
ঝরিল পরাগ অযাচিত-পাওয়া গন্ধচূর্ণ প্রায়।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর। স্বয়ংবর সভায় নানা দেশের নৃপতিরা সমাসীন। ইন্দুমতীকে পাওয়ার আশায় কতো না তাদের বিলাস-বিভ্রম, কতো না ছলাকলা! কোনো রাজা হাতের লীলা-কমল ঘুরতে লাগলেন, কেউ বা স্থান-চ্যুত কণ্ঠহারটি যথাস্থানে সাজাতে ব্যস্ত, কেউ বা অঙ্গুলি বাঁকা করে স্বর্ণময় পাদপীঠে কি যেন লিখ্তে লাগলেন। এই রকম এক রাজার

বর্ণনা করে রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস বল্ছেন ঃ—

বিলাসিনী-বিভ্রম-দন্ত-পত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ার জঘনে পরমানন্দে যে নখর হানে যুবা,
সে নখর দিয়ে ছিন্ন করিছে কেতকীর পল্লব,
হলুদ-বরণ যে কেতকী দিয়ে রচে বিলাসিনীদল
পরম সোহাগে কানের ভূষণ অপরূপ অভিনব।

'ঋতুসংহারম্' কাব্যে বর্ষা-বর্ণনায় কেতকী উপেক্ষিতা হয় নি, তবে নিজের গৌরবে, না যে বিলাসিনীদের ভূষণ রচনা করেছে কেতকী, তাদের দৌলতে তার এই সমাদর কবির কাছে তা বলা শক্ত। তবে কেতকী-কেশর তার নিজ ঐশ্বর্যে নারীদের হিয়া লুটে নিচ্ছে, এমন কথাও কবি বলেন নি যে তা নয় ঃ— শছয়হ ঐডঘতু উভষত্রফ ুএদ শছয়হ হস

নবজলকণসেকাচ্ছীততামাদধানঃ
কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ
পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিততানাং মনাংসি ॥ ২৬ ॥

নবজলধারা বর্ষণ করি তাহার তীক্ষ্ন ঘাতে
কুসুমের ভারে আনত তরুরে নাশিয়া,
কেতকী-রেণুর পরশে বৃষ্টি ঘন সৌরভময়
লুণ্ঠিয়া লয় আজি নারীদের হিয়া।

শুধু তাই না ঃ—

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃসমন্তাৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকোচ্ছিন্নতাপো বনান্ত ॥ ২৩ ॥

নব বারিধারে প্রশমিত আজি বনানীর তপজ্বালা,
বনানীর দেহে রোমাঞ্চ সম ফুটেছে কদম ফুল,
কেয়া-মঞ্জুরী ফুটেছে যেন গো হাসিতেছে বনতল,
পবনে দুলিছে তরুশাখা যেন বনানী নৃত্যাকুল।

এমন যে কেয়া-মঞ্জুরী সে যদি বরবর্ণিনীদের কাজে না আসে তো তার ফোটাই বৃথা ঃ—

মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি-
রায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুম-মঞ্জরীভি
ইচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

কদম বকুল কেতকী কুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে,
কুটজ ফুলের মঞ্জরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কতো না ছাঁদে।

(ক্রমশঃ)

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

ইয়ানিনা ও এইলাস

আমাদের গল্প বেশ জ'মে গেল। এমন কি ক্যাফের অধিকারিণী মাদাম্‌ও এসে আমাদের আসরে ভিড়ে গেলেন। ইয়ানিনা বলে চ'লেছে 'জান, প্যারীর এটি অতি সাধারণ ক্যাফে, অনভিজ্ঞের কাছে কিন্তু বিশ বছর আগে যাদের সঙ্গে এই ক্যাফের যোগাযোগ ছিল, তারাই জানে, শিল্প ইতিহাসের কয়েকটি পাতা এখানে লেখা হয়ে গেছে। এইখানেই এসে ব'সে থাকত মদিগ্‌লিয়ানি। নিঃস্ব সে, ক্ষুধার তাড়নায় মাদামকে অনুনয় করত একবাটি সুপ্‌ বা এক টুকরো রুটি মাংস দিতে, এই দয়াদাক্ষিণ্যের প্রতিদানে শিল্পী মাদামকে দিত মাঝে মাঝে তার দু'একটি স্কেচ বা ছবি। কিন্তু সেগুলিকে মাদাম অখ্যাত শিল্পীর কৃতজ্ঞতার স্মারক—কাগজ ও ক্যান্‌ভ্যাস্‌এর অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয় ভেবে একটি কাবার্ডএ রেখে দিত। তার উদ্দেশ্য ছিল যে অনেক স্কেচ আর ছবি জমা হ'লে, একদিন সেরদরে সেগুলিকে পুরোন কাগজবিক্রেতার কাছে বিক্রী ক'রে দেবে। অনাহার-পীড়িত শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানির ক্রমে হ'লো যক্ষ্মা এবং অকালে হ'লো তার মৃত্যু। কিন্তু জীবিতকালে যে মদিগ্‌লিয়ানির কেউ করেনি সমাদর, কেউ দেয়নি তার শিল্পের মূল্য, তার জীবনান্তে হঠাৎ সাড়া প'ড়ে গেল সারা শিক্ষিত শিল্পরসিকমহলে, তার এই অকালমৃত্যুতে উঠল হাহাকার। তার শব-শোভাযাত্রার পিছনে চল্‌ল মাইলের অধিক দীর্ঘ প্যারীর নাগরিকরা। তার মধ্যে শোকাবনত মস্তকে চলেছিলেন পিকাসো, বোনার্‌, বাঙ্কুসি প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পীরা। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হ'লো তাঁর মৃত্যুর শোকোচ্ছ্বাস, তাঁর প্রতিভা ও জীবনকাহিনী। মদিগ্‌লিয়ানির ছবি নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে প'ড়ে গেল কাড়াকাড়ি এবং যার জীবিতকালে, তার ছবির জন্য অনেকেই দিতে চায়নি এক কানাকড়ি, তাদেরই হাত বদলে সেই ছবিরই মূল্য উঠতে লাগল ক্রমপর্যায়ে বিরাট সংখ্যায়। সেই সব প'ড়ে দেখে ক্যাফের মাদাম ভাবলেন তিনি আজ অতুল সম্পদের অধিকারিণী কারণ তাঁর কাবার্ড ভ'রে আছে মদিগ্‌লিয়ানির দেওয়া কত ছবি ও স্কেচ্‌। সেগুলিকে বিক্রী করলে তাঁর যে অর্থ লাভ হবে তা শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানি যদি পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে, চর্বচোষ্য খেয়ে যেতেন, তাহলেও তার খরচ এই ছবির মূল্যের এক দশমাংশও হ'ত না।

এই কাবার্ডএর উপর রাখত রেস্তোরাঁর পরিচারিকারা আহারান্তে উচ্ছিষ্ট প্লেটের-সারি। কাঠের ফাটল বেয়ে নামত সুপ ও খাদ্যের তরল চোয়ানি। মাদাম শিল্পীর কাছ থেকে স্কেচ্‌ বা ছবি পেলেই কাবার্ডএর দরজা একটু ফাঁক ক'রে সেগুলিকে ভিতরে ফেলে দিতেন। তারপর কোনদিনই সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেননি। সুপ্‌ ও খাদ্যের রসসিঞ্চিত সেই স্কেচ ও ক্যানভ্যাস্‌এর তাড়া মজে হয়েছিল মূষিকের মুখরোচক খাদ্য। যেখানে মাদাম আশা করেছিলেন দেখবেন, বহুদিনের সঞ্চিত শিল্পসম্পদের রাশি যেন সোনার বুলিয়ান-এ রূপান্তরিত হ'য়ে আছে, সেখানে দেখা গেল কেবল মূষিকভুক্তাবশিষ্ট কাগজ ও ক্যানভাস্‌এর স্তূপীকৃত টুক্‌রাগুলি। নৈরাশ্য যেন একটা সজোরে চপেটাঘাত ক'রে মাদাম্‌কে বসিয়ে দিল। তিনি ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। ছিঁড়তে লাগলেন চুল ও মাথা কুটলেন মাটিতে। চারিপাশ থেকে সবাই এল তাঁকে শান্ত করতে এই ভেবে যে, মাদামের শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানির প্রতি প'ড়ে ছিল অসীম মায়া ও স্নেহ এবং তার বিয়োগে তিনি এখন শোকে মূহ্যমান হ'য়েছেন। কয়েকজন

ক্যাফের পরিচারিকা ছাড়া কেউ জানল না মাদাম কাতর হয়েছেন কিসের বিয়োগে।'

বর্তমান ক্যাফের মাদাম জিজ্ঞাসা ক'রলেন ইয়ানিনাকে, সে কাবার্ডটি কোন্ জায়গায় ছিল। কারণ মদিগ্‌লিয়ানির সময় থেকে ক্যাফেটির সত্বাধিকার বদল হ'য়েছে কয়েকবার এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। সে বল্‌ল 'আমি কি ক'রে বলব? কারণ মাদাম্, যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। এ কাহিনী আমি শুনেছি আমার পিতা কাউণ্টের কাছে। তিনি স্বদেশ-বিতাড়িত হ'য়ে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্যারীতে এসে, কাজ নিয়েছিলেন এই ক্যাফেতে।

আমাদের অলক্ষ্যে এতক্ষণ শ্বশ্রুগুম্ফবিনিন্দিত মুখ, উস্কখুস্ক কেশ, আলুথালু বেশ-বিশিষ্ট একটি যুবক, ইয়ানিনার একটি স্কেচ ক'রতে ব্যস্ত ছিল। তার চেহারার একটা অক্ষম আদলে কাগজ ভ'রে, তার সামনে রেখে সে বল্‌ল 'মাদ্‌ময়জেল্ আমার ছবিটা কিনে নাও। বলা যায়না ভাল ক'রে রেখে দিলে দু' দশবছরে মদিগ্‌লিয়ানির ছবির মত, এ অনেক মূল্যবান হ'তে পারে।' ইয়ানিনার সঙ্গী আর এক ভদ্রলোক, কাগজে এই যুবকের একটি ব্যঙ্গচিত্র এ'কে তাকে দিয়ে বললেন 'এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। এটা রেখে দিও। হয়ত সময়ে এর মূল্যে যে পয়সা পাবে তাতে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির একটা মহাউপায় হ'য়ে যাবে।' যুবকটি রেগে বল্‌ল 'ও বুঝিনি যে, তোমরা আতলিয়ের লোক। তোমাদের মধ্যে নানান্ দেশীয়দের দেখে মনে হ'য়েছিল যে, তোমরা টুরিষ্ট্।' তারপর ইয়ানিনার হাত থেকে স্কেচখানা একরকম ছিনিয়ে বিড়্ বিড়্ করে বকতে বকতে সে চ'লে গেল। ইয়ানিনা, যে ভদ্রলোকটি ব্যঙ্গচিত্র এ'কেছিল তাকে, কপট ভৎর্সনা ক'রে বল্‌ল 'মির্‌কা তুমি অত্যন্ত ইতর। না হয় কয়েক ফ্রাঙ্ক দিয়ে বেচারীকে একটু সাহায্যই ক'রতে! তার গরীবানার এমন উপহাসের কি প্রয়োজন ছিল?' মির্‌কা বল্‌ল 'সে শুধু ছবিটি এ'কে পয়সা ভিক্ষা চাইলে দিতাম। কিন্তু নিজেনক মদিগ্‌লি-য়ানির তুলনা করবার স্পর্ধা দেখানতে তাকে সাজা দেবার লোভ সামলাতে পারিনি।'

মির্‌কা প্রাচ্য ইউরোপের একটি দেশের লোক। প্যারীতে সরকারীবৃত্তি পেয়ে এসেছে চিত্রাঙ্কনের অভিজ্ঞতা পেতে। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার দু'একদিন পরে, সে আমাকে একটি আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনের ক্লাবে নিমন্ত্রণ করল, সেখানে তার নিজের দেশের অনেকগুলি ছাত্র ছিল। এবং তারা প্রায় সকলেই সরকারীবৃত্তিধারী। মিরকা তাদের একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে কমিউনিষ্ট প্রথায় আমায় অভিবাদন জানাল। আমি 'আঁশাতে' ব'লে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করলে সে বল্‌লে 'ম্যাঁসিয়ো তুমি দেখছি কমিউ-নিষ্টবিরোধী।' বললাম 'না ম্যাঁসিয়ো, আমি কারুরই বিরোধী নই। আমাদের মধ্যে হাত উ'চু, কি হাতজোড় ক'রে অভিবাদন করার পার্থক্য থাকলেও এর উদ্দেশ্যে আশাকরি কোন গরমিল নেই।' সে বল্‌ল 'মির্‌কা আমাকে জানিয়েছে যে তুমি ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, এবং এখানে লেখক ও শিল্পীরা সকলেই কমিউনিষ্ট। যদিও সব কমিউনিষ্টরা লেখক ও শিল্পী হয় না।' ব'লে একটা মৌলিক রহস্য ক'রে ফেলেছে ভেবে খুব হেসে নিল। হাসি থামলে বল্‌ল 'অবশ্য মির্‌কার বন্ধুরা সকলে যে কমিউনিষ্ট নয় তা আমার জানা উচিত ছিল। বন্ধু মির্‌কার মাঝে মাঝে চেপে যায় বুর্জোয়া খেয়াল। এই দেখনা একটা হোয়াইট্ রাশিয়ান মেয়ের প্রেমে প'ড়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। যাই হোক, তুমি যে কমিউনিষ্ট নও তা বুঝেছি। এখন তুমি কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত তা জানাও।' আমার মনে পড়ল আতলিয়েতে প্রথম পরিচয়ে, সিত্রিনোভিচ্‌ও প্রশ্ন করেছিল, আমি কমিউনিষ্ট, স্যোসালিষ্ট বা ফ্যাসিষ্ট কিনা। কিন্তু আমি এর কোনটাই নয় বলায়, হতভম্ব হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কোন্ গ্রহ থেকে খসে পড়লাম এই

পৃথিবীতে! যেন এর বাইরে কেউ থাকতে পারে তা তার ধারণার অতীত। বললাম আমি মনুষ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত। এবং আশা করি সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। সে বলল 'তোমার কথাবার্তা ও রাজনৈতিক ধারণার আভাস দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কুল্যাক্-সম্ভূত। শুনেছি তোমাদের দেশে ইংরাজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের খুব তোয়াজ করে থাকে। তোমরা রেখেছ প্রোলিতারিয়াত্‌দের ক্রীতদাস ক'রে। শোনা যায় তোমাদের শ্রেণীর লোকেরা চাকরদের গোড়ালির বন্ধন কেটে দেয়, যাতে তারা দৌড়ে পালাতে না পারে। হেসে বললাম 'ম্যঁসিয়ো, কুল্যাক্‌দের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে দেখছি ঐতিহাসিক সত্যকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছ। আমরা চাকর রাখি ঠিক, কিন্তু তারা ক্রীতদাস নয়, আর গোড়ালির বন্ধন কাট্‌তে উদ্যোক্তারা ছিলেন হয়ত তোমারই পূর্বপুরুষদের কেউ, যদি তাঁদের কেউ আমেরিকায় গিয়ে থাকেন সেট্‌লার হ'য়ে। আমেরিকান সেট্‌লার্‌রা এই কাজে দড় ছিলেন—নিগ্রো ক্রীতদাসদের অধীন ও বন্দী রাখতে। আমি কুল্যাক্-সম্ভূত কিনা বল্‌তে পারি না, তবে পৈত্রিক ভিটে একটা আছে। এবং সাধারণ মজুরের মতই খেটে দিন চালাই। এতে আমি তোমার রাজনৈতিক মতে মানুষের কোন শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ব সে তুমিই জান।' মির্‌কা আমাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বল্‌ল 'এইলাস্-এর কথায় কান দিও না, বা কিছু মনে ক'রো না। ও ওই রকম উৎকট অন্ধভাবে সাম্যবাদী।'

এইলাস্ চেঁচিয়ে উঠল 'খবরদার মিরকা, ওকে তুমি তোমার রাজনৈতিক ভ্রান্তি দিওনা। ও আমার শিকার।। এমন একটা পিওর ডেকাডেন্ট মাল পেয়েছি, ওর শুদ্ধিকরণ (Purificaton) একটা চমৎকার এক্‌স্‌পেরিমেন্ট্ হবে।' সে ফের শুরু করল 'মার্কসের মতে, যে শ্রেণী যত বেশি ডেকাডেন্ট, বিশুদ্ধিকরণের সুযোগ পেলে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় সে ততবেশী দ্রুত। ম্যঁসিয়ো নিশ্চয়ই জান, মানবসমাজে আছে ক্যাপিতালিস্ত্, বুর্জোয়া, পেতিবুর্জোয়া ও প্রোলো-তারিয়াত্ শ্রেণী। এই প্রোলোতারিয়াতরা ক্যাপিতালিস্ত্‌দের দেশে ধনীদের দ্বারা শোষিত ও পীড়িত হ'য়ে পিষে মরছে। এদের উদ্ধার করতে হবে। উপরে এনে এদের হাতে তুলে দিতে হবে ন্যায্য পাওনা রুটি।' বল্‌লাম 'ম্যঁসিয়ো আমি তোমার সঙ্গে একমত যে দেশের লোকের ও সরকারের কর্তব্য, যাতে প্রত্যেকের পরিধেয়, অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হয়। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ কেবল কি রুটি-প্রাপ্তির সংগ্রাম ও জয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে? যে রুটি পায় না তার জীবন কি একেবারে নিষ্ফল? বহু শিল্পী, লেখক, কবি ও দার্শনিকরা ভোগ করেছিলেন অসীম দারিদ্রের তাড়না এবং তাঁদের অনাহারগ্রস্থ জীবন, মানব-ইতিহাসে রেখে গেছে লজ্জা ও কলঙ্কের ছাপ্। কিন্তু আমার মনে হয় এই দারিদ্র ও দুঃখ ভোগ ক'রেও, সৃষ্টির আনন্দের ক্ষণগুলিতে হয়ত পার্থিব নিঃস্বতার আঘাত দাগ বসাতে পারেনি তাদের মনে ও দেহে।' এইলাসের উত্তর এল যেন ষ্টেন্‌গানের গুলি-বৃষ্টি। 'আরে তাদের পেট যদি ভরা হত তাহলে তারা যে শিল্প ও সাহিত্যের সম্পদ এনে দিত তার তুলনায়, তাদের দেওয়া দান অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাছাড়া তারা তো কেবল বুর্জোয়া ও কাপিতালিস্ত্‌দের দাসত্ব করায়, তাদেরই তাঁবে-দারী-মোহাচ্ছন্ন শিল্প ও সাহিত্যকে এই কাপিতালিস্ত্ ও বুর্জোয়াসেবী ভ্রান্তি ও মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাদের বর্তমান সংগ্রাম।' বল্‌লাম 'যারা শিল্প ও সাহিত্যের সমঝ্‌দার, তারা তো এই দানকেই দ্যাখে মহান ও সম্পূর্ণ। এরই রসে রাঙান তাদের মনের কোন অংশটা যে খালি তা তো মনে হয় না। আর এই সংগ্রামেই তো জন্ম হচ্ছে বড় শিল্প ও সাহিত্যের। যখন সবাই ন্যায্য পাওনা রুটি পেয়ে যাবে তখন সংগ্রামের কারণ শেষ হ'য়ে যাওয়ায়, বলবার আর বোধহয় কিছু থাকবে না। এবং পরিপূর্ণ উদর আনবে সার্বজনীন ঘুম, মানসিক আলস্য ও

নিষ্ক্রিয়তা।' সে বল্‌ল 'এ শিল্প রসের অধিকারী কেবল একটি ছোট সমঝ্‌দারের সমষ্টি। আমরা এরই বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে সুবিধাভোগীদের নিপাত করে এমন শিল্প ও সাহিত্যের জন্মের সুযোগ এনে দেব, যা আনন্দ দেবে প্রত্যেকটি 'কামারাদ্‌কে।' বল্‌লাম 'ম্যঁসিয়ো আমার মোহাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক বলে, শিল্প ও সাহিত্যে ক্রমোত্তর উচ্চাঙ্গ সন্ধানে হয়, নূতনতর কলা ও কাহিনীর সৃষ্টি এবং তার স্রষ্টা ও রসগ্রাহীর সংখ্যা যত চেষ্টাই কর না, থেকে যাবে সংক্ষিপ্ত। তোমার ভাবধারায় তৈরী শিল্প ও সাহিত্যিকদের রচনা-প্রকাশ মাত্রেই সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে, তোমার কথায় প্রোলেতারিয়াত্‌-কৃষ্টির আদর্শ রূপায়ণ হবে কিন্তু তাতে উচ্চাঙ্গ ও অভিনবকথাটা কেটে বাদ দিতে হবে।

তোমরা তো পিকাসোকে কমিউনিষ্টদের বন্ধু বলে খুব খাতির কর কিন্তু তার রচনা তো বহুজনগ্রাহ্য নয় কাজেই তাঁর শিল্পকে তোমার নবতন্ত্রের রাষ্ট্রে স্থান দেবে কি? সে বল্ল 'পিকা-সোর কাজ আমরা রেখে দেব সংগ্রহশালায়, ঘুণধরা ক্যাপিতালিস্ত রাষ্ট্র-উদ্ভূত অপকৃষ্টির চরম নিদর্শন হিসাবে। পিকাসো তাঁর কাজে দেখাচ্ছেন ঐতিহাসিক সত্যকে। তাঁর রচনাগুলিতে ফুটে উঠেছে ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতিতে পরিচালিত সমাজের পচন্‌শীল ও গলিত রূপ। জিজ্ঞাসা করলাম—পিকাসোকে তাঁর শিল্পের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা কেউ জানিয়েছে কিনা এবং তিনি এমতকে সমর্থন করেন কিনা। সে বল্ল 'তাঁকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি। তিনি যে ডেকাডেন্স্‌-প্রসূত, তার মোহবিস্তৃত জালের বাইরে যে জ্ঞানের পথ তৈরী হচ্ছে তা তিনি দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ।' বল্লাম 'একই মস্তিষ্ক কমিউনিজমকে বুঝে পছন্দ করবে, অথচ শিল্প প্রকাশের বেলায় তাকে আড়াল করে ডেকাডেণ্টএর পচনক্রিয়ার রূপ দেখাতেই কেবল মত্ত থাকবে একি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা? অবশ্য পিকাসোর চিত্রকে নিয়ে যতগুলি ব্যাখ্যা শুনেছি তার কোনটাই খুব পরিস্কার ও বোধগম্য ভাষ্য নয়। অনেক সময়ে ব্যাখ্যাকারীরা তাঁর রচনাকে উপলব্ধি করেছেন কিনা সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ হয়। মনে পড়ে একবার পিকাসো-বিশেষজ্ঞ এক শিল্প-সমালোচককে প্রাইভেট কালেক্‌সানএর একটী অপরিচিত পিকাসো-চিত্রের প্রতিলিপি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ ছবি তাঁর কেমন লাগে। তাঁর স্বাক্ষরটীকে ঢেকে রেখে চেয়েছিলাম জানতে তিনি পিকাসোকে কতখানি চিন্‌তে পারেন নাম না দেখে। তিনি বল্লেন এটি কোন পিকাসোর নকলকারী অপারগ শিল্পীর অক্ষম শিল্পপ্রচেষ্টা। ছবিটির রঙের ও অবয়ব সমন্ব-য়ের শত ত্রুটী দেখিয়ে তার শ্রাদ্ধ করে যখন তিনি আসল শিল্পজ্ঞানের কসরতে উৎফুল্ল, তাঁকে পিকাসোর স্বাক্ষরটি দেখালাম। ইন্ধনে ঘৃত নিক্ষেপে আগুন যেমন সহসা লেলিহান হয়ে উঠে, তিনি একযোগে, শ্লেষের খরতা ক্রোধের দহন ও ঘৃণার বিষকে উদ্গার করে বল্লেন 'ম্যঁসিয়ো এটি অতি নিম্নস্তরের উপহাস' তারপর একটি দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ আমার উপর নিক্ষেপ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পিকাসোর চিত্র সম্বন্ধে একটি চলিত অভিমত হচ্ছে যে তিনি আজকের জগতের কপট রসজ্ঞদের উপহাস করবার জন্যে এই গূঢ় চিন্তামূলক দুর্জ্ঞেয় শিল্পসৃষ্টির ছলনা করেছেন বোধহয় একদিন তিনি এই মূঢ়দের ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন তাদের জানিয়ে যে এ পর্যন্ত তারা তাঁর যে ছবি থেকে আবিষ্কার করেছে যেসব সাধারণের অবোধ্য নিগূঢ় অর্থ সেগুলি আসলে অর্থহীন নক্‌শার হিজিবিজি মাত্র। অশব্য তখন তাঁর এই মত প্রকাশে হয়ত তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে গারদে পাঠিয়ে দেবে।

এইলাস বল্ল 'আচ্ছা আমার মত না হয় তোমার পছন্দসই হলনা তোমার নিশ্চয়ই পিকাসো সম্বন্ধে একটা অভিমত আছে সেটা আমাকে শুনিয়ে দাও তুলনা করে দেখি কোনটা গ্রহণযোগ্য।

বল্লাম 'পিকাসোর সঠিক ধারণা ও সার্থকতা হবে আজ নয়, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে যখন তাঁর সামনে পড়ে যাবে অনেকখানি জমি যেখানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কেবল নজরে পড়বে তাঁর রচনার সারাংশটুকু। আমার ভাস্কর-বন্ধু সেবাস্তিয়াঁ তাঁর সম্বন্ধে একটা ঘটনা সেদিন বল্ল যার থেকে পিকাসোর সত্য স্বরূপের খানিকটা আভাস যেন পাওয়া গেল।

সেবাস্তিয়াঁ দক্ষিণ ফ্রান্সে এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকতে পিকাসো এসে হলেন সেখানে অতিথি। সকালে প্রাতরাশের টেবিলে কফি পাত্রে ভরবার আগে পিকাসো পেয়ালাটা নিয়ে নিয়ে হেলিয়ে কাত করে, উল্টে নানাভাবে ছেলেখেলা করছিলেন হটাৎ উঠে নিয়ে এলেন এক তাড়া ড্রয়িং কাগজ এবং আঁকতে শুরু করলেন পেয়ালাটা। প্রথম স্কেচেএ পেয়ালাটার ঠিক স্বরূপ ধরা পড়ল কিন্তু যেমন তিনি আরও সীটের পর সীটে নতুন নতুন নক্সা করতে লাগলেন পেয়ালার বাস্তব রূপ ক্রমান্বয়ে বদলাতে লাগল। শেষে যেন সেটা মানবীয় সত্ত্বা পেতে আরম্ভ করল। তার পরিবর্তিত আকৃতিতে উঁকি মারতে লাগল মানুষের মুখ, ফুটে উঠল নারীর একটি সুপুষ্ট পয়োধর ও উরুস্থান ও তার কেন্দ্রে একটি অনিমীলিত চোখের বিস্তার; দেখাল সেটা যেন মুখব্যাদন করে কফি পানার্থে উদ্‌গ্রীব। এরপর তিনি সব ড্রয়িংগুলিকে তাল পাকিয়ে ফেলে দিয়ে কফি পানে রত হলেন।

সেবাস্তিয়াঁ অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল পিকাসোর এই শিল্প-ব্যায়াম। তাঁর মনে হল যে যেমন অনেক মানুষ মস্তিষ্কের কোন স্থান আল্‌গা হওয়ায় ক্রম চলমান ও বিবর্তিত মনের চিন্তাধারাকে অবিরাম মুখে বলে চলে তিনি যেন তাদেরই মত মুখে না বলে তা চিত্রের রূপে প্রকাশ করে গেলেন। পেয়ালাটার আকৃতি ও তার উপরের আলো ও ছায়ার খেলা তাঁর মনে এনেছিল এক শিল্পধারণা এবং তাকে রূপ দিয়ে সে ধারণাকে পূর্ণ না করতে করতে তাঁর মন ছুটেছিল আরো কত স্মৃতির খাতায় জমা নানা মানুষ, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও রঙবেরঙের কুহেলিকার হট্টগোলের পিছনে। এই জন্যই বোধ হয় তাঁর রচনাগুলিকে দেখায় না দীর্ঘচিন্তা ও বিচারনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে। প্রায় অসংলগ্ন—স্রোতে ভাসা খড় কুটো যেমন কিনারায় ভেসে জড়ো হয় তেমনি তাঁর মনে, না থেমে যাওয়া নানা ছাপের অসংকোচ ভিড়, তাঁর ছবিতে সহজেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। কেউ কেউ হয়ত, বলবে যে এ ব্যাখ্যা একটু নুন জল সমেত গিলে ফেলা সহজ কিন্তু তোমার অভিমত ও কারুর গলা দিয়ে নামবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় শিল্পিরা তাঁদের দৃষ্টিকে বাস্তব বাহ্য স্বরূপের খাঁচায় বেঁধে তারই আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন মনের রাজ্যের মুক্ত সীমানাবিহীন—ইচ্ছামত সংকোচিত ও সম্প্রসারিত করা চলে এমন, বন প্রান্তর ও প্রাঙ্গণকে; সোনা রূপো হীরে মাণিকের ফুল-পাতাভরা গাছকে; অভিনব মানুষ ও জীবকূলকে যাদের কোনদিন দেখতে পাওয়া যাবে না চর্ম্মচোখের দেখা পৃথিবীতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাহ্যদৃষ্টির চশমা যেন ভেঙ্গে যাওয়ায়, শিল্পীরা উদ্দাম পাড়ি দিয়েছেন সেই মনের মুক্ত জগতে এবং বাস্তব জগত যেন সরে গেছে বহুদূরে ও দৃষ্টির বাইরে। এই পথে অভিযাত্রী শিল্পীদের পুরোভাগে চড়ে বসেছিলেন পিকাসো। তাঁর পিছনে তাঁর আবিস্কৃত যে কল্পনা পড়ে রইল তাকে মনে ধরতে, ছুঁতে হলে, সামনে দেখা বাস্তবের অতি নির্দিষ্ট আকারগুলিকে ভুলে অন্তরের বিস্তারে খেয়ালের ঘোড়ায় চড়ে তাঁরই পথে কদম চালিয়ে দিতে হবে।"

এইলাস বল্ল, 'তোমার পিকাসো সম্বন্ধে প্রতি কথাটিই প্রমাণ করছে যে তিনি পচনশীল ডেকাডেন্টএর প্রদুকসিয়ঁ (Production), প্রত্যেক শিল্পীর কর্তব্য হচ্ছে সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করবার মত শিল্পের রূপ প্রচেষ্টা। তুমি কি বল যে যারা আজকের রাষ্ট্রে

নিম্নস্তরে বাস করে তাদের জীবনে শিল্পের স্থান নেই বা তাদের উন্নততর শিল্পবোধকে জাগ্রত করার প্রয়োজন নেই। বল্লাম বন্ধু তোমার নিজের মতকেই সমর্থন করে পূর্বেই বলেছি এই নবতন্ত্রের শিল্পপ্রচেষ্টায় 'উন্নততর' কথাটা আজকের মাপকাঠিতে ব্যবহার করা চলবে না। সে বল্লে তা হলে তোমার এই আইভরি টাওয়ারএর আবাসী শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে কাপি-তালিস্ত্ ফ্যাসিস্তদের সমর্থন করে চালাবে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি অত্যাচার, লুণ্ঠন ও অবিচার।' বল্লাম 'না বন্ধু আমি সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন অবিচারী ও অত্যাচারীকে সমর্থন করি না। কিন্তু এও আমি মানতে রাজী নই যে তোমার ভাগ করা শ্রেণীর একটি বাদে আর বাকি ক'টায় কেবল আছে অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারীরা।

যাদের তুমি বল আজকের সমাজে নিম্নস্তরের লোক, তাদের মধ্যে শিল্পবোধ জাগান বা তাদের শিল্পরসের অংশীদারী করা, তাকি বাকি স্তরের লোকগুলিকে জাহান্নামে না পাঠিয়ে সম্ভব হবে না? আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে তাদের সকলের সঙ্গে সমান সৌন্দর্য্য-ভোগের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য বর্তমান রাষ্ট্রবিধির উৎসন্নচেষ্টার চেয়ে কার্যকরী উপায় হবে প্রত্যেক নগরে নগরে সাধারণ শিল্প সংগ্রহশালার ব্যবস্থা ও প্রত্যেক বিদ্যায়তনে শিল্পদর্শন ও উপলব্ধির সুযোগ ও শিক্ষার ব্যবস্থা। তুমি এ স্বীকার করতে বাধ্য যে ফ্রান্স-এ এ সম্বন্ধে লোকেরা বেশী সুযোগ পাওয়ায় এ দেশে শিল্পে রসগ্রাহীর সংখ্যা সর্ব স্তরে এমনকি শ্রমিক চাষীদের মধ্যেও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এইলাস আমার বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে জানাল যে ক্যাপিতালিষ্ট ও বুর্জোয়ারা জন্মগত স্বার্থপর এক্স্প্লয়টার তারা নিম্নস্তরের শ্রেণীকে কোনদিন নিজেদের সুখে ভোগের ও বিদ্যার একরত্তিও ভাগ দেবেনা। উচ্চাঙ্গ শিল্পের রসাস্বাদ কেবল তাদের শ্রেণীর মধ্যেই রেখে দেবে। বল্লাম, 'তোমার মতবাদে এইবার গোলমাল এসে যাচ্ছে ভ্রাতা। সাধারণগ্রাহ্য এ তোমার নব্যতন্ত্রীদেশেও হওয়া কঠিন। আরো বলি যে, তোমার এই ব্যাপক কয়টি শ্রেণীবিভাগে বেশ কিছু খুঁত রয়ে গেছে। কারণ দেশ অনুযায়ী ধনী ও দরিদ্রের স্তরে মনোবৃত্তিতে ও আচরণে বেশ কিছু তফাৎ দেখা যায়। আরও তোমায় বলি যে, আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, তারা রুটি পাবার জন্যে লড়াই করে না, তাকে ত্যাগ করার জন্যে তৈরী করে তাদের দেহ ও মনকে। তাদের অস্তিত্ব হয়ত রুটি-সন্ধানী লোক-সমুদ্রে খুঁজে দেখতে গেলে লাগে দূরবীণ, কিন্তু তাদের আদর্শ ও বাণী যেন বহু বাহু বিস্তার করে জনগণকে বেষ্টন ক'রে আছে। তাঁদের অনেকে নিজের সুখ ও পার্থিব সম্পদকে ত্যাগ ক'রে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তুমি বোধহয় রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শোননি,—এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' নীতিকে মুখ্য ক'রে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন শিক্ষায়তন, হাঁসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, পল্লীউন্নয়ন, ধর্মপুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি মানব কল্যাণের প্রতিষ্ঠানগুলি। তোমার রাজনৈতিক আখ্যার কোন্ তালিকায় তাঁদের ফেলবে?' সে বলল 'তারা প্যারাসাইট্ ও এক্স্প্লয়টার—অনধিকার চর্চা করছে। তাদের, পরোপকারের অছিলায় ধর্মভণ্ডামীর প্রচার চেষ্টার জন্য, সত্বর তাদের নিপাতের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে সে ব্যবস্থা করার আগে তাদের এই সংস্থাকে সাম্যবাদ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করা যায় কিনা তার একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। তোমার কথায় মনে হচ্ছে, এই ধর্মান্ধদের খানিকটা সংগঠন করবার সামর্থ আছে। তাদের মধ্যে প্রচারের দ্বারায় প্রোলেতারিয়াত্ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কি, তা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে দু' একজন যারা উচিত রাষ্ট্র-বিধির জ্ঞানে সহজে সচেতন হতে পারে তাদের—সে ভাবে তৈরী করে, বাকী জ্ঞানহীনগুলোকে

তাদের জিম্মায় মানুষ করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হেসে বল্‌লাম 'কি প্রচার ক'রে ও কি ব'লে, তুমি ভাঙ্‌বে তাঁদের বিশ্বাস ও সৎকর্মের ধারণা? পরের মঙ্গলে সর্বত্যাগী তাঁরা, কোন্‌ যুক্তি দিয়ে প্রলুব্ধ করবে তাঁদের, তোমার সাম্যবাদ গ্রহণ করতে? তাঁরা প্যারাসাইট হলেন কি ক'রে? তাঁরা তো কেবল ধনীর অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিলিয়ে দিচ্ছেন গরীবদের হাতে, তাদের জীবন উন্নয়নে।' সে উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌ল 'আমি বলি, এটা তাদের অনধিকার চর্চা। এ কাজ করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রনিয়ন্তা দলের, ভগবান-বেচা লোকেদের নয়, এরা সব ভগবানে বিশ্বাসী লোকেদের ধর্মের নেশায় বিহ্বল ক'রে, সফল করছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি।' বুঝলাম এইলাসের ধারণা, তার মত ও যুক্তি ছাড়া আর কোন পথ প্রণালী শোনবার বা গ্রহণ করবার উপযুক্ত নয়। তবুও বললাম 'আমি সে ভগবানে বিশ্বাস করি না, যাকে প্রার্থনার ঘুষ দিয়ে সুখ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু অশ্রদ্ধাও করি না, যারা এইভাবে ভগবানে বিশ্বাস করে ও প্রার্থনা জানায়। ভগবানই বল, আর মার্কসের রাষ্ট্রনীতিই বল, আপন জীবন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস, যার উপর নির্ভর ক'রে, বিনা বিচার ও প্রশ্নে গ্রহণ করা যেতে পারে কতগুলি নীতিকে, জীবন সমস্যার প্রয়োজনে একান্ত উপায় হিসাবে। তাই হ'য়ে যায় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কখনও বা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় উদ্‌ভাসিত ভগবানের বাণী, দার্শনিকের গভীর চিন্তা, বিচার ও মীমাংসাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ নেতার সুরুহ অনুশাসন বাণী। অনেক যুগ ধ'রেই মানুষ জেনে ফেলেছে মঙ্গলও অমঙ্গলের স্বরূপকে। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ, ন্যায় ও অন্যায়ের উপলব্ধি; কেবল ব্যবহারিক জগতে তার সঠিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় যুগে যুগে সৃষ্টি হ'য়েছে ধর্মের বাঁধন ও রাষ্ট্রের নিয়ম। প্রত্যেক রাষ্ট্রনীতির বা সমাজনীতির উদ্ভবে প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও সাধারণের মঙ্গল কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজগত আত্মাভিমান ও স্বার্থ সাধারণের মঙ্গলার্থে উচিত নীতি ও পথকে করে বিকৃত। কি করলে সকলের মঙ্গল ও শান্তি হবে তা বোধহয় বলা খুব কঠিন নয়, কেবল তার কার্যকরী প্রয়োগপন্থা খুঁজতেই ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি উঠছে ও নামছে যুগে যুগে। বর্তমানের সাম্যবাদ সেই তরঙ্গভঙ্গেরই একটা ঢেউ। এবং এটাকে শেষ ও একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ পথ ব'লে মেনে নেওয়া যাবে কিনা, মানব সমাজ এর ব্যবহারের মেয়াদই তার প্রমাণ দেবে। আমার মনে হয়, মানব মনের হাসি ও কান্না; রাগ, দ্বেষ-ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা, প্রেম ও বিরহ প্রভৃতি আদিম অনুভূতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রের বন্ধনে কিছু না কিছু ফাঁক থেকে যাবেই। মানুষ অবশ্য খুঁজতেই থাকবে সমাজ ও রাষ্ট্রে যাতে বিশৃংখলতা না আসে, তার জন্য অতীত ও বর্তমানের চেয়েও উন্নততর পথ. এ বিষয়ে তোমার ও আমার মধ্যে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।'

. এইলাস যেন আমার সব কথা ভাল করে শুনল না। তার জবাব এল, যখন দেখলেই এসব ধর্ম কিংবা রাজনৈতিক পন্থায় সন্তোষজনক রাষ্ট্র বা সমাজ গ'ড়ে উঠল না এত যুগ ধরে, তখন সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ব'লে ফেলে দেওয়া উচিত। যখন মূল খুঁটিতেই ঘুণ ধরে, কুটিরের চালে নতুন খড় দিয়ে লাভ কি? তাকে ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে গড়া উচিত দৃঢ় ভিত্তি ও শক্তিময় খুঁটিতে ভর করা নতুন আশ্রয়।' আমি বললাম 'তোমার প্রণালী গ্রহণ করলে, ইতিহাস ব'লে আর কিছু থাকবে না। ধ্বংস-হস্তের মার্জনায় অতীতের কৃষ্টি ও জীবনের স্মৃতি যাকিছু অস্তিত্ব আছে তাকে ঘুণ-ধরা ব'লে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করেই কি নূতনের বোধন হওয়া উচিত?' তার মতে শুনলাম যে যাকে আমরা জানি ইতিহাস হিসাবে, তার কিছুটা ছেঁটে বাদ দিয়ে বদ্‌লে, কিছু আধুনিক মতবাদের প্রলেপ দিয়ে নতুন না ক'রে নিলে, সাম্যবাদী সমাজে তা

গ্রহণীয় নয়। ইতিমধ্যেই ইয়ানিনা আসায়, আমাদের আলোচনাকে ঐখানেই ক্ষান্তি দিতে হ'ল। সে বলল 'কি এইলাস, তোমার রাজনৈতিক তর্কজালে এ বেচারীর মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টায় আছ? মির্কা আমাকে এইমাত্র জানাল, তুমি নাকি ওকে বলেছ, ওদের সেণ্ট আর ইয়োগীদের সব লিকুইডেড করা উচিত! তুমি তো ষ্টেট্এর লিডার্সিপ্ চাও। এই ভারতীয় সাধুদের লিকুইডেড্ করবার পন্থা না খুঁজে, তোমার উচিত ওদেশে গিয়ে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। ভেবে দেখ, সুবিধা হবে যৌবনকে বহুকাল ধ'রে রাখতে, আগুন খেতে পারবে জলের মত, মাটিতে কবরস্থ হ'লেও একমাস পরে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসতে পারবে—সুখশয্যায় একরাত সুনিদ্রা দিয়ে আসার মত। তারপরে বিষ, এ্যাসিড, ভাঙা কাঁচ, পেরেক খেতে পারবে, মিঠাই খাওয়ার মত সহজে কিংবা বিনাহারে বিষাক্ত সরীসৃপের সান্নিধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে ছেলেখেলা হবে।' এইলাস্ একেই বিরক্ত হয়েছিল, বেশ-জমে-ওঠা বাক্যালাপে বাধা পাওয়ায়, তার এই বক্রোক্তিতে আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে সে বলল 'কুল্যাক্এর মেয়ের আর কত বুদ্ধিই বা হবে! চিরকালই তো তোমরা গরীব শ্রমিক ও চাষীদের রক্ত শুষে অলসবেলা কাটিয়েছ, এইসব গাঁজা-খুরি গল্প ক'রে।' বড় আহত হ'ল ইয়ানিনা। তাকে এত তীব্র আক্রমণের কোন কারণই দেখলাম না। সে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা ক'রে, বেশ হাল্কা ভাবে হেসে বললে 'তোমাদের দেশে সকলেই তো একটু আধটু ইয়োগী। তুমি ওকে সম্মোহন ক'রে, ওর সপ্তমে চড়া মেজাজটা একটু নামিয়ে দিতে পার না?' তাকে জানালাম, আমাদের সাধুরা ইয়োগ করলেও, তাদের উদ্দেশ্য নয় এই রকম ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ান। সে জিজ্ঞাসা করল 'তবে তারা করে কি?' এইলাস বলল 'আমার বন্ধু এইমাত্র জানালেন, তারা আগে করত ধর্মের ভণ্ডামী, আর এখন তারা লোকসেবার অছিলায় রাষ্ট্র শাসনের খেলার অভিনয় করছেন।' ইয়ানিনা তার মন্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে বলল 'তোমাদের ইয়োগীদের সম্বন্ধে আমার ভাল করে জানবার অনেক-দিনের ইচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই তাদের সংস্পর্শে এসেছ? আমাকে বলবে তাদের কথা?' বললাম 'মাদ্ম্যয়জেল্, জীবনে একটি ইয়োগীর কথাই আমার বিশেষ করে মনে আছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে—

কৈশোর থেকে যৌবনে আসার মাঝপথে, আমাদের মনে হ'য়ে যায় একটা বিভ্রাট। রাজপুত্তুর রাজকন্যার সাততলা প্রাসাদের আনাচে কানাচে খুঁজতো যে মন, ঘুমন্ত রাজপুরীকে জাগাবার সোনার কাঠিটিকে, কিংবা পাতালের গোপন কুঠুরী আবিষ্কার ক'রে দৈত্যদানার প্রাণ-রাখা শুক পাখীর গলা টিপে, বন্দী রাজকুমারীকে মুক্তি দেওয়ার বাহাদুরী, সেই মিঠে স্বপ্নগুলিকে খান খান ক'রে, আসে বাস্তবের বার্তা। এই সময় আমাদের কারোর বা মন হ'য়ে যায় উদাস, কারোর বা তিক্ত ও ক্ষিপ্ত। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে, আমি উদাসীন হ'য়ে একবার পৌঁছে গিয়েছিলাম দক্ষিণ ভারতের মাইশোরএ, রামকৃষ্ণ মিশনে। এই আশ্রমে আমার কাজ ছিল, আগন্তুক অতিথিদের সুখ সুবিধার তত্ত্বাবধান। তখন শীতকাল। স্থানটি অধিত্যকার উচ্চতায় বেশ কিছু ঠাণ্ডা। আশ্রমে একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রাঙ্গণ শুভ উচ্চারণে মন্দ্রিত ক'রে, উপস্থিত হলেন এক সাধু। প্রায় ছ'ফুটের উপর লম্বা এক বিরাট পুরুষ। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে পরিধানের বালাই ছিল না। কেবল একটি ব্যাঘ্রচর্ম বাঁ কাঁধ থেকে সামনে ঝোলান থাকায় আমাদের লজ্জা নিবারণ হচ্ছিল। কারণ দিগম্বর সাধুজী যে, লজ্জা ও শরমের বহু ঊর্ধ্বে পৌঁছেছেন, তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি অনুরোধ করলেন আমাদের আশ্রমে তিনদিন কাটাবার। আমাদের আশ্রমের অধিনায়ক স্বামীজীকে, সাধুজীর উপস্থিতি সংবাদ দিলে, তিনি নির্দেশ দিলেন যে অতিথিদের থাকবার একটি ঘর

পরিষ্কার ক'রে তাঁকে দেওয়া হোক। সাধুজীকে ঘরের কথা বলতেই, তিনি জানালেন যে, তাঁর কোন সাধারণ আবাসগৃহ আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। উন্মুক্ত আকাশই তাঁর আবাসের আচ্ছাদন। সামনের প্রাঙ্গণে একটি নাগ-কেশর গাছের তলা দেখিয়ে বললেন 'ঐখানেই তিনরাত্রি আমাকে থাকতে দিলে আমি খুব খুশী হব।' স্বামীজীকে এ সংবাদ দিলে তিনি বিরক্ত হ'য়ে বললেন 'আচ্ছা বিপদ! এখন তাঁকে দিতে হবে আধ ডজন কম্বল এবং তাঁর সামনে এক বিরাট অগ্নি-কুণ্ড জ্বলাবারও ব্যবস্থা করতে হবে।' সাধুজীকে এ বিষয়ে জানাতেই শশব্যস্তে আমাদের নিরস্ত করলেন, তাঁর সুখ সুবিধার ব্যবস্থায় অযথা উদ্ব্যস্ত হ'তে। কারণ তাঁর কম্বল কিংবা আগুনের কোন প্রয়োজন নেই। আহারের কথায় বললেন যে, সে রাত্রে তারও প্রয়োজন নেই কারণ তিনি একাহারী, দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তাঁর দৈনিক একান্নভোজন সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। এইবারে আশ্রমের স্বামীজী বেরিয়ে এলেন সাধুজীকে স্বাগত জানাতে। আশ্রমের দাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তার সুবিধা নিয়ে, বহু ভণ্ড সাধুই মাঝে মাঝে আশ্রমে থাকবার চেষ্টা করত। স্বামীজী প্রথমে ভেবেছিলেন, ইনি বোধহয় তাদেরই একজন। স্বামীজী ও সাধুজীর স্বাগত পরিচয় হ'ল শুদ্ধ সংস্কৃতে। যদিও স্বামীজী সংস্কৃতে নামকরা পণ্ডিত তবুও সাধুজীর ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে তিনি প্রতিহত হ'য়ে গেলেন। পরদিন সকালে সাধুজীর পরিচর্যায় আমি হাজির হ'লে তিনি অনুরোধ করলেন, তাঁকে যদি আমি শহরটি দেখিয়ে দি। পথে চলতে আমাকে সাধুজী প্রশ্ন করলেন 'তোমার এই অল্প বয়স, এই বৈরাগীদের মাঝে এসে তুমি কি করছ?' বললাম 'হঠাৎ মনে কিছু আর ভাল লাগল না, তাই চ'লে এসেছি এদের মধ্যে। এদের জীবনধারাকেই মনে হয় সবচেয়ে শ্রেয় ও প্রেয়।' সাধুজী নিষেধের তর্জনী নেড়ে বললেন 'কখন এ কাজ ক'র না। তুমি জান তোমার আশ্রমের অধিবাসীরা কেন সাধু হ'য়েছে?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বললেন 'কারণ এরা সাংসারিক জীবনে ঘা খেয়ে, পরাস্ত হ'য়ে, হয়েছে বৈরাগী। তুমি তো বালক মাত্র। সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই তোমার হয়নি। তবে তুমি কেন শখ ক'রে এদের মধ্যে আসবে? গেরুয়া দেখেই মনে ক'র না, এদের মনে আছে কোন রঙ্। বেরঙা জীবন এদের সব সুরহীন ও বিস্বাদ। সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তিনি কেন হয়েছেন সাধু? বললেন 'ভইয়া সংসারে হার মেনে, দুঃখ পেয়ে।' জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে, আপনিও কি এখন এদেরই মত বেরঙা সুরহীন ও বিস্বাদ? সাধুজী বললেন 'না, তা ঠিক নয়। বৈরাগ্য নেওয়ায় অনেক বছরই ঐ অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু ক্রমে দেখতে পেলাম, জগতের চারিদিকে রঙের ছড়াছড়ি, শুনতে পেলাম বহুবিধ সুর, আস্বাদন করলাম বহু মিঠে স্বাদ। তারপর এই দেহের খোলটা সেইরূপ শব্দ ও স্বাদের রত্ন দিয়ে ভরতে সুরু করেছি। বললাম এরাও যে সে রঙ্, সে সুর ও মিঠে স্বাদের সন্ধান পায়নি, তা আপনি জানলেন কেমন ক'রে? তিনি বললেন যে 'একটা রঙিন কাপড়ের আড়াল দিয়ে ওরা সে সবের থেকে নিজেদের তফাৎ ক'রে রেখেছে। ওদের জীবনের যে উদ্দেশ্য তাকে অর্জন করতে গেরুয়া ও সাদা কাপড়ের তফাৎ করবার দরকার হয় না। তুই যদি সমাজ সেবাই করতে চাস্ তো, বাড়ী ফিরে যা। আর যতক্ষণ সংসার তোকে মেরে ঘায়েল করে না দেয়, কাজ ক'রে যা আপন মনে। জানিস, একটা টক আমের আঁটি যদি সার-ওলা জমিতে পুঁতে গাছ বানাস, তাতে বড় বড় শাঁসাল সুপুষ্ট ফল হলেও কেউ তা খেতে চাইবে না। কিন্তু মিঠে আমের আঁটির গাছ, সারহীন জমিতে প'ড়ে অনাদরে বর্দ্ধিত হলেও যখন ফলাবে ফল, তা ছোট হলেও লোকে আসবে লুট ক'রে নিতে। ঐ আমেরই মত যদি তোর আঁটিতে টক থাকে, তাহলে এই সাধুদের মধ্যে থাকলেও তুই হবি না মিষ্টি। উলটে তোর সঙ্গ পেয়ে এদের কেউ কেউ ট'কে যেতে পারে। আর তুই যদি মিঠে

আঁটিরই আদমি হোস, তাহলে তুই যেখানে যেমন ক'রেই থাকিস, সবাই পাবে তোর মিষ্টত্ব।' বেশ লাগল তাঁর কথাগুলি। সাধুজী চ'লে যাবার পরেরদিন, আশ্রমের স্বামীজীকে বিদায় জানিয়ে আমিও ফিরে গেলাম বাড়িতে। তারপর এমন কোন সাধুসঙ্গ লাভ জীবনে ঘটেনি, যা আমার মনে এমন ভাবে দাগ বসাতে পেরেছে। তিনি আমাকে ইয়োগ করতে বলেননি যৌবনকে দীর্ঘকাল ধ'রে রাখবার উদ্দেশ্যে, অথবা আগুন, বিষ, কাঁচ ও পেরেক খাওয়ার অমানুষিক ক্ষমতা অর্জনের পথও বলেননি। শুধু ব'লেছিলেন 'জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, সাচ্চা ও ভাল হওয়া।' এইলাস একটা বিদ্রূপসূচক শব্দ ক'রে বলল 'যত সব বুজরুকি। এই অমানুষিক ক্ষমতা সমাজে অর্জনের প্রয়োজন হ'লে আমাদের সাইন্স্ শিগ্গিরই এর সহজ উপায় আবিষ্কার ক'রে দেবে। বললাম 'কামারাদ্, সবই পারবে হয়ত সাইন্সের দ্বারায় আয়ত্ব করতে কিন্তু টক আঁটির গাছে মিষ্টি আম ফলাতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে এক হ'তে পারে যে সাইন্সের দ্বারায় আমাদের মিষ্টিকে ভাললাগা বদ্‌লিয়ে টকের অনুরক্ত করতে পার।'

ইয়ানিনা যাবার জন্যে উঠে পড়ায় আমরা সকলে বিদায় নিলাম সেদিনের মত। রাস্তায় চলতে ইয়ানিনা বলল 'তোমার কাছে আশা ক'রেছিলাম, ইয়োগীদের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনব কিন্তু তুমি যেন চার্চএর পুলপিট্ দেখিয়ে আমাদের নিরাশ করে দিলে। আর সবচেয়ে খারাপ লাগল যে এইলাস্ এখন দয়া, মায়া ও সহানুভূতিহীন এক ম্যানিফেষ্টোতে পরিণত হয়েছে।'

অথ জীবন জিজ্ঞাসা

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

নীরস শুষ্ক মরুভূমিতে আজ বয়ে চলেছে আমাদের ক্ষীণস্রোতা জীবনধারা। বাইরের ধুলোতে ভরে গেছে আমাদের চোখের পর্দা। বাইরের জগতের যা কিছু সব যেন মনে হচ্ছে, ঘোলাটে, অস্পষ্ট ও ছন্দহীন, কোথাও যেন সব সুর হারিয়ে গেছে। ছেড়া তাঁর, ভাঙ্গা সেতার ঘরের এক কোণে শুধু অতীতের সঙ্গীত ঝঙ্কারের জীর্ণ স্মৃতি বহন করে রয়েছে। এক মহাঅসস্তিকর গুমোট আবহাওয়াতে আমরা শুধু জীবনের জের টেনে চলেছি। বাইরের হাটেও ঐকতান ও অর্থহীন প্রলাপের মাঝখানে থেকে সে হারিয়েছে তার সামান্যতম সমতা। অশান্ত জীবন বাইরের ঝোড়ো হাওয়াতে দিনরাত দুলছে। ঘরের শান্ত-তীরে এসেও সে শান্তির ক্ষীণতম আলোর রশ্মি থেকে বঞ্চিত। তার কল্পিত Sweet home, স্বপ্ন-গড়া মৌচাক মধুহীন শুধু হুল বিঁধছে। শূন্য হৃদয়ে ভবিষ্যতের অজানা অকূল সমুদ্রে সে পাড়ি দিয়ে চলেছে, জীবনের পিছিয়ে আসা দিনগুলো একে একে মিলিয়ে গেছে বেদনা অবসাদের গাঢ় আঁধার গহ্বরে। চলতি জীবন নানা সমস্যার আঘাতে আপনার ভারে আপনি ঝরে পড়ছে। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙ্গা টুকরো, বিছিন্ন জীবনের ছেঁড়া পাতা, দেয়ালে ঝুলছে দিন পঞ্জিকার মৃত অক্ষর-গুলো। দৈনন্দিন ঘটনাপুঞ্জ রূঢ় বাস্তবের নির্মম আঘাতে কাতর, মসীলিপ্ত। এই অর্থহীন মৃত জগত থেকে প্রাণ চির নির্বাসিত।

আজ জনস্রোতের ভিতর থেকেও নিজেকে বড়ো অসহায়, বিছিন্ন মনে হচ্ছে। কোথাও সে নিরাপত্তা, স্থির ভবিষ্যতের নিশ্চয় তীর খুঁজে পাচ্ছেনা। সব জল ঘোলাটে, পথগুলো আঁকাবাঁকা প্রশ্ন চিহ্নের মতো দেখাচ্ছে। পলাতক বালকের সে বাইরের হাট থেকে শুধুমাত্র নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, সে আজ নিজের গড়া লৌহকপাট থেকেও একান্তভাবে মুক্তি চাইছে। আজ সে সর্বতোভাবে নিজেকে নিজে ভুলতে চাইছে। বাইরে চলেছে জড় পৃথিবীর নির্মম অভিযান, ভিতরে বয়ে চলেছে বেদনাহত অন্তরাত্মার নিষ্ফল ক্রন্দন। আমাদের চারিদিকে গুমোট আবহাওয়া, মৃত্যুর কালোছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সারা পৃথিবীর আঙিনাকে ছেয়ে দেবার জন্য কুটিল ফন্দী করছে। যুদ্ধের চিরপ্রস্তুতি। মৃত্যুর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আকাশ বাতাস সব বিষিয়ে তুলেছে। দূর থেকে মনে হয় জনসাধারণের এক বিরাট শোকযাত্রা নীরবে বৈতরিণীর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। অভিশপ্ত জীবন মৃত্যুর হিম স্পর্শে শান্তি কামনা করছে। স্বার্থের ছোট দেয়ালে ঘেরা জীবন শুধু নিজেকে কেন্দ্র করে সপ্তম-স্বর্গের স্বপ্নজাল বুনছে। লোভী, স্বার্থের বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ রেখে এবং নিজের জৈবিক প্রেরণায় দিনরাত ছুটোছুটি করছে। সম্মুখের দিগন্ত অবরুদ্ধ। ভাবজগত, রূপ রস সব একে-একে বিদায় নিয়েছে। অন্তরের বিবেক চিরসুপ্ত, নগ্ন পাশবিকতা তাকে পরাজিত করেছে। এই হিংসায় জর্জরিত নিষ্ঠুর পৃথিবীতে জীবনের জয়গান আজ ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে।

নাই সুর, নাই ছন্দ অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।

সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?

জীবন জিজ্ঞাসু অস্থির হয়ে উঠল। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সুদীর্ঘদিন ধরে পলেপলে নিজেকে সে আত্মাহুতি দিয়েছে জীবনের মহান যজ্ঞে। কর্মস্রোতে সে তার জীর্ণ তরীকে কতবার ভাসিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেছে দূরে দুস্তর পারাবারে তার ইয়ত্তা নেই। তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন উঠছে। জীবনের সব সাধনা, ত্যাগ প্রস্তুতি কি ব্যর্থ হবে "প্রকাণ্ড মরণের" চিরঅন্ধকারময় অতলে? মৃত্যুর চরম প্রহর কি হবে জীবনের পরম সমাপ্তি?

জীবনের কতো অপূর্ণ আশা, আকাঙ্খা সব একনিমিষে পুড়ে ছাই হবে নিঃশেষ হবে চিতাগ্নির শেষ শিখাতে? কতো বীরের আজীবন বলিষ্ঠ সাধনা, ত্যাগ ও শৌর্যদীপ্ত বিচিত্র ছবিগুলো—সব একে একে চিরতরে বিলুপ্ত হবে পৃথিবীর বুক থেকে? আদর্শবোধ, সত্য-নিষ্ঠা—সব কি ভূয়ো, রঙ্গীন মনের বিলাপ? নির্মম, নির্দয় বাস্তবের কষাঘাত কি হবে জীবনে একমাত্র সত্য অভিজ্ঞতা? শুধুমাত্র দৈহিক নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানো কি জীবনের একমাত্র ব্রত? ঐ কদাকার কুৎসিৎ, জড় জগতকে অবিরত প্রসাধন করা বা তার পায়ে প্রলেপ দেওয়া কি হবে জীবনের একমাত্র সাধনা? ধনগর্বিতের কাছে নিজের বিবেককে অবনমিত অথবা অত্যাচারী শোষকের কাছে আত্মসমর্পণ করে হীন দুর্বল মানুষ আজ তার মনুষ্যত্বকে করছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, চিরতরে হারাতে বসেছে। মিথ্যা, অন্যায়ের উপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভয়ের শাসনের কাছে চিরকাল মাথা নত করে চলা কি হবে জীবনের একমাত্র পথ? তবু কেন শত সহস্র তরুণ, সবুজ প্রাণ যুগে যুগে অন্যায়ের চিরঅবসানের জন্য নিজেদের আরামের সুখশয্যা ত্যাগ করে ঝড়ের রাত্রিতে দুর্গম পথের পথিক হয়েছে? কেন তারা তিলে তিলে মৃত্যুর শীতল পরশ অনুভব করেছে ক্ষতবিক্ষত জীবনের করুণ ইতিহাসে? সীমাহীন দুঃখ, বেদনা-লাঞ্ছিত পথে একদিন তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর তারা একে একে মিলিয়ে গেছে চিরনিস্তব্ধ, গভীর অন্ধকার বুকে, তবু সেই চিরজাগ্রত মুক্ত সেনানীর অমিত প্রাণের প্রদীপ কতো অজানা গৃহকোণকে আলোকিত করেছে, কতো দুর্বল হৃদয়কন্দরে প্রাণ সঞ্চার করেছে তার নিদর্শন ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে। যুগে যুগে সেই প্রাণবান নির্ভিক যোদ্ধারা পথে প্রান্তরে অসংখ্য শুষ্কবুকে নবজীবন উদ্বোধন করে চলেছে। আজও সেই প্রাণস্পর্শে পৃথিবীর কতো মরুপ্রান্তরে মুক্তির স্রোত বয়ে চলেছে। প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমানাতে যদি জীবন চিরকাল বদ্ধ থাকতো তবে কেন যুগে যুগে ঘরছাড়া শত সহস্র সেনানী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে আপনাকে নিঃশেষে আত্মদান করে চলেছে?

সমকালীন ব্যবহারিক জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে তাঁরা অল্পবিস্তর ছিলেন নির্বোধ, ভাগ্য-হীন অথবা দুষ্টগ্রহ চালিত। সার্থকতা কতিপয় লোকের জীবনে প্রসন্ন হাসি হেসেছে। অপর-দিকে ব্যর্থতা, পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে চলেছে অধিকাংশ ভাগ্যহীন নির্ভিক অভিযাত্রীরা। সাধারণ বুদ্ধির অভিধানে এই অভাগারা 'পাগল' বলে পরিচিত। আমরা ভুলে যাই যে এই তথাকথিত পাগলরা আপনার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে ঐ "স্থির মস্তিষ্কদের" হিসেবী বুদ্ধির বাঁধা জগত ভেঙ্গে নতুন প্রাণের জোয়ার বইয়েছে। সমাজে একদল লোক আছেন যারা সদাসর্বদা নিজেদের ঘর গুছতে ব্যস্ত। তারা দিনরাত স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাওয়া করছে না হয় ঘরে বসে টাকার হিসেব করছে। ছলেবলে বা কৌশলে টাকা কামানো এদের জীবন-দর্শন। তারা সুখী কিন্তু সেই সুখ স্থূল দেহের প্রসাধনে শুধুমাত্র ব্যস্ত। ব্যবসায়ী-মন অপরের চোখে ধুলো

দিয়ে নিজেকে পাকা করবার মতলব করছে অপরদিকে নিজের শুভবুদ্ধি, বিবেককে ঠকিয়ে-নিজেকে অবিরত হারাতে বসেছে, এদের অন্তরমহল ও বহির্মহলের ভিতরে কোন বিরোধ নেই, ব্যবসায়ী-মন উভয় মহলকেও জটিল ও বিষাক্ত করেছে। তারা উদ্বেগহীন শান্তিতে বাস করেন, কিন্তু সেই শান্তি অচেতন জড় অথবা মৃতের কবরের শান্তি। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করা বা দাসত্বকে গ্রহণ করা শান্তির নামান্তর হয় তার থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। যারা প্রাণবান, জীবন-রসে রসিক তাদের চোখ নিজেদের দেহের সীমানা, পরিবারের ছোট দেয়াল, পাড়া-পড়শীর ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর নিরন্তর স্রোতবেগ, দেশজোড়া বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা তাদের বুকে আছড়িয়ে পড়ছে। তাদের দৃষ্টি পাড়ি দিয়ে চলেছে দেশ-দেশান্তরে, চারদিকের আঁধাররাশিকে ভেদ করে যাত্রা করেছে ভবিষ্যতের আলোকতীর্থে। এরা নিজেদের বেদনাহত জীবনে সান্ত্বনা পায় নিজেদের অন্তর থেকে, বাইরের জগৎ বা পাড়া-পড়শী থেকে নয়। যারা কাজ করতে না করতে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে মালাচন্দন, পুরস্কারের লোভে; তারা হচ্ছেন লোভী, ব্যবসায়ী। তাদের অন্তর শ্লেষ, আত্মবঞ্চনার নিষ্ফল অভিমানে সদাসর্বদা ধূমায়িত। কার কাছে তুমি প্রতিদান, সান্ত্বনা চাইছ? চোখ মেলে দেখো সত্যপথের যারা পথিক তাদের বুক থেকে রক্ত ঝরছে, দুঃখ বেদনার শাণিত ইস্পাতে গড়া তাদের দেহ, প্রাণ, মন।—অম্লান হাসিমুখে বিষপান অথবা খোলাবুকে বুলেট গ্রহণ করে এই মহান পথিকরা যুগে যুগে মৃত্যুর অমোঘ পুরস্কার পেয়েছেন। অন্তহীন বেদনা ও মৃত্যুর চরম স্বাক্ষর দিয়ে সত্য তার শেষ পুরস্কার দিয়ে চলেছে। সত্যের সাধনা বীরের সাধনা, দুর্বল, হীনবীর্য, লোভী লোকের বিলাস নয়।

ব্যবসায়ী মহলে, জীবনের প্রয়োজনের নিক্তিও দাঁড়িপাল্লাতে সার্থকতার বিনিময়ে হয়না সত্যের মূল্যবিচার। জীবন সংগ্রামের নির্মম আঘাতে, দৈনন্দিন বহ্নিতে, চিত্তের প্রশান্ত মহিমাতে, ভাবলোকের স্থির আলোকে সেই সত্য মূর্ত, প্রত্যক্ষ আনন্দোচ্ছল হয়ে অবিরত প্রতি-ভাত হচ্ছে। ত্যাগের কষ্টি পাথরে, লোভ ও হীন স্বার্থকে নিয়ত দহন করে সত্যের নির্মম আলোকে অনুভব করতে হবে। যে সত্যাগ্রহী সে নির্ভিক, অবিচল পর্বতের মতো কালের দারুণ অভিশাপ, দুঃখ সুখের তরঙ্গমালা নীরবে গ্রহণ করছে। পাড়াপড়শীর মন রেখে, দেশের লোকের সাথে সুর মিলিয়ে, শুধু "হ্যাঁ-বলা"র দলে নাম লিখিয়ে তাঁরা চলতে নারাজ। সত্যর জন্য প্রয়োজন হলে তাঁরা সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তৈরী। আজ যারা স্তুতি করছে কাল তারাই নিন্দা রটাবে, আজ যারা দূর থেকে পাথর ছুঁড়ছে কাল তারাই মালাচন্দন নিয়ে হাজির হবে। সত্যের যারা আজীবন পূজারী তারা হচ্ছেন নীলকণ্ঠ। জীবনের বেশীর ভাগ তারা অমৃত থেকে গরল পান করে মহাপ্রয়াণ করেছেন। অভীঃ, নির্ভয় বাণী তাঁদের পেশীকে বজ্র ধাতুতে তৈরী করেছে। দেশ ও কালে নিছক অস্তিত্বকে প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা বেঁচে থাকেন না। সারাজীবন ধরে তাঁরা লড়ে চলেছেন, এই সংগ্রামের কোথাও বিরাম নেই। রাজার শাসনের ভয়ে অথবা লোকনিন্দা, সামাজিক অপবাদের ভয়ে এদের মন দুলছেনা। ভাবনাতে এরা অস্থির নয়। নিজের অবিচল নিষ্ঠা দিয়ে সত্যকে অনুভব করেছে, সেই পথে তারা নিত্য-যাত্রী। সত্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রাজা, শাসক, ধনবল নিজের মান, যশ, অহমিকা সবার বিরুদ্ধে এরা অকম্পিত বুকে নড়তে ভয় পায় না। এরা চিরবিদ্রোহী। "Of Great Place" রচনার একজায়গায় Bacon বলছেনঃ "Men in great place are thrice servants; servant to the sovereign or state, servants of fame, of business, so as they have no freedom, neither in their perons nor in their action; nor in their time.—The rising unto

place is laborious, and by pains men come to greater pains; and it is sometimes base, and by indignities men comes to dignities. The standing is slippery, and the regress is either a downfall or as at least an ellipse."

সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উঁচুপদে থেকেও মানুষ কতো অসহায় ও অপরের গোলাম, এমনকি নামমাত্র স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, তার ছবি Bacon দেখিয়েছেন। আমরা সাধারণতঃ কাজ করি পড়াপড়শীর মুখ চেয়ে, নিজেদের কোন আত্মবিশ্বাস বা উচু আদর্শের প্রতি স্থির সংকল্প নেই। আমার আদর্শ যদি সত্য হয় তবে সেই পথে বরাবর চলতে হবে। যতদিন বাঁচব ততদিন চলব। চলতে চলতে জীবনের শেষ শিখা মিলিয়ে যাবে অনন্তলোকে। সারা অংগে রক্ত ঝরছে, সংগ্রাম ক্ষেত্রে বীরের মতো মৃত্যুর পরম প্রশান্তিতে সুপ্তিতে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে হবে। Bacon মৃত্যুর সম্বন্ধে এক জায়গায় বলছেন আমি মরতে চাই "in an earnest pursuit, which is like one wounded in hot blood, who for the time scarce feels the hurt."

যারা সত্যিকার জীবনের প্রতি পদে পদে বেঁচে আসছেন তাঁরা অম্লান বদনে মরতে পারেন* তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা নয়। জীবনকে যারা ভালবাসেন তারাই মৃত্যুকে এতো সহজে গ্রহণ করতে পারেন। আমরা আজ বাঁচতে ভুলে গেছি, তাই মৃত্যুর কালো ছায়া চারিদিকে দেখছি। স্পিনোজা (Spinoaza) এক-জায়গায় বলছেনঃ "he who lives his fellow men is untouched by the fear of death." যারা দেশকে ভালবাসে, সমাজকে সেবা করে, দেশ দেশান্তরের অগণিত লোকের জন্য যার মন স্বভাবতঃ ব্যাকুল তারা অকাতরে মরতে পারে। তারা দুঃখজয়ী, প্রাণঢেলে তারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করতে পারে। স্বার্থান্ধ, পীড়িত দুর্বল সত্যকে জানতে বা অমৃতের সন্ধান পায় না। চাই প্রাণ, চাই আলো **চাই আনন্দের চির প্রবহমান** সংগীত।

আমাদের সাজানো সভ্যজগতের অন্তরালে অবচেতন মনে যে আদিম বর্বর হিংস্র মানুষটি লুকিয়ে রয়েছে সে সুযোগ পেলে সতর্ক প্রহরীর অগোচরে আপনাকে আত্ম প্রকাশ করে। তখন বিবেক সুপ্ত, চেতন মন মোহাচ্ছন্ন, সেই আদিম বর্বর প্রাণীটি ধীরে ধীরে নগ্নরূপে সবার সম্মুখে নিজেকে খুলে ধরে। কামলালসা, হিংস্র প্রাণীর নখদন্তের আক্রমণে সহজে খুলে পড়ে সভ্যতার মুখোস Voltaire তাহার বিখ্যাত অভিধানে "মানুষ" সম্বন্ধে একজায়গায় বলছেন ঃ

Twenty years are required to bring man from the state of a plant, in which he exists in the womb of his mother, and from the state of an animal, which is his condition in infancy, to a state in which the maturity of reasons begins to make itself felt. Thirty centuries are necessary in which to discover even a little of his structure. An eternity would be required to know anything of his soul. But one moment suffices in which to kill him.

মাতৃগর্ভে 'মানুষ উদ্ভিদের জীবনের মতন চেতনাবিহীন, জড়পিন্ড, মাটির শৃংখলে আবদ্ধ। এই অচেতন জীবন থেকে মানুষকে চৈতন্যালোকে পৌছিতে বিশবছর পার হয়ে যায়। জন্ম থেকে সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত শৈশবকাল পশু জীবনের সামিল। অন্ধ প্রবৃত্তির লোকে আমরা তখন চলে বেড়াই। তারপর ধীরেধীরে চৈতন্যের উদয় হয় আমাদের জীবন পথে। মানুষের চরিত্র তার আকার, তার জীবনরহস্যের একাংশ উদ্ঘাটন করতে আমাদের ত্রিশ শতাব্দী লেগেছে।

*To bear all naked truth
And to envisage circumstance all calm
That is the top of sovereignty. (Keats: Hyperion, 203)

মানুষের আত্মার সের‍ুপকে জানতে মনে হয় অনন্তকালও সম্পূর্ণ নয় কিন্তু তাকে মসীলিপ্ত, ধ্বংস করতে এক মুহূর্তে যথেষ্ট। আমাদের সাধারণ জীবন উদ্ভিদ বা পশু জগতের স্তরে সীমাবদ্ধ। এই জড় অচেতন জগত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমাদের চতুর ব্যবসায়ীমন নিজেদের বাঁধা ছকে দিনরাত জাল বুনছে। এই জালের বাহিরে বেরিয়ে আসবার শক্তি বা দৃষ্টি এদের নেই। শিক্ষাভিমানীরা বইএর সমুদ্রে নিত্য অবগাহন করেন বটে কিন্তু তার গভীর জলে ডুব দিয়ে রত্ন আবিস্কারের গভীর আনন্দ থেকে এরা বঞ্চিত। এদের ভাগ্যে নোনা জল। সেই পান করে হয় অরসিক। চৈতন্যলোকে যাবার চাবিকাটি হোল অনন্ত জিজ্ঞাসা, আবিস্কারের উন্মাদনা, প্রাণের অফুরন্ত আনন্দ। লোভী, কৃপণ ব্যবসায়ী যারা সাধারণতঃ সমাজের ওপরতলায় বাস করেন তারা চৈতন্যলোকের বহিরাঙ্গণে বিচরণ করেন। ভিতরে যাবার পথ জানে না। তোমরা ছলচাতুরীর বাঁকা পথ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি জীবনকে পাকা করতে পারো, কিন্তু চৈতন্য বা আনন্দলোকে যাবার অনুমতিপত্র পাবেনা। মনে প্রাণে আন্তরিক হতে হবে। সহৃদয় আন্তরিকতা ছাড়া শুধু চালাকির পথে কার্যসিদ্ধি হয়না। উচ্ছ্বাসময় হাল্কা, অগভীর জীবন হাওয়ার তালে দুলছে, বাইরের দমকা হাওয়াতে সহজে নুইয়ে পড়ে। এই হীনবীর্য, দুর্বল মাটিতে কিছু দানা বাঁধেনা। সব ভেসে যায়। জীবনকে পেশীময়, মনকে করতে হবে দৃঢ় ও বলিষ্ট। রাজার ভয়, সমাজের ভয়, পাড়াপড়শীর ভয়, দিনরাত ভয়ের পাথর মাথায় নিয়ে চলছি। তাকে ছুড়ে দিতে হবে। চৈতন্যলোকে যেতে হলে চাই বিবেকের অমিত দীপশলাকা, শুদ্ধ মুক্ত, নির্ভীক প্রাণ। নীটশের বলবানের জয়গাথা নয়, প্লেটো বলছেন ঃ He who would truly live ought to allow to his desires to wax to the uttermost; but when they have grown to their greatest he should have courage and intelligence to minister to them, and to satisfy all his longings. And this affirm to be natural justice and nobility. But the many can not do this; and therefore they blame such persons, because they are ashamed of their own inability, which they desire to conceal; and hence they call intemperance base... They enslave the nobler natures, and they praise justice only because they are cowards. (Gorgias 491)

আমাদের আছে শুধু দুর্বলের কান্না, তাই জীবনকে দেখি অসহায়ের চোখ দিয়ে। দুর্জয় প্রাণের আনন্দে বলবীর্যের সাধনার পথে আমাদের যাত্রা শুরু হোক—আমাদের অন্ধকামনাকে করতে হবে সংযত, শাসনের বাঁধানে তাকে করতে হবে নিয়ন্ত্রিত, আরেকদিকে আমাদের শুভচিন্তা, সত্যাগ্রহীকে মনের গহন কোণে বন্দী না করে তাকে নির্ভয়ে ঘোষণা করতে হবে সবার সম্মুখে। সত্যের বিনিময়ে স্বার্থসিদ্ধি অথবা দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে মিথ্যার প্রশস্তি করা হোল বীর্যহীন কাপুরুষের জীবন। সত্যকে অনুভব করতে হলে নির্ভীক, বীর্যবান হতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অন্ধবিশ্বাসের সোজা পথে স্বর্গে যাওয়ার থেকে তীক্ষ্ন সচেতন মন নিয়ে মর্ত্তধামে দুঃখ, শোকাগ্নির হলকাতে দহন হওয়া শ্রেয়ঃ। আমাদের কপট অভিনয়, শঠচাতুরী, লোভ ও অহমিকার উদ্ধত প্রাচীর করতে হবে চূর্ণবিচূর্ণ। সমস্যা বিজড়িত জীবনে, সদা বিচার অনুশীলনের পথে মনকে পরীক্ষা, আগুনে ঝালিয়ে নিতে হবে। দুঃখ শোকের বহ্নি অথবা আনন্দ ঔজ্জ্বল্যে আমাদের সুপ্ত চেতনা, শুভবুদ্ধিকে করতে হবে জাগ্রত। চৈতন্যের আলোতে জ্বলে ওঠা জীবনের পরম শুভলগ্ন আমাদের resurrection (পুনর্জ্জীবন)।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

—কি করবি পুঁটিদি?

পুঁটি বলে, আচ্ছা, রোজ শিব পুজো করতে বড্ড মন চায় কেন বলত?

—তবে শিব পুজোই কর।

পুঁটি চুপ করে থাকে।

—তাই কর পুঁটিদি। কাল থেকেই কর।

পুঁটি তেমনি চুপ করে বসে থাকে।

মৃগনয়নী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বলে,—তোর বিয়ে না হলেই ভাল হোত।

—ঠিক বলেছিস। একটু ইচ্ছে ছিল না আমার।

মনের মত কথা শুনে একটু মুখর হয়ে ওঠে পুঁটি,—সত্যি বলছি, সংসার করতে একটুও সখ হয় না। ওসব আমোদ যেন ভালই লাগে না।

ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে মৃগনয়নী। মনে মনে ভাবে, আশ্চর্য।

রাত্রে বনবিহারীকে বলছিল মৃগনয়নী,—আশ্চর্য মেয়ে পুঁটিদি। বলে সংসার করতে একটুও ইচ্ছে করে না।

—তাই নাকি! বনবিহারী বিড়ি ধরিয়ে পুঁটির কাহিনী শুনছিল।

—আমার ত বাপু অদ্ভুত লাগে। ওর এমন কেন বলোত?

বনবিহারী বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে। বলে—কে জানে! মায়ের ইচ্ছে। আমরা কি করে বুঝব বলো? কাল বাদে পরশু ত' চলে যাচ্ছি। তোমার মনটা খারাপ লাগছে না?

মৃগনয়নী চুপ করে শুয়ে থাকে।

বনবিহারী বলে,—আমার কিন্তু মনটা বড্ড ইয়ে লাগছে। কি রকম জানো, মানে ইয়ে মত লাগছে।

—থাক আর বোঝাতে হবে না! হেসে ফেলে মৃগনয়নী বনবিহারীর অবস্থা দেখে।

বনবিহারী ব্যথিত হয়,—তুমি হাসছ?

—তবে কি ডাক ছেড়ে কাঁদব? শোন চুড়ি বার গাছা দিয়ে দোব। ওখানে বিক্রি করতে পারবে ত'?

বনবিহারী বিড়ি ধরায়,—তা পারা যাবে।

দেখো ঠকে যেও না যেন। ওজনটা ঠিক দেখে নেবে। তুমি যা মানুষ!

বনবিহারী বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে।

—ওখান থেকে কলকাতা যাবে কবে? —জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—দিনকতকের ভেতরেই।

—দিনকতক মানে মাস দুইও হতে পারে! —বলে মৃগনয়নী

বিঁড়ি কেমন তেঁতো লাগে। ছুঁড়ে ফেলে দেয় বনবিহারী। বলে,—এই ধরো হপ্তা খানেকের ভেতরেই রওনা হবো।

—চিঠি দিও কিন্তু!

—হ্যাঁ, দোব। তোমার নামেই দোব?

— তবে আবার কার নামে দেবে?

—না, এমনি বলছিলুম? তোমার নামে চিঠি দিলে যদি কোনও কথা ওঠে।

মৃগনয়নী ঠোঁট ওলটায়,—ওঠে ত' উঠবে। ভারি বয়ে গেল। চিঠি না দিলে চলবে না।

বনবিহারী একটা হাঁই তোলে।

—চলে গিয়ে আর যে খোঁজ খবর করবে না, তা চলবে না।

বনবিহারী তাকায় মৃগনয়নীর দিকে। প্রদীপের আলোয় চোখ দুটোয় তরাসে ভাব দেখতে পায় স্পষ্ট।

—অত ভয় কিসের?

উত্তর দেয় না মৃগনয়নী। বনবিহারীর হাতটা কাছে টেনে আনে। ওর রোগা ফরসা হাতখানা নিজের মুখের ওপর রাখে। চোখের ওপর। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—পুঁটিদিকে দেখে ভয় করে।

বনবিহারী হাসে। ওর ভয়েতে বনবিহারীর আনন্দ হয়—খুসীও হয়।

শুধু বলে,—খেপেছ!

মৃগনয়নী ওর হাঁটুদুটোর কাছে মুখটা আনে শুয়ে পড়ে। বনবিহারী চুপ করেই বসে থাকে।

আজ যে মানুষটা কাছে বসে আছে, এত কাছে। পরশু আর সে থাকবে না। অনেক-দূরে চলে যাবে। আবার কবে আসবে কি আসবে না কে জানে! কলকাতা সহরে যাবে, সেখানে শোনা যায় মেয়েমানুষরা যাদু জানে। শেষকালে যদি একেবারে ভুলিয়ে দেয় সব কথা। মৃগনয়নীর কথাও।

ও সব বোধহয় বাজে কথা। বাবাকে একসময় জিজ্ঞেস করবে মৃগনয়নী। বাবা এক-বার কলকাতায় গিয়েছিলেন এক মোকদ্দমার ব্যাপারে। বাবা ঠিক বলতে পারবেন সহর কলকাতার হাবভাবগুলো। জেনে রাখা ভাল।

বনবিহারী চাকরী পেয়ে, অনেক টাকা রোজগার করে যদি এদিককার কথা সব ভুলে যায়, বদলে যায় টাকার গরমে? তবে কি পাঠাবে না কলকাতায়। দেবে না গয়না। না তা কি করে হয়! নিজের স্বার্থের জন্যে সে একটা এতবড় সংসারকে নষ্ট করবে? মামাদের পালিত হয়ে গ্রামের এক অতি দরিদ্র পরিবার হয়েই থাকবে চিরকাল। তবে আর তার ভাগ্য ভাল বলবে কেন সবাই। পোড়াকপালের বদনাম আর ও বইতে পারবে না। ছোটবেলা থেকে বয়েছে। আর নয়। তাতে যা হয় হবে। চেষ্টা ওকেই করতে হবে, এতে কপাল যদি একেবারে পোড়ে ত' পুড়বে। মৃগনয়নীর মনটা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে এবার।

বনবিহারীর হাঁটুর ওপর থেকে মুখটা তুলে নেয়। বালিসের ওপর মুখ রাখে। বনবিহারী পাশে শুয়ে চুপ করেই থাকে। প্রদীপটার বুক পুড়ে যাচ্ছে। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় মৃগনয়নী। ঘরের অন্ধকার জমাট হয়ে আসে। বাতাস নেই আজ। একটু গরম লাগে। কানদুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে যেন। হাতের তালু জ্বলছে। পায়ের তালুও। বনবিহারী পাশ ফেরে।

—ঘুমুলে?—জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—না।

—চাকরী পেলে—।

—কি বলো। থামলে কেন?

—চাকরী পেলে প্রথম মাইনে থেকে পাঁচটা টাকা পাঠাবে?

—কেন বলোত'?

মৃগনয়নী উত্তর দেয় না। বনবিহারী আস্তেই আবার জিজ্ঞেস করে,—কেন?

—পুজো দোব। মা কালীকে।

বনবিহারী ভারি খুসী,—নিশ্চয়ই পাঠাব। ঠিক পাঠাব। চাকরী যদি হয় মায়ের ইচ্ছেয়। ঠিক পাঠাব। ঠিক জায়গায় ঘা পড়েছে।

ইচ্ছে করে যে মৃগনয়নী কথাটা বলেছে তা নয়। হঠাৎ মানত করেছিলো, তাই বললো। কিন্তু কথাটা যে বনবিহারীর মর্মে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসে যাবে ধারণাও করতে পারেনি। এখন বোঝে যে বনবিহারী সত্যি মনে রাখবে কথাটা। মৃগনয়নীর জন্যে নয়। ওর মায়ের জন্যে। মা বলতে আনন্দে ভরে ওঠে বনবিহারী শিশু সন্তানের মত।

মাঝে মাঝে মৃগনয়নীরও ভাবটি বড় ভাল লাগে। বড় সহজ মনে হয়।

আজীবন নানা ভাবতরঙ্গে উঠে নেমে মৃগনয়নী একথা স্থির জেনেছিল যে সহজ হওয়া বড় সহজ নয়। সংসারের ভাববিলাসে মত্ত হয়ে উঠলে মনের অনেক ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ভাব থেকে এড়ান যায় না। মাঝে মাঝে বেঁকে মুচড়ে ওঠে মন। জ্বালায় অস্থির হয়ে যেতে হয়। কোন কোন তীব্র ঘটনা মনের সতীব্র বেগ সামলান কঠিন হয়ে পড়ে। মনকে সহজ লাগা বড় সহজ নয়।

শেষ জীবনে একথা মৃগনয়নী বহুবার বলত আমায়—। ওঁর ভেতরে ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। এত সরল আর সহজ হতে পারত কি করে ভেবে আশ্চর্য হতুম। অনেক ভেবে দেখতাম। খুব কঠিন বিপদে পড়লেও ও একটুও ভেঙে পড়ত না। বিশ্বাসের এক অসাধারণ শক্তি এসে পড়ত ওর ভেতর। বলত, মা যা করেন, তাই হবে। মায়ের ওপর কিযে বিশ্বাস, বলে বোঝাতে পারব না।

আমিও জানতাম। কথাগুলো বনবিহারী সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মৃগনয়নীর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল এইখানেই। এই বিশ্বাসের ছোঁয়া লেগে লেগে ওর মনও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল।

তবু মৃগনয়নী মেয়ে মানুষ। মানুষ কিন্তু মেয়ে মানুষ। এ কথা যাক। পরে হবে।

সেদিন রাত্রে বনবিহারীর মনের সঠিক তারে সুর তুলেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি ও। ও জানে এ সুর কলকাতায় গিয়েও বনবিহারীর কানে বাজবে। তবু ভয় মাকেও যদি ভুলে যায়। খারাপ সঙ্গে পড়ে! যাকগে, যা হয় হবে। আর ভাবতে পারে না মৃগনয়নী।

বনবিহারী আস্তে আস্তে একবার বলে,—আচ্ছা, এখানে আরও দিনকত থাকলে হয় না?

—কেন?

—বারে। কেন আবার কি?—ওই ইয়ের জন্যে বলছিলুম। চট্ করে যেতে ভাল লাগছে না।

বনবিহারীর বুকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মৃগনয়নী হাসতে থাকে।

—তুমি একবার বলে দেখতে পারো!

—আমি! হাসতে হাসতে বালিস থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃগনয়নী।—তুমি কি খেপেছ? বৌঠান কি তাহলে আর টিঁকতে দেবে ভেবেছ? তাছাড়া দূর! কি যে বলো? তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

বনবিহারী চুপ করে থাকে। তা ছাড়া আর কি বা ওর বলবার আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—ছেলে হলে কি করে জানব?

—আবার ওই সব বাজে কথা আরম্ভ হোল!

—তুমি লিখে জানাবে?

—আতুড়ে আমি চিঠি লিখতে বসব! কোথায় দোয়াত কলম, কোথায় কাগজ, কোথায় কি—চুপ করো বাপু। কিযে সব আকাশভাঙা কথা বলো!

—তবে কি খবর পাব না? হতাশ হয়ে বলে বনবিহারী।

মৃগনয়নী হেসে ফেলে আবার,—পাবে গো পাবে। কর্তাবাবুই লিখবেন তোমার মাকে। তাঁর কাছ থেকে তোমরা খবর পাবে। কোন নিয়ম জানো না।

বনবিহারীর মনটা আশ্বস্ত হয় এবার। পাশ ফিরে শোয়। কিছুক্ষণের ভেতরই ঘুমিয়ে পড়ে।

জেগে থাকে মৃগনয়নী।

বনবিহারীর অন্তরের রূপটি ওর চোখের সামনে ভাসে। এত সোজা আর নির্ভরশীল মানুষ! ভালবাসার চেয়ে স্নেহের ভাবই যেন বেশী জাগে মৃগনয়নীর। ছেলেমানুষের মত বনবিহারীর কথাগুলো। একটি শিশু যেন বাস করছে ওর অন্তরে। তাকে শ্রদ্ধা মেশান ভালবাসা নয়। সস্নেহ ভালবাসা।

বনবিহারীর রোগা পিঠখানায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

এক ঘুমে ভোর। উঠতে একটু বেলাই হয়ে যায় আজ। চারদিকে উঁকি মেরে দেখে এক ছুটে চলে যায় ঘাটে। ঘাটে এসে পুঁটিকে দেখতে পায়। পুঁটির চুল তখনও ভিজে। খুব ভোরে বোধহয় স্নান করেছে। হাতে পুঁটির ওটা কি? ফুলজল সমেত একটি পঞ্চপাত্র আর ছোটখানা থালা। মৃগনয়নীর মনে পড়ে পুঁটিদি বলেছিল আজ থেকে শিবপুজো করবে। না করে আর উপায়ই বা কি? ও নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। পুজোর কথা তার মনে থাকলে বড় ভাল হোত। পুঁটিদির পুজোয় ওকে সাহায্য করা উচিত ছিল।

পুঁটির মুখখানি যেন উজ্জ্বল আজ। অনেক স্নিগ্ধ। চোখদুটি আজ ঠাণ্ডা শান্ত। বেশ লাগে মৃগনয়নীর।

পুঁটি একটু হেসে বলে,—এই এলি বুঝি?

একটু সলজ্জ হেসে মৃগনয়নী বলে,—হ্যাঁ।

—পুজো করলুম।

—কোথায় করলি?

—ভোর রাতে উঠে ভাবছিলুম কোথায় পুজো করি। তারপর স্নান সেরে মাটির শিব বানিয়ে নিয়ে করলুম। পুজোর মন্তর ত' জানাই আছে ছোটবেলা থেকে!

—কালী বাড়ীর শিবমন্দিরে গেলেই পারতিস?

—অত ভোরে একা একা ভয় করছিল। দুজন হলে হোত।

মৃগনয়নীকে আবার সলজ্জ হাসতে হয় একটু। ওর ভোরে ওঠা উচিত ছিল।

মুখটা নীচু করে বলে,—শিবের কাছে কি চাইলি রে পুঁটিদি?

চাইলুম! —একটু থেমে পুঁটি বলে,—চাইলুম ওর যেন ভাল হয়। ওর যেন সুমতি হয়। পুঁটির মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে আসে বলতে বলতে।

মৃগনয়নী অবাক। যে স্বামী লাথি মারে, তার ভাল কামনা! পুঁটিদির কি মাথা

খারাপ?

পুঁটি ওর মনের ভাবটা যেন বুঝতে পারে,—ওর কোন দোষ নেই রে! আমি ত' ওকে সুখী করতে পারিনি। দোষ আমার। আমারই দোষ। ঠাকুরকে বললুম, এমন করে দাও আমায়, যেন ওকে সুখী করতে পারি।

চোখদুটো ভিজে ভিজে মনে হয় পুঁটির।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পুঁটিদি'র দিকে।

নয়

প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেছে। বনবিহারী চলে গেছে কতদিন হয়ে গেছে। মৃগনয়নীর মনে হয় বহুদিন—বহুদিন চলে গেছে। মাত্র একখানা চিঠি এসেছিল কলকাতা থেকে। তাও একটুখানি চিঠি। মন ভরল না। আরও ভেঙে পড়ল যেন। লেখাটা পড়ে যেন বুকের ভেতরটা মোচড়াতে লাগল মৃগনয়নীর। "পরম কল্যানীয়া, নির্বিঘ্নে পেঁৗছিয়াছি জানিবা! টাকা বেশী কাছে নাই। একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া আছি। গত দুইদিন হইল রাত্রে ভাত জুটে নাই। দাদা আর আমি মুড়ি খাইয়া আছি। কাজ হইলে জানাইব। সাবধানে থাকিবা। ঠিকানা দিলাম। উত্তর দিবা। ইতি আঃ বনবিহারী দেবশর্ম্মণ।"

কি চিঠি! রাগে দুঃখে কান্না পায় মৃগনয়নীর। জীবনে স্বামীর এই প্রথম পত্র। চিঠিখানি তবু তিনবার, চারবার পাঁচবার ছ'বার পড়ে মৃগনয়নী। তারপর পা ছড়িয়ে বসে থাকে চৌকীর ওপর প্রদীপটা জ্বালিয়ে।

পুরুষের কাছ থেকে ওর জীবনে এই প্রথম চিঠি পাওয়া। চিঠিতে কয়েকটা সহজ মনের কথা আশা করেছিল মৃগনয়নী। কোন মেয়েই বা আশা না করে! অন্ততঃ লিখতে ত' পারত, "তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে জানিবা।" বুক ফাটিয়া যাইতেছে—কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? কিছু না লেখাতে মৃগনয়নীর এ কথা অবশ্য মনে হচ্ছে না যে ওকে ছেড়ে থাকতে বনবিহারীর একটু কষ্টও নেই। তা—হতেই পারে না। ও নিশ্চয় করে বলতে পারে যে রোজই অন্ততঃ রাত্তিরে অনেকবার তার কথা মনে হবে বনবিহারীর। স্বপ্ন দেখাও বিচিত্র নয়। তোমাকে স্বপ্নে দেখি—লিখলেও ত' মৃগনয়নীর মনটা ভরত। ভরত সমবেদনায়। দূরের মানুষের জন্য এক অপরূপ ভালবাসায়। কল্পনা করতে ও পারে। বেশ কল্পনা করতে পারে যে তাহলে বনবিহারীর জন্যে ওর বুকের ভেতরটা শূন্য বোধ হোত।

কিন্তু হোল উলটো। বুকটা যেন জ্বলছে। জ্বালাটা ক্ষোভে খানিকটা বা ওদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করে, নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। গত দুইদিন হইল রাত্রে ভাত জুটে নাই। কথাটা যেন জ্বালাচ্ছে মনের খুব সূক্ষ্ম সুতোগুলো।

মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছে দুটো রাত্রি! রোগা মানুষ। তার ওপর দুর্বল মাঝে মাঝে ফিট্ হয়ে যায়। শেষকালে চাকরীর জন্যে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও পড়ে যায় যদি অজ্ঞান হয়ে কেউ ত' চিনবেও না। কেউ জানবেও না মানুষটা কে, কোথায় ঘর।

মনে মনে জ্বালাটা আতংকের রূপ নেয়। প্রদীপটা কমিয়ে দেয় মৃগনয়নী। না। অন্ধকারটা ভাল লাগছে না। যেন দমটা আটকে যাচ্ছে। উঠে পড়ে মৃগনয়নী। বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। না। বাতাস নেই একটুও। পৃথিবীতে হঠাৎ বাতাস এত কম হয়ে গেল।

মৃগনয়নীর চোখের ওপর ভেসে ওঠে বনবিহারীর ফ্যাঁকাসে রোগা মুখখানা। অসহায়

দুটি পিঙ্গল চোখ। ছেলেমানুষের মত চাউনী।

নিজের অজান্তে ওর চোখদুটো কখন জলে ভরে ওঠে, ও টেরও পায় না।

সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। দয়াময়ী কালীবাড়ীর আরতির বাজনা ভেসে আসছে কানে।

মনে মনে দয়াময়ী কালীবাড়ীর চাতালে গিয়ে দাঁড়ায় মৃগনয়নী। মা কি তার ছেলেকে বিপদে দেখবে না। মায়ের যে এত নির্ভর করে, তাকে আগলে রাখবে না মা?

আবার মন চলে আসে ঘরের অন্ধকার দাওয়ায়। চোখদুটো ভাল করে মুছে দাওয়া থেকে নেমে পড়ে মৃগনয়নী। সোজা চলে আসে বাইরের ঘরে। বাপের ঘরে।

রামতারণ জপে বসেছিলেন।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে এসে বাবার পাশে বসে। কষ্টে ভেঙে পড়বার মুহূর্তে এই একটি মাত্র জায়গা যেখানে এলে ওর মনটা আপনাআপনি অনেকটা হালকা হয়ে আসে। বাতাস পায়। বুক ভরে নিশ্বাস নেবার মত বাতাস।

খানিক বাদে রামতারণের জপ বন্ধ হয়। হয়ত বা মৃগনয়নীকে দেখে ইচ্ছে করে একটু থামেন রামতারণ। চোখদুটোয় ভরা আনন্দ নিয়ে চুপ করেই বসে আছেন।

মৃগনয়নী বাবার দিকে তাকায়।

—কিছু বলবে মা? খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে রামতারণ।

—না, বাবা। কিছু নয়।

রামতারণ ওর মনোভাবটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেও বসে থাকেন চুপ করে।

মৃগনয়নী একটু নড়ে বসে,—আচ্ছা, বাবা তুমি ত' কলকাতায় ছিলে?

—হ্যাঁ।

—কলকাতায় মানুষগুলো কেমন?

—রামতারণ ওর অর্থহীন প্রশ্ন শুনে একটু হাসেন।

—শুনেছি নাকি পাশে কেউ মরে গেলেও চোখ ফিরিয়ে দেখে না? মৃগনয়নীই আবার বলে।

সব মানুষই যে এমন তা নয়। ভাল মানুষও আছে।

তবে বেধাহয় বেশীর ভাগই এই রকম?

—তাও ঠিক নয়। —রামতারণ আস্তে আস্তে বলেন,—কি জান। সবাই কাজে কর্মে ব্যস্ত। বসে থাকবার চোখ ফেরাবার সময় মানুষের কম।

মৃগনয়নী কর্মব্যস্ত মানুষের চেহারাগুলো কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করে।

রামতারণ বলেন,—কিন্তু হঠাৎ কলকাতার কথা কেন?

মৃগনয়নী বাবার কাছে যেন ধরা পড়ে গেছে।

—বলে,—এমনি। কলকাতায় জিনিষের দাম বুঝি খুব বেশী।

—এখানকার চেয়ে বেশী। সহর কিনা! মানুষের টাকাও বেশী।

—টাকা কি করে বেশী হয় বাবা!

—ওখানে ব্যবসাবাণিজ্য বেশী কিনা, টাকার লেনদেন বেশী হয়।

—চাকরী বোধহয় একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়?

রামতারণ মৃদু মৃদু হাসেন.—কেন বলত'? তোর এত খোঁজে কি দরকার পড়ল?

মৃগনয়নী বলে ফেলেই লজ্জিত হয়।

আর না। ভাগ্যিস বাবা জানেন না বনবিহারী কলকাতায় গেছে! জানলে কি লজ্জায়

পড়ত।

—কলকাতার কথা এত কি দরকার?

—এমনি,—বলেই উঠে পড়ে মৃগনয়নী।

উঠে বাড়ীর ভেতর চলে আসে। একবার ভাবে পুঁটিদির ঠাকুর ঘরে যাবে। কিন্তু কারো সঙ্গ ভাল লাগে না। সোজা শোবার ঘরে চলে আসে।

প্রদীপটা বাড়িয়ে দেয়।

আবার পা ছড়িয়ে বসে। চিঠিখানি পেটকোমরের আঁচল থেকে বার করে আবার তারপর পড়তে থাকে। কতক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে ছিল কে জানে! হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে চিঠিটা মুঠোয় লুকিয়ে ফেলে। বৌঠান।

বৌঠান ডাকতে এসেছে,—খাবে এস ঠাকুরকন্যা।

একটু ইতস্তত করে মৃগনয়নী।

মনের ওপর কথাটি ভেসে ওঠে, রাত্রে ভাত জুটে নাই। বনবিহারীর বিশুষ্ক মুখ।

—না, বৌঠান একদম খিদে নেই আজ।

—তা হোক দুটিখানি মুখে দিয়ে যাও!

—পেটটা ভাল নেই বৌঠান। খেতে পারব না।

—খাবে না তবে?

—না।

বৌঠান চলে যায় খেতে।

চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। বনবিহারীর অসহায় পিঙ্গল চোখদুটি ওকে বিভ্রান্ত করে তোলে। হাতদুটোর তালুর ঘামে চিঠিখানা ভিজে ওঠে। মৃগনয়নীর মাথাটার ভেতর কেমন যেন ফাঁকা মনে হয়। কিছু ভাবতেই পারে না। চুপ করে শুয়ে পড়ে ও। শুয়ে পড়লে কি হবে, ঘুম আর আসে না। চোখদুটো অকারণেই বুঁজে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলো অকস্মাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। কানের পাশে একটা মশা ভন্‌ভন্‌ শব্দ করে পাক খায়। একটা মশার জ্বালায় যেন অস্থির হয়ে ওঠে মৃগনয়নী। উঠে বসতে হয় ওর।

একটু পরে পুঁটি আসে ঘরে।

পুঁটি আর মৃগনয়নী এক ঘরেই শোয়।

একটা পান চিবোতে চিবোতে আসে পুঁটি,—হ্যাঁরে, আজ কিছু খেলিনে?

মৃগনয়নী ও কথার উত্তর না দিয়ে বলে,—কি মশা দেখেছিস্‌ পুঁটিদি?

পুঁটি বিছানায় এসে বসে।

ও কথার উত্তর না দিয়ে পুঁটি আবার বলে,—খেলি না কিছু?

—না। শরীরটা ভাল নেই।

পুঁটি এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে আর কথা না বলে শুয়ে পড়ে। চোখদুটো বোঁজে। মৃগনয়নীই আবার ডাকে,—কিরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ও পুঁটিদি!

—উঁ!

—রোজ শিবপুজো করে তোর কি মনে হয় রে?

—বেশ ভাল।—পুঁটির ঘুম পেয়েছে।

হঠাৎ বলে মৃগনয়নী,—আমিও কাল থেকে কোরব।

—পুঁটি চোখ বুঁজেই বলে,—বেশত'।

—কাল ডাকবি কিন্তু আমায়।

—পুঁটি হুঁ বলে পাশ ফেরে।

মৃগনয়নী বোঝে পুঁটিদির ঘুম পেয়েছে।

বর খোঁজ নেয় না, তবু ঘুম পায়! কি মেয়ে পুঁটিদি!

বোধহয় শিবপুজোর গুণে। তাই কি? হ্যাঁ, তার আগে পুঁটিদের ঘুম ছিল না চোখে। পুঁটিদি নিজেই বলেছে। মনের ভেতরটা মনে হোত বড্ড ভার-ভার।

এখন যেন পুঁটিদি অনেক হাল্কা। অনেক সহজ।

শিবপুজো করবে মৃগনয়নী। নিশ্চয়ই করবে।

নিয়মগুলো সব শিখে নিতে হবে পুঁটিদির কাছ থেকে। সোমবার বোধহয় উপোস করতে হবে। একটুখানি একটি জীবন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। তার জন্যে ওর উপোস করা হবে না।

কিন্তু বনবিহারী? বনবিহারী যে রাত্রে ভাত খেতে পায়নি! হয়ত আরও কতদিন পাবে না।

এরপর দুবেলাই যদি ভাত না জোটে? ভাবতে পারে না মৃগনয়নী। ময়লা বালিসের ওয়াড়ের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ওয়াড়টা ভিজে ওঠে একটু পরেই।

এমনি করেই কি রোজ রাত কাটবে?

কাটলও তাই। অনেকগুলো রাত কেটে গেল। আরও দুমাসের ওপর।

এর ভেতরে কি আর একখানাও চিঠি দিতে নেই? আর একটা মানুষ যে তার জন্যে ভেবে ভেবে রাতের পর রাত চোখ চেয়ে কাটাত একথা কি একবারও মনে করতে নেই?

রাগে দুঃখে মৃগনয়নী যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

পুঁটি ইদানীং কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে।

বলে,—হ্যাঁরে, চিঠিপত্তর কিছু পাসনি তার?

মৃগনয়নী যেন বিরক্ত হয়। পুঁটিদি কি ওকে নিজের দলে টানতে চাইছে?

পুঁটিদি কি জানে না যে বনবিহারী ওর বরের মত নয়। বনবিহারীর সঙ্গে কার তুলনা হয়!

—মন খারাপ করে কি লাভ বল?

মৃগনয়নী ফস্ করে রেগে ওঠে,—মন খারাপ হলে ত' দরদ দেখাবে। আন্দাজে দরদ দেখাতে এসেছ কেন বলত'?

পুঁটি বলে,—না, তা নয়। চিঠি না পেলে ত' অমন হয়।

মৃগনয়নী তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে,—ভেবেছ বুঝি সবাই তোমার মত?

পুঁটির মুখখানায় অকস্মাৎ যেন মেঘ করেছে মনে হয়। মৃগনয়নী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বেরিয়ে গিয়ে সোজা চলে যায় কর্তামার ঠাকুর ঘরের দিকে।

ঠাকুর ঘরে ঢোকা আর হয় না। যেতে যেতেই মনে ওর তোলপাড় করতে থাকে। ছি, ছি, এ কি কথা বলে এলো ও। কি করে ও এমন কঠিন কথা উচ্চারণ করতে পারল! নিজের মাথাটা নিজের ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছে। আবার ফিরে আসে ঘরে। এসে দেখে পুঁটি উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। রোগা ফরসা শরীরটি ওর থেকে থেকে কাঁপছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মৃগনয়নী। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তারপর।

(ক্রমশঃ)

শাশ্বতী

[illegible]কুমার গুপ্ত

এই সব ঘরদোর, ঢেঁকি, মাচা, কুসুমের ফেনা—
মনে হয় যেন কত চেনা!
জানালার পাশে জাম-নিমের বীণায়
যত গান ঝরে—জানে মন;
ভোরের শিশিরে রোদে যে কথাটি করে বলি বলি,
আঙিনায় কপোতকূজন,
কমলসখীর রসকলি,—
সব যেন স্মৃতিময় মনে পড়ে যখন তোমায়!

কতবার আমাদের মনে
ফুটেছে এ নীলাকাশ মেঘ,
তুলেছে হিল্লোল হাওয়া-রোদের আবেগ;
জীবনের খড়কুটো পাতা নিয়ে রঙিন সময়
গড়েছে কালের মোহনীড়,
পাখির ডানায় স্বপ্ন লীলায়িত উতল নির্জনে:
ঘাসে ফুলে ব্যাপ্ত সুনিবিড়
কামনার পাণ্ডুলিপি, বেদনার আলেখ্য অক্ষয়।

আমার শাশ্বতী তুমি। কখনো তোমাকে
হারাতে পারি না আমি। পৃথিবীর কোনো পথবাঁকে
সহসা সাক্ষাৎ হবে জানি;
আবার রাঙাবো মোহে আকাশের পরিচিত মুখ,
প্রেমের লাবণ্যে মুছে প্রাণের অসুখ
গ'ড়ে যাব আলো-ছায়া-তৃণ-ফুলে স্বপ্ন-রাজধানী।

পরম লগ্ন

শোভন সোম

উজান-ভাঁটার নানাবিধ হাওয়া লাগে তার পালে
সকালে বিকালে;
সকালে যে পাখি নীড় ছেড়ে ভাসে দূর নীলিমায়
বিকালে তাদের শেষ ছায়া রাঙা-জল ছুঁয়ে যায়,
ভেঙে ভেঙে পড়ে রঙীন আভার
মেঘের পাহাড়।

নিশীথিনী মেলে তারকা খচিত ওড়না আকাশে
দূরের চাঁদের মুখ জলে ভাসে;
এধারে ওধারে তীরে ঝোপে ঝাড়ে অযুত জোনাকি.
কোনখানে ডাকে রাত জাগা পাখি।

উজান-ভাঁটার নানাবিধ হাওয়া টেনে নেয় পাল
সকাল বিকাল,
যেন যাদুকরী প্রতি মুহূর্তে এঁকে চলে ছবি
আপন খেয়ালে, রক্ত করবী
পশ্চিমে আর পূর্বে ফোটায়,
দুপুরের জল ভরে ঝিকিমিকি রোদের হীরায়।

দু'টি চোখ ভ'রে আকণ্ঠ পান করে সে অমৃত
সকাল বিকালে: মনে জাগে প্রীত
অমিয় মথিত
অমর্ত্য-সুর
সে-সুরের স্বরলিপি লেখে মন. তবুও সুদূর
অপ্রকাশিত যে ভাষার বেদনা. সে বেদনা তাকে বিক্ষত করে
নীরব প্রহরে
যখন সে হয় মুখোমুখী তার নিজের সঙ্গে
তখনি সে বোঝে, স্থির জলে প্রাণ জাগবে এবার গতি-তরঙ্গে॥

অনিবার্যতা

সম্প্রতি ভারতের সুপ্রীম কোর্ট দক্ষিণাঞ্চলের এক মন্দিরে (মহীশূরের বেঙ্কটরমণ মন্দির) সব শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে যে সমর্থনসূচক রায় দিয়েছেন তা থেকেই অনুমান করা যায়, ভারতবাসীর ধর্মীয় মনোভাব কী নিদারুণ হাস্যকর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বেঙ্কটরমণ মন্দিরের অছিবর্গের যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে এ মামলার অভ্যুদয় তা হ'ল সেই আদিম চিত্তসংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি। সমকালীন গণতান্ত্রিক যুগজীবনে এই সংকীর্ণ ব্রাহ্মণত্ব যে ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রে একটা বিকট অট্টহাস, এ কথা জেনেও আদিমপ্রবৃত্তির এমন সুপরিকল্পিত বিকাশ ঘটছে কি ভাবে তা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু বিকাশ ঘটছে এবং সম্ভবত এ জাতীয় মূঢ়তার বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সাবধানতা সত্বেও ঘটবে।

বর্তমানে ধর্মজগতের অবস্থা টালমাটাল। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি তাই নিদারুণ মূঢ়তা। কারণ, ধর্মের অনিবার্যতা যখন তার পোষাকী প্রয়োজন, তখন নতুন করে বিধিনিষেধ প্রচারের ধারণাটাই সাবভারসিভ্—এ যুগে মোটামুটি এটুকু আশ্বাস দেখি যে পৃথিবীর সব জাতিই একান্ত ধর্মনির্ভর এবং বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাই হ'ল সবচেয়ে বেশী। তারপর নিরাকারত্ব, পৌত্তলিকতা বা নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি বিশ্বাসগুলো হ'ল শাখা, শ্রেণী বা সম্প্রদায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ধর্ম সংস্কার ও তার আচরণের পরে দায়িত্ব-বোধ খুব ব্যাপক।

একটা কাল ছিল যখন ধর্মের সংগে বিরোধ ঘটিয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উন্মেষ দেখানো হ'ত। ধর্মকে অস্বীকার করা, তার সংগে কোনপ্রকার আপোষ না করা ছিল বুদ্ধি-দর্পী প্রতিভার স্বাক্ষর। প্রতিভার একটা বিশেষ আধার ছিল ধর্ম। সে যুগ এখন অতীত। অন্তত মৌলিক তত্ব অবতারণার অন্যতম আধার আজ আর ধর্ম নয়—তার গোঁড়ামি বা সংস্কার-বোধ ত' নয়ই। কারণ প্রতিভা বিচারের পক্ষে ধর্মের অনিবার্যতা আজ অবাস্তব, তার আবেদন আজ হ্রস্ব। সুতরাং বৈপ্লবিক উৎসাহে ভাঁটা পড়ার সংগত কারণ আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল পৃথিবীতে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল যে কল্যাণ বিশ্বাসের ওপর, সেই বিশ্বাসটা আজ অব্যবহৃত কেন! ধর্ম সৃষ্টির যুগ থেকে আজ অব্দি যত ধর্মমত, পথ প্রচারিত হয়েছে। ঠিক তত বিলুপ্তও হয়েছে। পুরোনো ধর্মপ্রথা নতুন আলোয় উদ্দীপ্ত হয়েছে। জীর্ণতার সংস্কার হয়েছে। আবার ধর্মহীন গোঁড়ামির বহুল প্রসারের সাথে সাথে আসল ধর্মমত নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এমন সময় গেছে যখন ধর্মই হয়েছে রাষ্ট্রের প্রধান অংগ। ধর্ম-প্রচার হয়েছে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। সে সময় ধর্ম বাদ দিয়ে মানুষ, সমাজ বা রাষ্ট্র কোন কিছুই কল্পনা করা সম্ভব হয় নি। তখন ধর্ম মানুষকে উৎসাহ দিয়েছে, সমাজকে দিয়েছে নীতি শিক্ষা আর রাষ্ট্রকে শুনিয়েছে সংযম, সদাচার আর কল্যাণের বাণী। ফলে শিল্প, সাহিত্য সবই গড়ে উঠেছে ধর্মের এক সুকঠিন অথচ অদৃশ্য ইঙ্গিতে। ধর্মের এই অপ্রতিহত গতিবেগ সে সময় মানুষ, সমাজ বা রাষ্ট্র শ্রদ্ধার সংগেই মেনে নিয়েছে। প্রশ্ন তোলে নি বা

ধর্মসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে তর্ক'ও করে নি। হয়ত এমন তর্ক বা প্রশ্নের অবকাশ ছিল না বলেই করে নি। কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তখনই, যখন ধর্মমত মানুষের জীবন যাত্রার পথকে পিচ্ছিল করেছে। তার নীতিহীন নীতির সায়রে অবগাহন করে যখন সরল বিশ্বাসী মানুষের মনে বিভ্রান্তি এসেছে; এবং তাই মানুষের বোধ-বুদ্ধি-ধ্যান-জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে ধর্মবিশ্বাসটা এ যুগে হয়ত অব্যবহৃত।

এ ক্ষেত্রে মহীশূরের অপেক্ষাকৃত হীনবল সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশাধিকারের ওপর বিধি-নিষেধ জারী করে সত্যকার মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ এ কালে ধর্ম, যুদ্ধ ও অর্থ এই ত্রিসত্য ভোগসুখের অধিকার একমাত্র বলবানের। বর্তমান 'ওয়েলফেয়ারের' এটিই অন্যতম অনিবার্যতা।

স্পেশিয়ালের পত্র !!

স্বাধীনোত্তর যুগে জীবনধারণকে খুব সহজ করে নেবার একটা আয়োজন চলছে। এর পেছনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত-দলশক্তির প্রবল সমর্থন আছে, এবং সেই কারণে স্থানে অস্থানে এর আবেদন কাটিয়ে ওঠা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। যদিও অনেকে মনে করেন এটা হ'ল সাম্প্রতিক একটা হুজুগ মাত্র।

তা সে যাই হোক, সহজ হওয়ার ও সহজভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনার অনুশীলন খুবই আশাপ্রদ। অস্থায়ী অবস্থার বিপন্নকালে যুক্তির জটিলতা অনেক সময়ই মাবনজীবনে একটা গুরুভার। তা থেকে রেহাই পেতে হ'লে সামগ্রিক নিরপেক্ষতা প্রয়োজন—সে নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রিকও হতে পারে আবার সামাজিকও হতে পারে। স্বাধীন ভারতে এইরকমই এক মানসিক নির্ভরতার ছবি—অলীক নয়, কুয়াশার আবরণে আচ্ছন্ন নয়, অথচ খুব স্পষ্ট, খুব পরিচ্ছন্ন একটা গভীরতা—কল্পনা করতে কত ভাল লাগে।

কিন্তু কল্পনা যেমনই হ'ক, নিরপেক্ষতার মূল্যায়ন নিয়ে যেমনই নাড়াচাড়া হ'ক, একটা অভ্রান্ত সত্য যা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি তা বোধহয় হিপক্রিসি। কেন সে আলোচনাই করি।

কয়েকজন আঞ্চলিক ভাষাবিদ নিয়ে গঠিত ভাষাকমিশনের রিপোর্ট অনেকেই পড়েছেন। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভাব্য অনেক আলোচনাও হয়েছে। নতুন করে তার পুনরাবৃত্তি আমার অভিপ্রেত নয়। অথচ এটুকু হৃদয়ঙ্গম হয় যে একটা ভয়াবহ রকমের সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার চলেছে ভাষা নিয়ে। যেটুকু উল্লেখ্য তা হ'ল অহিন্দী অঞ্চলের একটা স্বাভাবিক আতঙ্কিত অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে' স্পেশিয়ালের পত্র এই আখ্যানে সেকালের নীতিভ্রষ্ট, জ্ঞানহীন, ইংরেজ চরিত্রের অর্বাচীন মনোভাবের এক অতি সুন্দর ছবি আঁকেন। তাঁর স্পেশিয়াল বলে "আমি কিছু কিছু বাঙলা শিখিয়াছি। বাঙালীরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে বলে ডিক্রী, ডিসমিসকে ডিসমিস, রেলকে রেল, ডোরকে ডোর, এবং ডবলকে ডবল ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বাঙলা-ভাষা ইংরেজির একটী শাখা মাত্র।" এ অংশটুকু উদ্ধৃতির কারণ আর কিছুই নয়, অনুরূপ হাস্যকর এবং অর্বাচীন একটী যুক্তিসঙ্কীর্ণতার উদাহরণ তুলে ধরা। আগামী সাত আট বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি ভাষা বর্জন ও সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় প্রথায় হিন্দীর

অভিষেক বন্দনার কল্পনাটি যেমন অযৌক্তিক তেমনি অপরিণামদর্শিতা। অথচ এই অপরিণাম-দর্শন মেনে নেওয়া এবং অবস্থার সঙ্গে সহজ হওয়ার বিদ্যাচর্চার নির্দেশই হ'ল ক্ষমতাপ্রাপ্ত-দলের অত্যাধুনিক অস্ত্র। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় অলংকরণের আন্দোলন চলছে। সে আন্দোলনের পুরোধা তৎকালীন অগ্রজ কেরী সাহেবদের ভুরি ভুরি লেখা আছে। কিন্তু তারও অনেক অনেক আগে থেকে হয়ত বা মানুষ-জাতির বিবর্তনবাদের প্রথমাবস্থা থেকেই মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক প্রণবতা ও মমত্ববোধের ঐতিহাসিক উল্লেখ আছে। ভাষা কমিশন ভ্রান্তবশতই এটুকু স্বীকার করেন না। অহিন্দী অঞ্চলে হিন্দী ভাষার দানবীয় করক্ষেপ একটা কুৎসিৎ সংকীর্ণতা এবং যুক্তি জটিলতা। এটুকু মানতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করছেন। অথচ পরনিপীড়নের এই জ্ঞানহীন তাণ্ডব রেস্ (Race) কোনদিন না কোনদিন মানসিক নির্ভরতার সব শক্তি হ্রাস করবেই এবং সেদিন দেশ জুড়ে নগ্ন আত্মপ্রচারের উৎকট প্ররোচনায় স্বাভাবিকতার গ্রন্থিও শিথিল হবেই।

রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত

ট্রাজেডী প্রসঙ্গে

ট্রাজেডীর সংজ্ঞার দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী নির্দেশিত হয়ে থাকে। ট্রাজেডীর আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে গেলে প্রথমেই গ্রীক ট্রাজেডীর কথা মনে আসে। কারণ নাট্যসাহিত্যের আদি গুরু হচ্ছেন ইসকাইলস। তিনি ট্রাজেডী সৃষ্টি করেন। ট্রাজেডীর অবতারণা করতে হলে প্রথমেই নাটকীয় ও ধর্মীয় প্রভাব এসে পড়ে। গ্রীক ধর্ম ও নাট্যশাস্ত্রের মূল বক্তব্য—যারা অপরাধী তারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। আর এই অপরাধবোধ-তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিয়তির কথা। এ-নিয়তি হচ্ছে ট্রাজেডীর এক রূঢ়, অন্ধ ও অপ্রতিরোধনীয় বস্তু। এ-নিয়তির ওপর মানুষের হাত নাই। আবেষ্টনী ও ঘটনার প্রবাহে পড়ে এ-অন্ধ নিয়তি এমন কাজ করে যা বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। গ্রীক নাট্যসাহিত্যে যে ট্রাজেডীর মধ্যে অন্ধ নিয়তি জুড়ে আছে—সেই নিয়তির বিশ্লেষণ করা দরকার। ট্রাজেডীর প্রথম কথা হচ্ছে দুর্দশা ভোগ। এ দুর্দশা ভোগ না করলে ট্রাজেডী হবে না। এই দুর্দশা সাধারণতঃ নিয়তি ঘটিয়ে থাকে। এই নিয়তিবাদের অবতারণা করলে একটা কথা সবার আগে মনে পড়ে। সে কথাটা আছে প্রকৃতিবাদ। আজকের বিজ্ঞানের যুগে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে। বিজ্ঞানের চাবিকাঠি তার হাতে। বুদ্ধিমান মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে। গ্রীক সভ্যতা বহু দেব-দেবীর ওপর আস্থাবান ছিল। এই দেব-দেবী প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট রূপকে প্রতীক করত। ভারতীয় আর্যদের মত তাদের বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও নানা দেবী তারা স্বীকার করেছিল। এই যে স্বীকার করা কোন রূপকে—তা থেকে প্রমাণ করা যায় তারা সে-সব দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করত। স্বীকার করে নিয়েছে মানুষ এমন কোন বস্তুকে যারা স্বভাবতঃ ভয়ের কারণ হত। ধর্মকে স্বীকার করা মানে ভয়কে স্বীকার করা। এই ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি। এই কারণে দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য স্তব, স্তুতি ও আরাধনা করে মানুষ ভয়কে দূর করবার চেষ্টা করত। ধর্মের প্রথম সোপান হচ্ছে ভয়—এ মতবাদ অনেকে প্রচার করেছেন। মানুষ সব কিছুতে আস্থা রাখতে পারে না।

সেই কারণে অদৃশ্য তৃতীয় বস্তুকে সন্তুষ্ট রাখত। এই তৃতীয় বস্তু রহস্যে আবৃত এবং অত্যন্ত বলবান। তা ছাড়া এ তৃতীয় বস্তুর দয়া নাই। মায়া নাই। এই বস্তুর কোন নাম অবশ্য দেওয়া যায় না, তবু এ জিনিষ অপ্রতিরোধনীয়। দরকার বোধে আমাদের জীবনে এই তৃতীয় অদৃশ্য অন্ধ শক্তিকে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছেন গ্রীক নাট্যকারগণ।

এ-নিয়তি প্রকৃতির অলংঘনীয় বিধান। প্রকৃতির খেয়ালীপণা এ-নিয়তিকে বলা যায়। কথা একটা শোনা যায়—সে কথাটা হচ্ছে—বিধির বিধান, অদৃষ্টের লিখন প্রভৃতি। এ কথা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে কতকগুলো ঘটনা আছে যা ঘটবেই। কোন যুক্তি বা তর্কের অবতারণা না করে এক পামর পৈশাচিক প্রকৃতি সব কিছু নিজের মত করে যাচ্ছে। একটা অদৃশ্য প্রবল আবর্ত্ত এবং এই আবর্ত্তের চাপে মানুষের স্থিরীকৃত ও নির্ধারিত পথ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ট্রাজেডীর অগ্রচারণ হয়ে আছে জীবনের আগে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা শিশু জন্মাল। শিশু কাঁদছে। এই কান্না নিয়ে ট্রাজেডীয়ানরা বলবে ঃ শিশুর জন্ম একটা অভিশাপ—কারণ পাশব আদিম পুরুষ আর প্রকৃতি নারীর এক আদিম পৈশাচিক প্রবৃত্তির স্পৃহা হতে এ শিশু জন্ম নিয়েছে। বিধির খেয়ালী এসে—সৃষ্টির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে অন্ধকার জগতের নাটমঞ্চে হতভাগ্য কাহিনীর প্রবঞ্চিত নায়কের ভূমিকা করে তাকে যেতে হবে। অর্থাৎ তার জন্মের আগে এক পাপাচরণ সুরু হয়েছিল আর সেই পাপের ভার তাকেই বহন করতে হবে। মাতা ও পিতার পাপ সন্তানে বর্তিয়েছে—সে সন্তানকে দুর্দশা ভোগ করতে হবে—এ হচ্ছে প্রকৃতির বিধান। যে জৈব-ঈপ্সা থেকে শিশুর জন্ম সেই জৈববোধ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত নয়। যুক্তি বোধ দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার দরুণ অন্ধ প্রবৃত্তি বড় হয়। যুক্তি হারিয়ে ফেলে এমন কাজে জড়িয়ে পড়তে হয় যেখানে থেকে আর ফিরে আসা যায় না। সামান্য ঘটনার বিচার করতে গিয়ে ভ্রান্তি আসে। এই কারণে ট্রাজেডীতে দুর্ঘটনা, ভুল, সুযোগ, দোষ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বহিরংগগুলো বিরাট আকারে রূপান্তরিত হয়। বুদ্ধি মানুষ হারিয়ে ফেলে। তার ফলে এমন স্তরে এসে পড়তে হয় যেখানে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। পাপ দোষ সব শেষে মৃত্যুতে গিয়ে পরিসমাপ্তি আনে। এই মৃত্যু হচ্ছে উদাস, নিস্পৃহ। মৃত্যু অন্ধকার। মৃত্যুর দেবতা অন্ধ। অন্ধ পৈশাচিক অবক্ষয়ে সেই মৃত্যুর বিলাস। শিশু যেমন পৈশাচিক ধ্যান ধারণার বাণীকে নিয়ে এসেছিল সেইরকম পৈশাচিক মৃত্যুর মধ্যে জড়িয়ে নিজের ধ্বংস আনল। অবশ্য গ্রীক নাট্যসাহিত্যের যুগের পর খৃষ্টধর্ম এক অন্যবাণী এনেছিল। তবু একটা কথা আছে—বংশের ধারা নিয়ে উত্তরসূরী চলে—এ বংশগত ধারণার প্রভাব বর্তমানে পাওয়া যায়।

বংশগত ধ্যানধারণার ফল সুদূরপ্রসারী। এই ধ্যানধারণা মহামতি বিজ্ঞানী ডারউইনের লেখায় দেখা যায়। তা ছাড়া মদ্যপের ছেলে সাধারণতঃ মদ্যপ হয়। জীববিজ্ঞানে এই কথা বলে যে মদ্যপের ছেলে মদ্যপ হয়—এর কারণ পিতার সূক্ষ্ম অনুভূতি সন্তানের ওপর বর্তায়। এইসূক্ষ্ম অনুভূতি ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই সঞ্চারিত কৈবল্য বা সদগুণ ছেলের মধ্যে বর্তায়—রক্তের মধ্যে সে সমস্ত জীবকোষ সমগ্রভাবে কাজ করতে থাকে। এ হচ্ছে বংশগত প্রভাব। বংশগত প্রভাব ট্রাজেডীতে অনেক খানি স্থান জুড়ে আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে দুর্দশাভোগ হচ্ছে ট্রাজেডীর মূল কথা।

অবশ্য অনেক সময় মানুষ ট্রাজেডী আনে নিজের জন্য। মনোবিজ্ঞানের জগৎ ছেড়ে দিন—কারণ মনোবিজ্ঞান সাধারণতঃ কাউকে কোন কাজের জন্য দোষারোপ করে না—কারণ মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী নয়—পারিপার্শ্বিক, বংশগত ও সমাজের বিধান অনুযায়ী মানুষ

কাজ করে। সুতরাং এই কাজ করার মাঝে মানুষকে দোষারোপ করা যায় না।

তবু সামাজিক ক্ষেত্র আছে। এই সামাজিক জীবনের কথা ভেবে মানুষের দোষগুণ বিচার করা হয় কারণ মানুষ সামাজিক বন্ধন স্বীকার করেছে। সাহিত্য সৃষ্টি সমাজকে নিয়ে; উপজীব্য মানুষ সাহিত্যে ও সমাজে। পাপ দণ্ড ও পুরস্কার সামাজিক কাজের জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে।

মানুষ সামাজিক জীব। সে সৃষ্টি করছে। ভগবানের সৃষ্ট মানুষ ভগবানের চেয়ে কম গুণসমম্পন্ন। মানুষ কাজ করে। কখনও প্রজ্ঞার দীপ্তিবোধ দিয়ে কাজ করে। কখনও পশু শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পশুশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ যে-কাজ করে —এবং কাজের জন্য তাকে যে দুর্দশার মধ্যে পড়তে দেখি সেটাই হচ্ছে তার ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিবোধ দ্বারা জীবনের যে বীভৎসতা ফুটে ওঠে তা নিয়ে ট্রাজেডীয়ানরা কাহিনী রচনা করেন। তবে এ-কথা কেউ যেন ভাবেন না বীভৎসতার মধ্যে সৌন্দর্য নাই। বীভৎসতার মধ্যেও সুন্দর রস আছে। পৃথিবীতে খারাপ বলে কিছু নাই। আর মন্দ যদি খারাপ হত তা হলে মন্দ পৃথিবীতে থাকত না। এই মন্দ কু-বোধ জীবনকে সুন্দরভাবে উৎসারিত করছে। অবক্ষয়ের মধ্যে যে মৃত্যু তাতে কী সুন্দর রূপ নাই। অবক্ষয় যদি মানুষের পরিসমাপ্তি হত তা হলে কী এ-জীবন দুঃখের অতীত হত? দুঃখের অতীত, অবক্ষয়ের ওপর এ জীবন। সুতরাং ট্রাজেডীর রস দুঃখের অতীত। ট্রাজেডী দুঃখাতীত। মানুষের সৃষ্ট ভুল ভ্রান্তি ও দুর্ঘটনার মধ্যে যে জীবনের ধ্রুপদী-উদাত্ততা আছে ট্রাজেডী সেই রসকে ফুটিয়ে তোলে।

ট্রাজেডী সৃষ্টির পক্ষে আর একটা বস্তুর অবতারণা করা যেতে পারে। সেটী হচ্ছে মানুষের ঐশী অন্তর। যে অন্তর নিজেকে বিকাশ করতে চায়। প্রকাশ করতে চায়। এর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাশব অদৃশ্য শক্তি। যার স্পৃহা নাই যার যুক্তি নাই। সে-শক্তি অন্ধ—অন্ধকার। কিছুতেই কোন কিছু প্রকাশ করতে দেবে না। আর প্রকাশ করতে গেলে অবক্ষয় আসবে। যাকে প্রকাশ করতে হবে তাকে পাওয়া যাবে—হয়ত ভীষণ অবক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে। কারণ যাকে ভালবাসা যায় প্রকাশ করতে হয় যাকে—তাকেও ত প্রকাশ করতে হয় নিজেকে বিদীর্ণ করে। জীবনের এই অন্ধকার কোন কালে আলোর পরপারে যে-মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবন তাকে প্রকাশ করতে দেবে না। এই অন্ধকারকে কেউ নিয়তি বলেছে—আলো ও যুক্তির বিপক্ষে যার অতন্দ্র সংগ্রাম।

তা ছাড়া আর একটা কথা আছে মৃতের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। মৃত্যুর মধ্যে ঝরে পড়ে মানুষের কৃত পাপ, ভ্রান্তি ও ভুল সব শেষ। আর মৃত্যুই জীবনকে উত্তীর্ণ করে—কারণ ভয় বোধের ভেতর দিয়ে জীবনের অমৃত রস ট্রাজেডীর ভিতর থেকে পরিস্ফুট হতে থাকে।

ভুল না থাকলে সুন্দর প্রকাশ করত কী করে। মানুষের অন্ধ জৈবিক প্রবৃত্তি না থাকলে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হত কী করে। প্রজ্ঞার রূপ পুণ্যের মধ্যে অবস্থিত হবে কী করে যদি পাপ না থাকে—শয়তান না থাকে। মানুষের পরম অন্তর হৃদয়ের সত্য চরম মূল্য দেবে কী করে যদি না মানুষের খণ্ডিত রূপ ছলনা ও কুহকের ভেতর দিয়ে উদ্ঘাটিত না হয়। এ দ্বন্দ্বের মূল হল ট্রাজেডী। তাই দ্বন্দ্ব হচ্ছে নাটকের সব। দ্বন্দ্ব বলতে আবার আমরা মিল বুঝি—এই মিলকে বা ঐক্যকে একক রূপ দেওয়া হয় কু আর সু-কে নিয়ে। ট্রাজেডী এই দ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করে—খণ্ডিত রূপে নিলে এ দুঃখের। পূর্ণভাবে নিলে এ-রস দুঃখের অতীত।

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথঃ— অমল হোম। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দুটাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

"পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ" রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে একখানি উল্লেখনীয় সংযোজন। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীঅমল হোম দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে কাটিয়েছেন। অতএব স্বতই আশা করা যেতে পারে, তিনি কবিজীবনের অনেক অজানা তথ্য আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। এদিক থেকে "জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি" প্রবন্ধটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথে"র অধিকাংশ রচনাই অবশ্য বক্তৃতার অনুলিখন। সবসুদ্ধ মোট পাঁচটি প্রবন্ধে শ্রীঅমল হোম একদিকে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরূপ সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁদের বক্তব্যের প্রতিবাদী আলোচনা যেমন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়েছেন। এবং আমার মতে শেষোক্তদিক থেকেই গ্রন্থটি অধিকতর সার্থক।

অনেকগুলো পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ পার হয়ে যাবার পরও, দুঃখের সঙ্গেই বলছি, রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখ্য কোঠায় পেঁছয়নি। তাছাড়া এসব রচনা পড়ে আমাদের মন তেমন ভরে না। কবির স্নেহাস্পদ যাঁরা এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের রচনার একটি প্রধান দোষ এই যে, সেখানে 'গুরুদেব' নামে এক অতিমানুষের আড়ালে মানুষ রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই হারিয়ে যান। তাঁর সাহিত্য এবং জীবনী-আলোচনা উভয় ক্ষেত্রেই ভক্তি গদগদ ভাবটা যত বেশি দেখা যায়, যুক্তিপ্রবণতা ওতথ্যনিষ্ঠা তত নয়। আলোচ্য গ্রন্থে এ-ত্রুটি অনুপস্থিত। পরন্তু শ্রীঅমল হোম "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য—"রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি করণীয় আমাদের আছে—মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়কে তাঁর পরিপূর্ণ মানবমূর্তিটিকে সর্বজনগোচর করে তোলা।...কোনো কিছুতেই পাই না সেই রবীন্দ্রনাথ—যাঁকে চন্দ্রনাথ বসুমশাই কবিরই কাছে লেখা একখানি চিঠিতে "পুরুষপ্রধান" বলে সম্বোধন করেছিলেন। সেই পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেবার ও নেবার সময় এসেছে—সেই মানুষ রবীন্দ্রনাথের। সে-মানব অতি-মানব নয়, প্রাকৃতচিত্তহারী অলৌকিক-পুরুষ নয়, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সকাতর বৈরাগী নয়—এই ধরণীর ধূলোট-উৎসবে ধূলিলিপ্ত-বাস মানুষের-পাশে-দাঁড়ানো মানুষ রবীন্দ্রনাথ—দুঃখে-শোকে অবিচলিত, কর্তব্যে দৃঢ়নিষ্ঠ, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ, প্রেমে দীপ্ত—পরিপূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথ।" যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিকট থেকে দেখেছেন, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছেন, তাঁদের কেউই আপন কর্তব্য সমাধা করেননি। শ্রীঅমল হোমও একই দোষে দোষী। কারণ তিনি দীর্ঘকালের নীরবতা ভাঙলেন আমাদের একটি চটি বই উপহার দিয়ে।

বছর কয়েক আগে বাংলা দেশের সাম্যবাদী পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনার নামে কতকগুলো প্রলাপোক্তি ছাপা হয়েছিল। "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে শ্রীঅমল হোম তার জবাব দিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের কবি; তিনি শুধু এঁকেছেন তাঁর কাব্যে, গল্পে,

উপন্যাসে বড়লোকদের ছবি; দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন কি তা তিনি জানেন না, গরীব লোকের খবর তিনি রাখেন না"—সাম্যবাদী লেখকদের এই শ্রেণীর উক্তির প্রতিবাদে তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার উল্লেখ করে ও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে শুধু রাজামহারাজারই সাক্ষাৎ মেলে না— সেখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ—যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন কাটাতে হয়। অবশ্য সাম্যবাদী লেখকরা আজ তাঁদের মত পরিবর্তন করেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, কোন্ লেখক তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে গরীবদের জন্যে কতখানি চোখের জল ফেলেছেন, তার পরিমাপে সাহিত্যবিচার করা কোনক্রমেই উচিত নয়। এতে প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। এবং রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারে এই ভ্রান্তি খুব চোখে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচকরা—তিনি সাম্যবাদীই হোন আর র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টই হোন—সাহিত্য সম্পর্কে কতকগুলো একপেশে ধারণার কষ্টিপাথরে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করতে গিয়েই বিপদ ঘটিয়েছেন। যে-রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে নানা দিকে বিকশিত করে তুলেছেন, তাঁর বিচার কী অত সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে হতে পারে? য়ুরোপের অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবন উচ্ছৃংখল বলেই কী উচ্ছৃংখলতা বরণীয়? আসল কথা, য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের চিত্তমুক্তি ঘটলেও, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধ্যানধারণায় ফারাক আসমান-জমিন। এই সহজ কথাটা রবীন্দ্রসাহিত্যের সাম্প্রতিক সমালোচকের মনে রাখা দরকার (অধুনা যে-সব বাঙালী লেখক মর্বিডিটির অনুশীলনে রত কথাটা তাঁদেরও স্মরণ করতে বলি)। "সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅমল হোম উক্ত সমালোচকের মন্তব্যসর্বস্ব রচনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

আজকাল বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সম্মেলন আর সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে একাধিক সম্মেলন সাতদিনব্যাপী হয়। এই সাত-দিনে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনার ব্যবস্থা থাকে বটে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয়ের দিকেই ঝোঁকটা পড়ে বেশি। তাছাড়া প্রায়ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইসব সম্মেলনের উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে কোন খোঁজখবরই রাখেন না। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি তাই দেশের সুধীব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ এবং আশঙ্কিত করেছে। শ্রীঅমল হোম মশায়ের সুস্পষ্ট অভিমত, "এইভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আজ রবীন্দ্র-বারোয়ারিতে পরিণত হতে চলেছে। তাতে এসে লেগেছে সরস্বতী-পুজোর হৈ-হুল্লোড় হুজুগের ঢেউ। লঘুতা, চপলতা, বাচালতা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশি জায়গাতেই তার বিশিষ্ট লক্ষণ।...কেন এ-সব উৎসব এমন হৈ-হুল্লোড়ে পরিণত হচ্ছে? কেন এ-সব উৎসব শুধু নাচ-গান আর অভিনয়েই পর্যবসিত? কেন কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ এবং লক্ষ নিয়ে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে না, এ-প্রশ্নের উত্তর যদি আমাকে দিতে বলেন, তবে আমি বলব—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে উৎসব-কর্তাদের সম্যক পরিচয়, এমন কি কোনো কোনো স্থানে আংশিক পরিচয়ও নেই বলেই। আমি এ-ক্ষেত্রে অধিকারীভেদ মানি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনে সকলেরই, সব প্রতিষ্ঠানেরই অধিকার আছে, একথা আমি স্বীকার করি না।" উদ্ধৃত অংশে শ্রীঅমল হোম যা বলেছেন, স্পষ্টতই আমরা তার বিপরীত মত পোষণ করি। কেন করি বলছি।

সম্প্রতি পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ্যে আবালবৃদ্ধবণিতা যে মেতে উঠছেন, তার মধ্যে হুজুগপ্রিয়তার খাদ হয়ত খানিকটা মেশানো থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-মনোভাবও কার্যকরী

যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য কত-কিছু করেছেন। এই লোকোত্তর প্রতিভার জন্মোৎসব করা উচিত। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নাচ-গান-অভিনয় প্রাধান্য পায় অস্বীকার করিনা। কিন্তু নৃত্যনাট্য, নাটক বা সঙ্গীত এগুলো ত রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। এবং তাঁর প্রতি আমাদের এত শ্রদ্ধা এইজন্যেই যে, শিল্প ও সাহিত্যের যাবতীয় ক্ষেত্রে তিনি অনায়াসে পদচারণা করেছেন। জনৈক আধুনিক সমালোচকের রবীন্দ্রসঙ্গীত-সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে শ্রীঅমল হোম এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি উদ্ধার করেছেন—"তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান—এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীর শোকে-দুঃখে, সুখে-আনন্দে আমার গান না গেয়ে উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।" (সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা, পৃঃ ১২৭) রবীন্দ্রজয়ন্তী-অনুষ্ঠানে যদি বস্তাপচা বক্তৃতার চেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে, তাতে উষ্মা প্রকাশ করা অর্থহীন। না-হয় ধরে নিলাম, রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রসাহিত্যে পণ্ডিত নয় এবং তারা হুজুগপ্রিয়, ফিল্মী সঙ্গীতের ভক্ত। কিন্তু রবীন্দ্ররচনার সংস্পর্শে এদের চিত্তশুদ্ধি ঘটবে না তাই বা কে বলতে পারে। সুতরাং অধিকারীভেদের কথাটি নেহাৎই অবান্তর। এক্ষেত্রে যদি অধিকারী-ভেদের প্রশ্ন তোলা হয়, তবে অন্য ক্ষেত্রেও এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি যদি বলি, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে চলেন না, তাঁদের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচনার কোন অধিকার নেই, তাহলে কী কবির অসংখ্য স্নেহভাজন ব্যক্তি তা মেনে নেবেন?

আগেই বলেছি, "জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি" প্রবন্ধটিতে বহু তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। আর, এটিই আলোচ্য গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান রচনা।।

হীরেন বসু

পশ্চিম বঙ্গের জনবিন্যাসঃ—বিমলচন্দ্র সিংহ। বিশ্ব ভারতী।

কোন দেশের জন-সংখ্যার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় নৈসর্গিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে। বাংলা দেশের একটা ভৌগলিক স্বরূপ আছে—সেইটী হইতেছে নদী-মাতৃক সমতল-ভূমি। ইহার অর্থ এ নয় যে বাংলা দেশে কোনও পাহাড় বা টিলা বা উঁচু-নীচ জমি নাই। যেখানেই সমতলভূমি সেইখানেই বাঙ্গালী। শ্রীহট্টের সমতলভূমিতে বাঙ্গালী, আর পার্শ্ববর্তী গারো প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িয়া জাতিসমূহ। রাঁচি পাহাড়িয়া জায়গা, অপেক্ষাকৃত উচ্চ মালভূমির উপর অবস্থিত; এই মালভূমি ক্রমে ক্রমে ঢালু হইয়া বাংলার সমতলভূমির সহিত মিশিয়াছে। রাঁচি হইতে পুরুলিয়া আসিবার পথে জোন্‌হা (বর্তমানে গৌতমধারা) জল-প্রপাতের কাছে এই মালভূমি হঠাৎ কয়েকশত ফুট নামিয়া মানভূমের সমতলক্ষেত্রের সহিত মিশিয়াছে। বাঙ্গালীও মানভূম হইতে অগ্রসর হইয়া রাঁচি জেলার তামাড় প্রভৃতি পাঁচটী পর-গণায় বসতি স্থাপন করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বেকার অখণ্ড বঙ্গ বা সুবে বাংলার বা এই ভৌগলিক বঙ্গের ক্ষুদ্র ংকাংশ মাত্র। মোটামুটী এক চতুর্থাংশ। ইহার বর্তমান জন-বিন্যাসের কথা আলোচনা করিতে হইলে পূর্বকালের কথা মায় ইংরাজ আমলের কথাও আলোচনা করিতে হয়। সুধী লেখক অল্প কথায় তাহার যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছেন; এবং এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের

বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন গঙ্গার মূলস্রোত ক্রমাগত পূর্বাভিগামী হওয়ায় বহুনদী মজিয়া যাওয়ায়, বিশদ আলোচনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছেন। কেবল একটী বিষয়ে লেখক কোনও আলোচনা করেন নাই। সেইটী হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক হইতে ম্যালেরিয়া বা Burdwan fever-এর উৎপাতে যে দারুণ লোক-ক্ষয় তথা পশ্চিমবঙ্গে লোক-বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে। যতদূর জানা যায় ১৮১২ সালে বর্ধমান বিভাগে লোক-সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ছিল ৬০০ জন করিয়া; আর ১৮৭২ সালে প্রথম আদম-সুমারীর গণনায় ৬১০ জন করিয়া। অর্থাৎ ৬০ বৎসরে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১·৭ জন। ইহার মধ্যে আছে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খাদের নবাগত শ্রমিক। আছে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলা হইতে বিতাড়িত সাঁওতাল। বুকানন-হ্যামিল্টনের গণনানুযায়ী রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ১৯,১১৪ বর্গ মাইলে ১৮০৭-১৪ সালে লোক-সংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষ। ১৮৭২ সালের আদম-সুমারীতে এই তিন জেলার ১৯২৪২ বর্গ মাইলে লোক-সংখ্যা হয় ৭০ লক্ষ। অর্থাৎ লোক-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল শতকরা ১৯ জন করিয়া। এই সম্বন্ধে আলোচনা থাকিলে পুস্তিকাটী স্বয়ং সম্পূর্ণ হইত বলিয়া মনে করি।

লেখক পশ্চিম-বঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিসাব, পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক বিন্যাস, বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত, লোক-চলাচল ও বহিরাগতদের সম্বন্ধে বহু তথ্যমূলক আলোচনা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গ যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা ঘন-বসতিপূর্ণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সম্বন্ধে আলোচনাটী আরও বিশদ হইলে ভাল হইত। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান সমান হওয়াই স্বাভাবিক—যদিও নানা কারণে কোন দেশেই ঠিক সমান সমান নহে। বাংলায় তথা পশ্চিমবঙ্গে নারীর অনুপাত পুরুষের তুলনায় ১৮৭২ সাল হইতে দ্রুত কমিতেছে। আগন্তুকদের বাদ দিয়া দেশের সহজ (natural population) লোক-সংখ্যা ধরিলেও এই কমতি দেখা যায়। ইহার কারণ সম্বন্ধে বা ইহার জন্য যে সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে লেখকের ন্যায় সুধী ব্যক্তির বক্তব্য শুনিবার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই হিন্দুপ্রধান। পূর্ব-বঙ্গ হইতে ব্যাপক ভাবে হিন্দুর আগমনে হিন্দুর সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় হিন্দুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে ও হইতেছে। আমাদের মনে হয় মুসলমানদের তুলনায় একই দেশে বাস করিয়া হিন্দর বৃদ্ধি যে কম তাহার একটা বড় কারণ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকা। এ সম্বন্ধে লেখক কিছু আলোচনা করেন নাই। হয়ত পুস্তিকার বিস্তৃতি ভয়ে লেখক করেন নাই।

মোটের উপর পুস্তিকাখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। শিক্ষিত সমাজ ইহা পাঠে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন; এবং আরও অনেক বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ হইবে।

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

জীবন তীর্থ :—বেলা দেবী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

সীতার স্বয়ংবর ঃ— শচীন্দ্রনাথ বসু। একক প্রকাশন। দাম—২৲।
কয়েকটি রং ঃ— সুব্রতেশ ঘোষ। মিত্রালয় ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—২৲।

বাংলা সাহিত্যের জমিনে গল্প উপন্যাস অনেকটাই আশা ও আশ্বাসের বস্তু। বিষয় বস্তুর দিক থেকে, কাহিনী নির্বাচনের দিক থেকে, বলার ভঙ্গীর দিক থেকে সব দিক দিয়েই বাঙালী কথা সাহিত্যিকেরা আজ আগ্রহশীল। তাঁদের নজর আজ বিশেষভাবে নিবদ্ধ নতুন আঙ্গিকের দিকে। ছোটগল্পে উপন্যাসে বাঙ্লা সাহিত্য আজ বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী একথাও কোন কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। আলোচ্য বই-এর মধ্যে দুটো উপন্যাস আর একটা ছোটগল্পের বই। তিনটিই এ বছরে প্রকাশিত। বই বাজারে উপন্যাসের বেশ কাটতি আছে। প্রকাশকের দৃষ্টি সমকালীন চাহিদার তালে তাল রেখে চলাতে হয় তাই প্রচুর উপন্যাস তাঁরা অন্য পুস্তকের তুলনায় প্রকাশ করছেন। অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা যাচ্ছে লেখকরা বড় গল্পকে টেনেটুনে বাড়িয়ে উপন্যাস বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। ফলে যদিও সার্থক উপন্যাস সেগুলোকে সব সময়ে বলা শক্ত হয়ে উঠছে। সমকালীন পাঠক এক নিমেষের অবসরে অনেক-খানি জীবনের উত্থানপতনের, চড়াই উৎরাই-এর ভাঙ্গা গড়ার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান। বেলা দেবীর জীবন তীর্থ এই মিলনান্তক উপন্যাসটির মধ্যে পাঠক সেই রকম একটি ভাঙ্গা গড়ার বেদনার্ত অথচ মিষ্টি, করুণ অথচ ঐশ্বর্যমণ্ডিত কাহিনী কথার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। শচীন্দ্রনাথ বসুর সীতার স্বয়ংবর স্বাধীনতার ঠিক পরেই বাঙলীর উ'চুতলার একদিকের একটি ছবি। কাহিনীর পরিবেশনায় কিছু প্রহসনের ছোঁয়া আছে। সুব্রতেশ ঘোষের কয়েকটি রং আটটি ছোটগল্পের সংকলন। অধিকাংশ গল্পই মিষ্টি।

পাঠকমনকে অনেকখানি শেষ পরিণতির দিকে আকর্ষণ করে বেলা দেবী প্রথম উপন্যাসেই তাঁর ভবিষ্যত সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাহিনীর প্রথমটা আমাদের পরিচিত। সচরাচর এমন ঘটনা দেখা যায় যে কলেজের ছাত্র সহপাঠিনীর প্রতি অনুরাগে পড়েছেন এবং শেষে জীবন সঙ্গিনী করেছেন। এই জীবন তীর্থ উপন্যাসে বেলা দেবী তাঁর প্রধান নায়িকা সুমিত্রাকে একটু সেণ্টিমেণ্টাল করেছেন। তাই ইন্দ্রজিত মায়ের অমতে সুমিত্রাকে বিয়ে করায় বিবাহিত জীবনে সুমিত্রা শাশুড়ির কাছ থেকে কথার খোঁটা শুনে শুনে শেষে বাবার সঙ্গে দেশের বাড়ী চলে যান। সেখান থেকে আবার পশ্চিমে পিতৃবন্ধুর বাড়ী গিয়ে ইন্দ্রজিতকে বাবাকে দিয়ে চিঠি লেখালেন সে সুমিত্রা কয়েকদিনের অসুখে ছেড়ে চলেগেছেন। মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে সুমিত্রা স্কুল চালাতে থাকলো পশ্চিমে। এখানে আবার গোড়ায় আর একটু ঘটনা আছে ইন্দ্রজিতের মা তার বান্ধবীর কন্যার সঙ্গে চেয়েছিলেন পুত্রের বিবাহ দিতে যার জন্যে তাঁর সুমিত্রার প্রতি এত বিরূপ মনোভাব। মাতৃবিয়োগের পর ইন্দ্রজিত দ্বিতীয় পক্ষের বউ অশ্রুকন্যাকে নিয়ে পশ্চিমে স্বাস্থ্যোদ্ধারে গেলেন এবং শেষে সেখানেই অশ্রু-কন্যাকে হারালেন কিন্তু ফিরে পেলেন আকস্মিক ভাবে সুমিত্রাকে জীবন তীর্থের পথে। এই খানেই উপন্যাসের বেদনার মধ্যে মিষ্টি মধুর সমাপ্তি। উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে সামাজিক ও সাংসারিক কলহের একটি বাস্তব ও সুন্দর আভাস সুমিত্রার বিবাহিত জীবনের গোড়ায় রয়েছে। শেষদিকে লেখিকা পরিণতির জন্যে একটু বেশি মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছেন বলেই মনে হয় কিন্তু সংলাপ এতই ঘরোয়া যে আমাদের পাঠ করার সময় মনকে সহজেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

কাহিনীর সরসতার জন্যে সীতার স্বয়ংবর শচীন্দ্রনাথ বসুর লেখায় উপভোগ্য হয়েছে। মিসেস সিনার কন্যা সীতার বিয়ের জন্যে এক পার্টির আয়োজনের দুটি সন্ধ্যা ও দুটি সকালের

পটভূমিকায় সাত কাহিনী সীমাবদ্ধ। হাল্‌কাভাবের কাহিনী হলেও বলার ভংগী লেখকের মনোজ্ঞ। মূল চরিত্র এবং পার্শ্ব চরিত্রগুলোর চিত্রণেও কাহিনীটি পাঠের পক্ষে উপভোগ্য।

সুব্রতেশ ঘোষের গল্পবলার হাত মিষ্টি। ছোট গল্পগুলোর মধ্যে গল্পের রস আছে। চুরি, বিক্রি, ক্লান্তি। অনুক্ত, প্রতীক, অভিনেত্রী, মদনভস্ম, ছাড়াও প্রভৃতি কয়েকটি গল্প এক একটি রঙের প্রলেপ আমাদের মনে বুলিয়ে দিয়ে যায়। গল্পের ভাব-রঙে মন রাঙিয়ে ওঠে। সব কাহিনীরই পটভূমিকা বর্তমানের সমস্যাসংকুল সমাজ, সমকালীন নিম্ন মধ্যবিত্ত অভাব অনটনের সমাজ অথবা একটু ভালবাসার,—ভাললাগার পরিবেশ। তারওপর গল্পের ভাষা সুন্দর ব্যঞ্জনা বহুল। তাই ছোট গল্পের আবেদন সহজ হয়েছে। সুব্রতেশ ঘোষের কাছ থেকে আরও সুন্দর গল্পের আশা করা মনে হয় আমাদের অন্যায় হবে না।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

মঞ্জুষাঃ— সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা। অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ভারতবর্ষ হইতে যে কয়খানি সংস্কৃতভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে ভাষাসৌষ্ঠবে, বিষয়গৌরবে ও নিয়মিত প্রকাশে মঞ্জুষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও সরস অথচ প্রাদেশিকতা, অশুদ্ধতা বা অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট নয়। এই পত্রিকায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয় দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর বিষয়গুলির এরূপ সরস জ্ঞানগর্ভ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর কোন পত্রিকায় পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সংখ্যায় (জুলাই, ১৯৫৭) প্রথমেই 'আভাণকমালা' প্রবন্ধে গ্রীক লাটিন ইংরাজী ফ্রাসী ও জার্মান কতগুলি প্রবাদ সংস্কৃত অনুবাদের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা পরম উপাদেয়। "ভট্টিকাব্যপ্রয়োগবিমর্ষ" প্রবন্ধে "বসুনি তোয়ং ঘন বন্ধ্যকারিৎ" এই চরণটি শুদ্ধ কিনা তাহা বিবেচিত হইয়াছে। "বঙ্গভাষায়াং সংস্কৃতশব্দাঃ প্রবন্ধে বঙ্গভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলির যুক্তাযুক্তত্ব বিচার করা হইয়াছে। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাঁচ" প্রবন্ধটি অপূর্ব্ব। যাঁহারা সংস্কৃতব্যকরণের আলোচনা করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অভিনিবেশ সহকারে এই প্রবন্ধ পাঠ করা উচিৎ। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক-গণের মত উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক মহাশয় নিজমত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। Shelley কবির "Cloud" এর সুন্দর পদ্যানুবাদ আছে। "বেদান্তবিমর্ষঃ" প্রবন্ধে পণ্ডিতপ্রবর চারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য মহাশয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বেদান্তদর্শনের আলোচনা করিতেছেন। মঞ্জুষার রসমঞ্জরীর রসাস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। এত সহজ সরল ভাষায় যে এমন রসের সৃষ্টি করা যায় তাহা আমরা জানিতাম না। গ্যেটে কবির Ohne Hast, aber ohne Rast ও বোয়ালোর Hatey-vous lendement—ইত্যাদি সমগ্র শ্লোকদুইটি সংস্কৃত পদ্যানুবাদের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এরূপ সরল সংস্কৃতভাষায় উচ্চস্তরের নানাবিধ শাস্ত্রের তথ্যবহুল পত্রিকা বাংলা-দেশে আর একটিও নাই। এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

মঞ্জু সেনগুপ্ত